শ্রীশ্রীমায়ের কথা



উদ্বোধন কার্যালয়
কলিকাতা

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

[অখণ্ড]

উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা

প্রকাশক ঃ
স্বামী সত্যব্রতানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলকাতা - ৭০০ ০০৩

মুদ্রক ঃ
ট্রায়ো প্রসেস
পি ১২৮, সি.আই.টি. রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০১৪

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে উপস্থিত থেকে তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত অমৃতময়ীবাণী ও উপদেশ শ্রবণ করার মহাসৌভাগ্য অর্জন করে যাঁরা ধন্য হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যেই তাঁর কয়েকজন সন্ন্যাসী ও গৃহী সন্তান সেগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। কয়েকজনের বিবরণী 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রিত সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী অরূপানন্দজী শ্রীশ্রীমায়ের দুর্লভ সান্নিধ্যে দীর্ঘকাল বাস করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তাঁরই আন্তরিক প্রয়াসে ও উৎসাহে 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' সংগৃহীত হয়েছিল। তজ্জন্য আমরা সকলেই তাঁর নিকট অশেষ ঋণী।

তদানীন্তন 'প্রবাসী' সম্পাদক ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত পত্রিকার ১৩৩১ সালের বৈশাখ সংখ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী সংক্ষেপে আলোচনা করেছিলেন। উক্ত জীবনীটি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করার জন্য তাঁর অনুমতিলাভ করে আমরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

ইতিপূর্বে শ্রীশ্রীমায়ের কথাসমূহ 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' ১ম ও ২য় ভাগে এবং ১ম ভাগের চতুর্দশ সংস্করণ ও ২য় খণ্ডের দশম সংস্করণ পর্যন্ত উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ১ম ভাগে শ্রীমতী সরলাবালা দাসী লিখিত 'পরিচয়' ও শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 'প্রবাসী' পত্রিকায় আলোচিত 'সারদামণি দেবী' এবং ১ম ভাগের চতুর্দশ সংস্করণে 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'-র লেখক-লেখিকাদের নামসমূহ বিবরণীতে যথাসম্ভব সংগৃহীত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল।

শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় তাঁর অভূতপূর্ব মহিমময় জীবন ও বাণীর প্রতি দেশে ও বিদেশের অগণিত ভক্ত-চিত্তের আকর্ষণ ক্রমবর্ধিত হয়ে চলেছে। তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূরণার্থে ও সুবিধার্থে গ্রন্থের দুটি পৃথক ভাগ একত্রিত করে এখন একটি গ্রন্থে প্রকাশিত হলো। আশা করি, শ্রীশ্রীমায়ের অনুরাগী ভক্ত পাঠকবৃন্দ এ গ্রন্থ পাঠ করে খুবই উপকৃত হবেন।

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীমায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ সন্তানগণ তাঁহার নিকট আসিয়া যে-সব কথাবার্তা শুনিতেন তাহা অনেকেই নিজ নিজ 'ডাইরী'তে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের কয়েকজনের বিবরণী 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'-শীর্ষক নিবন্ধে 'উদ্বোধনে' ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণের কল্যাণকর বিবেচনায় উহাই পুনর্মুদ্রিত হইয়া পুস্তকাকারে বাহির হইল।

স্বামী অরূপানন্দের আন্তরিক চেষ্টা ও উৎসাহেই 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' সংগৃহীত হইয়াছিল; শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্যে দীর্ঘকাল বাস করিবার তাঁহার সৌভাগ্য হইয়াছিল। বর্তমান সংস্করণের জন্য তাঁহার কাছে আমরা অশেষ ঋণী।

তদানীন্তন 'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত পত্রিকায় ১৩৩১ সালের বৈশাখ সংখ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছিলেন। উহা এই পুস্তকের সহিত সন্নিবিষ্ট করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া তিনি আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রাখিয়াছেন।

বর্তমান সংস্করণে 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'-র বিবরণীতে লেখক-লেখিকাদের নামগুলি যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়া ছাপান হইল। ইহাতে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিলে তাহা আমাদিগকে অনুগ্রহপূর্বক জানাইলে বাধিত হইব। নিবেদনমিতি—

উদ্বোধন কার্যালয় **প্রকাশক**

২৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ

দ্বিতীয় ভাগ

লেখক ঃ **পৃষ্ঠা**

পরিচয়

১৭৭৫ শকাব্দ, ১২৬০ সাল ৮ পৌষ, বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণাসপ্তমী তিথি, রাত্রি ২ দণ্ড ৯ পল, ইংরেজী ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দ, ২২ ডিসেম্বর বাঁকুড়া জেলায় জয়রামবাটী গ্রামে জননী সারদেশ্বরী জন্মগ্রহণ করেন।

জয়রামবাটী গ্রামে শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অতি নিষ্ঠাবান ধার্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন, মা তাঁহারই তনয়ারূপে ধরণীকে কৃতার্থ করিতে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন।

১২৬৬ সালে শ্রীশ্রীমার বয়স যখন মাত্র ছয় বৎসর তখন যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার শুভ পরিণয় হয়। ইহার প্রায় সাত বৎসর পরে তিনি শ্বশুরালয় কামারপুকুরে প্রথম আসেন।

এই যে বিবাহ, ইহা একটি আশ্চর্য পরিণয়। শোনা যায়, বিবাহের পূর্বেই রমণীগণের বন-ভোজনস্থলে ঠাকুর ও মা যখন নিজ নিজ জননীর সঙ্গে বন-ভোজনে আসিয়াছিলেন তখন তাঁহাদের প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ইহার পর যখন ঠাকুরের নানাস্থানে বিবাহ সম্বন্ধ হইতেছিল তখন কন্যা যে নির্দিষ্ট হইয়াই আছেন এ কথা ঠাকুর স্পষ্টই জানাইয়াছিলেন এবং জয়রামবাটী গ্রামের সেই ছয় বৎসরের কুমারীটিই তাঁহার মনোনীতা ও নিরূপিতা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কিন্তু বিবাহের পর সেই মনোনীতা পত্নীর জন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় নাই। প্রায় সাত বৎসর পরে ১২৭৩ সালে মা কামারপুকুরে প্রথম আসেন। নিতান্ত অল্পবয়স বলিয়া এতদিন তাঁহাকে আনা হয় নাই। ইহার পাঁচ বৎসর পরে ১২৭৮ সালে ফাল্গুন মাসে মা দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আসেন। দক্ষিণেশ্বরে মা নহবতে থাকিতেন। অতি প্রত্যূষে কেহ উঠিবার পূর্বেই তাঁহার স্নান প্রভৃতি হইয়া যাইত। মন্দিরে কর্মচারী অনেক, অতিথি ও সাধুসন্ন্যাসীর সমাগমও যথেষ্ট, কিন্তু কেহই তাঁহার ছায়াটি পর্যন্ত দেখিতে পাইত না। ঠাকুর সর্বদাই ভাবে মগ্ন রহিতেন আর সেই ভাবাবেশেই তাঁহাকে যা কিছু সম্ভাষণ করিতেন তাহাতেই মায়ের আনন্দের সীমা থাকিত না। যতটুকু স্বামীর সেবাকার্যের ভার পাইতেন তাহাই তাঁহাকে পরিতৃপ্ত রাখিত এবং সেই তৃপ্তিতেই তিনি পরমানন্দিতা রহিতেন।

ইহার পর ১২৮০ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে ফলহারিণী কালীপূজার দিন রাত্রে ঠাকুর মাকে ষোড়শীপূজা করেন এবং তাঁহাদের অপূর্ব দাম্পত্য সম্বন্ধের এইটিই সম্পূর্ণ পরিচয়।

আগেই বলিয়াছি, এই বিবাহ একটি আশ্চর্য পরিণয়। ভাবুকের মনে ইহাতেই হরগৌরীর দাম্পত্যমাধুর্য-চিত্র জাগরিত হয়। সম্পূর্ণ কামগন্ধহীন একান্ত প্রীতিপূর্ণ এই যে

দাম্পত্যপ্রেম, জগৎ-সংসারে ইহার অনুরূপ কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব নয়। অথচ ইহা এমন সহজ ও সরলভাবপূর্ণ যে বিন্দুমাত্রও অস্বাভাবিকতা তাহাতে নাই। একবার মা পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে আসিতেছেন, তখন পথ হারাইয়া পথে বিপন্না হইয়া দস্যুর ন্যায় বলিষ্ঠ ও ভীষণ আকৃতির এক অপরিচিত ব্যক্তি ও তাহার স্ত্রীর দেখা পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে পিতৃ সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "বাবা, আমি পথ হারিয়েছি। তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে থাকেন—সেইখানে আমি যাচ্ছি।" এই 'তোমার জামাই' কথাটিতে মায়ের সরল ও প্রীতিপূর্ণ মনের ভাবটি কি সুন্দরভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে! ঠাকুরের সেবার প্রত্যেক খুঁটিনাটি কাজে মায়ের কত আনন্দ! সব সময়ই নিতান্ত লজ্জাশীলা কুলবধূর ন্যায় অতি মৃদু আচরণ—যেন হ্রী-র শোভন গুণ্ঠনে মা সর্বদাই গুণ্ঠিতা, অথচ সঙ্কোচহীন সহজ ভাব। পথ ভুলিয়া জনশূন্য মাঠে বলিষ্ঠ ভীষণাকৃতি অপরিচিতের সঙ্গে সাক্ষাতে মা যে ভাবে অতি সহজে "বাবা, আমি পথ হারিয়েছি" এবং "তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে থাকেন" বলিয়া তাহাকে এক কথাতেই পরমাত্মীয় করিয়া লইয়াছিলেন—অতি সাহসিকা কোন বয়োধিকাও তাহা পারেন কি না সন্দেহ। অথচ মা নিতান্ত সরলা গ্রাম্য মেয়ে মাত্র। স্বামি-সন্দর্শনের আশায় অতিমাত্র আনন্দিতা হইয়া পথ চলিতেছেন, তাঁহার অনভ্যস্ত পথক্লেশে তাঁহাকে ক্লিষ্টা করিতে পারিতেছে না, কোন আশঙ্কাই তাঁহার মনে উদ্বেগের ছায়াপাত করিতে পারিতেছে না, আবার সকলের উপরেই তাঁহার আত্মীয়ভাব এবং সে আত্মীয়তার প্রভাব অতিক্রম করিবার মতো শক্তি কাহারও আছে কি না সন্দেহ।

মা সরলা, মা গ্রাম্য কুমারী, লেখাপড়াও শিখেন নাই। কত সময়ে মা যেন জগৎসংসারে কিছুই বুঝেন না, তাঁহার সরলতায় এমনই মনে হইতে পারে, কিন্তু সেই সরলতার ভিতর গভীর বুদ্ধিমত্তা অঙ্গাঙ্গিভাবে সন্নিবেশিত। পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত 'লীলাপ্রসঙ্গ' হইতে একটি স্থান মাত্র এখানে উদ্ধৃত করিলাম—"দক্ষিণেশ্বরে একদিন দিনের বেলায় আমাদের পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে পান সাজিতে ও তাঁহার বিছানাটা ঝাড়িয়া ঘরটা ঝাঁটপাট দিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিতে বলিয়া ঠাকুর কালীঘরে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে দর্শন করিতে যাইলেন। তিনি ক্ষিপ্রহস্তে ঐ সকল কাজ প্রায় শেষ করিয়াছেন, এমন সময় ঠাকুর মন্দির হইতে ফিরিলেন—একেবারে যেন পুরাদস্তুর মাতাল! চক্ষু রক্তবর্ণ, হেথায় পা ফেলিতে হোথায় পড়িতেছে, কথা এড়াইয়া অস্পষ্ট অব্যক্ত হইয়া গিয়াছে। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া ঐ ভাবে টলিতে টলিতে একেবারে শ্রীশ্রীমাব নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীমা তখন একমনে গৃহকার্য করিতেছেন, ঠাকুর যে তাঁহার নিকট ঐ ভাবে আসিয়াছেন তাহা জানিতেও পারেন নাই। এমন সময় ঠাকুর মাতালের মতো তাঁহার অঙ্গ ঠেলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'ওগো, আমি কি মদ খেয়েছি?' তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া ঠাকুরকে ঐরূপ ভাবাবস্থ দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত! বলিলেন, 'না, না, মদ খাবে কেন?' ঠাকুর—'তবে কেন টলছি? তবে কেন কথা কইতে পাচ্ছি না? আমি মাতাল?'

শ্রীশ্রীমা—'না, না, তুমি মদ খাবে কেন ? তুমি মা-কালীর ভাবামৃত খেয়েছ।' ঠাকুর—'ঠিক বলেছ' বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।"

অন্যত্র আবার, ঠাকুর যখন পানিহাটিতে যাইবেন, মাও সঙ্গে যাইতে চাহেন কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। মায়ের সঙ্গিনীরা যাইতে চাহিলেও মা যাইতে চাহিলেন না। ঠাকুব তাহাতে আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "ও খুব বুদ্ধিমতী, যেতে চাইল না। গেলে পরে লোকে বলত—হংস-হংসী একত্রে এসেছে!" মা কেন যাইতে চাহিলেন না সে সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "উনি আমি যাইব কি না জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু 'আমার সঙ্গে যেতে হবে' এ কথা তো বলিলেন না। ইহাতেই আমার মনে হলো—না যাওয়াই ভাল।"

ঠাকুরের সহিত শ্রীশ্রীমার সরল ভাবের বিষয়ে অতিশয় সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। ঠাকুর যেমন গলার ব্যথা কিসে সারে ইহাকে-তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, মাও সেইরূপ অসুখের সময় "কি অসুখ হলো বাপু, একি আর সারবে না মা ! আমায় যে বিছানায় পেড়ে ফেললে। কি করি বল দেখি !" ইত্যাদি বলিতেছেন। আবার শশধর তর্কচূড়ামণি অসুস্থ স্থানে মানসিক শক্তিপ্রয়োগ করিয়া অসুখ সারাইবার কথা বলিতেই ঠাকুর যেমন "পণ্ডিত হয়ে ওকি কথা বল গো! যে মন সচ্চিদানন্দকে দিয়েছি তা কি আবার ফিরিয়ে এনে হাড়-মাসের খাঁচায় দেওয়া যায় ?" দৃঢ়ভাবে এই উত্তর দিয়াছেন, মাও তেমনি যদি কেহ অনুনয় করিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন, "আপনি একবার বলুন 'অসুখ সেরে যাবে', তা হলে নিশ্চয় অসুখ সেরে যাবে।" তা হলে—"তা কি বলতে পারি ? মা, ঠাকুর যা করেন তাই তো হবে ; আমি আর কি বলব ?" ইহা ভিন্ন অন্য উত্তর পাওয়া যায় নাই। যদি কেহ জেদ করিয়া বলিয়াছে, "আপনি একবার মুখে বলুন, তা হলে নিশ্চয় অসুখ সেরে যাবে," তাহা হইলেও "আমি কি তা বলতে পারি ? ঠাকু যা করেন তাই হবে।"—তাঁহার এই একই উত্তর ছিল।

তাঁহার ভালবাসা ক্ষণে ক্ষণে তাঁহাকে নব নব ভাবে বিভাবিত করিত। একজনের একটিমাত্র সন্তান সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছে, তিনি মায়ের নিকট আসিয়া নিজের মনের তাপ জানাইতে গিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন, শ্রীশ্রীমারও চোখে জল, মা বলিতেছেন, "আহা ! তাই তো, একটি মাত্র সন্তান, প্রাণের ধন, এমন করে সন্ন্যাসী হয়ে গেলে মা কি করে প্রাণ ধরে বল দেখি ?" আবার অপর একদিন একজন যখন তাঁহার দুইটি সন্তানই সন্ন্যাসী হইবার জন্য ব্রহ্মচর্য লইয়াছে ইহা জননীর কাছে জানাইয়া বলিতেছেন, "মা, সন্তানের কল্যাণ হয় সেইটিই মায়ের কামনা। কি আছে সংসারে . ছেলে যদি পরম কল্যাণের পথে যায়, তার চেয়ে আনন্দের বিষয় কি আছে ?" মা তখন সহর্ষে বলিতেছেন, "ঠিক বলেছ মা, পরম কল্যাণের পথে যদি ছেলে যায়, তার চেয়ে আনন্দ কি হতে পারে ?" এই যে বিভিন্ন স্থানে মায়ের বিভিন্ন ভাবের উক্তি উভয়ই তাঁহার আন্তরিক ; একটিতে তিনি সন্তানহারা মায়ের দুঃখের সম-অংশিনী, আবার অপরটিতে মা যে সন্তানের প্রকৃত কল্যাণের বিষয় বুঝিয়াছেন ইহা দেখিয়া পরমানন্দিতা।

জননীর অনেক কন্যাই মনে করেন—মা আমাকে অতিশয় ভালবাসেন, কখনও আমাকে ভুলেন না। অযোগ্যা এই দীনা লেখিকাও তাহাদের মধ্যে একজন। মা অতি নিকটেই থাকিতেন, দর্শনের জন্য ইচ্ছাও যে প্রবল হইত না এমন নহে। কিন্তু সঙ্কোচ সব সময়েই বাধা দিত। তথাপি যখনই যতদিন পরেই মায়ের দর্শন পাইয়াছি তখনই মনেপ্রাণে অনুভব করিয়াছি—মা আমাকে একবারও ভুলেন নাই।

সেই অপার স্নেহময়ী জননী যেমন তাঁহার পিতৃহীনা দুঃখিনী স্নেহপাত্রী 'রাধু'-র সকল অত্যাচার অম্লানমুখে সহ্য করিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহার সকল সন্তানেরই অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করিয়াছেন। জয়রামবাটীতে ইদানীং ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া তাঁহার শরীর অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল ; সে সময় হয়তো মধ্যাহ্নে বিশ্রাম করিতেছেন এমন সময় বহুদূর হইতে দর্শনপ্রার্থী পথশ্রান্ত ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জননী তখনই তাঁহার পরিচর্যার প্রয়োজনের জন্য বিশ্রাম ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের শতজনের শত আবদার—কেহ বা মায়ের হাতের অন্ন গ্রহণ না করিয়া জলগ্রহণ করিবেন না এই সংকল্প করিয়াছেন মা তখনই রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন ; কেহ বা ধূলিপায়ে মায়ের চরণপূজা করিয়া পরে প্রসাদান্ন গ্রহণ করিবেন বলিয়া আবদার ধরিয়াছেন, স্নেহময়ী সন্তানের সে আবদারও পূরণ করিতেছেন। শত অবুঝ সন্তানের মায়ের উপরে শত দাবী। সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি করুণাময়ী জননী সকল প্রকারেই স্নেহ-সুধায় তাহাকে শান্ত করিতেছেন—মায়ের এই ছবি প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু আবার অনুরূপ দৃঢ়তারও অভাব ছিল না। তাঁহার অসুস্থ অবস্থায় একদিন একজন গৈরিকবস্ত্রপরিহিতা মহিলা তাঁহার চরণদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি মায়ের নিকট দীক্ষা লইবার জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয়া আসিয়াছেন। মা তখন খাটের উপর শুইয়াছিলেন। তিনি যেমন পদধূলি লইবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন, অমনি মা যেন সন্ত্রস্তা হইয়া বলিলেন, "কর কি, কর কি,পায়ে হাত দিও না ; গৈরিকধারিণী সন্ন্যাসিনী তুমি, পায়ে হাত দিয়ে কেন আমাকে অপরাধী কর ?" মেয়েটি নিতান্ত দুঃখিতা হইয়া উত্তর করিলেন, "অনেক আশা করে যে আপনার কাছে এসেছি, আপনি আমায় দীক্ষা দেবেন বলে !"

মা বলিলেন, "ব্যস্ত হলে কি কিছু হয়, মা ? সময় হলে নিজেই হবে। দীক্ষা কি তোমার হয়নি ? গেরুয়া কে দিয়েছেন ? যাঁর কাছে সাধন পেয়েছ, নিষ্ঠা করে তাঁকেই ধরে থাক, সময়ে হবে।"

মেয়েটি অবশেষে বলিলেন, " গেরুয়া কেহ দেন নাই আমি নিজেই ধারণ করেছি। আর যে সাধন-প্রণালী পেয়েছি তাতে মনে শান্তি পাচ্ছি না।"

মা তখন বলিলেন, "আজ আমি বড় অসুস্থ ; তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারলুম না বলে মনে দুঃখ করো না। কিন্তু মা, এটি মনে রেখো, গেরুয়া পরা খুব সহজ নয়। এই যে সব আশ্রমের ত্যাগী ছেলেরা ঠাকুরের জন্য সব ছেড়ে এসেছে, এরাই গেরুয়া পরার

অধিকারী। গেরুয়া পরা কি যার-তার কাজ ?" এই সব বলিয়া মিষ্টি কথায় তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

কিন্তু মা তাঁহাকে পায়ের ধুলা নিতে দিলেন না।

মা অসুস্থা থাকিতেই তাঁহার জন্মতিথির দিন আসিল, সেদিন তাঁহার চরণপূজা করিতে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছে। মা তখন খুব দুর্বল, বারবার জ্বর হইতেছিল। মা পালঙ্কে অবগুণ্ঠিতা হইয়া বসিয়া আছেন, শত শত ভক্ত চরণপূজা করিতে আসিতেছেন, মা সস্নেহে সকলের পূজা গ্রহণ করিতেছেন। ত্বরা সত্ত্বেও পূজায় বহু সময় লাগিল, কিন্তু মা সমভাবেই প্রসন্নময়ীরূপে সন্তানদের অর্চনা গ্রহণ করিতেছেন। এই দৃশ্যটি আজও মনে অঙ্কিত রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীমার স্বরূপ ভাষার তুলি দিয়া আঁকিতে পারি, এমন ক্ষমতা আমার নাই। আমি যখন মার দর্শন পাই নাই, আমার মেয়ে তখন নিবেদিতা স্কুলে পড়িত, তাহার কাছে প্রথম মায়ের প্রত্যক্ষ সংবাদ পাই। তার পূর্বে কেবল মনে কল্পনা লইয়াই তৃপ্ত থাকিতাম। আমার মেয়ে প্রথমে আসিয়া তাঁহার প্রত্যক্ষ সংবাদ জানাইল। সে বলিল, "মা, মাকে আমরা দর্শন করতে গিয়েছিলুম, তিনি যে কত সুন্দর, কত ভাল, তুমি দেখলে বুঝতে পারবে। আমার এত ভাল লেগেছে মা, সে আর কি বলব। কেবলি মনে হচ্ছিল, তুমি যদি একবারটি তাঁকে দেখতে।" তাহার এই কথা শুনিয়া খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া তাহার কাছে মায়ের মধুর প্রসঙ্গ জিজ্ঞাসা করিলাম। সেও আনন্দের সহিত বলিল—কেমন তিনি খাইতে বসিয়া হাসিতে হাসিতে বালিকাদের সম্ভাষণ করিতেছিলেন, অল্পাহারের জন্য গোলাপ-মার কাছে তিরস্কৃতা হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছিলেন, সকলকে তাঁহার প্রসাদ কত স্নেহের সঙ্গে হাতে হাতে ভাগ করিয়া দিতেছিলেন।—সেই ছবিটি যেন তাহার বর্ণনায় মনের মধ্যে আঁকা হইয়া গেল। সেইদিন হইতে তাহার কাছে মায়ের কথা প্রত্যহ শুনিতে পাইতাম, আর মনে অভিমান প্রবল হইয়া উঠিত ; কেবল মনে হইত—সবাইকে আপন করে নিয়ে আমায় কেন এতদূরে রেখেছেন ? অবশেষে একদিন বাঁধ ভাঙিয়া গেল। মায়ের দর্শন পাইলাম।

আজ তিনি দুর্লভ, তিনি ধ্যানগম্য। ১৩২৭ সালের ৪ শ্রাবণ রাত্রি ১টা ৩০ মিনিটের সময় চিন্ময়ী জননী মৃন্ময় ঘট ভাঙিয়া দিয়াছেন, জড়দৃষ্টি আজ তাঁহার দর্শনের অধিকার হারাইয়াছে, কিন্তু জগৎ তাঁহার পাদস্পর্শে পবিত্র হইয়া কি সম্পত্তি লাভ করিয়াছে, তাহাই অনুভব করিবার আজ সময় আসিয়াছে।

শ্রীমতী সরলাবালা দাসী

সারদামণি দেবী

শাস্ত্রে গৃহস্থের প্রশংসা আছে, সন্ন্যাসীরও প্রশংসা আছে। শাস্ত্রে ইহাও লিখিত আছে এবং সহজ বুদ্ধিতেও ইহা বুঝা যায় যে, গার্হস্থ্য আশ্রম অন্য সব আশ্রমের মূল। কিন্তু গৃহস্থমাত্রেরই জীবন প্রশংসনীয় বা নিন্দনীয় নহে, সন্ন্যাসী মাত্রেরও জীবন প্রশংসনীয় বা নিন্দার্হ নহে। ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভগবদ্দত্ত শক্তি, হৃদয়-মনের গতি প্রভৃতির দ্বারা স্থির হয় যে, ভগবান কিরূপ জীবন যাপন করিয়া কি কাজ করিবার নিমিত্ত কাহাকে সংসারে পাঠাইয়াছেন। যিনি যে আশ্রমে আছেন, তদুচিত জীবন যাপন করেন কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া তিনি আত্মপ্রসাদ বা আত্মগ্লানি অনুভব করিতে পারেন। যিনি যে আশ্রমের মানুষ, কেবল সেই আশ্রমের নামের ছাপটি দেখিয়া তাঁহার জীবনের উৎকর্ষ-অপকর্ষ সার্থকতা-ব্যর্থতা নির্ধারিত হইতে পারে না। ব্যক্তি-নির্বিশেষে গৃহস্থাশ্রম অপেক্ষা সন্ন্যাসের বা সন্ন্যাসাশ্রম অপেক্ষা গার্হস্থ্যের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিবেচিত হইতে পারে না।

সাধারণতঃ ইহাই দেখা যায় যে, যাঁহারা সন্ন্যাসী তাঁহারা হয় কখনও বিবাহই করেন নাই, কিংবা বিবাহ করিয়া থাকিলে পত্নীর সহিত সমুদয় সম্বন্ধ বর্জন করিয়া এবং তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গৃহত্যাগী হইয়াছেন। পরমহংস রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু তিনি চব্বিশ বৎসর বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন ' বাল্যকালে যখন তাঁহার বিচার করিবার ক্ষমতা ছিল না, তখন কিংবা তাঁহার অনভিমতে কেহ তাঁহার বিবাহ দেন নাই। তাঁহার বিবাহ তাঁহার সম্মতিক্রমে হইয়াছিল—তাঁহার জীবন-চরিতে লিখিত আছে যে, তাঁহারই নির্দেশ-অনুসারে পাত্রী-নির্বাচন হইয়াছিল। ।কিন্তু তিনি একদিকে যেমন পত্নী লইয়া সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় ঘর করেন নাই, তাঁহার সহিত কখনও কোন দৈহিক সম্বন্ধ হয় নাই, অন্য দিকে আবার তাঁহাকে পরিত্যাগও করেন নাই। বরং তাঁহাকে নিকটে রাখিয়া স্নেহ উপদেশ ও নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহাকে সহধর্মিণীর মতো করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। ইহা তাঁহার জীবনের একটি বিশেষত্ব।

কিন্তু বিশেষত্ব কেবল রামকৃষ্ণের নহে। তাঁহার পত্নী সারদামণি দেবীরও বিশেষত্ব আছে। সত্য বটে রামকৃষ্ণ সারদামণিকে শিক্ষাদি দ্বারা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন; কিন্তু যাঁহাকে শিক্ষা দেওয়া হয়, শিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহার দ্বারা উপকৃত ও উন্নত হইবার ক্ষমতা তাঁহার থাকা চাই। এ·ই সুযোগ্য গুরুর ছাত্র তো অনেক থাকে, কিন্তু সকলেই জ্ঞানী ও সৎ হয় না। সোনা হইতে যেমন অলঙ্কার হয়, মাটির তাল হইতে তেমন হয় না।

এইজন্য সারদামণি দেবীর জীবন-কথা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার কোন জীবন-চরিত নাই। পরমহংসদেবের জীবন-চরিতে প্রসঙ্গক্রমে সারদামণি দেবী সম্বন্ধে স্থানে স্থানে অল্প অল্প যাহা লিখিত আছে, তাহা দ্বারাই কৌতূহল-নিবৃত্তি করিতে হয়। সম্ভব হইলে রামকৃষ্ণ ও সারদামণির ভক্তদিগের মধ্যে কেহ এই মহীয়সী নারীর জীবন-চরিত ও উক্তি লিপিবদ্ধ করিবেন, এই অনুরোধ জানাইতেছি। হয়তো একাধিক জীবন-চরিত লিখিত হইবে। তাহার মধ্যে একটি এমন হওয়া উচিত, যাহাতে সরল ও অবিমিশ্র ভাবে কেবল তাঁহার চরিত ও উক্তি থাকিবে, কোন প্রকার ব্যাখ্যা, টীকা-টিপ্পনী, ভাষ্য থাকিবে না। রামকৃষ্ণের এইরূপ একটি জীবন-চরিতের প্রয়োজন। ইহা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, রামকৃষ্ণমণ্ডলীর বাহিরের লোকদিগের রামকৃষ্ণ ও সারদামণিকে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে বুঝিবার সুযোগ পাওয়া আবশ্যক। মণ্ডলীভুক্ত ভক্তদিগের জন্য অবশ্য অন্যবিধ জীবন-চরিত থাকিতে পারে।

গৃহস্থাশ্রমে রামকৃষ্ণের নাম ছিল গদাধর। "সাংসারিক বিষয়ে তাঁহার পূর্ণমাত্রায় উদাসীনতা ও নিরন্তর উন্মনাভাব দূর করিবাব জন্য" তাঁহার "স্নেহময়ী মাতা ও অগ্রজ উপযুক্ত পাত্রী দেখিয়া তাঁহার বিবাহ দিবার পরামর্শ স্থির করেন।"

"গদাধব জানিতে পারিলে পাছে ওজব আপত্তি কবে, এজন্য মাতা ও পুত্রে পূর্বোক্ত পবামর্শ অন্তরালে হইয়াছিল। চতুব গদাধবেব কিন্তু ঐ বিষয় জানিতে অধিক বিলম্ব হয নাই। জানিতে পাবিযাও তিনি উহাতে কোনরূপ আপত্তি কবেন নাই। বাটীতে কোন একটা অভিনব ব্যাপাব উপস্থিত হইলে বালক-বালিকারা যেরূপ আনন্দ কবিয়া থাকে, তদ্রূপ আচবণ করিযাছিলেন।"

চারিদিকের গ্রামসকলে লোক প্রেরিত হইল, কিন্তু মনোমত পাত্রীর সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন গদাধর বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী গ্রামের শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যার সন্ধান বলিয়া দেন। তাঁহার মাতা ও ভ্রাতা ঐস্থানে অনুসন্ধান করিতে লোক পাঠাইলেন, সন্ধান মিলিল। অল্পদিনেই সকল বিষয়ের কথাবার্তা স্থির হইয়া গেল। সন ১২৬৬ সালের বৈশাখের শেষভাগে শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পঞ্চমবর্ষীয়া* একমাত্র কন্যার সহিত গদাধরের বিবাহ হইল। বিবাহে তিনশত টাকা পণ লাগিল। তখন গদাধরের বয়স তেইশ পূর্ণ হইয়া চব্বিশ চলিতেছে।

গদাধরের মাতা চন্দ্রাদেবী "বৈবাহিকেব মনস্তুষ্টি ও বাহিরেব সম্ভ্রম রক্ষাব জন্য জমিদার বন্ধু লাহা বাবুদেব বাটী হইতে যে গহনাগুলি চাহিযা বধূকে বিবাহের দিনে সাজাইযা আনিয়াছিলেন, কয়েকদিন পরে ঐগুলি ফিবাইয়া দিবার সময যখন উপস্থিত হইল, তখন তিনি যে আবার নিজ সংসারের দারিদ্র্যচিন্তায় অভিভূতা হইয়াছিলেন, ইহাও স্পষ্ট বুঝিতে পাবা যায। নববধূকে তিনি বিবাহেব দিন হইতে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। বালিকার অঙ্গ হইতে অলঙ্কারগুলি তিনি কোন্ প্রাণে খুলিয়া লইবেন, এই চিন্তায়

* তখন কন্যাব "বয়স—পঞ্চম বর্ষ উত্তীর্ণ হইযাছে মাত্র।"

— শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—সাধকভাব' (বিবাহ ও পুনরাগমন)

বৃদ্ধার চক্ষু এখন জলপূর্ণ হইয়াছিল। অন্তরের কথা তিনি কাহাকেও না বলিলেও গদাধরের উহা বুঝিতে বিলম্ব হয নাই। তিনি মাতাকে শান্ত করিয়া নিদ্রিতা বধূব অঙ্গ হইতে গহনাগুলি এমন কৌশলে খুলিয়া লইযাছিলেন যে, বালিকা উহাব কিছুই জানিতে পারে নাই। বুদ্ধিমতী বালিকা কিন্তু নিদ্রা ভঙ্গে বলিয়াছিল, 'আমাব গাযে যে এইরূপ সব গহনা ছিল, তাহা কোথায গেল?' চন্দ্রাদেবী সজলনয়নে তাহাকে ক্রোড়ে লইযা সান্ত্বনাপ্রদানেব জন্য বলিয়াছিলেন, 'মা' গদাধর তোমাকে ঐ সকলের অপেক্ষাও উত্তম অলঙ্কারসকল ইহার পর কত দিবে'।"

চন্দ্রাদেবী যে অর্থে এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন, সে অর্থে না হইলেও অন্য অর্থে ভবিষ্যৎকালে কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল।

"এইখানেই কিন্তু ঐ বিষযেব পরিসমাপ্তি হইল না। কন্যার খুল্লতাত তাহাকে ঐদিন দেখিতে আসিয়া ঐকথা জানিয়াছিলেন এবং অসন্তোষ প্রকাশপূর্বক ঐদিনেই তাহাকে পিত্রালয়ে লইয়া গিয়াছিলেন। মাতাব মনে ঐ ঘটনায বিশেষ বেদনা উপস্থিত হইযাছে দেখিযা গদাধব তাঁহাব ঐ দুঃখ দূব করিবাব জন্য পবিহাসচ্ছলে বলিযাছিলেন, 'উহারা এখন যাই বলুক করুক না, বিবাহ তো আর ফিরিবে না'।"

ইহার পর সন ১২৬৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে সারদামণি সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিলে কুলপ্রথা অনুসারে স্বামীর পিত্রালয় হইতে দুই ক্রোশ দূরবর্তী কামারপুকুর গ্রামে শ্বশুরালয়ে আসিয়াছিলেন।

অতঃপর বহু বৎসর রামকৃষ্ণ কামারপুকুরে ছিলেন না। ১২৭৪ সালে তিনি, যে ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাঁহার সাধনে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহার এবং ভাগিনেয় হৃদয়ের সহিত কামারপুকুরে আবার আগমন করেন।

বহুকাল পরে তাঁহাকে পাইয়া এই দরিদ্র সংসারে এখন আনন্দের হাট-বাজার বসিল এবং নববধূকে আনাইয়া সুখের মাত্রা পূর্ণ করিবার জন্য রমণীগণের নির্দেশে জয়রামবাটী গ্রামে লোক প্রেরিত হইল। বিবাহের পর সারদামণি একবার মাত্র স্বামীকে দেখিয়াছিলেন। তখন তিনি সাত বৎসরের বালিকা মাত্র। সুতরাং ঐ ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহার কেবল এইটুকু মনে ছিল যে, ভাগিনেয় হৃদয়ের সহিত রামকৃষ্ণ জয়রামবাটী আসিলে কোন নিভৃত অংশে লুকাইয়াও তিনি রক্ষা পান নাই। হৃদয় তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া কোথা হইতে অনেকগুলি পদ্মফুল আনিয়া বালিকা মাতুলানী লজ্জা ও ভয়ে সঙ্কুচিতা হইলেও তাঁহার পা পূজা করিয়াছিল। ইহার প্রায় ছয় বৎসর পরে তাঁহাব তের বৎসর বয়সের সময় তাঁহাকে শ্বশুরবাড়ি কামারপুকুর লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে তিনি একমাস ছিলেন, কিন্তু রামকৃষ্ণ তখন দক্ষিণেশ্বরে থাকায় তাঁহার সহিত দেখা হয় নাই। উহার ছয় মাস আন্দাজ পরে আবার শ্বশুরবাড়ি আসিয়া দেড় মাস ছিলেন। তখনও স্বামীর সহিত দেখা হয় নাই। তাহার তিন-চার মাস পর যখন তিনি বাপের বাড়িতে ছিলেন তখন খবর আসিল রামকৃষ্ণ আসিযাছেন, তাঁহাকে কামারপুকুরে যাইতে হইবে। তখন তাঁহার বয়স তের বৎসর ছয়-সাত মাস।

রামকৃষ্ণ এই সময়ে একটি সুমহৎ কর্তব্য সাধনে যত্নবান হইলেন। পত্নীর তাঁহার নিকট আসা-না-আসা সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ উদাসীন থাকিলেও যখন সারদামণি তাঁহার সেবা করিতে কামারপুকুরে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি তাঁহাকে শিক্ষা-দীক্ষাদি দিয়া তাঁহার কল্যাণসাধনে তৎপর হইলেন।

রামকৃষ্ণকে বিবাহিত জানিয়া "শ্রীমদাচার্য তোতাপুরী তাঁহাকে এক সময় বলিয়াছিলেন, 'তাহাতে আসে যায় কি ? স্ত্রী নিকটে থাকিলেও যাহার ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিবেক, বিজ্ঞান সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মে যথার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই যিনি সমভাবে আত্মা বলিয়া সর্বক্ষণ দৃষ্টি ও তদনুরূপ ব্যবহার করিতে পারেন , তাঁহারই যথার্থ, ব্রহ্ম বিজ্ঞান লাভ হইয়াছে, স্ত্রী-পুরুষে ভেদদৃষ্টিসম্পন্ন অপর সকলে সাধক হইলেও ব্রহ্ম বিজ্ঞান হইতে বহুদূরে রহিয়াছে'।"

তোতাপুরীর এই কথা রামকৃষ্ণের মনে উদিত হইয়া তাঁহাকে দীর্ঘকালব্যাপী সাধনলব্ধ নিজের বিজ্ঞানের পরীক্ষায় এবং নিজ পত্নীর কল্যাণসাধনে নিযুক্ত করিয়াছিল। কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইলে তিনি কোন কাজ উপেক্ষা করিতে বা আধসারা করিয়া ফেলিয়া রাখিতে পারিতেন না। এ বিষয়েও তাহাই হইল।

"ঐহিক পারত্রিক সকল বিষয়ে সর্বতোভাবে তাঁহার মুখাপেক্ষী বালিকা-পত্নীকে শিক্ষা প্রদান করিতে অগ্রসর হইয়া তিনি ঐ বিষয় অর্ধনিষ্পন্ন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। দেবতা, গুরু ও অতিথি প্রভৃতির সেবা ও গৃহকর্মে যাহাতে তিনি কুশলা হয়েন, টাকা সদ্ব্যবহার করিতে পারেন এবং সর্বোপরি ঈশ্বরে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া দেশকালপাত্রভেদে সকলের সহিত ব্যবহাব কবিতে নিপুণা হইয়া উঠেন, তদ্বিষয়ে এখন হইতে তিনি বিশেষ লক্ষ্য বাখিযাছিলেন।"

চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময় যখন সারদামণি দেবীর স্বামীর নিকট হইতে শিক্ষালাভ আরম্ভ হয়, তখন তিনি স্বভাবতই নিতান্ত বালিকা-স্বভাব-সম্পন্না ছিলেন।

"কামারপুকুর অঞ্চলের বালিকাদিগের সহিত কলিকাতার বালিকাদিগের তুলনা করিবার অবসর যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি দেখিয়াছেন কলিকাতা অঞ্চলের বালিকাদিগের দেহের ও মনের পরিণতি অল্প বয়সেই উপস্থিত হয়, কিন্তু কামারপুকুর প্রভৃতি গ্রামসকলের বালিকাদিগের তাহা হয় না। পবিত্র নির্মল গ্রাম্য বায়ুসেবন এবং গ্রামমধ্যে যথাতথা স্বচ্ছন্দবিহারপূর্বক স্বাভাবিকভাবে জীবন অতিবাহিত করিবার জন্যই বোধহয় ঐরূপ হইয়া থাকে।"

পবিত্রা বালিকা রামকৃষ্ণের দিব্য সঙ্গ ও নিঃস্বার্থ আদরযত্ন-লাভে ঐ কালে অনির্বচনীয় আনন্দে উল্লসিতা হইয়াছিলেন। পরমহংসদেবের স্ত্রীভক্তদিগের নিকট তিনি ঐ উল্লাসের কথা অনেক সময় এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন ঃ

"হৃদয় মধ্যে আনন্দের পূর্ণ ঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে—ঐকাল হইতে সর্বদা এইরূপ অনুভব করিতাম। সেই ধীর স্থির দিব্য উল্লাসে অন্তর কতদূর কিরূপ পূর্ণ থাকিত তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে !"

কয়েক মাস পরে রামকৃষ্ণ যখন কামারপুকুর হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন, সারদামণি তখন অত্যন্ত আনন্দ-সম্পদের অধিকারিণী হইয়াছেন—এইরূপ অনুভব করিতে করিতে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিলেন।

'উহা তাহাকে চপলা না করিয়া শান্তস্বভাবা করিয়াছিল, প্রগলভা না করিয়া চিন্তাশীলা করিয়াছিল, স্বার্থদৃষ্টিনিবদ্ধা না করিয়া নিঃস্বার্থপ্রেমিকা করিয়াছিল এবং অন্তর হইতে সর্বপ্রকার অভাববোধ তিরোহিত করিয়া মানব সাধারণের দুঃখকষ্টের সহিত অনন্তসমবেদনাসম্পন্না করিয়া ক্রমে তাঁহাকে সাক্ষাৎ প্রতিমায় পরিণত করিয়াছিল। মানসিক উল্লাস প্রভাবে অশেষ শারীরিক কষ্টকে তাঁহার এখন হইতে কষ্ট বলিয়া মনে হইত না এবং আত্মীয়বর্গের নিকট হইতে আদর যত্নের প্রতিদান না পাইলে মনে দুঃখ উপস্থিত হইত না। ঐরূপে সকল বিষয়ে সামান্যে সন্তুষ্ট থাকিয়া বালিকা আপনাতে আপনি ডুবিয়া তখন পিত্রালয়ে কাল কাটাইতে লাগিলেন।"

কিন্তু শরীর ঐ স্থানে থাকিলেও তাঁহার মন স্বামীর পদানুসরণ করিয়া এখন হইতে দক্ষিণেশ্বরেই উপস্থিত ছিল। তাঁহাকে দেখিবার এবং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য মধ্যে মধ্যে মনে প্রবল বাসনার উদয় হইলেও তিনি উহা যত্নে সংবরণপূর্বক ধৈর্যাবলম্বন করিতেন, ভাবিতেন প্রথম দর্শনে যিনি তাঁহাকে কৃপা করিয়া এতদূর ভালবাসিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে ভুলিবেন না—সময় হইলেই নিজের নিকট ডাকিয়া লইবেন।

ঐরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল এবং হৃদয়ে বিশ্বাস স্থির রাখিয়া তিনি ঐ শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। আশাপ্রতীক্ষার প্রবল প্রবাহ বালিকার মনে সমভাবেই বহিতে লাগিল। তাঁহার শরীর কিন্তু মনের ন্যায় সমভাবে থাকিল না, দিন দিন পরিবর্তিত হইয়া সন ১২৭৮ সালের পৌষে তাঁহাকে অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতীতে পরিণত করিল। দেবতুল্য স্বামীর প্রথম সন্দর্শনজনিত আনন্দ তাঁহাকে জীবনের দৈনন্দিন সুখ দুঃখ হইতে উচ্চে উঠাইয়া রাখিলেও সংসারে নিরবিল আনন্দের অবসর কোথায়? —গ্রামের পুরুষেরা জল্পনা করিতে বসিয়া যখন তাঁহার স্বামীকে 'উন্মত্ত' বলিয়া নির্দেশ করিত, 'পরিধানের কাপড় পর্যন্ত ত্যাগ করিয়া হরি হরি করিয়া বেড়ায়' ইত্যাদি নানা কথা বলিত, অথবা সমবয়স্কা রমণীগণ যখন তাঁহাকে 'পাগলের স্ত্রী' বলিয়া করুণা বা উপেক্ষার পাত্রী বিবেচনা করিত, তখন মুখে কিছু না বলিলেও তাঁহার অন্তরে দারুণ ব্যথা উপস্থিত হইত, উন্মনা হইয়া তিনি তখন চিন্তা করিতেন — তবে কি পূর্বে যেমন দেখিয়াছিলাম তিনি সেরূপ আর নাই? লোকে যেমন বলিতেছে, তাঁহার কি ঐরূপ অবস্থান্তর হইয়াছে? বিধাতার নির্বন্ধে যদি ঐরূপই হইয়া থাকে তাহা হইলে আমার তো এখানে থাকা কর্তব্য নহে, পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার সেবাতে নিযুক্তা থাকাই উচিত। অশেষ চিন্তার পর স্থির করিলেন, তিনি দক্ষিণেশ্বরে স্বয়ং গমনপূর্বক চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করিবেন—পরে যাহা কর্তব্য বিবেচিত হইবে তদ্রূপ অনুষ্ঠান করিবেন।"

ফাল্গুনের দোল-পূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মতিথিতে সারদামণি দেবীর দূরসম্পর্কীয়া কয়েকজন আত্মীয়া এই বৎসর গঙ্গাস্নান করিবার নিমিত্ত কলিকাতা আসা স্থির করেন। তিনিও তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা তাঁহার পিতাকে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করায় তি কন্যার এখন কলিকাতা যাইবার অভিলাষের কারণ বুঝিয়া তাঁহাকে স্বয়ং সঙ্গে লইয়া কলিকাতা যাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। জয়রামবাটী হইতে কলিকাতা

রেলে আসা যাইত না, সুতরাং পালকিতে কিংবা পদব্রজে আসা ভিন্ন উপায় ছিল না। ধনী লোকেরা ভিন্ন অন্য সকলকে হাঁটিয়াই আসিতে হইত। অতএব কন্যা ও সঙ্গিগণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হাঁটিয়াই কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলেন।

"ধান্যক্ষেত্রের পর ধান্যক্ষেত্র এবং মধ্যে মধ্যে কমলপূর্ণ দীর্ঘিকানিচয় দেখিতে দেখিতে, অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি বৃক্ষরাজির শীতল ছায়া অনুভব করিতে করিতে তাঁহারা সকলে প্রথম দুই দিন সানন্দে পথ চলিতে লাগিলেন। কিন্তু গন্তব্যস্থল পৌঁছানো পর্যন্ত ঐ আনন্দ রহিল না। পথশ্রমে অনভ্যস্তা কন্যা পথিমধ্যে একস্থানে দারুণ জ্বরে আক্রান্ত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে বিশেষ চিন্তান্বিত করিলেন। কন্যার ঐরূপ অবস্থায় অগ্রসর হওয়া অসম্ভব বুঝিয়া তিনি চটিতে আশ্রয় লইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।"

প্রাতঃকালে উঠিয়া শ্রীরামচন্দ্র দেখিলেন, কন্যার জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। পথিমধ্যে নিরুপায় হইয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। কন্যারও তাহাতে মত হইল, কিছুদূর যাইতে না যাইতে একটি পালকিও পাওয়া গেল। সারদামণি দেবীর আবার জ্বর আসিল। কিন্তু আগেকার মতো জোরে না আসায় তিনি অবসন্না হইয়া পড়িলেন না এবং ঐ বিষয় কাহাকেও কিছু বলিলেনও না। রাত্রি নয়টার সময় সকলে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিলেন।

সারদামণিকে এইরূপ পীড়িত অবস্থায় আসিতে দেখিয়া রামকৃষ্ণ অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন।

"ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর বাড়িবে বলিয়া নিজগৃহে ভিন্ন শয্যায় তাঁহার শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং দুঃখ করিয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন, 'তুমি এতদিনে আসিলে? আর কি আমার সেজবাবু (মথুরবাবু) আছে যে তোমার যত্ন হবে?' ঔষধপথ্যাদির বিশেষ বন্দোবস্তে তিন-চারি দিনেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী আরোগ্যলাভ করিলেন।"

ঐ তিন-চারি দিন রামকৃষ্ণ তাঁহাকে দিনরাত নিজগৃহে রাখিয়া ঔষধপথ্যাদি সকল বিষয়ের স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিলেন, পরে নহবতঘরে নিজ জননীর নিকট তাঁহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সারদামণি এখন বুঝিলেন, রামকৃষ্ণ আগে যেমন ছিলেন, এখনও তেমনি আছেন, তাঁহার প্রতি তাঁহার স্নেহ ও করুণা পূর্ববৎ আছে। তিনি প্রাণের উল্লাসে পরমহংসদেব ও তাঁহার জননীর সেবায় নিযুক্তা হইলেন এবং তাঁহার পিতা কন্যার আনন্দে আনন্দিত হইয়া কয়েকদিন পরে বাড়ি ফিরিয়া গেলেন।

রামকৃষ্ণ পত্নীর প্রতি কর্তব্যপালনে মনোনিবেশ করিলেন। অবসর পাইলেই তিনি সারদামণিকে মানবজীবনের উদ্দেশ্য ও কর্তব্য সম্বন্ধে সর্বপ্রকার শিক্ষাপ্রদান করিতে লাগিলেন। শুনা যায়, এই সময়েই তিনি পত্নীকে বলিয়াছিলেন, "চাঁদা মামা যেমন সকল শিশুর মামা, তেমনি ঈশ্বর সকলেরই আপনার, তাঁহাকে ডাকিবার সকলেরই অধিকার আছে; যে ডাকিবে, তিনি তাহাকেই দর্শনদানে কৃতার্থ করিবেন; তুমি ডাক তো তুমিও

তাঁহার দেখা পাইবে।" কেবল উপদেশ দেওয়াতেই রামকৃষ্ণের শিক্ষাপ্রণালী পর্যবসিত হইত না। তিনি শিষ্যকে নিকটে রাখিয়া, ভালবাসায় সর্বতোভাবে আপনার করিয়া লইয়া তাহাকে প্রথমে উপদেশ দিতেন ; পরে শিষ্য উহা কাজে কতদূর পালন করিতেছে, সর্বদা সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন এবং ভ্রমবশতঃ সে বিপরীত অনুষ্ঠান করিলে, তাহাকে বুঝাইয়া সংশোধন করিয়া দিতেন। সারদামণির সম্বন্ধেও এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। সামান্য বিষয়েও রামকৃষ্ণের এরূপ নজর ছিল যে, তিনি পত্নীকে বলিয়াছিলেন, "গাড়িতে বা নৌকায় যাবার সময় আগে গিয়ে উঠবে আর নামবার সময় কোন জিনিস নিতে ভুল হয়েছে কি না, দেখেশুনে সকলের শেষে নামবে।"

কথিত আছে, সারদামণি একদিন এই সময় স্বামীর পদসম্বাহন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমাকে তোমার কি বলিয়া বোধ হয় ?" রামকৃষ্ণ উত্তর দিয়াছিলেন, "যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়াছেন ও সম্প্রতি নহবতে বাস করিতেছেন এবং তিনিই এখন আমার পদসেবা করিতেছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলিয়া তোমাকে সত্য দেখিতে পাই।" রামকৃষ্ণ সকল নারীর মধ্যে—অতি হীনচরিত্রা রমণীর মধ্যেও বিশ্বের জননীকে দেখিতেন।

'উপনিষৎকার ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী-সংবাদে শিক্ষা দিতেছেন —পতির ভিতর আত্মস্বরূপ শ্রীভগবান রহিয়াছেন বলিয়াই স্ত্রীর পতিকে প্রিয় বোধ হয়, স্ত্রীর ভিতর তিনি থাকাতেই, পতির মন স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে।"

— (বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৫ম ব্রাহ্মণ)।

এই সময় রামকৃষ্ণ ও সারদামণি এক শয্যায় রাত্রিযাপন করিতেন। দেহবোধ-বিরহিত রামকৃষ্ণের প্রায় সমস্ত রাত্রি এই ভাবে সমাধিতে অতিবাহিত হইত। এই সময়ের কথা উল্লেখ করিয়া রামকৃষ্ণ যাহা বলিতেন, তাহাতে বুঝা যায় যে সারদামণি দেবীও যদি সম্পূর্ণ কামনাশূন্যা না হইতেন, তাহা হইলে রামকৃষ্ণের "দেহ-বুদ্ধি আসিত কি না, কে বলিতে পারে ?" পৃথিবীর নানা কার্যক্ষেত্রে অনেক প্রসিদ্ধ লোকের পত্নীদিগের সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তাহারা উঁহাদের সহায় হইয়া উঁহাদের জীবন-পথ সর্ববিধ সাংসারিক বাধাবিঘ্ন হইতে মুক্ত না রাখিলে, উঁহারা এত মহৎ কাজ করিতে পারিতেন না। অনেক মহান লোকের পত্নী কেবল যে পতিকে সংসারের খুঁটিনাটি ও নানা ঝঞ্ঝাট হইতে নিষ্কৃতি দেন তা নয়, অবসাদ, নৈরাশ্য ও বলহীনতার সময় তাহার হৃদয়ে শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করিয়া থাকেন। আমাদের সমসাময়িক ইতিহাসে রামকৃষ্ণের সুস্পষ্ট মূর্তির অন্তরালে সারদামণি দেবীর মূর্তি এখনও ছায়ার ন্যায় প্রতীত হইলেও তিনি সাত্ত্বিক প্রকৃতির নারী না হইলে রামকৃষ্ণও রামকৃষ্ণ হইতে পারিতেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ আছে।

বৎসরাধিক কাল অতীত হইলেও যখন রামকৃষ্ণের মনে একক্ষণের জন্যও দেহবুদ্ধির

উদয় হইল না এবং যখন তিনি সারদামণি দেবীকে কখনও জগন্মাতার অংশভাবে এবং কখনও সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্মভাবে দৃষ্টি করা ভিন্ন অপর কোন ভাবে দেখিতে ও ভাবিতে সমর্থ হইলেন না, তখন রামকৃষ্ণ আপনাকে পরীক্ষোত্তীর্ণ ভাবিয়া ষোড়শীপূজার আয়োজন করিলেন এবং সারদামণি দেবীকে অভিষেকপূর্বক পূজা করিলেন। পূজাকালের শেষদিকে সারদামণি বাহ্যজ্ঞানরহিতা ও সমাধিস্থা হইয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে।

ইহার পরও তিনি অহঙ্কৃতা হন নাই, তাঁহার মাথা বিগড়াইয়া যায় নাই।

ষোড়শীপূজাব পব তিনি প্রায় পাঁচ মাস দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন। তিনি ঐ সময়ে পূর্বের ন্যায় রন্ধনাদি দ্বারা রামকৃষ্ণ ও তাঁহার জননীর এবং অতিথি-অভ্যাগতের সেবা করিতেন এবং দিনের বেলা নহবত ঘরে থাকিয়া রাত্রে স্বামীর শয্যাপার্শ্বে থাকিতেন। সকল প্রকারের খাদ্য ও বন্ধন রামকৃষ্ণের সহ্য হইত না বলিয়া অনেক সময়েই তাঁহার জন্য আলাদা রান্না করিতে হইত। সেই সময় দিবাবাত্র বামকৃষ্ণের "ভাব-সমাধির বিরাম ছিল না" এবং কখন কখনও "মৃতেব লক্ষণসকল তাঁহার দেহে প্রকাশিত হইত।" কখন রামকৃষ্ণের সমাধি হইবে, এই আশঙ্কায় সাবদামণিব বাত্রিকালে নিদ্রা হইত না। এই কারণে তাঁহার নিদ্রাব ব্যাঘাত হইতেছে জানিযা বামকৃষ্ণ নহবত-ঘবে নিজের মাতাব নিকটে তাঁহাব শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপে এক বৎসর চাবি মাস দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া সাবদামণি দেবী সম্ভবতঃ ১২৮০ সালেব কার্তিক মাসে কামারপুকুরে ফিরিয়া আসেন।

তখনকাব কথা স্মবণ কবিযা সাবদামণি দেবী উত্তরকালে স্ত্রী-ভক্তদিগকে বলিতেন ঃ

"সে যে কি অপূর্ব দিব্যভাবে থাকতেন, তা বলে বোঝাবাব নয। কখনো ভাবেব ঘোবে কত কি কথা, কখনো হাসি, কখনো কান্না, কখনো একেবাবে সমাধিতে স্থিব হযে যাওযা—এই বকম, সমস্ত বাত। সে কি এক আবিভাব আবেশ, দেখে ভযে আমাব সর্বশবীব কাঁপত, আব ভাবতুম, কখন বাতটা পোহাবে। ভাব সমাধিব কথা তখন তো কিছু বুঝি না, একদিন তাঁব আব সমাধি ভাঙে না দেখে ভযে কেঁদে-কেটে হৃদযকে ডেকে পাঠালুম। সে এসে কানে নাম শুনাতে শুনাতে তবে কতক্ষণ পবে তাঁব চৈতন্য হয। তাব পব ঐরূপে ভযে কষ্ট পাই দেখে তিনি নিজে শিখিযে দিলেন—এই বকম ভাব দেখলে এই বীজ শুনাবে। তখন আব তত ভয হতো না, ঐ সব শুনালেই তাব আবাব হুঁশ হতো।"

সাবদামণি দেবী বলিতেন—

"এইরূপে প্রদীপে শলতেটি কি ভাবে বাখিতে হইবে, বাড়িব প্রত্যেকে কে কেমন লোক ও কাহাব সঙ্গে কিরূপ ব্যবহাব কবিতে হইবে, অপবেব বাড়ি যাইয়া কিরূপ ব্যবহাব কবিতে হইবে প্রভৃতি সংসাবেব সকল কথা হইতে ভজন, কীর্তন ধ্যান, সমাধি ও ব্রহ্মজ্ঞানেব কথা পর্যন্ত সকল বিষয ঠাকুব তাঁহাকে শিক্ষা দিযাছেন।"

কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক ভদ্রমহিলা দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের দর্শনে আসিয়া নহবতখানায সমস্ত দিন থাকিতেন। বামকৃষ্ণ ও তাঁহার জননীর জন্য রন্ধন ব্যতীত

ইঁহাদের জন্য রান্নাও সারদামণি করিতেন। কখন কখনও বিধবাদের জন্য গোবর গঙ্গাজল দিয়া তিনবার উনুন পাড়িয়া আবার রান্না চড়াইতে হইত।

একবার পানিহাটির মহোৎসব দেখিতে যাইবার সময় রামকৃষ্ণ জনৈক স্ত্রীভক্তের দ্বারা সারদামণি দেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, তিনি যাইবেন কি না—"তোমরা তো যাইতেছ, যদি ওর ইচ্ছা হয় তো চলুক।" সারদামণি দেবী ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন, "অনেক লোক সঙ্গে যাইতেছে, সেখানেও অত্যন্ত ভিড় হইবে, অত ভিড়ে নৌকা হইতে নামিয়া উৎসব দর্শন করা আমার পক্ষে দুষ্কর হইবে, আমি যাইব না।" তাঁহার এই না যাওয়ার সঙ্কল্পের উল্লেখ করিয়া, পরে রামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "অত ভিড়—তাহার উপর ভাব-সমাধির জন্য আমাকে সকলে লক্ষ্য করিতেছিল ও (সারদামণি) সঙ্গে না যাইয়া ভালই করিয়াছে, ওকে সঙ্গে দেখিলে লোকে বলিত—'হংস-হংসী এসেছে'। ও খুব বুদ্ধিমতী।" তারপর পত্নীর বুদ্ধির ও নির্লোভিতার দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলেন—

"মাড়োয়ারী ভক্ত (লছমীনারায়ণ) যখন দশ হাজার টাকা দিতে চাহিল তখন আমার মাথায় যেন করাত বসাইয়া দিল, মাকে বলিলাম, 'মা, এতদিন পরে আবাব প্রলোভন দেখাইতে আসিলি'! সেই সময় ওর মন বুঝিবার জন্য ডাকাইয়া বলিলাম—'ওগো, এই টাকা দিতে চাহিতেছে, আমি লইতে পারিব না বলিয়া তোমার নামে দিতে চাহিতেছে, তুমি উহা লওনা কেন? কি বল?' শুনিয়াই ও বলিল, 'তা কেমন করিয়া হইবে? টাকা লওযা হইবে না—আমি লইলে, ঐ টাকা তোমারই হইবে। কারণ আমি উহা রাখিলে, তোমার সেবা ও অন্যান্য আবশ্যকে উহা ব্যয় না করিয়া থাকিতে পারিব না। সুতরাং ফলে উহা তোমারই গ্রহণ করা হইবে। তোমাকে লোকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে তোমার ত্যাগের জন্য—অতএব টাকা কিছুতেই লওয়া হইবে না।' ওর ঐ কথা শুনিয়া আমি হাঁপ ফেলিয়া বাঁচি।"

যাঁহাকে দরিদ্রতাবশতঃ বিপদসঙ্কুল দুই-তিন দিনের পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাইতে হইত, ইহা সেইরূপ অবস্থার নারীর নিঃস্পৃহতার সুবিবেচনারও অন্যতম দৃষ্টান্ত।

"সারদামণি দেবী পানিহাটিব মহোৎসব দেখিতে না যাওযার কারণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন— প্রাতে উনি আমাকে যে ভাবে যাইতে বলিয়া পাঠাইলেন তাহাতেই বুঝিতে পারিলাম, উনি মন খুলিয়া অনুমতি দিতেছেন না। তাহা হইলে বলিতেন—'হাঁ, যাবে বই কি।' ঐরূপ না করিয়া উনি ঐ বিষয়ের মীমাংসার ভার যখন আমার উপর ফেলিযা বলিলেন, 'ওর ইচ্ছা হয় তো চলুক', তখন স্থির করিলাম, যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করাই ভাল।"

সারদামণি দেবী বাঙালী হিন্দুকুলবধূ, সুতরাং সাতিশয় লজ্জাশীলা ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের বাগানে নহবতখানায় তিনি দীর্ঘকাল স্বামীর ও অতিথি-অভ্যাগতের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন অল্প লোকেই তাঁহাকে দেখিতে পাইত। রাত্রি তিনটার পর কেহ উঠিবার বহু পূর্বেই উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য স্নানাদি সমাপন করিয়া তিনি যে

ঘবে ঢুকিতেন, সমস্ত দিবস আব বাহিবে আসিতেন না, কেহ উঠিবাব বহু পূর্বে নীববে নিঃশব্দে আশ্চর্য ক্ষিপ্রকাবিতাব সহিত সকল কার্য সম্পন্ন কবিযা পূজা-জপ-ধ্যানে নিযুক্তা হইতেন। অন্ধকাব বাত্রে নহবতখানাব সম্মুখস্থ বকুলতলাব ঘাটেব সিঁড়ি বাহিয়া গঙ্গায অবতবণ কবিবাব কালে তিনি এক দিবস এক প্রকাণ্ড কুম্ভীবেব গাত্রে প্রায পদার্পণ কবিযাছিলেন। কুম্ভীব ডাঙায উঠিযা সোপানেব উপব শযন কবিযাছিল। তাঁহাব সাড়া পাইযা জলে লাফাইযা পড়িল। তদবধি সঙ্গে আলো না লইযা তিনি কখনও ঘাটে নামিতেন না। এইরূপ স্বভাব ও অভ্যাস সত্ত্বেও স্বামীর কঠিন কণ্ঠবোগেব চিকিৎসাব জন্য শ্যামপুকুবে অবস্থানেব সময ' এক মহল বাটীতে অপবিচিত পুরুষসকলেব মধ্যে সকল প্রকাব শাবীবিক অসুবিধা সহ্য কবিযা তিনি যে ভাবে নিজ কর্তব্য পালন কবিযাছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয।" ডাক্তাবেব উপদেশ মতো সুপথ্য প্রস্তুত কবিবাব লোকাভাবে ঠাকুবেব বোগবৃদ্ধিব সম্ভাবনা হইযাছে, শুনিবামাত্র সাবদামণি দেবী আপনাব থাকিবাব সুবিধা অসুবিধাব কথা কিছুমাত্র চিন্তা না কবিযা শ্যামপুকুবেব বাটীতে আসিযা ঐ ভাব সানন্দে গ্রহণ কবেন। তিনি সেখানে থাকিযা সবপ্রধান সেবাকাযেব ভাব গ্রহণ কবিযাছিলেন।" তিনি তখনও বাত্রি তিনটাব পূর্বে শয্যা ত্যাগ কবিতেন এবং বাত্রি এগাবটাব পব মাত্র দুইটা পযন্ত শযন কবিযা থাকিতেন। হিন্দুকুলবধূ হইলেও তিনি প্রযোজন হইলে পবসংস্কাব ও অভ্যাসেব বাধা অতিক্রম কবিযা প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সাহসেব সহিত যথাযথ আচবণে কতদূব সমর্থা ছিলেন তাহাব দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি ঘটনাব বিববণ দিতেছি।

স্বল্পব্যযসাধ্য যানেব অভাব অর্থাভাব প্রভৃতি নানা কাবণে সেকালে সাবদামণি দেবী অনেক সময জযবামবাটী ও কামাবপুকুব হইতে দক্ষিণেশ্ববে হাটিযা আসিতেন। আসিতে হইলে পথিকগণকে চাব-পাঁচ ক্রোশব্যাপী তেলোভেলো ও কৈকলাব মাঠ উত্তীর্ণ হইতে হইত। ঐ বিস্তীর্ণ প্রান্তবদ্বযে তখন নবহন্তা ডাকাতদেব ঘাটি ছিল। প্রান্তবেব মধ্যভাগে এক ভীষণ কালীমূর্তি দেখিতে পাওযা যায। এই তেলোভেলোব ডাকাতে কালীব পূজা কবিযা ডাকাতেবা নবহত্যা ও দস্যুতায প্রবৃত্ত হইত। এই কাবণে লোকে দলবদ্ধ না হইযা এই দুইটি প্রান্তব অতিক্রম কবিতে সাহসী হইত না

একদা শ্রীবামকৃষ্ণেব এক ভাইপো ও ভাইঝি এবং অপব কযেকটি স্ত্রীলোক ও পুরুষেব সহিত সাবদামণি দেবী পদব্রজে কামাবপুকুব হইতে দক্ষিণেশ্ববে আগমন কবিতেছিলেন। আবামবাগে পৌঁছিযা তেলোভেলো ও কৈকলাব প্রান্তব সন্ধ্যাব পূর্বে পাব হইবাব যথেষ্ট সময আছে ভাবিযা তাঁহাব সঙ্গিগণ ঐ স্থানে অবস্থান ও বাত্রিযাপনে অনিচ্ছা প্রকাশ কবিতে লাগিল। পথশ্রমে ক্লান্ত থাকিলেও সাবদামণি দেবী আপত্তি না কবিযা তাহাদেব সহিত অগ্রসব হইলেন। তাহাবা ববাবব আগাইযা গিযা তাহাব জন্য অপেক্ষা কবিতে লাগিল, তিনি নিকটে আসিলে আবাব চলিতে লাগিলেন। শেষবাব তাহাবা বলিলেন, এইরূপে চলিলে এক প্রহব বাত্রিব মধ্যেও প্রান্তব পাব হইতে পাবা যাইবে না এবং সকলকে ডাকাতেব হাতে পড়িতে

হইবে। এতগুলি লোকের অসুবিধা ও আশঙ্কার কারণ হইয়াছেন দেখিয়া তিনি তখন তাঁহাদিগকে তাঁহার নিমিত্ত পথিমধ্যে অপেক্ষা করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "তোমরা একেবারে তারকেশ্বরের চটিতে পৌঁছে বিশ্রাম করগে, আমি যত শীঘ্র পারি তোমাদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছি।" তাহাতে সঙ্গীরা বেলা বেশি নাই দেখিয়া জোরে হাঁটিতে লাগিল ও শীঘ্র দৃষ্টির বহির্ভূত হইল। সারদামণি দেবীও ক্লান্তি সত্ত্বেও যথাসাধ্য দ্রুত চলিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রান্তরমধ্যে পৌঁছিবার কিছু পরেই সন্ধ্যা হইল। বিষম চিন্তিতা হইয়া তিনি কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন দীর্ঘাকার ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ এক পুরুষ লাঠি কাঁধে লইয়া তাঁহার দিকে আসিতেছে। তাহার পিছনেও তাহার সঙ্গীর মতো কে যেন একজন আসিতেছে মনে হইল। পলায়ন বা চিৎকার বৃথা বুঝিয়া তিনি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই লোকটা তাঁহার কাছে আসিয়া কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা এসময়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছ?" সারদামণি বলিলেন, "বাবা, আমার সঙ্গীরা আমাকে ফেলে গেছে, আমিও বোধ হয় পথ ভুলেছি; তুমি আমাকে সঙ্গে করে যদি তাহাদের নিকট পৌঁছিয়ে দাও। তোমার জামাই দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির কালীবাড়িতে থাকেন। আমি তাঁহার নিকট যাচ্ছি। তুমি যদি সেখান পর্যন্ত আমাকে নিয়ে যাও তা হলে তিনি তোমায় খুব আদরযত্ন করবেন।" এই কথাগুলি বলিতে না বলিতে পিছনের দ্বিতীয় লোকটিও তথায় আসিয়া পৌঁছিল এবং সারদামণি দেবী দেখিলেন সে লোকটি পুরুষটির পত্নী। তাহাকে দেখিয়া বিশেষ আশ্বস্তা হইয়া তিনি তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে বলিলেন, 'মা, আমি তোমার মেয়ে সারদা, সঙ্গীরা ফেলে যাওয়ায় বিষম বিপদে পড়েছিলাম; ভাগ্যে বাবা ও তুমি এসে পড়লে, নইলে কি করতাম বলতে পারি নে।"

সারদামণির এইরূপ নিঃসঙ্কোচ সরল ব্যবহার, একান্ত বিশ্বাস ও মিষ্ট কথায় বাগদী পাইক ও তাহার স্ত্রীর প্রাণ এমনি গলিয়া গেল। তাহারা সামাজিক আচার ও জাতির পার্থক্য ভুলিয়া সত্যসত্যই তাঁহাকে আপনার কন্যার ন্যায় দেখিয়া তাঁহাকে খুব সান্ত্বনা দিতে লাগিল এবং তিনি ক্লান্ত বলিয়া আর তাঁহাকে অগ্রসর হইতে না দিয়া নিকটস্থ গ্রামের এক দোকানে লইয়া গিয়া রাখিল। রমণী নিজ বস্ত্রাদি বিছাইয়া তাঁহার জন্য বিছানা করিয়া দিল এবং পুরুষটি দোকান হইতে মুড়ি-মুড়কি কিনিয়া তাঁহাকে খাইতে দিল। এইরূপে পিতামাতার ন্যায় আদর ও স্নেহে তাঁহাকে ঘুম পাড়াইয়া ও রক্ষা করিয়া তাহারা রাত কাটাইল এবং ভোরে উঠিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তারকেশ্বরে পৌঁছিল। সেখানে এক দোকানে তাঁহাকে রাখিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। বাগদিনী তাহার স্বামীকে বলিল, "আমার মেয়ে কাল কিছুই খেতে পায় নি, বাবা তারকনাথের পূজা শীঘ্র সেরে বাজার হতে মাছ তরকারি নিয়ে এস; আজ তাকে ভাল করে খাওয়াতে হবে।"

বাগদী পুরুষটি ঐসব করিবার জন্য চলিয়া গেলে সারদামণি দেবীর সঙ্গী ও সঙ্গিনীগণ তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তিনি নিরাপদে

পৌঁছিয়াছেন দেখিযা আনন্দ প্রকাশ কবিতে লাগিল। তখন তিনি তাঁহাব বাত্রে আশ্রযদাতা বাগদী পিতামাতাব সহিত তাঁহাদেব পবিচয কবাইযা দিযা বলিলেন, "এবা এসে আমাকে বক্ষা না কবলে কাল বাত্রে যে কি কবতুম, বলতে পাবি না।"

তাহাব পব সকলে আবাব পথ চলা আবম্ভ কবিবাব জন্য প্রস্তুত হইলে সাবদামণি দেবী ঐ পুরুষ ও বমণীকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইযা বিদায প্রার্থনা কবিলেন। তিনি বলিযাছেন—

"এক বাত্রেব মধ্যে আমবা পবস্পবকে এতদূব আপনাব কবিযা লইযাছিলাম যে, বিদাযগ্রহণকালে ব্যাকুল হইযা অজস্র ক্রন্দন কবিতে লাগিলাম। অবশেষে সুবিধামত দক্ষিণেশ্ববে আমাকে দেখিতে আসিতে পুনঃ পুনঃ অনুবোধপূবক ঐকথা স্বীকাব কবাইযা লইযা অতিকষ্টে তাহাদিগকে ছাডিযা আসিলাম। আসিবাব কালে তাহাবা অনেকদূব পর্যন্ত আমাদেব সঙ্গে আসিযাছিল এবং বমণী পার্শ্ববর্তী ক্ষেত্র হইতে কতকগুলি কডাইশুটি তুলিযা কাঁদিতে কাঁদিতে আমাব অঞ্চলে বাঁধিযা কাতবকণ্ঠে বলিযাছিল 'মা সাবদা বাত্রে যখন মুডি খাবি তখন ঐগুলি দিযে খাস।' পূবোক্ত অঙ্গীকাব তাহাবা বক্ষা কবিযাছিল। নানাবিধ দ্রব্য লইযা আমাকে দেখিতে মধ্যে মধ্যে কযেকবাব দক্ষিণেশ্ববে আসিযা উপস্থিত হইযাছিল। উনিও আমাব নিকট হইতে সকল কথা শুনিযা ঐ সমযে তাহাদিগেব সহিত জামাতাব ন্যায ব্যবহাব ও আদব আপ্যাযনে তাহাদিগকে পবিতৃপ্ত কবিযাছিলেন। এমন সবল ও সচ্চবিত্র হইলেও আমাব ডাকাত বাবা পূর্বে কখন কখনও ডাকাইতি যে কবিযাছিল, একথা কিন্তু আমাব মনে হয।

১২৯৩ সালেব ৩১ শ্রাবণ পবমহংসদেব দেহত্যাগ কবেন। তখন সাবদামণি দেবীব বযস ৩৩ বৎসব। আমি শুনিযাছিলাম, স্বামীব তিবোভাবে সাবদামণি দেবী বিধবাব বেশ ধাবণ কবেন নাই। ইহা সত্য কিনা জানিবাব জন্য পবমহংসদেবেব ও সাবদামণি দেবীব একজন ভক্তকে চিঠি লিখিযাছিলাম। তিনি উত্তব দিযাছেন ঃ

"শ্রীশ্রীমৎ পবমহংসদেবেব দেহবক্ষাব সময মা হাতেব বালা খুলিতে গেলে শ্রীশ্রীপবমহংসদেব, জীবিত অবস্থায বোগহীন শবীবে যেমন দেখিতে ছিলেন, সেই মূর্তিতে আসিযা মাব হাত চাপিযা ধবিযা বলিলেন—আমি কি মবিযাছি যে তুমি এযোস্ত্রীব জিনিস হাত হইতে খুলিতেছ? এই কথাব পব মা আব কখনও শুধু হাতে থাকেন নাই—পবিধানে লাল নরুন-পেডে কাপড এবং হাতে বালা ছিল।"

আত্মাব অমবত্বে এইরূপ বিশ্বাস সকলেব থাকিলে সংসাবে অনেক দুঃখ পাপ তাপ দুর্গতি দূব হয।

স্বামীব তিবোভাবেব পব সাবদামণি দেবী ৩৪ বৎসব বাঁচিযা ছিলেন। তিনি ১৩২৭ সালেব ৪ শ্রাবণ ৬৭ বৎসব বযসে পবলোকগমন কবেন। তাব পববর্তী ভাদ্রমাসেব 'উদ্বোধন' পত্রে তাঁহাব ব্রত, ত্যাগ, নিষ্ঠা, সংযম, সকলেব প্রতি সমান ভালবাসা, সেবাপবাযণতা, দিবাবাত্র অক্লান্তভাবে কর্মানুষ্ঠান ও নিজ শবীবেব সুখদুঃখেব প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা, তাঁহাব সবলতা, নিবভিমানিতা, সহিষ্ণুতা, দযা, ক্ষমা, সহানুভূতি ও

নিঃস্বার্থপরতা প্রভৃতি গুণ কীর্তিত হইয়াছিল। তাহার স্বামীর ও তাঁহার ভক্তেরা তাঁহাকে মাতৃসম্বোধন করিতেন এবং এখনও মা বলিয়াই তাঁহার উল্লেখ করেন। এই মাতৃসম্বোধন সার্থক হউক।

[সারদামণি দেবীর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত-রচনা আমার পক্ষে নানা কারণে সহজ হয় নাই। তাঁহাকে প্রণাম করিবার ও তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য আমার কখনও না হওয়ায় তাঁহার সম্বন্ধে আমার সাক্ষাৎ কোন জ্ঞান নাই। পুস্তক ও পত্রিকা হইতে আমাকে তাঁহার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইতেও যথেষ্ট সাহায্য পাই নাই। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' আমার প্রধান অবলম্বন। ছোট অক্ষরে যাহা ছাপা হইয়াছে, তাহা ছাড়া অন্য অনেক স্থলেও ঐ পুস্তকের ভাষা পর্যন্ত গৃহীত হইয়াছে। 'উদ্বোধন' হইতেও অল্প সাহায্য পাইয়াছি। ইহার দুটি প্রবন্ধে ভক্তি-উচ্ছ্বসিত ভাষায় তাঁহার নানা গুণের বন্দনা আছে। যে সকল কথায়, কাজে, ঘটনায়, আখ্যায়িকায় ঐ সকল গুণ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা কিছু কিছু লিখিত হইলে ভাল হয়। যাহাতে মানুষের অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায় এমন কোনও কথা, কাজ, ঘটনা, আখ্যায়িকা তুচ্ছ নহে কাহারও জীবন্ত ছবি মানুষের নিকট উপস্থিত করিতে হইলে এগুলি আবশ্যক। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' ব্যতীত সারদামণি দেবীর যে সকল ফটোগ্রাফ হইতে ছবি প্রস্তুত করাইয়াছি, সেইগুলির এবং কয়েকটি সংবাদের জন্যও আমি ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথের নিকট ঋণী। তাঁহাকে তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।]

(প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৩১) শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

প্রথম দর্শন—১৩১৭

কলিকাতা পটলডাঙাব বাসায় শুক্রবার সকালে শ্রীমান—বলে গেল,"কাল শনিবার মাযে শ্রীচরণদর্শন করতে যাব; আপনি তৈরি হয়ে থাকবেন।" কাল তবে মায়ের দর্শন পাব! সারা রাত আমার ঘুমই এল না। আজ ১৩১৭ সন, প্রায় চৌদ্দ-পনর বৎসব হযে গেল কলিকাতায় আছি, এত কাল পরে মায়ের দয়া হলো কি? এত দিনে কি সুযোগ মিলল? পরদিন বৈকালে গাড়ি করে সুমতিকে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয হতে নিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণদর্শন করতে চললুম। কি আকুল আগ্রহে গিয়েছিলুম, তা ব্যক্ত করাব ভাষা জানি না। গিযে দেখি মা বাগবাজারে তাঁর বাড়িতে ঠাকুরঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। এক পা চৌকাঠের উপর, অপর পা পাপোশখানির ওপাবে; মাথায কাপড় নেই, বাঁ হাতখানি উঁচু করে দরজার উপর রেখেছেন, ডান হাতখানি নিচুতে, গায়েরও অর্ধাংশে কাপড় নেই, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। গিয়ে প্রণাম করতেই পরিচয় নিলেন। সুমতি বললে, 'আমার দিদি।' সে পূর্বে কয়দিন গিয়েছিল; তখন মা একবার আমার দিকে চেয়ে বললেন, "এই দেখ মা, এদের নিয়ে কি বিপদে পড়েছি। ভাই-এর বউ, ভাইঝি, বাধু, সব জ্বরে পড়ে। কে দেখে, কে কাছে বসে, ঠিক নেই। এস, আমি কাপড় কেচে আসি।" আমরা বসলুম। কাপড় কেচে এসে দুই হাত ভরে জিলিপি-প্রসাদ এনে দিয়ে বললেন, "বৌমাকে (সুমতি) দাও, তুমিও নাও।" সুমতিকে শীঘ্র স্কুলে ফিরতে হবে, তাই সে দিন একটু পরেই প্রণাম করে বিদায় নিলুম। মা বললেন, 'আবাব এস।' এই পাঁচ মিনিটের জন্য দেখা, আশা ল না! অতৃপ্ত প্রাণে বাসায ফিরলুম।

৩০ মাঘ ১৩১৭

শ্রীশ্রীমা সেদিন বলরামবাবুর বাড়ি গিয়েছিলেন। আমি তাঁর বাগবাজারের বাড়িতে গিয়ে একটু অপেক্ষা করতেই মা ফিরলেন। প্রণাম করে উঠতেই হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কার সঙ্গে এসেছ?'

আমি বললুম আমার এক ভাগ্নের সঙ্গে।

মা—ভাল আছ? বৌমা ভাল আছে? এত দিন আস নি—ভাবছিলুম অসুখ করল না কি।

বিস্মিত হয়ে ভাবলুম একদিন মাত্র পাঁচ মিনিটের দেখা, তাতে মা আমাদের কথা মনে করেছেন! ভেবে আনন্দে চোখে জলও এল।

মা—(আমাব পানে সস্নেহে চেয়ে) তুমি এসেছ, তাই ওখানে (বলরামবাবুর বাড়িতে) বসে আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

আমি একেবারে অবাক হয়ে গেলুম!

মায়ের একটি শিশু ভাইপোর (ক্ষুদের) জন্য সুমতি দুটি পশমের টুপি দিয়েছিল; মাকে উহা দিতে এই সামান্য জিনিসের জন্য কতই খুশি হলেন। তক্তপোশেব উপর বসে বললেন, "বস এখানে, আমার কাছে।" পাশেই বসলুম, মা আদর করে বললেন, "তোমাকে যেন মা, আরও কত দেখেছি—যেন কত দিনের জানাশোনা!"

আমি বললুম, "কি জানি, মা, একদিন তো কেবল পাঁচ মিনিটের জন্য এসেছিলুম।"

মা হাসতে লাগলেন ও আমাদের দুই বোনের অনুবাগ-ভক্তির অনেক প্রশংসা করলেন। আমবা কিন্তু ঐ সকল কথার কতদূর যোগ্য তা জানি না। ক্রমে ক্রমে অনেক স্ত্রী-ভক্ত আসতে লাগলেন। ভক্তি-বিগলিত চিত্তে সকলেই মায়ের হাসিমাখা স্নেহভরা মুখখানিব পানে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন, ওরূপ দৃশ্য আমি আর কখনো দেখিনি। মুগ্ধ হযে তাই দেখছি, এমন সময় বাসায় ফিরবার তাগিদ এল—গাড়ি এসেছে। মা তখন উঠে প্রসাদ দিয়ে 'খাও খাও' করে একেবারে মুখের কাছে ধবলেন। অত লোকেব মধ্যে একলা অমন করে খেতে আমার লজ্জা হচ্ছে দেখে বললেন, "লজ্জা কি? নাও।" তখন হাত পেতে নিলুম। "তবে আসি, মা," বলে প্রণাম করে বিদায় নেবার সময় বললেন, "এস মা, এস, আবার এস। একলা নেমে যেতে পারবে তো? আমি আসব?" এই বলে সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি পর্যন্ত এলেন। তখন আমি বললুম, "আমি যেতে পারব, মা। আপনি আর আসবেন না।" মা তাই শুনে বললেন, "আচ্ছা, একদিন সকালে এস।" পরিপূর্ণ প্রাণে ফিরলুম। ভাবলুম—এ কি অদ্ভুত স্নেহ!

বৈশাখ-সংক্রান্তি, ১৩১৮

আজ গিয়ে প্রণাম কবতেই মা বললেন, "এসেছ মা, আমি মনে করছি কি হলো গো, কেন আসে না। এতদিন আসনি কেন?"

আমি বললুম, "এখানে ছিলুম না, মা, বাপের বাড়ি গিয়েছিলুম।"

মা—বৌমা (সুমতি) আসে না কেন? পড়াশুনার চাপে?

আমি—না, ভগ্নীপতি এখানে ছিলেন না।

মা—তা, ও তো ইস্কুলে যাচ্ছে, আচ্ছা, ওরা সংসার ধর্ম করে তো?

আমি বললুম, "কাকে বলে সংসার, কাকে বলে ধর্ম, তা কি জানি মা—আপনিই জানেন।" মা একটু হাসলেন।

মা—'কি গরম পড়েছে!' বলে বাতাস খেতে পাখাখানা হাতে দিয়ে বললেন, "আহা, দুটো ভাত খেয়েই ছুটে আসছ—এখন আমার কাছে একটু শোও।"

নাকে নিচে মাদুর পেতে দিয়েছে। তাঁর বিছানায় শুতে সঙ্কুচিত হচ্ছি দেখে বললেন, 'তাতে কি মা, শোও আমি বলছি শোও।" অগত্যা শুলুম। মার একটু তন্দ্রা আসছে দেখে চুপ করে আছি এমন সময় দুই-একটি স্ত্রী ভক্ত এবং শেষে দুজন সন্ন্যাসিনী এলেন। একজন প্রৌঢ়া, অপরটি যুবতী। মা চোখ বুজেই বলছেন, "কে গো মা, গৌরদাসী এলে?"

যুবতী বললেন, "আপনি কি করে জানলেন, মা?"

মা বললেন, টের পেয়েছি। কিছুক্ষণ পরে উঠে বসলেন।

যুবতী বললেন, 'বেলুড় মঠে গিয়েছিলুম। প্রেমানন্দ স্বামীজী খুব খাইয়ে দিয়েছেন, তিনি থাকলে তো না খেয়ে ফিরবার উপায় নেই।' যুবতী সিন্দুর পরেননি দেখে মা তাকে একটু বকলেন।

পরে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আমার পরিচয় নিয়ে গৌরীমা একদিন তাঁদের আশ্রমে আমাকে যেতে বলে বললেন, 'সেখানে প্রায় ৫০।৬০ জন মেয়েকে শিক্ষা দেওয়া হয়। তুমি সেলাই জান?" আমি 'সামান্য কিছু জানি' বলাতে তিনি তাঁর আশ্রমের মেয়েদের তাই শিখিয়ে আসতে বললেন।

মায়ের আদেশ নিয়ে গৌরীমার আশ্রমে একদিন গেলুম। তিনি খুব স্নেহ-যত্ন করলেন এবং প্রত্যহ দুই এক ঘণ্টা করে এসে মেয়েদের পড়িয়ে যেতে অনুরোধ করলেন। আমি বললুম, "এই সামান্য শিক্ষা নিয়ে শিক্ষয়িত্রী হওয়া বিড়ম্বনা। ক, খ পড়াতে বলেন তো পারি।" গৌরীমা কিন্তু একেবারে নাছোড়। অগত্যা স্বীকৃত হয়ে আসতে হলো।

একদিন স্কুলের ছুটি হলে গৌরীমার আশ্রম হতে মায়ের শ্রীচরণদর্শন করতে গেলুম। গ্রীষ্মকাল। সেদিন একটু পরিশ্রান্ত হয়েছিলুম। দেখি, মা একঘর স্ত্রী ভক্তের মধ্যে বসে আছেন। আমি গিয়ে প্রণাম করতেই মুখপানে চেয়ে মশারির উপর হতে তাড়াতাড়ি পাখাখানি নিয়ে আমায় বাতাস করতে লাগলেন। ব্যস্ত হয়ে বললেন, "শিগগির গায়ের জামা খুলে ফেল, গায়ে হাওয়া লাগুক।" কি অপূর্ব স্নেহ-ভালবাসা! অত লোকের মধ্যে এত আদর যত্ন! আমার ভারি লজ্জা করতে লাগল—সবাই চেয়ে

দেখছিল; মা নিতান্ত ব্যস্ত হয়েছেন দেখে জামা খুলতেই হলো। আমি যত বলি, "পাখা আমাকে দিন, আমি বাতাস খাচ্ছি," ততই স্নেহভরে বলতে লাগলেন, "তা হোক, হোক; একটু ঠাণ্ডা হয়ে নাও!" তারপর প্রসাদ ও এক গ্লাস জল এনে খাইয়ে তবে শান্ত হলেন! স্কুলের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, তাই দু-একটি কথা কয়েই সেদিন ফিরতে হলো।

১৮ শ্রাবণ, ১৩১৮

আজ সকালে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে দীক্ষা নেবার আকাঙ্ক্ষায় গেলুম। কি কি দ্রব্যের দরকার হয়, তা গৌরীমার নিকট জেনে তাঁকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলুম। মায়ের বাড়ি গিয়ে দেখি—মা তদ্গতচিত্তে ঠাকুরপূজা করছেন, আমরা যাবার একটু পরে চেয়ে ইঙ্গিতে বসতে বললেন। পূজা শেষ হলে গৌরীমা আমার দীক্ষার কথা বললেন। পূর্বে মার সঙ্গে একদিন আমারও ঐ বিষয়ে কথা হয়েছিল। মর্তমান কলা নিয়ে গেছি, মা দেখে বললেন, "এই যে মর্তমান কলা এনেছ। (একজন সাধুর নাম করে) সে কলা খেতে চেয়েছিল, বেশ করেছ।" পরে বললেন, "ঐ আসনখানা নিয়ে আমার বাঁ দিকে এসে বস।"

আমি বললুম, "গঙ্গাস্নান তো করা হয়নি।"

মা—তা হোক। কাপডচোপড তো ছেড়ে এসেছ?

কাছে বসলুম। বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করতে লাগল। মা তখন ঘর হতে সবাইকে বেরিয়ে যেতে বললেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "স্বপ্নে কি পেয়েছ বল।"

আমি বললুম, "লিখে দেব, না মুখে বলব?"

মা—মুখেই বল।...

দীক্ষার সময় শ্রীশ্রীমা স্বপ্নে প্রাপ্ত মন্ত্রের অর্থ বলে দিলেন। বললেন, "আগে ঐটি জপ করবে।" পরে তিনি আর একটি বলে দিয়ে বললেন, "শেষে এইটি জপ ও ধ্যান করবে।"

মন্ত্রটির অর্থ বলবার পূর্বে মাকে কয়েক মিনিটের জন্য ধ্যানস্থ হতে দেখেছিলুম। মন্ত্র দেবার সময় আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল এবং কেন বলতে পারি না, কাঁদতে লাগলুম। মা কপালে বড় করে একটা রক্ত-চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দিলেন। দক্ষিণা ও ঠাকুরের ভোগের জন্য কিছু টাকা দিলুম। শ্রীশ্রীমা পরে গোলাপ-মাকে ডেকে ভোগের টাকা তাঁর হাতে দিলেন।

দীক্ষার সময় মাকে খুব গম্ভীর দেখলুম। পরে পূজার আসন হতে মা উঠে গেলেন। আমাকে বললেন, "তুমি খানিক ধ্যান, জপ ও প্রার্থনা কর।" আমি ঐরূপ

করবার পরে উঠে মাকে প্রণাম করতেই মা আশীর্বাদ করলেন—"ভক্তি লাভ হোক।" মনে মনে মাকে বললুম, "দেখো মা, তোমার কথা মনে রেখো, ফাঁকি দিও না যেন।"

শ্রীশ্রীমা এইবার গঙ্গাস্নানে যাবেন—গোলাপ-মা সঙ্গে। আমিও মায়ের কাপড়-গামছা নিয়ে সঙ্গে গেলুম। স্নানের জন্য মা গঙ্গায় নেমেছেন, এমন সময় অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হলো। স্নান করে উঠে ঘাটের পাণ্ডা-ব্রাহ্মণকে একটি কলা, একটি আম ও একটি পয়সা দিয়ে মা বললেন, "ফল আমি দিলুম বটে, কিন্তু দানের ফল তোমার!" হায়! পাণ্ডাঠাকুর, জান না কার হাতের দান আজ পেলে! আর কত বড় কথা শুনলে! কোটি কামনায় জড়িত মানুষ আমরা ঐ দেববাণীর মর্ম কি বুঝব!

আমার কাছ থেকে কাপড়খানি নিয়ে পরে, ভিজে কাপড়খানি আমার হাতে দিয়ে মা বললেন 'চল।' গোলাপ-মা আগে, মা মাঝে, আমি পেছনে চললুম। ছোট একটি ঘটিতে গঙ্গাজল নিয়ে মা রাস্তার ধারে প্রতি বটবৃক্ষে জল দিয়ে প্রণাম করে যেতে লাগলেন। মা তখন বাজার ঘাটে স্নান করতেন। কারণ নূতন, ঘাট (দুর্গাচরণ মুখার্জীর ঘাট) তখনো হয়নি। গোলাপ-মা ছোট একটি ঘড়ায় গঙ্গাজল নিয়ে এসেছিলেন, বাড়িতে ফিরে উহা ঠাকুরঘরে রাখতে গেলেন। নিচের কলতলায় চৌবাচ্চার কাছে একটা ঘটিতে জল ছিল, মা তাই দিয়ে পা ধুয়ে আমায় বললেন, "কাদা লেগেছে, ধুয়ে এস।" আমি জল খুজছি দেখে বললেন, "ঐ ঘটির জলেই ধোও না।"

আমি বললুম, "আপনি যে ও জল ছুঁয়েছেন।"

মা—আগে একটু মাথায় দিয়ে নাও, তা হলেই হবে।

আমার কিন্তু মন সরল না, বললুম "তা কি হয়? আমি আর একটা পাত্র এনে চৌবাচ্চা হতে জল নিয়ে পা ধুয়ে নিলুম। মা ততক্ষণ আমার জন্য দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর উপরে গিয়ে ঠাকুরের প্রসাদ দুখানি শালপাতায় সাজিয়ে নিজে একখানি নিলেন এবং আমাকে একখানি দিয়ে কাছে বসে খেতে বললেন। আমি প্রসাদ পাবার পূর্বে মায়ের চরণামৃত পাবার আকাঙ্ক্ষা জানাতে মা বললেন, "তবে জালা হতে একটু কলের জল নিয়ে এস" এবং আমি উহা আনলে পাত্রটি আমাকে হাতে করে ধরে রাখতে বলে নিজে বাম ও দক্ষিণ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ জলে দিয়ে কি বলতে লাগলেন—বুঝতে পারলুম না, শুধু ঠোঁট নড়তে দেখলুম। শেষে বললেন, 'নাও এখন।' আমি নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করে উহা পান করলুম। তারপর খেতে খেতে প্রত্যেক জিনিসটি নিজে এক একটু খেয়ে আমার পাতে দিতে লাগলেন।

ক্রমে অনেকগুলি স্ত্রী-ভক্তের আগমন হলো। কাউকেই চিনি না। শুনলুম—তাঁরা সকলেই এখানে প্রসাদ পাবেন। ঠাকুরের ভোগের পর আমরা সকলে প্রসাদ পেতে বসলুম। মাও তাঁর নির্দিষ্ট আসনে এসে বসলেন। তিনবার অন্ন মুখে দিয়ে মা আমাকে ডাকলেন এবং আমার হাতে প্রসাদ দিলেন। প্রসাদ গ্রহণ করলুম। কি যে

একটি সুগন্ধ পেলুম এখনো সে কথা ভাবলে অবাক হই। তারপর একে একে সকলের পাতেই মার প্রসাদ বিতরিত হলো। গোলাপ-মা সকলকে দিয়ে শেষে নিজে খেতে বসলেন। মা এইবার খুব হাসিখুশি গল্প-সল্প করতে করতে খেতে লাগলেন। তাই দেখে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। দীক্ষার সময় হতে এতক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে যেন আর এক মা মনে হচ্ছিল। সে কি গম্ভীর, অন্তর্মুখী নিগ্রহানুগ্রহসমর্থা দেবীমূর্তি! ভয়ে জড়সড় হয়েছিলুম। পরে কত লোককে দীক্ষা দিতে দেখেছি, দু চার মিনিটেই হয়ে গেছে, কিন্তু সেরূপ গম্ভীর ভাব তাঁর আর কখনো দেখিনি। কতজনকে হাসতে হাসতে দাঁড়িয়ে বা বসে দীক্ষা দিয়েছেন। তারা খুশি হয়ে তখনই তৃপ্ত হয়ে চলে গেছে। কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে কাউকে বা জিজ্ঞাসাই করে ফেলেছি, "দীক্ষার সময় মায়ের কেমন রূপ দেখলেন?" একটি বিধবা স্ত্রী ভক্ত আমার ঐ প্রশ্নে বলেছিলেন, "এই এম্নিই। আমি পূর্বে কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলুম—পরে মায়ের কথা শুনে এখানে দীক্ষা নিতে এসেছি। পূর্বে কুলগুরু যেটি দিয়েছেন, মা আমাকে সেটি বীজ প্রথমে দশবার জপ করে নিতে বললেন—পরে নিজে যেটি দিয়েছেন সেটি দিয়ে ঠাকুরকে দেখিয়ে বললেন উনি গুরু (অন্য এক মূর্তি দেখিয়ে) আর ইনি ইষ্ট' আর এই বলে প্রার্থনা করতে বললেন যে 'ঠাকুর আমার পরজন্মের ইহজন্মের কুকর্মের ভার তুমি নাও ইত্যাদি। আমার কি হয়েছে বলুন তো যখনই জপ করতে বসি আধ ঘণ্টার বেশি জপ করতে পারি নে, কে যেন ঠেলা দিয়ে তুলে দেয়। আপনাদের এমন হয়? ভাবি মার কাছে কত কথা বলি— কিছুই বলতে পারি নে আপনারা তো বেশ মায়ের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। মা কি আমাকে ফাঁকি দিলেন?" আমি কিন্তু অত কথা জানতে চাইনি স্ত্রীলোকটির প্রায় প্রৌঢ়াবস্থা—সরল ভাবেই নিজেই বলে যাচ্ছেন। আমি বললুম, "যা আপনার ইচ্ছা হবে মায়ের কাছে বলুন না, দু চার দিন বলতে বলতে সহজ হয়ে আসবে। আমরাও প্রথম প্রথম অত কথা বলতে পারিনি। এখনো এক এক সময় এমন গম্ভীরভাব ধারণ করেন, কাছেই এগুনো যায় না।"

বেলা পড়ে আসতে সমাগত ভক্ত-মহিলাগণ শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে একে একে বিদায় নিতে লাগলেন, কেহ বা আরতি দেখে যাবেন বললেন। শ্রীশ্রীমা কাপড় কেচে এসে ঠাকুরের বৈকালী ভোগ দিয়ে প্রত্যেককে প্রসাদ দিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল। মা রাধু, মাকু প্রভৃতিকে ঠাকুরঘরে এসে জপ করতে বসতে বললেন। তারা আসতে বিলম্ব করায় মা অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, "সন্ধ্যার সময় এখন এসে সব জপ টপ করবে, না কোথায় কি করছে দেখ।" একটু পরে তারা এসে জপ করতে বসল।

পূজনীয় গোলাপ মা, যোগীন মা প্রভৃতি এসে সন্ধ্যাকালে ভক্তিভরে শ্রীশ্রীমায়ের পদধূলি গ্রহণ করলেন, মা তাঁদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। কারও বা

চিবুক স্পর্শ কবে চুমো খেলেন, আবাব হাতজোড কবে নমস্কাবও কবলেন। তারপব ঠাকুবপ্রণাম কবে একখানি আসন পেতে জপে বসলেন। সন্ধ্যাবতিব উদ্যোগ হচ্ছে, শ্রীশ্রীমা কিছুক্ষণ পবে জপ শেষ কবে উঠলেন। বাসা হতে একটি ছেলে নিতে এসেছে, মাযেব কাছে বিদায নিতে গিযে বললুম, "মা, কই সেদিনকাব সেই কাপডখানি তো পবলেন না?"

মা বললেন "তাই তো মা, তখন মনে কবে দিলে কই?" প্রণাম কবে বাসায ফিবলুম।

স্কুলেব কাজেব জন্য শীঘ্র আব মাযেব কাছে যেতে সময পাইনি। অনেক দিন পবে আজ আবাব মাযেব পদপ্রান্তে গিযে বসতেই মা কত আনন্দ কবতে লাগলেন। ভূদেব মহাভাবত পডছিল। ছেলেমানুষ, পডতে দেবি হচ্ছিল, মাকে এখন শীঘ্র উঠতে হবে, কাবণ প্রায সন্ধ্যা হযে এল। সেজন্য তিনি ভূদেবকে বললেন, "একে দে, এ ভালেব মতো পডে দেবে এখন, এ অধ্যায শেষ না কবে তো উঠতে পাবব না।" মাযেব আদেশে মহাভাবত পডতে বসলুম। এব পূর্বে আব কখনো মাযেব কাছে পডিনি। কেমন লজ্জা লজ্জা কবতে লাগল। যা হোক, কোন প্রকাবে অধ্যায শেষ হলো। মহাভাবতকে মা হাতজোড কবে প্রণাম কবে উঠে পডলেন এবং আমবা সকলে ঠাকুবঘবে আবতি দেখতে গেলুম। মা নির্দিষ্ট আসনে গিযে জপে বসলেন।

জপান্তে হবিবোল হবিবোল কবে উঠে ঠাকুবপ্রণাম কবে সকলকে প্রসাদ দিলেন। কথায কথায কর্মেব কথা উঠল। মা বললেন, 'সর্বদা কাজ কবতে হয। কাজে দেহ মন ভাল থাকে। আমি যখন আগে জযবামবাটী ছিলুম, দিনবাত কাজ কবতুম। কোথাও কাবো বাডি যেতুম না, গেলেই লোকে বলত 'ও মা, শ্যামাব মেযেব ক্ষ্যাপা জামাই-এব সঙ্গে বে হযেছে।' ঐ কথা শুনতে হবে বলে কোনখানে যেতুম না। একবাব সেখানে আমাব কি অসুখই কবেছিল--কিছুতেই সাবে না, শেষে মা সিংহবাহিনীব দুযাবে হত্যা দিযে তবে সাবে। বড জাগ্রত দেবতা, সেখানকাব মাটি কৌটায কবে বেখেছি। নিজে খাই এবং বাধুকে বোজ সেই মাটি একটু কবে খেতে দিই।'

মাযেব বাডিব সামনেব মাঠে নানা দেশেব কতকগুলো স্ত্রী-পুরুষ বাস কবে। নানা প্রকাব কাজ কবে তাবা জীবিকা নির্বাহ কবে। তাব মধ্যে একজনেব উপপত্নী ছিল, উভযে একত্রেই বাস কবত। ঐ উপপত্নীব বসন্ত পীডা হযেছিল। মা ঐকথাব উল্লেখ কবে বললেন, "কি সেবাটাই কবেছে মা, এমন দেখিনি। একেই বলে সেবা, একেই বলে টান।' এই বলে ঐরূপে তাব সেবাব কতই সুখ্যাতি কবতে লাগলেন। উপপত্নীব সেবা! আমবা উহা দেখলে ঘৃণায নাসিকা কুঞ্চিত কবতুম, সন্দেহ নাই। মন্দেব মধ্য হতেও ভালটুকু যে নিতে হয, তা কি আমবা জানি!

সামনের মাঠেব ঘব হতে একটি দরিদ্রা হিন্দুস্থানী নাবী তার রুগ্ন শিশুকে কোলে করে মাযের আশীর্বাদ নিতে এসেছে। তার প্রতি মাযেব কি দযা! আশীর্বাদ কবলেন, 'ভাল হবে।' তাবপব দুটো বেদানা ও কতকগুলো আঙুব ঠাকুবকে দেখিযে এনে তাকে দিতে বললেন। আমি মাযেব হাতে ঐগুলো এনে দিলে মা সেই নিঃস্ব বমণীটিকে দিযে বললেন, "তোমাব বোগা ছেলেকে খেতে দিও।" আহা ' সে কতই খুশি হযে যে গেল ' বাববাব মাকে প্রণাম কবতে লাগল।

১৩১৮—পটলডাঙাব বাসা হতে বৈকালে গিযেছি। মাযেব ঘবে গিযে বসতেই গোলাপ-মা এসে আমাকে বললেন. একটি সন্ন্যাসিনী গুরুব দেনাশোধ কবতে সাহায্যপ্রার্থী হযে কাশী হতে এসেছেন। তোমাকে কিছু দিতে হবে।" আমি সানন্দে স্বীকৃত হলুম। মা হেসে বললেন. "আমাকে ধবেছিল। আমি কি কাবো কাছে টাকা চাইতে পাবি মা?" বললুম 'থাকো. হযে যাবে।' গোলাপ-মা বললেন, "হা. মা আমাব শেষে হিল্লে (উপায) কবে দিযেছেন।" মা আস্তে চুপি চুপি আমাকে বলছেন, "গোলাপ তিনখানা গিনি দিযেছে।"

খানিক পবে সেই সন্ন্যাসিনী এলেন। তিনি বলবামবাবুব বাড়ি গিযেছিলেন। সেখানে ভক্তেবা তাঁকে যাঁব যা সাধ্য কিছু কিছু দিযেছেন। শুনলুম, সন্ন্যাসিনী হবাব পূর্বে তাব বৃহৎ সংসাব ও সাত ছেলে ছিল তাবাই এখন কৃতী হযে সকল বিষযেব ভাব নিতে তিনি সংসাব ত্যাগ কবে চলে এসেছেন।

সন্ন্যাসিনী—গুরুনিন্দা কবতে নেই, বলে।

তাবপব তিনি প্রণাম কবে বলছেন, "বড মকদ্দমাপ্রিয ছিলেন—এখন বৃদ্ধ হযে পডেছেন' আব পাবেন না। ওদিকে পাওনাদাব ডিক্রী পেযে ধবতে চায। কি কবি. তাই তাব জন্যে ভিক্ষায বেবিযেছি।"

এই কথা শুনে শ্রীশ্রীমা একটি শ্লোক বললেন, শ্লোকটি মনে পডছে না। তবে ভাবটি এই—উচিত কথা গুরুকেও বলা যায, তাতে পাপ হয না।

মা আবও বললেন "তবে গুরুভক্তি থাকা চাই। গুরু যেমনই হোক তাঁব প্রতি ভক্তিতেই মুক্তি। ঠাকুবেব শিষ্য ভক্তদেব কি ভক্তি দেখ দেখি ' এই গুরুভক্তিব জন্যে ওবা গুরুবংশেব সকলকে ভক্তি তো কবেই, গুরুব দেশেব বিডালটাকে পর্যন্ত মান্য কবে।"

সন্ন্যাসিনী বাত তিনটা হতে বেলা আটটা পর্যন্ত জপধ্যান কবেন। সেইজন্য একখানি ধোযা কাপড চাইলেন, মা ভূদেবেব একখানি কাপড দিতে বললেন। সন্ন্যাসিনী আমায জিজ্ঞাসা কবলেন, "তুমি কি বাতে থাকবে? থাক তো তোমায কিছু শিক্ষা দিতে পাবি।" মনে মনে ভাবলুম, 'আমাদেব মাব কাছে আবাব আপনি কি শিখাবেন ' কিন্তু প্রকাশ্যে বললুম, "না, আমাব থাকা হবে না।"

আমাব গাডি এসেছে। সন্ধ্যাবতি হতে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম কবে বিদায নিলুম।

২৮ মাঘ, ১৩১৮

আজ মায়ের কাছে গিয়ে প্রণাম করে বসতেই মা আক্ষেপ করে বললেন, "আহা, গিরিশবাবু মারা গেছেন—আজ চারদিন, চতুর্থীর কাজ, আমায় নিতে এসেছিল। সে নেই—আর কি সেখানে যেতে ইচ্ছে করে? আহা, একটা ইন্দ্রপাত হয়ে গেল! কি ভক্তি বিশ্বাসই ছিল! গিরিশ ঘোষের সে কথা শুনেছ? ঠাকুরকে পুত্রভাবে চেয়েছিল। ঠাকুর তাতে বলেছিলেন, 'হাঁ, বয়ে গেছে আমার তোর ছেলে হয়ে জন্মাতে।' তা কে জানে মা, ঠাকুরের শরীর যাবার কিছুকাল পরে গিরিশের এমন একটি ছেলে হলো, চার বছর হয়েও কারো সঙ্গে কথা বলেনি। হাবভাবে সব জানাত। ওরা তো তাকে ঠাকুরের মতো সেবা করত। তার কাপড় জামা, খাবার জন্য রেকাব, বাটি, গেলাস, সমস্ত জিনিস পত্র নতন করে দিলে—সে সব আর কাউকে ব্যবহার করতে দিত না। গিরিশ বলত, 'ঠাকুরই এসেছেন।' তা ভক্তের আবদার, কে জানে, মা। একদিন আমাকে দেখবার জন্যে এমন অস্থির হলো যে, আমি উপরে যেখানে ছিলুম সকলকে টেনে টেনে সেই দিকে 'উ উ' করে দেখিয়ে দিতে লাগল। প্রথমে কেউ বোঝেনি। শেষে বুঝতে পেরে আমার কাছে নিয়ে গেল, তখন ঐটুকু ছেলে, আমার পায়ের তলায় পড়ে প্রণাম করলে। তারপর নিচে নেমে গিরিশকে ধরে টানাটানি—আমার কাছে নিয়ে আসবে বলে। সে তো হাউ-হাউ করে কাঁদে আর বলে, 'ওরে, আমি মাকে দেখতে যাব কি—আমি যে মহাপাপী।' ছেলে কিন্তু নাছোড়ই ছাড়ে না। তখন ছেলে কোলে করে কাঁপতে কাঁপতে, দুচক্ষে জলধারা, এসে একেবারে আমার পায়ের তলায় সাষ্টাঙ্গ হয়ে পড়ে বললে, 'মা, এ হতেই তোমার শ্রীচরণ দর্শন হলো আমার।'* ছেলেটি কিন্তু, মা, চার বছরেই মারা গেল।

এর আগে একদিন গিরিশ ও তার পরিবার তাদের বাড়ির ছাদে উঠেছিল। আমি তখন বলরামবাবুর বাড়িতে, বিকেল বেলা ছাদে গেছি। গিরিশের ছাদ হতে তাকালে যে দেখা যায়, সেটা আমি লক্ষ্য করিনি। পরে তার পরিবারের কাছে শুনলুম, সে গিরিশকে বলেছিল, 'ঐ দেখ, মা ওবাড়ির ছাদে বেড়াচ্ছেন।' গিরিশ ঐ কথা শুনে অমনি তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বলেছিল—'না, না, আমার পাপ-নেত্র, এমন করে লুকিয়ে মাকে দেখব না।' এই বলে নিচে নেমে গিছিল।"

১ আষাঢ়, ১৩১৯

বেলা প্রায় চারটা, শ্রীশ্রীমা অনেক স্ত্রী ভক্তসঙ্গে বসে আছেন। আমার পরিচিতার মধ্যে তাদের ভিতরে আছেন মাস্টার মহাশয়ের স্ত্রী, ডাক্তার দুর্গাপদবাবুর স্ত্রী, গৌরীমা

* মা তখন বরানগর কুটীঘাটার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভাড়াটে বাড়িতে ছিলেন

ও তাঁর পালিতা কন্যা যাঁকে আমি দুর্গাদিদি বলে ডাকি এবং বরেনবাবুর পিসী। আর যাঁরা আছেন, তাদের চিনি না। মা হাসিমুখে সকলের সঙ্গে কথা কচ্ছেন। আমাকে দেখে বললেন, "এই যে এস মা, বস।" আমি গৌরীমাকে দিয়ে নিচে অফিস ঘর হতে 'নিবেদিতা' ও 'ভারতে বিবেকানন্দ' বই দুখানি আনালুম। আমার ইচ্ছা মা 'নিবেদিতা' বইখানির কিছু শুনেন। মাও বই দেখে বলছেন, "ওখানি কি বই গা?" আমি বললুম—'নিবেদিতা'। মা বললেন, "পড় তো মা, একটু শুনি। সেদিন আমাকেও একখানি ঐ বই দিয়ে গিয়েছে, এখনো শোনা হয়নি।" যদিও অত লোকের মধ্যে পড়তে লজ্জা করতে লাগল, তথাপি নিবেদিতার সম্বন্ধে সরলাবালা কেমন সুন্দর লিখেছেন, তা মাকে শোনাবার আগ্রহে ও মায়ের আদেশে পড়তে আরম্ভ করলুম। শ্রীশ্রীমা ও সমবেত স্ত্রী ভক্তেরা সাগ্রহে শুনতে লাগলেন। নিবেদিতার ভক্তির কথা পড়তে সকলেরই চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। দেখলুম মায়ের চোখ দিয়েও অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। ঐ প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন, 'আহা নিবেদিতার কি ভক্তিই ছিল! আমার জন্যে যে কি করবে ভেবে পেত না। রাত্রিতে যখন আমায় দেখতে আসত, আমার চোখে আলো লেগে কষ্ট হবে বলে একখানি কাগজ দিয়ে ঘরের আলোটি আড়াল করে দিত। প্রণাম করে নিজের রুমাল দিয়ে কত সন্তর্পণে আমার পায়ের ধুলো নিত। দেখতুম, যেন পায়ে হাত দিতেও সঙ্কুচিত হচ্ছে।' কথাগুলি বলেই মা নিবেদিতার কথা ভেবে স্থির হয়ে রইলেন। তখন উপস্থিত সকলেও নিবেদিতার কথা যা জানতেন বলতে লাগলেন। দুর্গাদিদি বললেন, 'ভারতের দুর্ভাগ্য যে তিনি এত অল্পদিনে চলে গেলেন।' অপর একজন বললেন, 'তিনি যেন ভারতেরই ছিলেন। নিজেও তাই বলতেন। সরস্বতীপূজার দিন খালি পায়ে হোমের ফোঁটা কপালে দিয়ে বেড়াতেন।' পুস্তকপড়া শেষ হলো। শ্রীশ্রীমা তখনও মাঝে মাঝে নিবেদিতার জন্য আক্ষেপ করতে লাগলেন। শেষে বললেন, 'যে হয় সুপ্রাণী, তার জন্য কাঁদে মহাপ্রাণী (অন্তরাত্মা), জান মা।'

এইবার মা কাপড় ছেড়ে এসে ঠাকুরের বৈকালী-ভোগ দিতে বসলেন। ইতঃপূর্বে কোন সময়ে স্বহস্তে অনেকগুলি ফুলের মালা গেঁথে বৈকালে পরিয়ে দেবেন বলে ঠাকুরের সামনে রেখেছিলেন। ব্রহ্মচারী রাসবিহারী ঐগুলোর নিকটেই ভোগের জন্য রসগোল্লা এনে রেখে গেছেন। তার রস গড়িয়ে ফুলের মালাতে লেগে ডেয়ো পিঁপড়ে ধরেছে। মা হাসতে হাসতে বলছেন, "এইবার ঠাকুরকে পিঁপড়েয় কামড়াবে গো! ও রাসবিহারী, এ কি করেছ?" এই বলে সযত্নে পিঁপড়ে ছাড়িয়ে ঠাকুরকে পরিয়ে দিলেন। মা ঐরূপে সকলের সামনে নিজের স্বামীকে মালা পরিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছেন দেখে রাধুর মা মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলেন। শ্রীশ্রীমা উপস্থিত সকলকে প্রসাদ দিতে গৌরীমাকে বললেন এবং সকলে প্রসাদ পেলেন।

একজন স্ত্রী-ভক্ত বললেন, "আমার পাঁচটি মেয়ে, মা, বে দিতে পারিনি, বড়ই ভাবনায় আছি।"

শ্রীশ্রীমা —বে দিতে না পার, এত ভাবনা করে কি হবে? নিবেদিতার স্কুলে রেখে দাও। লেখাপড়া শিখবে, বেশ থাকবে।

ঐ কথা শুনে আর একজন স্ত্রী-ভক্ত বললেন, "মায়ের উপর যদি তোমার ভক্তি বিশ্বাস থাকে, তাহলে ঐ কর, ভাল হবে। মা যখন বলছেন তখন আর ভাবনা কি?" বলা বাহুল্য মেয়ের মায়ের এ-সব কথা মনে ধরল না।

অপর একজন বললেন, "এখন ছেলে পাওয়া কঠিন, অনেক ছেলে আবার বে করতেই চায় না।"

শ্রীশ্রীমা —ছেলেদের এখন জ্ঞান হচ্ছে, সংসার যে অনিত্য তা তারা বুঝতে পারছে। সংসারে যত লিপ্ত না হওয়া যায় ততই ভাল।

একে একে অনেকেই শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে বিদায় নিলেন। সন্ধ্যা হয়েছে, [illegible] যোগীন-মা এসে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে ঠাকুরের সন্ধ্যারতি করতে বসলেন। মা রাস্তার ধারের বারাণ্ডায় বসে জপধ্যান করছিলেন। পরে তিনি উঠে আসতে অপর স্ত্রী-ভক্তেরা সকলে প্রণাম করে বিদায়গ্রহণ করলেন।

সকলে চলে যেতে মাকে একা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, "মা স্ত্রীলোকদের অশুচি অবস্থায় ঠাকুরকে পূজো করা চলে কি?"

শ্রীশ্রীমা বললেন, "হাঁ মা, চলে —যদি ঠাকুরের উপর তেমন টান থাকে। এ কথা আমিও ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম। ঠাকুর বলেছিলেন, 'যদি পূজো না করার জন্যে তোমার মনে খুব কষ্ট হয়, তাহলে করবে, তাতে দোষ নেই। নতুবা করো না।' তা তুমি পূজো করো, কিন্তু মনে কোন দ্বিধা এলে করো না।" সকলকেই যে মা ঐরূপ করতে বলতেন, তা নয়। কারণ দিন কয়েক পরে ঠিক এই একই অবস্থার আর একটি স্ত্রী-ভক্তকে বলেছিলেন, "এই অবস্থায় কি ঠাকুর দেবতার কাজ করতে হয়? তা করো না।" ঐরূপে মা লোকের মানসিক অবস্থা দেখে কাকে কখন কি বলতেন, তা অনেক সময় বুঝা দুষ্কর হয়ে পড়ে।

অনেক রাত হয়েছে, এখনো আমাকে নিতে আসেনি। গোলাপ-মা ওকে জিজ্ঞাসা করাতে নিচে হতে কে বললেন, "আমরা বলে দিয়েছি—গৌরীমার সঙ্গে চলে গেছেন বোধ হয়।" শুনে আমি মাকে বলছি, "না আসে, আজ থাকাই যাবে।"

মা বললেন, "সে তো কোন ভাবনা নেই, কিন্তু আজ পয়লা—অগস্ত্যযাত্রা, আজ বাড়ি হতে যাত্রা করে এসে কোথাও থাকতে নেই।"

মনে ভাবলুম, এমন স্থানে যদি অগস্ত্যযাত্রা হয়, সে তো ভালই।

রাত্রে ঠাকুরের ভোগের পর সকলে প্রসাদ পেতে বসলেন। মা আমাকে বৈকালে

অনেক প্রসাদ দিয়েছিলেন, সেজন্য আমি পুনরায় এখন প্রসাদ পেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় গোলাপ-মা বললেন, "কেন গো, আমাদের বাড়ি এসে উপোস করে থাকবে কেন ?"

মা বললেন, "না না, দুখানি খাবে বৈকি।"—বলে নিজে একখানি রেকাবিতে চারখানা লুচি, তরকারি, মিষ্টি প্রভৃতি এনে দিলেন। রাত তখন প্রায় এগারোটা , এই সময় শ্রীমান বিনোদ আমাকে নিতে এল, সে গৌরীমার আশ্রমে গিয়ে আমাকে না পেয়ে পুনরায় এসেছে। নিচে সাধু-ব্রহ্মচারিগণ অনেকেই শয়ন করেছেন। মাকে প্রণাম করে বিদায় নিতে বললেন, "থাকা হলো না গো, তা আর একদিন এসে থেকো।"

আস্তে আস্তে অতি সন্তর্পণে নেমে আসছি, শুনছি—পূজনীয় শরৎ মহারাজ বলছেন "সাবধানে সিঁড়িতে নামিয়ে নিয়ো, বিনোদ, রাত হয়েছে।" তিনি নিচের বৈঠকখানা ঘরে শুয়েছেন। বাসায় ফিরতে রাত বারটা হয়েছিল।

আর একদিন গিয়ে দেখি শ্রীশ্রীমা দ্বিপ্রহরের আহারান্তে বিশ্রাম করছেন। আদেশ মতো তাঁর কাছে শুয়ে বাতাস করছি, এমন সময়ে তিনি সহসা আপন মনেই বলছেন, 'তাই তো মা, তোমরা সব এসেছ, তিনি (ঠাকুর) এখন কোথায় ?" শুনে বললুম, "এ জন্মে তো তাঁর দর্শন পেলুমই না। কোন জন্মে পাব কি না তা তিনিই জানেন। আপনার যে দর্শন পেয়ে গেছি—এই আমাদের পরম সৌভাগ্য।' শ্রীশ্রীমা বললেন, তা বটে।' ভাবতে লাগলুম, কি ভাগ্য যে এ কথাটি স্বীকার করলেন ' সব সময়ই তো দেখি নিজের কথা চেপে যান।

মায়ের কাছে কত লোকের কত রকমের গোপনীয় কথা যে থাকতে পারে—তারা আমি তা তখন বুঝতে পারতুম না। জানবই বা কেমন করে--মার কাছে তখন অল্পদিন মাত্র যাচ্ছি বই তো নয়। সেজন্য মার বাড়িতে পৌঁছে তাঁকে দেখতে না পেলে আসবার অপেক্ষা না করে খুঁজে খুঁজে যেখানে তিনি আছেন সেইখানে গিয়ে দেখা করতুম। একদিন বিকালবেলা বেশ সুশ্রী দুটি বৌ মাকে তাঁর ঘরের উত্তরের বারাণ্ডায় নিয়ে গিয়ে গোপনে কি বলছেন—এমন সময় আমি মাকে দেখতে একেবারে সেইখানে গিয়ে হাজির। শুনতে পেলুম মা তাঁদের বলছেন 'ঠাকুরের কাছে মনের কথা জানিয়ে প্রার্থনা করবে। প্রাণের ব্যথা কেঁদে বলবে - দেখবে তিনি একেবারে কোলে বসিয়ে দেবেন।' বুঝতে বাকি রইল না, বৌ দুটি মার কাছে সন্তানের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। আমাকে দেখে তাঁরা লজ্জিতা হলেন, আমিও ততোধিক। আমার কিন্তু খুব শিক্ষা হয়ে গেল। মনে মনে স্থির করলাম, আর কখনো সাড়া না দিয়ে মাকে অমন করে দেখতে যাব না। কয়েক মাস পরে মার বাড়িতে বৌ

দুটির সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিল এবং বুঝেছিলুম তারা উভয়েই সন্তান-সম্ভবা হয়েছেন।

গৌরীমা এসেছেন। তাঁকে একটু ঠাকুরের কথা বলতে অনুরোধ করায় তিনি বললেন, "আমি ঠাকুরের কাছে অনেক আগে গিয়েছিলুম। তারপরে আর সকলে আসতে লাগলেন। এই নরেন, কালী এদের ছোট দেখেছি।" বেলা বেশি নেই দেখে আর অধিক কথা হলো না। মাকে প্রণাম করে গৌরীমা বিদায় নিলেন।

আমাকেও যেতে হবে। মাকে প্রণাম করে বিদায় চাইতে মা বারাণ্ডায় ডেকে এনে প্রসাদ দিলেন, বলতে লাগলেন, "তবে এস মা। আমার সব ছেলেমেয়েগুলো আসে, আবার একে একে চলে যায়। একদিন সকাল সাতটায় এস। এখানে প্রসাদ পাবে।"

রথযাত্রা, ৩২ আষাঢ়, ১৩১৯

আজ প্রাতে সাতটায় গৌরীমার আশ্রমে গিয়েছিলুম তিনি প্রসাদ পাবার নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ইচ্ছা ছিল, ওখান হতে সকাল সকাল শ্রীশ্রীমায়ের নিকট যাব। কিন্তু সুযোগ হয়ে উঠল না। ঠাকুরের ভোগ ও ভক্তসেবা সাঙ্গ হতে প্রায় দুটো বেজে গেল। চারটার সময় গৌরীমাকে নিয়ে মায়ের কাছে গেলুম, তখন মা বৈকালের ভোগ দিতে বসেছিলেন। ভোগ দিয়ে উঠলে প্রথমে গৌরীমা, পরে আমি মাকে প্রণাম করলুম। গৌরীমা তাঁকে একটু নিভৃতে নিয়ে গেলেন এবং কি কথাবার্তার পর আমাকে ডাকলেন। মার জন্য একখানি গরদ নিয়ে এসেছিলুম। উহা পদপ্রান্তে রেখে প্রণাম করে বললুম, "মা, এখানি পরবেন।" মা হেসে বললেন, "হাঁ, পরব বই কি।" গৌরীমা আমাকে স্নেহভরে প্রশংসা করতে লাগলেন। মাও তাতে একটু যোগ দিলেন। ঠাকুরঘরে মাস্টারমশায়ের স্ত্রী ও কন্যা এবং অন্যান্য স্ত্রী ভক্তও অনেকে আছেন। সকলকে চিনি না মাস্টারমশায়ের মেয়ে ও স্ত্রীর সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করার পর পুরুষ ভক্তেরা মাকে প্রণাম করতে আসছেন শুনে আমরা সকলে বারাণ্ডায় গেলুম। একটি ভক্ত কতকগুলো প্রস্ফুটিত গোলাপ, জবা, এক ছড়া সুন্দর জুঁই ফুলের গোড়ে এবং ফল ও মিষ্টি এনেছিলেন। মায়ের পদপ্রান্তে ঐ সব রেখে চরণপূজা করতে লাগলেন। সে এক সুন্দর দৃশ্য। মা সহাস্যমুখে স্থির হয়ে বসে—গলায় ভক্ত প্রদত্ত মালা, শ্রীচরণে জবা ও গোলাপ। পূজাশেষে ভক্তটি ফল মিষ্টি প্রত্যেক জিনিস হতে কিছু কিছু নিয়ে মাকে প্রসাদ করে দিতে প্রার্থনা করলেন। গৌরীমা তাই শুনে হাসতে হাসতে বললেন "শক্ত ভক্তের পাল্লায় পড়েছ মা, এখন খাও।" মাও তাতে হাসতে হাসতে অত না, অত না – অত খেতে পারব না" বলে একটু একটু খেয়ে ভক্তের হাতে দিতে লাগলেন, ভক্তটি প্রত্যেক দ্রব্য মাথায় ঠেকিয়ে নিয়ে

অনির্বচনীয আনন্দে উল্লসিত হযে প্রণাম কবে বিদায নিলেন। মা তখন নিজেব গলাব ফুলেব মালাটি গৌবীমাব গলায পবিযে দিলেন। পদে নিবেদিত ফুলগুলি ভক্তেবাই নিযে গিযেছিলেন।

ভূদেব বথ তৈবি কবেছে। ঠাকুব বথে উঠবেন, সেই আযোজন হচ্ছিল। গৌবীমাব আশ্রমে বিশেষ কাজ ছিল, তাই তিনি তাডাতাডি বিদায নিযে চলে গেলেন। আমি সিঁডি পর্যন্ত তাঁব সঙ্গে গিযে পুনবায মাযেব কাছে ফিবে গেলুম।

কথায কথায গৌবীমাব কথা উঠল। মা বললেন, "আশ্রমেব মেযেদেব ও বড সেবা কবে—অসুখ-বিসুখ হলে নিজেব হাতে তাদেব গু মুত পবিষ্কাব কবে। সংসাবে ওব ও সব তো আব বড একটা কবা হযনি ঠাকুব যে সবই কবিযে নেবেন—এই শেষ জন্ম কি না।"

এইবাব পাশেব ঘবে ঠাকুব বথে উঠলেন। মা তক্তপোশে বসে অনিমেষনযনে তাকে দেখতে দেখতে কত যে আনন্দ প্রকাশ কবতে লাগলেন। পবে ভূদেব ও ভক্তেবা মিলে বথসুদ্ধ ঠাকুবকে ধবে তুলে নিচে নিযে গেলেন এবং বাস্তায, গঙ্গাব ধাবে বথ টেনে সন্ধ্যাব পব আবাব ঘবে আনলেন। এইবাব স্ত্রী ভক্তেবা উপবেব ঘবেব ভিতব বথ টানলেন। তাবপব মা, বাধু, নলিনী দিদি ও আমি টানলুম। যে কেউ আসতে লাগল তাকেই মা আনন্দ কবে বথেব কথা বলতে লাগলেন। ভক্ত-মহিলাবা প্রসাদ নিযে একে একে চলে গেলেন। পবে বাত্রিব ভোগ আবতি হতে মা নিজেই একখানি থালায কবে প্রসাদ এনে আমাকে দিলেন। সেদিন বাসায ফিবতে বাত প্রায সাডে এগাবটা হযে গিযেছিল।

যখন সামনেব বাস্তায বথ টানা হচ্ছিল মা বলেছিলেন, সকলে তো জগন্নাথ যেতে পাবে না। যাবা এখানে (ঠাকুবকে বথে) দর্শন কবলে তাদেবও হবে।'

বাধাষ্টমী, ২ আশ্বিন, ১৩১৯

গৌবীমাব আশ্রমেব স্কুলেব কাযে ব্যস্ত থাকায মাযেব নিকট আব ইচ্ছানুসাবে আজকাল যাওযা হযে ওঠে না। বাধাষ্টমীব দিন অবসব পেযে গিযে দেখি, মা গঙ্গাস্নানে যাবেন বলে পাশেব ঘবে তেল মাখছেন। লোকে বলে, তেল মাখলে প্রণাম কবতে নেই এবং মানবদেহ ধাবণ কবলে জগজ্জননীও মানব-বীতিব বশীভূত হযে চলেন, তাই প্রণাম কবলুম না। আমাকে দেখেই মা বললেন, "এস মা, এস, সকালে এসেছ—বেশ কবেছ। আজ বাধাষ্টমী দিনও ভাল, বস আমি স্নান কবে আসি।" আমি তাঁব সঙ্গে গঙ্গায যাব বলায মা বললেন, 'তবে এস।' কিন্তু অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছিল বলে গোলাপ-মা আমাকে কিছুতেই যেতে দিলেন না। মাও তখন গোলাপ-মাব মতে মত দিযে বললেন, "তবে থাক, মা, আমি

এখনি আসছি।" কাজেই রইলুম। ঐরূপ প্রায়ই দেখতে পেতুম—সরলা বধূটির মতো মা কারও কথার উপর জোর করে কিছু বলতেন না। যা হোক, রাস্তায় মা বেরুতেই জল ধরে গেল। মা তাই বাড়ি ফিরে এসেই আমাকে বললেন, "বেরুতেই জল ধরে গেল দেখে আমি ভাবলুম, আহা, তুমি আসতে চেয়েছিলে, এলে বেশ হতো, গঙ্গাদর্শন করে যেতে।" সত্যি কথা বলতে কি, আমি গঙ্গাদর্শনের জন্য যত না হোক, মার সঙ্গে যাবার আকাঙ্ক্ষাতেই যেতে চেয়েছিলুম। কারণ, সংসারে নানা বাধাবিঘ্নের জন্য মার কাছে তো আসাই হয় না, সেজন্য ভাগ্যক্রমে যেদিন আসা ঘটে, সেদিন আর ইচ্ছা হয় না যে এক মুহূর্তও মাকে চোখের আড়াল করি। গোলাপ-মা মায়ের কথা শুনে বললেন, "নাই বা গেছে, তোমার পা ছুঁলেই সব হবে।" আমিও তাই বলতেই মা বললেন, "আহা সেকি কথা! গঙ্গা!" ঐরূপে ব্যবহারে বা কথাবার্তায় মা কখনো নিজের মহত্ত্বের কথা প্রকাশ করতেন না—অপর সকলের ন্যায় তিনিও একজন সামান্য মানুষ এইরূপই বলতেন এবং দেখাতেন। তবে এও দেখেছি, অন্য কেহ কাছে না থাকলে কখনো কখনো কারও কারও প্রতি কৃপায় তাঁর অসীম মহিমান্বিত জগন্মাতার ভাব প্রকাশ পেত। ঘরে এসেই তক্তপোশখানির উপর বসে আমাকে বললেন, "বেশ, গঙ্গাস্নান করেও এসেছি।" বুঝলুম যে তাঁর পাদপদ্ম পূজা করব মনে করে এসেছি তা টের পেয়েছেন। মনে মনে বললুম—নিত্যশুদ্ধা তুমি মা, তোমার আবার গঙ্গাস্নান! তাড়াতাড়ি ফুল চন্দনাদি নিয়ে পদতলে বসতেই বললেন, "তুলসীপাতা থাকে যদি তো পায়ে দিও না।" পূজাশেষ হলে প্রণাম করে উঠলুম। মা এইবার জল খেতে বসলেন। সেই অপূর্ব স্নেহে কাছে নিয়ে বসা এবং প্রত্যেক জিনিসটির অর্ধেক খেয়ে প্রসাদ দেওয়া। আমিও মহানন্দে প্রসাদ পেলুম। শালপাতাখানিতে করে প্রসাদ খাবার সময় সাধু নাগ মহাশয়ের কথা মনে হলো। শ্রীশ্রীমাকে বললুম, "মা, শালপাতায় প্রসাদ পেলেই নাগ মহাশয়ের কথা মনে পড়ে!"

মা বললেন, "আহা, তার কি ভক্তিই ছিল! এই তো দেখ শুকনো কট্‌কটে শালপাতা! একি কেউ খেতে পারে? ভক্তির আতিশয্যে প্রসাদ ঠেকেছে বলে পাতাখানা পর্যন্ত খেয়ে ফেললে! আহা, কি প্রেমচক্ষুই ছিল তার! রক্তাভ চোখ, সর্বদাই জল পড়ছে! কঠোর তপস্যায় শরীরখানি শীর্ণ। আহা, আমার কাছে যখন আসত ভাবের আবেগে সিঁড়ি দিয়ে আর উঠতে পারত না, এমনি (নিজে দেখিয়ে) থরথর করে কাঁপত—এখানে পা দিতে ওখানে পড়ত। তেমন ভক্তি আর কারও দেখলুম না!"

আমি বললুম, "বই-এ পড়েছি, তিনি যখন ডাক্তারী ব্যবসায় ছেড়ে দিয়ে দিনরাত ঠাকুরের ধ্যানে তন্ময় থাকতেন, তখন তাঁর পিতা একদিন বলেছিলেন, 'এখন আর কি করবি, নেংটা হয়ে ফিরবি আর ব্যাঙ ধরে খাবি!' উঠানে একটা মরা ব্যাঙ পড়ে আছে দেখে নাগ মহাশয় কাপড়খানি ফেলে দিয়ে উলঙ্গ হয়ে সেই ব্যাঙটা ধরে খেয়ে পিতাকে

বলেছিলেন, 'আপনার দুই আদেশই পালন করলুম, আপনি আমার খাওয়া-পরার চিন্তা ছেড়ে ইষ্টনাম করুন'।"

মা—আহা, কি গুরুভক্তি! কি শুচি-অশুচিতে সমজ্ঞান! আমি আবার বললুম, "অর্ধোদয়-যোগের সময় কলকাতা ছেড়ে নাগ মহাশয় বাড়ি গিয়েছিলেন, তাতে তাঁর পিতা ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন, 'গঙ্গাস্নান না করে গঙ্গার দেশ থেকে বাড়ি এলি ?' কিন্তু যোগের সময় সকলে দেখে, উঠান ভেদ করে জল উঠে সারা উঠান একেবারে ভেসে যাচ্ছে! আর নাগ মহাশয়—'এস মা গঙ্গে, এস মা গঙ্গে' বলে অঞ্জলি পূর্ণ করে সেই জল মাথায় দিচ্ছেন! তাই দেখে পাড়ার সকলে সেই জলে স্নান করতে লাগল।

মা—হাঁ, তার ভক্তির জোরে অমন সব অদ্ভুতও সম্ভবে। আমি একখানা কাপড় দিয়েছিলুম, তা মাথায় জড়িয়ে রাখত। তার স্ত্রীও খুব ভাল আর ভক্তিমতী। এই সেবার—আমের সময় এখানে এসেছিল। এখনো বেঁচে আছে।

এই সময় অন্য কয়েকজন স্ত্রী-ভক্ত আসায় কথাটা চাপা পড়ে গেল। মা উঠে তাঁদের প্রণাম নিয়ে আমাকে পান সাজতে যেতে বললেন। খানিক পরে আমি দুটো পান এনে মাকে দিলাম। মা পান দুটি হাতে নিয়ে একটি খেয়ে একটি আমাকে খেতে দিলেন। আমি আবার বাকি পানগুলি সাজতে চলে এলুম। মাও অল্পক্ষণ পরে দুটি স্ত্রী-ভক্তের সহিত সেই ঘরে এসে বসলেন। স্ত্রী-ভক্ত দুটিও সাহায্য করায় খুব শীঘ্রই পানসাজা হয়ে গেল। মা ঠাকুরের পানগুলি আলাদা করে আগে তুলে নিলেন এবং 'আমার মা লক্ষ্মীরা কত শিগ্‌গির সেজে ফেললে' বলে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন।

এইবার মা তেতলায় গোলাপ-মার ঘরে গেলেন। খানিক পরে আমি সেখানে গিয়ে দেখি, মা ঐ ঘরের দরজার চৌকাঠে মাথা রেখে শুয়ে আছেন—কেমন করে ভিতরে যাই। আমাকে দেখে মা বলছেন, "এস, এস, তাতে দোষ নাই।" মার সর্বত্র এইরূপ ভাব, পরে মা মাথা তুললেন। আমি ঘরে গিয়ে কাছে বসে তাঁকে বাতাস করতে লাগলুম। মা শুয়ে শুয়ে গৌরীমার স্কুলের নানা কথা, আর গাড়িভাড়া এ-সব কথা পাড়লেন। আমি যথাযথ উত্তর দিতে লাগলুম। এই সময়ে সেই স্ত্রী-ভক্ত দুটি সেখানে এলেন। তাঁদের একজন মায়ের চুল শুকিয়ে দিতে দিতে দু-একটি পাকা চুল বেছে আঁচলে বেঁধে রাখতে লাগলেন; বললেন, কবচ করবেন। মা লজ্জিত হয়ে বললেন, "ও কেন, ও কেন? কত নুড়োনুড়ো কাঁচা চুল ফেলে দিচ্ছি!" মা এইবার উঠে ছাদে একটু রোদে গেলেন। আমরাও সঙ্গে গেলুম এবং একপাশে দাঁড়িয়ে গঙ্গাদর্শন করতে লাগলুম। এমন সময়ে ঘর হতে গোলাপ-মা বলে উঠলেন, "মা তো সকলকে নিয়ে ছাদে গেলেন, এখন কে খাবে, কে না খাবে, তা আমি কি করে জানি?" ঐ কথা শুনতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করে গিয়ে তাঁকে বললুম, "বিধবাটি কেবল খাবে না।" রৌদ্রে অনেকগুলি কাপড় ছিল, মা আমাকে সেগুলি তুলে ঘরে রাখতে বললেন। আমি তুলছি এমন সময়ে মা নিচে ঠাকুরের ভোগ দিতে নামলেন।

আমরাও সকলে নিচে ঠাকুরঘরে এলুম ; ভোগ দেওয়া হলে মা আমাকে মেয়েদের খাবার জায়গা করতে বললেন। পরে সকলে প্রসাদ পেতে বসলুম। মা দুই-এক গ্রাস খাবার পরে আমাদের সকলকে প্রসাদ দিলেন। ইহার কিছু পূর্বে আরও দুইটি স্ত্রী-ভক্ত এসেছিলেন ; তন্মধ্যে একজন বৃদ্ধা সধবা ঠাকুরের সময়ের এবং অপরটি তাঁর পুত্রবধূ! বৃদ্ধাটি খেতে খেতে বললেন, "আহা, ঠাকুর আমাদের যে-সব কথা বলে গেছেন, তা কি আমরা পালতে পেরেছি, তা হলে এত ভোগ ভুগবে কে, মা ? সংসার সংসার করেই মরছি—ওকাজ হলো না, সেকাজ হলো না—এই কেবল করছি।" মা তাঁর ঐ কথায় বললেন, "কাজ করা চাই বই কি, কর্ম করতে করতে কর্মের বন্ধন কেটে যায়, তবে নিষ্কাম ভাব আসে। একদণ্ডও কাজ ছেড়ে থাকা উচিত নয়।"

আহারান্তে মা এখন একটু বিশ্রাম কববেন—খাটের উপর শয়ন করলেন। সকলেই এখন তাঁর একটু সেবা করতে ব্যগ্র। মা কিন্তু সকলকেই বিশ্রাম করতে বললেন ; খানিক পরে বাড়িতে কাজ আছে বলে অপর স্ত্রীলোকেরা সব চলে গেলেন। আমি এবং ঠাকুরের সময়কার একটি বিধবা স্ত্রীলোক রইলুম। আমি এখন মার সেবার ভার একাই পেলুম। বিধবাটি মায়েব কাছে বসে তাঁর সংসারের দুঃখেব অনেক কথা বলতে লাগলেন, "মা, আপনার কাছে সকল অপরাধের ক্ষমা পাই, কিন্তু ওদের কাছে ক্ষমা নাই" ইত্যাদি। আমি কথাপ্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনি ঠাকুরকে দেখেছেন ?"

"ও মা, দেখেছি বই কি ! তিনি যে আমাদের বাড়িতে আসতেন। মা তখন বৌটির মতন থাকতেন।"

আমি বললুম, "ঠাকুরের দুটো কথা বলুন না—শুনি।" তিনি বললেন, "আমি না মা, মাকে বলতে বল।" কিন্তু মা তখন একটু চোখ বুঁজে আছেন দেখে আমি ওকথা বলতে পাবলুম না। খানিক পবে মা নিজেই বলছেন, "যে ব্যাকুল হয়ে ডাকবে সেই তাঁর দেখা পাবে। এই সে দিন* একটি ছেলে মাবা গেল। আহা, সে কত ভাল ছিল ! ঠাকুর তাদের বাড়ি যেতেন। একদিন পরের গচ্ছিত ২০০˙০০ টাকা ট্রামে তাব পকেট থেকে মারা যায়, বাড়ি এসে দেখে। ব্যাকুল হয়ে গঙ্গার ধারে গিয়ে কাঁদছে—'হায় ঠাকুর, কি করলে !' তাব অবস্থাও তেমন ছিল না যে নিজে ঐ টাকা শোধ করবে। আহা, কাঁদতে কাঁদতে দেখে ঠাকুর তার সামনে এসে বলছেন, "কাঁদছিস কেন ? ঐ গঙ্গার ধারে ইট চাপা আছে দ্যাখ্।" সে তাড়াতাড়ি উঠে ইটখানা তুলে দেখে—সত্যই তো একতাড়া নোট ! শরতের কাছে এসে সব বললে। শরৎ শুনে বললে, 'তোরা, তো এখনো দেখা পাস, আমরা কিন্তু আর পাই নে।' ওরা পাবে কি ? ওরা তো দেখে শুনে এখন গ্যাঁট্ হয়ে বসেছে। যারা ঠাকুরকে দেখেনি, এখন তাদেরই ব্যাকুলতা বেশি।

*৩১ ভাদ্র ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত তেজচন্দ্র মিত্র দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমা তাঁহার কথাই বলিতেছেন

"ঠাকুর তখন দক্ষিণেশ্বরে, রাখাল টাখাল এরা সব তখন ছোট। একদিন রাখালের বড় খিদে পেয়েছে, ঠাকুরকে বললে। ঠাকুর ঐ কথা শুনে গঙ্গার ধারে গিয়ে 'ও গৌরদাসী, আয় না, আমার রাখালের যে বড় খিদে পেয়েছে', বলে চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন। তখন দক্ষিণেশ্বরে খাবার পাওয়া যেত না। খানিক পরে গঙ্গায় একখানা নৌকা দেখা গেল। নৌকাখানা ঘাটে লাগতেই তার মধ্য হতে বলরামবাবু, গৌরদাসী প্রভৃতি নামল এক গামলা রসগোল্লা নিয়ে। ঠাকুর তো আনন্দে রাখালকে ডাকতে লাগলেন, 'ওরে, আয় না রে রসগোল্লা এসেছে, খাবি আয়। খিদে পেয়েছে বললি যে।' রাখাল তখন রাগ করে বলতে লাগল, 'আপনি অমন করে সকলের সামনে খিদে পেয়েছে বললেন কেন?' তিনি বললেন,'তাতে কি রে,খিদে পেয়েছে, খাবি তা বলতে দোষ কি?' তাঁর ঐ রকমই স্বভাব ছিল কি না।"

এমন সময় ভূদেব স্কুল থেকে জ্বর নিয়ে এল। মা তার জন্য বিছানা করে দিতে বললেন। বিছানা করে দিলুম। মাকে আজ একবার বলরামবাবুর বাড়ি যেতে হবে, রামবাবুর মাকে দেখতে—কারণ তিনি রক্তামাশয়ে খুব পীড়িতা। তাই তাড়াতাড়ি উঠে বৈকালের কাজকর্ম সেরে নিতে লাগলেন, বললেন, "একবার যেতেই হবে, মাকুর স্কুলের (নিবেদিতা স্কুলের) গাড়ি এলে দাঁড়াতে বলো।" ঠাকুরকে বৈকালী-ভোগ দিয়ে উঠে আমাকে কিছু প্রসাদ নেব কি না জিজ্ঞাসা করায় বললুম, 'এখন থাক্।' মা বললেন, "তবে পরে খেয়ো! নলিনী খেতে দিস।" মাকুর গাড়ি আসতেই বললেন, "আমি শিগগির ঘুরে আসছি, তুমি বসে থেকো, আমি না এলে যেও না।" মা ও গোলাপ-মা বলরামবাবুর বাড়ি গিয়ে ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এলেন। এদিকে খবর এসেছিল আমাকে নিয়ে যেতে লোক এসেছে। আমি কিন্তু মার ফিরবার অপেক্ষায় ছিলুম। মা এসেই বললেন, "এই যে আছ মা, আমি এই তোমার জন্যে তাড়াতাড়ি আসছি ; জল খেয়েছ?"

'না, মা।'

"সে কি, নলিনী খেতে দিস্ নি? বলে গেলুম।"

নলিনী (লজ্জিতভাবে)—মনে ছিল না, এই দিচ্চি।

মা—না থাক এখন আর তোকে দিতে হবে না, আমিই দিচ্চি। (আমার প্রতি) তুমি চেয়ে খাও নি কেন, মা? এ যে নিজের বাড়ি।

আমি বললুম, "তেমন খিদে পেলে চেয়ে খেতুম বই কি, মা।"

মা তাড়াতাড়ি নিজেই কিছু প্রসাদী মিষ্টি এনে দিলেন। আমি আনন্দের সহিত খেলুম। 'পান দি' বলে সাজা পান আনতে গেলেন। নলিনী দিদি বললেন, "বোগনোতে আর পান সাজা নেই, দেবে কি?" কিন্তু পুনরায় খুঁজতে গিয়ে মা তাতেই দুটি সাজা পান পেয়ে আমার হাতে দিলেন। আমি প্রণাম করে বিদায় চাইতে "এস মা, আবার এস, দুর্গা, দুর্গা" বলে উঠে বললেন, "আমি সঙ্গে যাব কি? একলা নেমে যেতে পারবে? রাত হয়েছে।"

আমি বললুম, "খুব পারব মা, আপনাকে আসতে হবে না।" মা তবু 'দুর্গা, দুর্গা' বলতে বলতে সহাস্য মুখে সিঁড়ি পর্যন্ত এসে দাঁড়ালেন ; আমি বললুম, "আর দাঁড়াতে হবে না মা, আমি বেশ যেতে পারব।"

আর একদিন—সেদিন অক্ষয় তৃতীয়া, পূর্বোক্ত সধবা বৃদ্ধাটি ও তাঁর বধূ স্নান করে এসে পৈতে আর দু-একটি কি ফল মায়ের হাতে দিতে গেলে মা বললেন, "আমাকে কেন ? ভূদেবকে দাও।" তার খানিক পরে, কথায় কথায় আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, "আজকের দিনে আমি তোমাদের আশীর্বাদ করছি, তোমাদের মুক্তি লাভ হোক। জন্ম মৃত্যু বড় যন্ত্রণা, তা যেন তোমাদের আর ভুগতে না হয়।"

শেষ সপ্তাহ, আশ্বিন, ১৩১৯

পূজার ছুটিতে একদিন সকালেই মার কাছে গেলুম। দেখলুম, মা খুব ব্যস্ত। আমাকে বসতে বলে রাঁচি হতে কে ভক্ত এসেছেন তাঁকে ডাকতে বললেন ভক্তটি অনেক ফল, ফুল, কাপড় ও একছড়া কাপড়ের গোলাপের মালা—দেখতে ঠিক সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের মতো—নিয়ে উপরে এলেন। মালাটি মাকে গলায় পরতে অনুরোধ করায় মা উহা পরলেন। এমন সময়ে গোলাপ-মা এসে মালার লোহার তার মায়ের গলায় লাগবে বলে ভক্তটিকে বকলেন। ভক্তটিকে অপ্রতিভ হতে দেখে করুণাময়ী মা বললেন, "না না লাগছে না, কাপড়ের উপর পরেছি।" ভক্তটি প্রণাম করে নিচে গেলেন।

পরে মা ও আমি জলখাবার (প্রসাদ) খেতে বসলুম। আমি কিছু ফল ও খাবার নিয়ে গিয়েছিলুম মাকে দেবার জন্য। উহা তাঁর কাছে আনতেই মা বললেন, "ঠাকুরকে নিবেদন করে নিয়ে এস।" নিয়ে আসতে তা থেকে একটি আঙ্গুর মুখে দিয়ে বললেন, "আহা, বেশ মিষ্টি তো।" একখানি কাপড় কয়েকদিন পূর্বে দিয়েছিলুম। সেই কাপড়খানিই পরেছিলেন। আমাকে দেখিয়ে বললেন, "এই দেখ গো, তোমার কাপড় পরে পরে কালো করেছি।" অবাক হয়ে ভাবলুম—এই অযোগ্য সন্তানের ওপর তোমার এতই কৃপা ও স্নেহ! মা নিজের পাত হতে প্রসাদ তুলে তুলে আমাকে দিতে লাগলেন। আমি হাত পেতে নিচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ একবার তাঁর হাতে আমার হাত ঠেকে গেল। আমি বললুম, "মা হাত ধুয়ে ফেলুন। মা হাতে একটু জল দিয়ে বললেন, 'এই হয়েছে।' এই সময়ে নলিনী দিদি এসে বসলেন, ইতঃপূর্বে কি কারণে যেন তিনি রাগ করেছিলেন। মা তাঁকে তিরস্কার করে বললেন, "মেয়েমানুষের অত রাগ কি ভাল, সহ্য চাই। শৈশবে বাপ-মায়ের কোল, যৌবনে স্বামীর আশ্রয় ছাড়া মেয়েদের আর কেউ 'আবরুতে' পাবে না। মেয়েলোক বড় খারাপ জাত, ফস্ করে একটা কথা যদি কেউ বলেই ফেললে গো ! মানুষের তো কথা—বললেই হলো ! তাই দুঃখকষ্ট সয়েও (স্বামী বা বাপ-মায়ের কাছে) থাকতে হয়।"

একটু পরে রাধু এসে হাঁটুর কাপড় তুলে বসেছে। আবার মা তাকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন, "ও কি গো, মেয়েলোকের হাঁটুর কাপড় উঠবে কেন?" এই বলে কি একটি শ্লোক বললেন। তার মানে, হাঁটুর কাপড় উঠলেই মেয়েলোক উলঙ্গের সামিল।

চন্দ্রবাবুর ভগ্নী এসেছেন। কথায় কথায় তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মার গোঁসাই (স্বামী) আছেন? এ সব বুঝি ছেলে, মেয়ে, বউ?"

আমি—কেন, ঠাকুরের কথা শোনেন নি? তাঁর শিক্ষাই ছিল কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ।

তিনি অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "আমি মনে করেছি এরা সব ছেলে, বউ হবে।"

দুর্গাপূজা আসছে। মা তাই জামাইদের* কাপড় ভাগ ভাগ করে রাখছিলেন এবং আমাকে পৃথক করে বেঁধে রাখতে বললেন। আর একখানি কাপড় আমার হাতে দিয়ে বললেন, "এখানা কুঁচিয়ে রাখ তো মা, গণেন পূজোর সময় পরে মঠে যাবে।"

মধ্যাহ্নের ভোগ ও প্রসাদ হয়ে গেল। আহারান্তে মা বিশ্রাম করছেন। আমি নিকটে বসে বাতাস করছিলুম। মা তাতে বললেন, "ঐখান হতে একটা বালিশ নিয়ে আমার এইখানে শোও, আর বাতাস লাগবে না।" মায়ের বালিশে কি করে শোব মনে করে রাধুর ঘর হতে একটা বালিশ নিয়ে আসতেই মা হেসে বললেন, "ওটা পাগলের (রাধুর মার) বালিশ গো, তুমি এই বালিশটাই আন না, তাতে দোষ নেই।" রাধুকে ডেকে বললেন, "রাধুও আয়, তোর দিদির পাশে শো।"

মার সঙ্গে চন্দ্রবাবুর ভগ্নীর সম্বন্ধে কথা হতে লাগল। মা বললেন, "তা তুমি বললেই পারতে—হাঁ, এই তো তাঁর স্বামী ঘরে বসে আছেন, আর তোমরা সব ছেলেমেয়ে।"

আমি—সে তো জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে কত ছেলেমেয়ে আছে, মা।

মা হাসতে লাগলেন। কথায় কথায় আবার বললেন, "কত লোকে কত ভাবে আসে, মা। কেউ হয়তো একটা শশা এনে ঠাকুরকে দিয়ে কত কামনা করে বলে—'ঠাকুর তোমাকে এই দিলুম, তুমি এই করো।'—এই এমনি কত কামনা!"

মা একটু পাশ ফিরে শুলেন। আমারও একটু তন্দ্রার মতো এসেছিল, জেগে দেখি মা পাখা নাড়ছেন। একটু পরেই মা উঠলেন। দেখলুম পাশের ঘরে কয়েকটি স্ত্রীলোক বসে আছেন। তন্মধ্যে দু-জন গৈরিকধারিণী। তাঁরা মাকে প্রণাম করলেন। ঐ সঙ্গে একটি ছোট ছেলেও এসেছিল, সে প্রণাম করতেই মা প্রতিনমস্কার করলেন। তাঁরা মিষ্টি এনেছিলেন, মা আমাকে তুলে রাখতে বললেন এবং হাতমুখ ধুতে গেলেন। পরিচয়ে জানলুম, তাঁরা কালীঘাটের শিবনারায়ণ পরমহংসের শিষ্যা, সম্প্রতি তাঁদের গুরুর ওখানে অহোরাত্রব্যাপী এক যজ্ঞ হচ্ছে—ইত্যাদি। একটু পরেই শ্রীশ্রীমা এসে বসলেন। গৈরিকধারিণীদের মধ্যে একজন মাকে বললেন, "আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

* মাব তিনটি ভ্রাতুষ্পুত্রী—তাদেব স্বামীব জন্য

মা—বল।

গৈরিকধারিণী—মূর্তিপূজায় কিছু সত্য আছে কি না ? আমাদের গুরু বলেন, "মূর্তিপূজা কিছু নয়, সূর্যের ও অগ্নির উপাসনা কর।"

মা—তোমার গুরু যখন বলেছেন, তখন ওকথা আমায় জিজ্ঞাসা না করাই ঠিক। গুরুবাক্যে বিশ্বাস রাখতে হয়।

তিনি বললেন, "তা হবে না, আপনার মত বলতেই হবে।" মা নিজ মত বলতে পুনরায় অসম্মতি প্রকাশ করলেন। কিন্তু গৈরিকধারিণী একেবারে নাছোড়বান্দা। তখন মা বললেন, "তিনি (তোমার গুরু) যদি সর্বজ্ঞ হতেন—এই দেখ তোমার জিদের ফল, কথায় কথা বেরুল—তা হলে ঐ কথা বলতেন না। সেই আদিকাল হতে কত লোকে মূর্তি উপাসনা করে মুক্তি পেয়ে আসছে, সেটা কিছু নয় ? আমাদের ঠাকুরের ওরূপ সঙ্কীর্ণ ভেদবুদ্ধি ছিল না। ব্রহ্ম সকল বস্তুতেই আছেন। তবে কি জান—সাধুপুরুষেরা সব আসেন মানুষকে পথ দেখাতে, এক এক জনে এক এক রকমের বোল বলেন। পথ অনেক, সেজন্য তাঁদের সকলের কথাই সত্য। যেমন একটা গাছে সাদা, কালো, লাল নানা রকমের পাখি এসে বসে, হরেক রকমের বোল বলছে। শুনতে ভিন্ন ভিন্ন হলেও সকলগুলিকে আমরা পাখির বোল বলি—একটাই পাখির বোল আর অন্যগুলো পাখির বোল নয় এরূপ বলি না।"

তাঁরা কিছুক্ষণ তর্ক করে শেষে নিরস্ত হলেন। তারপর তাঁরা শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার বাড়ি কোথায় ?"

মা—কামারপুকুর, হুগলী জেলায়।

"এখানকার ঠিকানা কি বলুন, আমরা মাঝে মাঝে আসব।"

মা ঠিকানা লিখে দিতে বললেন। তাঁরা যে মিষ্টি এনেছিলেন ইতঃপূর্বেই শ্রীশ্রীমা তা হতে ছেলেটিকে দিতে বলেছিলেন এবং আমি তখনই দিয়েছিলুম। একটু পরে তাঁরা বিদায় নিলেন। তাঁরা গেলে শ্রীশ্রীমা বললেন, "মেয়েলোকের আবার তর্ক। জ্ঞানী পুরুষরাই তর্ক করে তাঁকে বড় পেলে! ব্রহ্ম কি তর্কের বস্তু ?" একটু পরেই আমার গাড়ি এল। মা বললেন, "এই গো পটলডাঙার গাড়ি এসেছে বলছে, এখনি এল ?" ঐ কথা বলেই তিনি তাড়াতাড়ি ঠাকুরের বৈকালী-ভোগ দিলেন এবং কিছু প্রসাদ, প্রসাদী জলের গ্লাসটি এবং দুটি পান নিয়ে বারাণ্ডায় আড়ালে গিয়ে ডাকলেন—'এস।' তাঁর স্নেহযত্নে আমার চোখে জল এল। ভাবতে লাগলুম—আবার কত দিনে মার সঙ্গে দেখা হবে। কারণ, পূজার পরেই মা কাশী যাবেন। মা সস্নেহে বললেন, 'আবার আসবে।' এমন সময় বাহির হতে চন্দ্রবাবু এসে একটু বিরক্তির সহিত বললেন, "বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে, গাড়োয়ান দিক্ করছে, আমি এই সকলকে বলে রাখলাম গাড়ি আসলে কেউ যেন তিলার্ধ দেরি না করেন।" শ্রীশ্রীমা তাই শুনে বললেন, "আহা, তার কি, এই তো যাচ্ছে—এস মা।" আমি অশ্রুসিক্ত চোখে তাড়াতাড়ি প্রণাম করে নেমে গেলুম। প্রাণের আবেগে সেদিন বাড়িতে কারও সহিত ভাল করে কথা বলতে পারলুম না। সারারাতও ঐ ভাবে কেটে গেল।

১৮ মাঘ, ১৩১৯

৩ মাঘ মা কাশী হতে ফিরেছেন। সকালবেলা গিয়ে দেখি, মা পূজা করছেন এবং পূজা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। পূজা শেষ হলে উঠে বললেন, "এই যে, মা, এসেছ, আমি ভাবছি দেখা হলো না বুঝি, আবার শিগ্‌গির দেশে চলে যাব।" খাবার তৈরি করে নিয়ে গিয়েছি দেখে মা বললেন, "ঠাকুরের আজ মিষ্টি কম দেখে ভাবছিলুম। তা ঠাকুর তাঁর ভোগের জিনিস সব নিজেই যোগাড় করে নিলেন—তা আবার কেমন ঘরের তৈরি সব খাবার!" ঠাকুরকে ঐ সব নিবেদন করা হলে ভক্তদের জন্য এক একখানি শালপাতায় ভাগ ভাগ করে সাজিয়ে দিতে লাগলেন। ভূদেব বললে, "এত দেব কাকে?"

মা হেসে বললেন, "দেখ ছেলের বুদ্ধি! নিচে যেসব ভক্তরা আছে তাদের দিবি। দিয়ে আয়গে যা।"

একটু পরে রাঁচি হতে একটি ভক্ত এসে মাকে প্রণাম করে ফুলের মালা দিলেন এবং বললেন, "সুরেন আপনাকে এই টাকাটি দিয়েছে।" এই বলে টাকাটি মার পদতলে রাখলেন।

বেলা হয়েছে। রাধু সামনের মিশনারী স্কুলে যাবে বলে খেয়ে দেয়ে কাপড় পরে প্রস্তুত, এমন সময় গোলাপ-মা এসে মাকে বললেন, "বড় হয়েছে মেয়ে, এখন আবার স্কুলে যাওয়া কি?" এই বলে রাধুকে যেতে নিষেধ করলেন। রাধু কাঁদতে লাগল।

মা বললেন, "কি আর বড় হয়েছে, যাক না। লেখাপড়া, শিল্প এসব শিখতে পারলে কত উপকার হবে। যে গ্রামে বিয়ে হয়েছে—এসব জানলে নিজের এবং অন্যেরও কত উপকার করতে পারবে, কি বল মা?" পরে রাধু স্কুলে গেল।

অন্নপূর্ণার মা একটি মেয়ে নিয়ে এসেছেন দীক্ষার জন্য। তিনি বললেন, "মা, ও আমাকে খেয়ে ফেললে তোমার কাছে দীক্ষা নেবার জন্যে। কি করি—নিয়ে এলুম।"

মা—আজ কি করে হবে? জল খেয়েছি।

অন্নপূর্ণার মা—ও তো খায় নি। তা মা, তোমার খাওয়ায় তো আর দোষ নেই।

মা—একেবারে কি ঠিক হয়েই এসেছে?

অন্নপূর্ণার মা—হাঁ মা, একেবারে স্থির করেই এসেছে। মা সম্মত হলেন। দীক্ষার পরে শ্রীশ্রীমাকে মেয়েটির কথা বলতে লাগলেন—"ও কি মা, তেমন মেয়ে! ঠাকুরের বই পড়ে চুল কেটে পুরুষ সেজে তপস্যা করতে তীর্থে বেরিয়ে গিয়েছিল—একেবারে বৈদ্যনাথে গিয়ে হাজির! সেখানে এক বনের মধ্যে বসেছিল। ওর মায়ের গুরু সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, ওকে দেখতে পেয়ে পরিচয় নিয়ে নিজের কাছে রেখে ওর বাপের কাছে সংবাদ পাঠাতে ওর বাপ গিয়ে নিয়ে এল।"

মা চুপ করে কথাগুলি শুনে বললেন, "আহা, কি অনুরাগ!" আর সকলে বলতে

লাগলেন, "ও মা, সে কি গো! অমন রূপের ডালি মেয়ে (মেয়েটি খুবই সুশ্রী) কেমন করে রাস্তায় বেরিয়েছিল, হোক গে বাপু ভক্তি অনুরাগ!"

নলিনী—বাপরে আমাদের দেশ হলে আর রক্ষে থাকত না।

অবশ্য এই সব কথা মেয়েটির ও অন্নপূর্ণার মার অসাক্ষাতেই বলা হচ্ছিল।

নলিনী ও আমার সঙ্গী একটি স্ত্রীলোক উভয়েই স্বামীর কাছে থাকেন না। কি কথায় যেন তাঁদেব কথা এল। মা বললেন, "ঠাকুর বলতেন, জরু, গরু, ধান—এ তিন রাখবে আপন বিদ্যমান," আরও বললেন, "এসব চারাগাছের সময়ে বেড়া না দিলে 'ছাগলে মুড়াবে মাথা'।"

দুপুরে আহারান্তে সকলে পাশের ঘরে শয়ন করলেন। নূতন মেয়েটিকে মা, একটু শুতে বললেন। সে বললে, "না, মা, আমি দিনের বেলায় শুই না।" আমি তাকে বললুম, "মা বলছেন, কথা শুনতে হয়।" 'তবে শুই' বলে সে একটু শুয়ে আবার তখনই উঠে বারাণ্ডায় গেল। মা বললেন, "মেয়েটি একটু চঞ্চল, সেই জন্যেই বেরিয়ে গিয়েছিল।" মা মেয়েটির ঝিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মেয়েটির স্বামী কি করে? কেন মেয়েটিকে কাছে নিয়ে রাখে না?"

ঝি বললে, "তিনি অল্প মাইনে পান, ঘাব ঘরে কেউ নেই, ওঁকে নিয়ে গিয়ে একলাও বাখতে পারেন না। তাই শনিবার শনিবাব শ্বশুববাড়ি আসেন।"

অন্নপূর্ণার মা—ও স্বামীকে বলে, "তুমি আমার কিসের স্বামী, জগৎ-স্বামীই আমার স্বামী।"

মা কোন উত্তব দিলেন না।

ঠাকুরঘরের উত্তরেব বাবাণ্ডায় মেয়েবা সব গল্প কবছিলেন।

বড় গোল হচ্ছিল। মা বললেন, "বলে এস তো, মা, আস্তে কথা বলতে, এক্ষুণি শবতের ঘুম ভেঙে যাবে" (তিনি নিচে বৈঠকখানা ঘরে শুয়েছিলেন)। ঘবটি এখন নির্জন দেখে মাকে সাধন-ভজন ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করলুম। মা বললেন, "ঠাকুর ও আমাকে অভেদ-ভাবে দেখবে, আব যখন যে ভাবে দর্শন পাবে, সেই ভাবেই ধ্যান-স্তুতি করবে, ধ্যান হয়ে গেলেই পূজা শেষ হলো। এইখানে (হৃদয়ে) আরম্ভ ও এইখানে (মস্তকে) শেষ কববে।" এই বলে দেখিয়ে দিলেন।

মা—মন্ত্র-তন্ত্র কিছু নয়, মা, ভক্তিই সব। ঠাকুরের মাঝেই গুরু, ইষ্ট, সব পাবে। উনিই সব।

তারপর কথাপ্রসঙ্গে গৌরীমা ও দুর্গাদেবীর কথা উঠল। মা উভয়ের অনেক সুখ্যাতি কবলেন। আর বললেন, "দেখ, মা, চড় খেয়ে বামনাম অনেকেই বলে, কিন্তু শৈশব হতে ফুলের মতো মনটি যে ঠাকুরের পায়ে দিতে পাবে, সে-ই ধন্য। মেয়েটি যেন অনাঘ্রাত ফুল। গৌবীদাসী মেয়েটিকে কেমন তৈরি করেছে! ভায়েরা বিয়ে দেবার বহু চেষ্টা

করেছিল ! গৌরীদাসী ওকে লুকিয়ে হেথা সেথা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াত। শেষে পুরী গিয়ে জগন্নাথের সঙ্গে মালা বদল করে সন্ন্যাসিনী করে দিলে। সতী লক্ষ্মী মেয়ে, কেমন লেখাপড়াও শিখেছে ! কি একটা সংস্কৃত পরীক্ষাও দেবে শুনছি।" গৌরীমার পূর্বজীবন সম্বন্ধেও অনেক কথা বললেন ; তাতে জানলুম, তাঁর জীবনের উপর দিয়ে কম দুঃখ-ঝঞ্ঝা বয়ে যায়নি। কাশীর কথা ওঠাতে বললেন, "কাশীতে বেশ ছিলুম গো, আর আমি তো সঙ্গে করে যদুবংশ সব নিয়ে গিয়েছিলুম, মা।"

একটু পরে চার-পাঁচটি স্ত্রীলোক এলেন। তাঁরা ডাব ও কিছু অন্য ফল মায়ের-চরণপ্রান্তে রাখলেন। একটি স্ত্রীলোক প্রণাম করবার জন্য নিকটে আসবার উপক্রম করলে মা বললেন, "ওখান হতেই কর।" তাঁরা প্রত্যেকেই মার সামনে দু-চারটি পয়সা রেখে প্রণাম করতে লাগলেন ; মা পয়সা দিতে বারবার নিষেধ করলেন। তাঁর কিছু উপদেশ চাইতে মা একটু হেসে বললেন, "আমি আর কি উপদেশ দেব। ঠাকুরের কথা সব বইয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। তাঁর একটা কথা ধারণা করে যদি চলতে পার, তো সব হয়ে যাবে।" শ্রীশ্রীমা খুঁটিনাটি অনেক কথা তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা বিদায় নিলে মা আমাকে বললেন, "উপদেশ নেয় তেমন আধার কই ? আধার চাই, মা, নইলে হয় না।" কথায় কথায় ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয় প্রভৃতির কথা উঠল ; দু-একটি কথা হতেই অন্নপূর্ণার মা ঘরে ঢুকতে সে-সব কথা চাপা পড়ে গেল। তিনি বললেন, "মা, আমি স্বপ্ন দেখেছি, তুমি যেন আমাকে বলছ, 'আমার প্রসাদ খা, তবে তোর অসুখ সারবে।' আমি বলছি, 'ঠাকুর নিষেধ করেছেন, আমাকে কারও উচ্ছিষ্ট খেতে।' তা মা, আমাকে এখন তোমার প্রসাদ একটু দাও।" মা সম্মত না হওয়ায় তিনি খুব জিদ করতে লাগলেন।

মা বললেন, "ঠাকুর যা নিষেধ করেছেন, তাই করতে চাও ?"

অন্নপূর্ণার মা উত্তর করলেন, "তাঁতে ও তোমাতে যতদিন তফাত বোধ ছিল ততদিন ওকথা ছিল, এখন দাও।" মা শেষে তাঁকে প্রসাদ দিলেন।

কিছুক্ষণ পরে তারা বিদায় নিলেন। গৌরীমার ওখান হয়ে যেতে হবে বলে আমিও একটু পরে বিদায় নিলুম।

৫ কি ৬ ফাল্গুন, ১৩১৯—শ্রীমান শোকহরণের সহিত পুনরায় গিয়েছি। সকালবেলায় পূজা হয়ে গেছে। দেখেই মা বললেন, "এসেছ, মা বেশ করেছ। জয়রামবাটী যাবার দিন বদলে গেছে. ১৩ নয় ১১ (ফাল্গুন)। কার সঙ্গে এলে ?"

আমি—শোকহরণ নিয়ে এসেছে। অনেক দূরে আছি মা, আসবার সুবিধা হয় না।

মা শ্রীমানের প্রশংসা করে বললেন, "আহা, লক্ষ্মী ছেলে কত কষ্ট করে নিয়ে এসেছে !" জিজ্ঞাসা করলেন, "জামাই (আমার স্বামী) কেমন আছেন ?"

আমি—বড় ভাল নেই, মা।

কিছুক্ষণ পরে একখানি চিঠির জবাব লিখে দিতে বললেন। মা বলতে লাগলেন, আর আমি লিখে যেতে লাগলুম।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর মা একটু বিশ্রাম করছিলেন, এমন সময় কয়েকজন স্ত্রীলোক দর্শন করতে এলেন। মা শুয়ে শুয়েই তাঁদের কুশল-প্রশ্ন করতে লাগলেন। তাঁরা দু-একটি কথার পর বলতে আরম্ভ করলেন, "আমার একটি ভাল ছাগল আছে, দু সের দুধ দেয়। তিনটি পাখি আছে। এসবই এখন অবলম্বন। আর বয়স তো কম হয়ে গেল না, মা।" আমার তখন ঠাকুরের কথা মনে পড়ল—'বেড়াল পুষিয়ে মহামায়া সংসার করান!' শ্রীশ্রীমা 'হাঁ হাঁ' করে যেতে লাগলেন।

আহা! মা, আমাদের জন্য তোমাকে কতই না সইতে হয়! এই বিশ্রামটুকুর সময়েও যত রাজ্যের বাজে কথা! বৈকালে বেলা একটু পড়ে আসতে আমরা বিদায় নিলুম!

গত ১১ ফাল্গুন মা পিত্রালয়ে গিয়েছিলেন। ১৩২০ সনের আশ্বিন মাসে পূজার পূর্বে কলকাতা ফিরেছেন। একদিন বৈকালে গিয়ে দেখি, একটি স্ত্রীলোক তাঁর পদতলে কাঁদছেন—দীক্ষার জন্য। শ্রীশ্রীমা চৌকির উপর বসে আছেন। মা সম্পূর্ণ অসম্মত—বলছেন, "আমি তো তোমাকে পূর্বেই বারণ করেছি; কেন এলে? আমার শরীর ভাল নয়, এখন হবে না।" সে যতই বলছে, মা আরও বিরক্তি প্রকাশ করছেন, "তোমাদের আর কি? তোমরা তো মন্ত্রটি নিয়ে গেলে; তারপর?" মেয়েটি তবুও নাছোড়। উপস্থিত সকলেই বিরক্ত হয়ে উঠলেন। শেষে মা বললেন, 'পরে এস।' তখন স্ত্রীলোকটি বললে, "তবে, আপনার কোন ভক্ত ছেলেকে বলে দিন।"

মা—তারা যদি না শুনে?

মেয়েটি—সে কি, আপনার কথা শুনবে না?

মা—এ ক্ষেত্রে নাও শুনতে পারে।

তারপর কিছুতেই না ছাড়াতে মা বললেন "আচ্ছা, খোকাকে* বলে দেব, সে দেবে।" তবুও মেয়েটি বলতে লাগলেন, "আপনি দিলেই ভাল হয়, আপনি ইচ্ছা করলেই পারেন।" এই বলে দশ টাকার একখানি নোট বের করে বললেন, "এই নিন টাকা, যা লাগে আনিয়ে নেবেন।" ঐরূপে টাকা দিবার প্রস্তাবে আমাদের লজ্জা করতে লাগল, রাগও হলো। মা এবার তাঁকে ধমকে বললেন, "কি, আমাকে টাকার লোভ দেখাচ্ছ না কি? আমি টাকায় ভুলি না, যাও, টাকা নিয়ে যাও।" এই বলে উঠে গেলেন।

পরে স্ত্রীলোকটির অনেক অনুনয়-বিনয়ে ঠিক হলো মহাষ্টমীর দিন দীক্ষা হবে। মেয়েটি তো বিদায় নিলেন। মা এইবার পাশের ঘরে এসে বসে আমাকে ডাকলেন, "এস, মা, এই ঘরে এস। এতক্ষণ তোমাকে একটা কথাও জিজ্ঞেস করতে পারি নি। কেমন আছ?"

* স্বামী সুবোধানন্দ—ডাকনাম 'খোকা' মহারাজ

বেলা শেষ হয়ে এসেছে, পূজার সময় বলে অনেক স্ত্রীলোক কাপড়, মিষ্টি ইত্যাদি নিয়ে এসেছেন। মা হাসিমুখে তাঁদের কথার উত্তর দিচ্ছেন। খুব গরম, আমি মাকে হাওয়া করতে লাগলুম। একটি মহিলা এসে সাগ্রহে আমার হাত থেকে পাখাখানা চেয়ে নিয়ে মাকে হাওয়া করতে লাগলেন। মায়ের একটু সামান্য সেবার কাজ করতে পেলেও সকলের কি আনন্দ! আহা, কি অপূর্ব স্নেহ-করুণাতেই শ্রীশ্রীমা আমাদিগকে চিরাবদ্ধ করেগেছেন আর তাঁর অবস্থানে বাগবাজারের মাতৃমন্দির সংসার-তাপদগ্ধ মানুষের কি মধুর শান্তিনিলয়ই হয়েছিল, তা বলা বা বুঝান অসম্ভব।

এইবার আমিও রওনা হব। মাকে প্রণাম করতে গিয়ে বললুম, "মা, শীঘ্রই একবার বাপের বাড়ি যেতে হবে।" মা সস্নেহে বললেন, "আবার শিগ্‌গির এস, মা—চিঠিপত্র দিও।" মার জন্য একখানি কাপড় নিয়ে গিয়েছিলুম, আসবার সময় বলছেন, "তোমার কাপড়খানি দেখিয়ে দিয়ে যাও, মা—পরব।"

প্রায় আড়াই মাস পরে আবার একদিন (১৪ অগ্রহায়ণ) গিয়েছি। সিঁড়ি উঠতেই কল-ঘরে মার সঙ্গে দেখা হলো। মা কাপড় কাচতে গিয়েছিলেন। আধভিজে কাপড়েই এসে জিজ্ঞেস করে গেলেন, "এতদিন দেরিতে কেন এলে?" কাপড় কেচে এসে তক্তপোশের উপর বসতে কুশলপ্রশ্নাদির পর কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলুম, "সেই যে স্ত্রীলোকটি মন্ত্র নিতে চেয়েছিলেন, তাঁর কি হলো, মা?"

মা—সে সেদিন নিতে পারলে না। বলেছিলুম আমার অসুখ সারুক, তার পর নেবে—তাই হলো। অসুখ হওয়ায় সেদিন সে আসতে পারে নি। তার অনেক পরে একদিন এসে নিয়ে গিয়েছে।

আমি—তাই তো মা, আপনার মুখ দিয়ে যে কথা বেরিয়ে পড়ে তাই হয়। আমরা আপনার ইচ্ছা না মেনে নিজেরা কষ্ট পাই, আপনিও নিজের অসুস্থ শরীরে অনেক সময় দয়া করে দীক্ষা দিয়ে আমাদের ভোগ নিজ শরীরে নিয়ে আরও বেশি কষ্ট পান।

মা বললেন, "হাঁ, মা, ঠাকুর ঐ কথা বলতেন। নইলে এসব শরীরে কি রোগ হয়? এর মধ্যে আবার কলেরার মতো হয়েছিল।"

আমার ভ্রাতৃবধূ সঙ্গে গিয়েছিল। মা তাকে দেখে বললেন, "বেশ শান্ত বৌটি। এক ব্যান্নন নুনে পোড়া হলে মুশকিল হতো।" অর্থাৎ আমার ভ্রাতৃবধূ একটি মাত্র, সে ভাল না হলে তাকে নিয়ে সংসারে থাকা কষ্টকর হতো।

মাঘ, ১৩২০

একদিন সকালে গিয়েছি; বাগান থেকে অনেকগুলি ফুল তুলে নিয়ে গিয়েছিলুম। মায়ের নিকট উহা দিতে মা মহা আনন্দিত হয়ে ঠাকুরকে সাজাতে লাগলেন। নীল রঙের

এক রকমের ফুল ছিল। সেইগুলি হাতে করে বললেন, "আহা,দেখেছ কি রং !দক্ষিণেশ্বরে 'আশা' বলে একটি মেয়ে একদিন বাগানে কালো-কালো-পাতা একটি গাছ থেকে সুন্দর একটি লাল ফুল তুলে হাতে নিয়ে খালি বলতে লাগল, 'এ্যাঁ, এমন লাল ফুল, তার এমন কালো পাতা! ঠাকুর, তোমার একি সৃষ্টি!' এই বলে, আর হাউ হাউ করে কাঁদে। ঠাকুর তাই দেখে তাকে বলছেন, 'তোর হলো কি গো, এত কাঁদছিস কেন ?' সে আর কিছু বলতে পারে না, খালি কাঁদে, তখন ঠাকুর তাকে অনেক কথা বলে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করেন। আহা, এই ফুলগুলি কেমন নীল রং দেখ! ফুল না হলে কি ঠাকুর মানায়!" এই বলে মা অঞ্জলি অঞ্জলি ফুল নিয়ে ঠাকুরকে দিতে লাগলেন। প্রথমবার দেবার সময় কয়েকটি ফুল সহসা তাঁর নিজের পায়ে পড়ে গেল দেখে বললেন. "ওমা. আগেই আমার পায়ে পড়ে গেল।" আমি বললুম, "তা বেশ হয়েছে।" মনে ভাবলুম. তোমার কাছে ঠাকুর বড় হলেও আমাদের কাছে তোমরা দুই-ই এক।

একটি বিধবা মহিলা এসেছেন। মাকে তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করলুম। মা বললেন, "মাসখানেক হলো দীক্ষা নিয়েছে। পূর্বে অন্য গুরুর নিকট দীক্ষিত হয়েছিল। তা মা, মনের ভ্রান্তি, আবার এখানে নিলে। গুরু সবই এক. একথা বুঝলে না।"

দুপুরে প্রসাদ পাবার পর বিশ্রাম করতে গিয়ে কামারপুকুরের কথা উঠল। মা বললেন, "ঠাকুর যখন পেটের অসুখ করে কামারপুকুরে গিয়েছিলেন, আমি তখন ছেলেমানুষ বউটি ছিলুম গো। ঠাকুর একটু রাত থাকতেই উঠে আমাকে বলতেন, 'কাল এই এই সব রান্না করো গো।' আমরা তাই রান্না করতুম। একদিন পাঁচফোড়ন ছিল না, দিদি (লক্ষ্মীর মা) বললে, 'তা অমনিই হোক, নেই তার কি হবে।' ঠাকুর তাই শুনতে পেয়ে ডেকে বলছেন, 'সে কি গো পাঁচফোড়ন নেই, তা এক পয়সার আনিয়ে নাও না ; যাতে যা লাগে তা বাদ দিলে হবে না। তোমাদের এই ফোড়নের গন্ধের ব্যান্নন খেতে দক্ষিণেশ্বরের মাছের মুড়ো পায়েসের বাটি ফেলে এলুম আর তাই তোমরা বাদ দিতে চাও ?' দিদি তখন লজ্জা পেয়ে আনতে দিলে। সেই বামুন ঠাকরুনও (যোগেশ্বরী) তখন ওখানে ছিলেন। ঠাকুর তাঁকে মা বলতেন। আমিও তাঁকে শাশুড়ীর মতো দেখতুম ও ভয় করতুম। তিনি বড় ঝাল খেতেন। নিজে রান্না করতেন—ঝালে পোড়া ; আমাকে খেতে দিতেন, চোখ মুছতুম আর খেতুম। জিজ্ঞাসা করতেন, 'কেমন হয়েছে।' ভয়ে ভয়ে বলতুম 'বেশ হয়েছে।' রামলালের মা বলত, 'হ্যাঁ, যে ঝাল হয়েছে!' আমি দেখতুম, তিনি তাতে অসন্তুষ্ট হতেন ; বলতেন, 'বৌমা তো বলেছে ভাল হয়েছে। তোমার বাপু কিছুতে ভাল হয় না। তোমাকে আর ব্যান্নুন দেব না'।" এই বলে মা খুব হাসতে লাগলেন।

আবার ফুলের কথা উঠল। মা বললেন, "দক্ষিণেশ্বরে থাকতে একদিন আমি রঙ্গনফুল আর জুঁইফুল দিয়ে সাত লহর গড়ে মালা গেঁথেছি! বিকেল বেলা গেঁথে পাথরের বাটিতে জল দিয়ে রাখতেই কুঁড়িগুলি সব ফুটে উঠল। মাকে পরাতে পাঠিয়ে দিলুম। গয়না খুলে

মাকে ফুলের মালা পরানো হয়েছে। এমন সময়ে ঠাকুর মাকে দেখতে গিয়েছেন, দেখে একেবারে ভাবে বিভোর। বারবার বলতে লাগলেন, 'আহা, কাল রঙে কি সুন্দরই মানিয়েছে!' জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে এমন মালা গেঁথেছে'? আমি গেঁথে পাঠিয়েছি একজন বলাতে তিনি বললেন, 'আহা, তাকে একবার ডেকে নিয়ে এস গো, মালা পরে মায়ের কি রূপ খুলেছে একবার দেখে যাক!' বৃন্দে ঝি গিয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে এল। মন্দিরের কাছে আসতেই দেখি, বলরামবাবু, সুরেনবাবু—এঁরা সব মায়ের মন্দিরের দিকে আসছেন, আমি তখন কোথায় লুকুই। বৃন্দের আঁচলটি টেনে ঢাকা দিয়ে তার আড়ালে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেলুম। ওমা, ঠাকুর তা জানতে পেরে বলছেন, 'ওগো, ওদিক দিয়ে উঠো না। সেদিন এক মেছুনী উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে মরেছে। সামনের দিক দিয়ে এস না।' তাঁর ঐ কথা শুনে বলরামবাবুরা সরে দাঁড়ালেন। গিয়ে দেখি—মায়ের সামনে ঠাকুর ভাবে প্রেমে গান ধরে দিয়েছেন।" কয়েকজন স্ত্রী ভক্ত আসাতে উপস্থিত প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল। আমারও যাবার সময় হয়ে এল। মা বললেন, আমাকে একটি জিনিস দেবেন—কাপড় কেচে এসে।

আবার মুক্তির কথা উঠল। মা বললেন, "ও কি জান মা, যেন ছেলের হাতের সন্দেশ! কেউ কত সাধাসাধি করছে, 'একটু দে না, একটু দে না', তা কিছুতেই দেবে না; অথচ যাকে খুশি হলো, টপ করে তাকে দিয়ে ফেললে। একজন সারা জীবন মাথা খুঁড়ে কিছু করতে পারলে না, আর একজন ঘরে বসে পেয়ে গেল। যেমনি কৃপা হলো, অমনি তাকে দিয়ে দিলে। কৃপা বড় কথা।" এই বলে কাপড় কাচতে গেলেন। বৈকালী-ভোগের পর বেল পাতায় মুড়ে আমাকে যা দেবেন বলেছিলেন দিয়ে বললেন, "মাদুলি করে পরো। এটির কথা কাউকে বলো না। তা হলে সবাই আমাকে ছিঁড়ে খাবে।" শ্রীশ্রীমাকে বালিগঞ্জে শ্রীমানের বাসায় যাবার কথা বললুম; মা বললেন—যাবেন। মা আমায় বললেন, "আমাকে একখানা শীতলপাটি দিও, মা, আমি শোব।"

আমি—সে তো আমাব সৌভাগ্য, অবশ্য আনব।

এই বলে প্রণাম করে বিদায় নিলুম। মা বললেন, 'আবার এস।'

জ্যৈষ্ঠ, ১ম সপ্তাহ—১৩২১

আজ মা বালিগঞ্জের বাসায় আসবেন। পূর্বদিন হতে সব বন্দোবস্ত হচ্ছে। মার জন্য পৃথক আসন, নূতন শ্বেতপাথরের বাসন ইত্যাদি কেনা হয়েছে। মা আসবেন। আনন্দে সারারাত ঘুমই হলো না। কথা ছিল, মা অপরাহ্নে আসবেন। পাছে কোন কারণে তাঁর অন্য মত হয়, সেজন্য প্রাতেই শ্রীমান শোকহরণ বাগবাজারে মার বাড়িতে গাড়ি নিয়ে গিয়ে

অপেক্ষা করতে লাগল। আর আমরা সংসারের কাজ সব সকাল সকাল চুকিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলুম। মায়ের আসন পেতে চারিদিকে ফুল সাজিয়ে রাখলুম, সমস্ত ঘরদোরে গঙ্গাজল ছড়িয়ে দিলুম, ফুলের মালা গেঁথে রাখলুম এবং বড় দুটি ফুলের তোড়া করে মায়ের আসনের দুপাশে দিলুম। বেলা পড়তেই পথ চেয়ে আছি—কখন মা আসবেন। এইবার এতক্ষণে সেই শুভ মুহূর্ত! গাড়ির শব্দ হতেই সকলে নিচে নেমে এলুম। গাড়ি থামতেই দেখলুম, মা হাসিমুখে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাদের পানে চেয়ে আছেন। গাড়ি হতে নামতেই সকলে তাঁর পদধূলি নেবার জন্য ব্যস্ত হলুম।

মায়ের সঙ্গে গোলাপ-মা, ছোটমামী, নলিনীদিদি, রাধু এবং চার-পাঁচজন সাধু-ব্রহ্মচারী এসেছেন। শ্রীশ্রীমাকে উপরে নিয়ে আসনে বসিয়ে প্রণাম করলুম। মা বললেন, "খেয়েছ তো? আমি কত তাড়াতাড়ি করেছি, কিন্তু কিছুতেই আর এর চেয়ে সকালে হয়ে উঠল না। এতক্ষণে তবে আসা হলো।" এই বলে চিবুকে হাত দিয়ে চুমো খেলেন। আমি আর বসতে পারলুম না, খাবারের আয়োজন করতে ও নিমকি ভাজতে হবে। আর সব খাবার ইতঃপূর্বে ঠিক করা ছিল।

উপরে গ্রামোফোনে গান হচ্ছে। কাজ করতে করতে একটু ফাঁক পেয়ে ছুটে গিয়ে দেখি—মা কলের গান শুনে ভারি খুশি, আর "কী আশ্চর্য কল করেছে!" —বলে বালিকার মতো আনন্দ করছেন। খুব গ্রীষ্ম—মা বারাণ্ডায় শীতলপাটিতে শুয়ে আছেন এবং তাঁর আশেপাশে সবাই বসে আছেন। একটি পাথরের বাটিতে বরফ-জল দেওয়া হয়েছে, মা মাঝে মাঝে খাচ্ছেন। আমাকে দেখতে পেয়ে মা বললেন, "ওগো, একটু বরফ-জল খেয়ে যাও।" মায়ের প্রসাদী জলটুকু খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে নিচে রান্নাঘরে আবার ছুটে এলুম। আজ এত তাড়াতাড়ি করেও যেন কাজ আর সেরে উঠতে পাচ্ছি নে।

সন্ধ্যার পরে পাশের ঘরে ভোগ সাজান হলো। মা এসে গোলাপ-মাকে ঠাকুরের ভোগ নিবেদন করে দিতে বলতে তিনি বললেন "তুমিই দাও, তুমি উপস্থিত থাকতে আমি কেন?" তখন শ্রীশ্রীমা নিজেই ভোগ নিবেদন করতে বসলেন এবং "আহা, কি সুন্দর সাজিয়েছে!" বলে তারিফ করতে লাগলেন। এইরূপ সবেতেই বালিকার মতো আনন্দ প্রকাশ করে আমাদের অপরিসীম আনন্দ দিতে লাগলেন। ভোগ দেওয়া হলে মা ও অন্য সকলে প্রসাদ গ্রহণ করতে বসলেন। সকলের আগে মায়ের খাওয়া হয়ে গেল। বারাণ্ডায় একখানি বেতের ইজিচেয়ারে বসে আমায় ডেকে বলছেন, "ওগো, আমায় পান দিয়ে যাও।" আমি তখনও গোলাপ-মায়েদের পরিবেশন করছিলুম। তাড়াতাড়ি গিয়ে পান দিয়ে এলুম। মাকে পান চেয়ে খেতে হলো বলে একটু লজ্জিতা হলুম! সুমতিকে বললুম, "পান নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারিস নি, দেখছিস আমি এদিকে রয়েছি?" একটু পরে মা একবার কলতলায় গেলেন. আমি আলো নিয়ে সঙ্গে গেলুম। বাগানের এই দিকটি বেশ নির্জন, পথে দুপাশে ক্রোটন-গাছের সার। মা সস্নেহে বললেন, "আহা, একটুও বসতে পেলে না

কাজের জন্যে। যেয়ো ওখানে, তোমার মাকে নিয়ে যেয়ো।" আমার মা বেড়াতে এসেছিলেন। ভাগ্যক্রমে ঘরে বসেই শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন পেয়ে গেলেন।

তারপর বিদায়ের ক্ষণ এল। মোটরগাড়িতে যেতে মায়ের মত নাই। কারণ একবার মাহেশের রথ দেখতে যেতে তাঁর মোটরের তলায় নাকি একটা কুকুর চাপা পড়ে, কিন্তু অত দূরে বাগবাজারে মোটরে না গেলে রাত হবে, কষ্টও হবে বলায় ভক্তদের মতেই শেষে রাজি হলেন। বারবার ঠাকুরকে প্রণাম করে প্রস্তুত হলেন এবং আমাদের আশীর্বাদ করে গাড়িতে উঠলেন।

একদিন রাত্রে গিয়েছি। মা শুয়ে আছেন। কালো-বউ (মা ঐ নামেই তাঁকে ডাকতেন) কাছে বসে আছেন। মা উঠে বসলেন—প্রণাম করব সেইজন্য। প্রণাম করতেই কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে আবার শয়ন করে পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে বললেন। পরে কথাপ্রসঙ্গে বলতে লাগলেন, "শোন, মা, বিধাতা যখন প্রথম মানুষ সৃষ্টি করলেন, তখন একপ্রকার সত্ত্বগুণী করেই করলেন। ফলে তারা জ্ঞান নিয়ে জন্মাল, সংসারটা যে অনিত্য তা বুঝতে আর তাদের দেরি হলো না। সুতরাং তখনি তারা সব ভগবানের নাম নিয়ে তপস্যা করতে বেরিয়ে পড়ল এবং তাঁর মুক্তিপদে লীন হয়ে গেল। বিধাতা দেখলেন, তবে তো হলো না। এদের দিয়ে তো সংসারের লীলা-খেলা কিছু করা চলল না। তখন সত্ত্বের সঙ্গে রজঃ তমঃ অধিক করে মিশিয়ে মানুষ সৃষ্টি করলেন। এবার লীলাখেলা চলল ভাল।" এই পর্যন্ত বলে সৃষ্টিপ্রকরণ সম্বন্ধে সুন্দর একটি ছড়া বললেন। তারপর বললেন, "তখন, মা, যাত্রা কথকতা এই সব ছিল। আমরা কত শুনেছি, এখন আর তেমনটি শোনা যায় না।" ইতিমধ্যে কালো-বউ অন্য ঘরে উঠে গিয়ে নলিনীদিদি ও মাকুর কাছে কি একখানা বই চেঁচিয়ে পড়ছিল। মা তাই শুনে বললেন, "দেখছ মা, অত চেঁচিয়ে পড়ছে, নিচে সব কত লোক রয়েছে, তা হুঁশ নেই?"

রাধারানীর মা এসে বললেন, "লক্ষ্মীমণিরা নবদ্বীপে যাবে, তা তুমি আমায় তাদের সঙ্গে যেতে দিলে না।" ঐ কথা বলেই তিনি অভিমান করে চলে গেলেন। মা বললেন, "ওকে যেতে দেব কি মা, সে (লক্ষ্মী) হলো ভক্ত, ভক্তদের সঙ্গে মিশে কত নাচবে গাইবে, হয়তো জাতের বিচার না করে তাদের সঙ্গে খাবে * ও-তো সে সব ভাল বুঝবে না, দেশে এসে লক্ষ্মীর নিন্দে করবে। তুমি দেখেছ লক্ষ্মীকে?"

আমি বললুম, 'না, মা।'

মা—দক্ষিণেশ্বরেই তো আছে, দেখো। দক্ষিণেশ্বরে গেছ তো?

আমি—হ্যাঁ, মা, অনেক বার গেছি। তা তিনি যে সেখানে আছেন, তা জানতুম না।

মা—দক্ষিণেশ্বরে আমি যে নবতে † থাকতুম, দেখেছ?

---

* শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন ভক্তেরা এক আলাদা জাত ভক্তের স্বভাব গাঁজাখোরের মতো ইত্যাদি

† উত্তর দিকের নহবতের নিচের কুঠরিতে মা থাকতেন

আমি—বাইরে থেকে দেখেছি।

মা—ভিতরে গিয়ে দেখো। ঐ ঘরটুকুর মধ্যেই সব সংসার ছিল—মায় ঠাকুরের জন্য হাঁড়িতে করে মাছ জিয়ান পর্যন্ত! প্রথমে যখন কলকাতায় আসি আগে জলের কল-টল তো কিছু দেখি নি, একদিন কলঘরে * গেছি—দেখি কল সোঁ সোঁ করে সাপের মতো গর্জাচ্ছে। আমি তো মা, ভয়ে এক ছুটে মেয়েদের কাছে গিয়ে বলছি 'ওগো, কলের মধ্যে একটা সাপ এসেছে, দেখবে এস। সোঁ সোঁ করছে।' তারা হেসে বললে, 'ওগো, ও সাপ নয়, ভয় পেয়ো না। জল আসবার আগে অমনি শব্দ হয়।' আমি তো হেসে কুটিপাটি।

এই বলেই মা খুব হাসতে লাগলেন। সে কি সরল মধুর হাসি! আমিও আর হাসি চেপে রাখতে পারলুম না, ভাবলুম—এমনি সরলই আমাদের মা বটেন!

মা—বেলুড়ে ঠাকুরের উৎসব দেখেছ?

আমি—না, মা, কখনো বেলুড়ে যাই নি। শুনেছি, সেখানে মেয়েদের গিয়ে গোল করা সাধু-ভক্তরা পছন্দই করেন না। সেই ভয়ে আরো যাই নি।

মা—যেয়ো না একবার, ঠাকুরের উৎসব দেখতে যেয়ো।

আর একদিন শ্রীশ্রীমা রাস্তার ধারে বারাণ্ডায় এসে আমাকে আসনখানি পেতে হরিনামের ঝুলিটি এনে দিতে বললেন, তা এনে দিলে বসে জপ করতে লাগলেন। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, এমন সময় সামনের মাঠে যেখানে কুলি-মজুর-গোছের কতকগুলি লোক স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বসবাস করত, সেখানে একজন পুরুষ, সম্ভবত তার স্ত্রীকে বেদম মার সুরু করে দিলে—কিল, চড়, পরে এমন এক লাথি মারলে যে, স্ত্রীলোকটির কোলে ছেলে ছিল, ছেলেসুদ্ধ গড়িয়ে এসে উঠানে পড়ে গেল। আহা, তার উপর এসে আবার কয়েক ঘা লাথি! মায়ের জপ করা বন্ধ হয়ে গেল। একি আর তিনি সহ্য করতে পারেন? অমন যে অপূর্ব লজ্জাশীলা, গলার স্বরটি পর্যন্ত কেহ কখনো নিচে থেকে শুনতে পেত না—একেবারে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে উঠে তীব্র ভর্ৎসনার স্বরে বললেন, "বলি ও মিনসে, বউটাকে একেবারে মেরে ফেলবি নাকি, আঃ মলো যা!" লোকটা একবার তাঁর দিকে তাকিয়েই অত যে ক্রোধোন্মত্ত হয়েছিল, যেন সাপের মাথায় ধুলোপড়া দেওয়ার মতো অমনি মাথা নিচু করে বউটাকে তখনি ছেড়ে দিল! মায়ের সহানুভূতি পেয়ে বউটির তখন কি কান্না! শুনলুম, তার অপরাধ—সে সময়মত ভাত রান্না করে রাখে নি। খানিক পরে পুরুষটার রাগ পড়ল এবং অভিমান ও সাধাসাধির পালা সুরু হলো দেখে আমরাও ঘরে চলে এলুম।

কিছুক্ষণ পরে একজন ভিক্ষুকের স্বর রাস্তায় শোনা গেল—"রাধাগোবিন্দ, ও মা

* কলিকাতা কাঁসারীপাড়ায় গিরিশ ভট্টাচার্যের বাড়ি শ্রীশ্রীমায়ের সহোদর প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের বাসায় তখন মা উঠেছিলেন

নন্দরানী, অন্ধজনে দয়া কর, মা" ইত্যাদি। মা শুনতে পেয়ে বললেন, "প্রায়ই রাতে এই রাস্তা দিয়ে ঐ ভিখারিটি যায়, 'অন্ধজনে দয়া কর, মা' আগে এই ওর বুলি ছিল। তা গোলাপ ওকে সেদিন বলেছিল ভাল—'ওরে, সঙ্গে সঙ্গে একবার রাধাকৃষ্ণের নামটিও কর। গৃহস্থেরও কানে যাক, তোরও নাম করা হোক। তা নয়, 'অন্ধ অন্ধ করেই গেলি।' সেই হতে ও এখানে এলেই এখন 'রাধাগোবিন্দ' বলে দাঁড়ায়। গোলাপ ওকে একখানি কাপড় দিয়েছে, পয়সাও পায়।"

একদিন সন্ধ্যাবেলা গেছি, শুনি মা বলছেন—"নূতন ভক্তদের ঠাকুরসেবা করতে দিতে হয়, কারণ তাঁদের নবানুরাগ, সেবা হয় ভাল। আর, ওরা সব সেবা করতে করতে এলিয়ে পড়েছে। সেবা কি করলেই হয়, মা! সেবাপরাধ না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখা চাই। তবে কি জান, মানুষ অজ্ঞ জেনে তিনি ক্ষমা করেন।" জনৈকা সেবিকা কাছে ছিলেন, তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন কি না বুঝতে পারলুম না—কেন না বললেন, "চন্দনে যেন খিচ না থাকে, ফুল-বিল্বপত্র যেন পোকা-কাটা না হয়। পূজো বা পূজোর কাজের সময় যেন নিজের কোন অঙ্গে, চুলে বা কাপড়ে হাত না লাগে। একান্ত যত্নের সঙ্গে ঐ সব করা চাই। আর ভোগরাগ সব ঠিক সময়ে দিতে হয়।"

রাত্রি প্রায় ৮৷৷টা। আজ গিয়ে দেখি, মা তখন ঠাকুরঘরের উত্তরে রাস্তার দিকের বারাণ্ডায় অন্ধকারে বসে জপ করছেন। পাশের ঘরে আমরা বসবার খানিক পরে মা উঠে এলেন এবং হাসিমুখে বললেন, "এসেছ মা, এস।"

আমি—হ্যাঁ মা, আজ আমরা দুবোনে এসেছি। আরতি কি হয়ে গেছে?

মা—না এখনো হয় নি। তোমরা আরতি দেখ, আমি আসছি।

আরতি আরম্ভ হলো। অনেকগুলি মহিলা ঠাকুরঘরে জপ করতে বসলেন। আরতি সাঙ্গ হলে আমরা প্রণাম করে মায়ের উদ্দেশে পাশের ঘরে গেলুম। ওখানে গেলে এক মুহূর্তও মাকে চোখছাড়া করতে ইচ্ছা হয় না। খানিক পরে মা কাছে এসে বসলেন। একটি বৃদ্ধা অপর একজনের কাছে ভক্তি-রসাত্মক একটি গান শিখছিলেন। মা তাই শুনে বললেন, "হাঁ, ও যা শিখাবে—দু-ছত্র বলে আবার দু-ছত্র বাদ দিয়ে বলবে! আহা, গান গাইতেন তিনি (ঠাকুর) যেন মধুভরা, গানের উপর যেন ভাসতেন! সে গানে কান ভরে আছে। এখন যে গান শুনি, সে শুনতে হয় তাই শুনি। আর নরেনের কি পঞ্চমেই সুর ছিল! আমেরিকা যাবার আগে আমাকে গান শুনিয়ে গেল ঘুসুড়ির বাড়িতে। বলেছিল, 'মা, যদি মানুষ হয়ে ফিরতে পারি, তবেই আবার আসব, নতুবা এই-ই।' আমি বললুম, 'সে কি!' তখন বললে, 'না, না, আপনার আশীর্বাদে শীঘ্রই আসব।' আর গিরিশবাবু এই সেদিনও গান শুনিয়ে গেলেন। সুন্দর গাইতেন।"

রাধু এই সময় মাকে তার কাছে গিয়ে শুতে বলায় মা বললেন, "তুমি যাও না, শোওগে। আহা, ওরা কতদূর থেকে এসেছে, আমি এদের কাছে একটু বসি।" রাধু তবুও

ছাড়ে না দেখে আমি বললুম, "আচ্ছা, মা, চলুন ও ঘরেই (ঠাকুরঘরে) চলুন, শোবেন।" মা বললেন, "তবে তোমরাও এস।" আমরাও গেলুম। মা শুয়ে শুয়ে কথা বলতে লাগলেন এবং আমি বাতাস করতে লাগলুম। খানিক পরে মা বললেন, "এখন বেশ ঠাণ্ডা হয়েছে, আর না।" আমি তখন পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলুম। একজন বৃদ্ধা অপর একজনকে যোগশাস্ত্রের ষট্‌চক্রভেদ ও বিভিন্ন পদ্মের বীজাদি সম্বন্ধে কিছু বলছিলেন। গোলাপ-মা বললেন, "ও সব বীজ-মন্ত্র অমন করে বলতে নেই।" তবু তিনি বলতে লাগলেন। মা ঐ সব কথা শুনতে শুনতে সহাস্যে আমাকে বললেন, "ঠাকুর নিজ হাতে আমাকে কুল-কুণ্ডলিনী, ষট্‌চক্র এঁকে দিয়েছিলেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "সেখানি কই, মা?"

মা—আহা মা, এত যে হবে তা কি তখন জানি? সেখানি কোথায় যে হারিয়ে গেল, আর পেলুম না।

রাত প্রায় এগারটা হয়েছিল। আমরা প্রণাম করে বিদায় নিতে মা আশীর্বাদ করে 'দুর্গা, দুর্গা' বলতে বলতে উঠে বসলেন। যাবার পূর্বে একান্তে আমাদের বললেন, "দেখ, মা, স্বামী-স্ত্রী একমত হলে তবে ধর্মলাভ হয়।"

কার্তিক, ১৩২১

আমাদের বালিগঞ্জের বাসায় ফুলের অভাব ছিল না। মা ফুল পেলে খুব খুশি হন বলে অনেক ফুল যোগাড় করে নিয়ে একদিন ভোরে মায়ের কাছে গেলুম। দেখি মা সবে পূজার আসনে বসেছেন। আমি ফুলগুলি সাজিয়ে দিতে ভারি খুশি হয়ে পূজায় বসলেন। শিউলি ফুল দেখে বললেন, "এ ফুল এনে বেশ করেছ। কার্তিক মাসে শিউলি ফুল দিয়ে পূজো করতে হয়। এবার আজ পর্যন্ত এই ফুল ঠাকুরকে দেওয়া হয়নি।"

আমি আজ মায়ের শ্রীচরণপূজার ফুল আলাদা করে রাখিনি। সেজন্য ভাবলুম, 'আজ আর বোধ হয় মাকে পূজা করা হবে না'; কিন্তু ফলে দেখলুম আমার ঐরূপ ভাববার আগেই মা সকল কথা ভেবে রেখেছেন। কারণ, সমস্ত ফুলগুলিতে চন্দন মাখিয়ে মন্ত্রদ্বারা পুষ্পশুদ্ধি করে নিয়ে পূজা করতে বসবার সময় দেখলুম তিনি থালার পাশে কিছু ফুল আলাদা করে রেখে দিলেন। পরে পূজা শেষ হলে উঠে বললেন, "এস গো মা, ঐ থালায় তোমার জন্য ফুল রেখেছি, নিয়ে এস।" এই সময় একটি ভক্ত অনেকগুলি ফল নিয়ে মাকে দর্শন করতে উপস্থিত হলেন। ভক্তটিকে দেখে মা খুব আনন্দিত হলেন, কপালে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে চিবুকে হাত দিয়ে চুমো খেলেন। কোন পুরুষ-ভক্তকে ঐরূপ আদর করতে আমি এ-পর্যন্ত মাকে দেখি নি। তারপর আমাকে বললেন, "মা, তোমার ঐ ফুল

হতে চারটি ওকে দাও তো।" আমি দিতে গেলে ভক্তটি অঞ্জলি পেতে ফুল নিলেন। দেখলুম ভক্তির প্রবাহে তখন তাঁর সর্বাঙ্গ কাঁপছে। তিনি সানন্দে মায়ের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন এবং প্রসাদ নিয়ে বাহিরে গেলেন। শুনলুম তিনি রাঁচি হতে এসেছেন। তক্তপোশখানিতে বসে মা এইবার সস্নেহে আমায় ডেকে বললেন, "এইবার এস গো।" আমি শ্রীচরণে অঞ্জলি দিয়ে উঠতেই মা চুমো খেয়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। এইবার আমরা পান সাজতে গেলুম। পান সেজে এসে মাকে খুঁজতে গিয়ে দেখি—মা ছাদে চুল শুকাচ্ছেন। আমাকে দেখে বললেন, "এস, মাথার কাপড় ফেলে দাও, চুল শুকিয়ে নাও, অমন করে ভিজে চুলে থেকো না, মাথায় জল বসে চোখ খারাপ হয়।" এর মধ্যে আর একটি স্ত্রী-ভক্তও তথায় উপস্থিত হলেন। ছাদে অনেকগুলি কাপড় শুকাচ্ছিল, মা আমাকে সেইগুলি তুলে কুঁচিয়ে রাখতে বললেন। আমি কাপড়গুলি তুলছি, এমন সময় গোলাপ-মা শ্রীশ্রীমাকে ডেকে নিচে নেমে আসতে বললেন ; কাবণ ঠাকুরকে ভোগ দিতে হবে। মা নিচে নেমে গেলেন। আমিও খানিক পরে ঠাকুরঘরে গিয়ে দেখি—মা সলজ্জ বধূটির মতো ঠাকুরকে বলছেন, "এস, খেতে এস।" আবার গোপালবিগ্রহের কাছে বলছেন, "এস গোপাল, খেতে এস।" আমি তখন তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ আমার দিকে দৃষ্টি পড়তেই হেসে বললেন, "সকলকে খেতে ডেকে নিয়ে যাচ্ছি।"এই কথা বলে মা ভোগের ঘরের দিকে চললেন। তাঁর তখনকার ভাব দেখে মনে হলো যেন সব ঠাকুররা তাঁর পিছনে চলেছেন। দেখে খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

ভোগের ঘর (সর্বদক্ষিণের ঘর) হতে ফিরে এসে মা পাশের ঘরে সকলকে সঙ্গে নিয়ে প্রসাদ পেতে বসলেন। আহারান্তে পাশের ঘরে বিছানা করে দিলুম, মা শয়ন করলেন। কাছে বসতেই মা বললেন, "শোও, এই খেয়ে উঠেছ।" শুয়েছি, মায়ের একটু তন্দ্রার মতো এসেছে, এমন সময় বলরামবাবুর বাড়ির চাকর "ঠাকুর-মা, ঠাকুর-মা" করে ডেকে ঠাকুরঘরে কতকগুলি আতা রেখে গেল। একটি চুপড়িতে আতা ছিল, লোকটি নিচে সাধুদের কাছে গিয়ে চুপড়িটি কি করবে জিজ্ঞাসা করায় তাঁরা বললেন, "ও আর কি হবে রাস্তায় ফেলে দে।" সে ফেলে দিয়ে চলে যেতেই মা উঠলেন এবং ঠাকুরঘরের রাস্তার দিকের বারাণ্ডায় গিয়ে আমাকে ডেকে বলছেন, "দেখেছ কেমন সুন্দর চুপড়িটি ! ওরা তখন ফেলে দিতে বললে। ওদের কি ? সাধু মানুষ ও সবে কি আর মায়া আছে ? আমাদের কিন্তু সামান্য জিনিসটিও অপচয় করা সয় না। এটি থাকলে তরকারির খোসাও রাখা চলত।" এই বলে চুপড়িটি আনিয়ে ধুইয়ে রেখে দিলেন। মায়ের এই কথায় ও কাজে আমার বেশ একটু শিক্ষা হয়ে গেল। কিন্তু 'স্বভাব যায় না মলেও'।

কিছুক্ষণ পরে নিচে একজন ভিক্ষুক এসে 'ভিক্ষা দাও' বলে চিৎকার করছিল। সাধুরা বিরক্ত হয়ে তাকে তাড়া দিয়ে উঠেছেন,"যাঃ, এখন দিক্ করিস্ নে।" মা তাই শুনতে পেয়ে বললেন, "দেখেছ দিলে ভিখারিকে তাড়িয়ে ! ঐ যে নিজেদের কাজ ছেড়ে একটু

উঠে এসে ভিক্ষা দিতে হবে, এইটুকুও আর পারলে না, আলস্য হলো। ভিখারিকে একমুঠো ভিক্ষা দিতে পারলে না। যার যা প্রাপ্য, তা হতে তাকে বঞ্চিত করা কি উচিত? এই যে তরকারির খোসাটা, এও গরুর প্রাপ্য। ওটিও গরুর মুখের কাছে ধরতে হয়।"

বেলা প্রায় শেষ হয়ে এল। আমার রওনা হবার সময় হয়ে এসেছে। শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে কিছু প্রসাদ নিয়ে বিদায় গ্রহণ করলুম।

আজ সন্ধ্যায় গেছি। কাছে হবে বলে এখন বাগবাজারের বাসায় আছি এবং রোজই প্রায় শেষ বেলায় মার কাছে যাই। নিরিবিলি দেখে আজ তাঁকে একটি স্বপ্নবৃত্তান্ত বললুম, "মা, একদিন স্বপ্নে দেখি—আপনি তখন জয়রামবাটীতে, আমি যেন সেখানে গিয়েছি। ঠাকুরকে সামনে দেখে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করলুম, 'মা কোথায়?' তিনি বললেন, 'ঐ গলি ধরে যাও, খড়ের ঘরে সামনের দাওয়ায় বসে আছে'।" মা শয়ন করেছিলেন, উৎসাহে একেবারে উঠে বসে বললেন, "ঠিক, মা, ঠিকই তো দেখেছ।"

আমি—সত্য না-কি, মা? আমার কিন্তু এতদিন ধারণা ছিল, আপনার পিত্রালয় ইটের কোঠাবাড়ি। তাই মাটির দাওয়া. খড়ের চালা দেখে ভাবলুম মনের ভ্রান্তি।

'ভগবানের জন্য তপস্যা করা প্রয়োজন' এই কথাপ্রসঙ্গে মা এখন বললেন, "আহা গোলাপ, যোগীন ওরা কত ধ্যান-জপ করেছে! যোগীন কতবার চাতুর্মাস্য করেছে—একবার শুধু কাঁচা দুধ ও ফল খেয়ে ছিল! এখনো কত জপ-ধ্যান করে! গোলাপের মনে বিকার নেই, দিলে হয় তো খানিকটা দোকানের রাঁধা আলুর দম খেয়ে!"

আজ মায়ের বাড়িতে কালীকীর্তন হবে। মঠের সন্ন্যাসী মহারাজেরাই কীর্তন করবেন। রাত প্রায় সাড়ে আটটায় কীর্তন আরম্ভ হলো। মেয়েরা গান শুনবার জন্য অনেকেই বারাণ্ডায় গেলেন। আমি মায়ের পায়ে তেল মালিশ করে দিচ্ছিলুম। ওখান হতেও বেশ শুনা যাচ্ছিল। এই সব গান আরও কতবার শুনেছি, কিন্তু ভক্তদের মুখে গানের শক্তি যেন আলাদা—কতই ভাবপূর্ণ বোধ হলো! চোখে জল আসতে লাগল। শ্রীশ্রীঠাকুর যে-সব গান করতেন, মাঝে মাঝে যখন সেই গান দু-একটি হচ্ছে, মা সোৎসাহে বলতে লাগলেন, "এই গো, এইটি ঠাকুর গাইতেন।" তারপর যখন 'মজলো আমার মনভ্রমরা শ্যামাপদনীলকমলে'—এই গানটি আরম্ভ হলো তখন মা আর শয়ন করে থাকতে পারলেন না—চোখে দু-এক ফোঁটা অশ্রু, উঠে বললেন, "চল মা, বারাণ্ডায় গিয়ে শুনি।" কীর্তন শেষ হলে মাকে প্রণাম করে বাসায় ফিরলুম।

২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫

বৈশাখ মাসে শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটী হতে এসেছেন। ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগে দেহ জীর্ণ-

শীর্ণ। একটু সুস্থ হলেই দেখা করা উচিত মনে করে এবং তাঁর অসুস্থ শরীর বলে এখনও কাউকে বড় একটা দর্শন করতে দেওয়া হচ্ছে না শুনে এতদিন দেখতে যাইনি। পরে 'মেয়েদের আসতে বাধা নাই'—আজ এই মর্মে চিঠি পেয়ে গিয়ে দেখি, মা পাশের ঘরটিতে শুয়ে আছেন। দেহ অত্যন্ত শীর্ণ। আমাকে দেখেই বললেন, "এস, মা, এতদিনে এলে গো।"

"হ্যাঁ, মা, কবেই তো আসতুম, কিন্তু শুনেছিলুম, এখনো আপনার অসুখের জন্য আপনার ভক্ত-ছেলেরা সকলের অবাধ আসাটা পছন্দ করছেন না, তাই এতদিন আসি নি। আপনার জন্যে আমাদের প্রাণ ছট্‌ফট্ করে, আর আপনি বাপের বাড়ি গিয়ে এতদিন আমাদের বেশ ভুলে ছিলেন। তা আপনার তো সর্বত্রই ছেলেমেয়ে রয়েছে, অভাব তো নেই।"

মা হেসে বললেন, "না, মা, না, তোমাদের কারও কথা আমি ভুলিনি, সকলের কথাই মনে করেছি।"

"আপনার অসুখ শুনে আমরা তো ভয়েই মরি, না জানি কেমন আছেন।"

"আগের চেয়ে অনেক ভাল আছি, মা, দেখ না পায়ে হাতে কি ছালচামড়াটা উঠে যাচ্ছে।"

পায়ে হাত দিয়ে দেখি সত্যিই ঐরূপ হয়েছে।

একখানি কাপড় নিয়ে গিয়েছিলুম, দিতেই মা বলছেন, "বেশ কাপড়খানি এনেছ, মা, এবার কাপড় কমও আছে, পুজোর সময় তো এখানে ছিলুম না। বউ-মা সেদিন এসেছিল। তারা সব ভাল আছে?" শ্রীমান শোকহরণের কথা জিজ্ঞাসা করে বললেন, "তার এখন কি করে চলছে? কাজকর্ম-চাকরি কিছুরই তো এখন সুবিধা নেই। কি পোড়া যুদ্ধ লেগেছে! কতদিনে যে থামবে, লোকে খেয়ে পরে বাঁচবে! তা এ যুদ্ধটা গোড়ায় লাগল কেন বল তো, মা?" আমি কাগজপত্রে যা পড়েছিলুম কিছু কিছু বলতে লাগলুম।

অধিক কথা কইলে পাছে তাঁর অসুখ বাড়ে এই ভেবে আজ অল্পক্ষণ থেকে বিদায়গ্রহণ করলুম।

৬ শ্রাবণ, ১৩২৫

রাত সাড়ে সাতটা, মায়ের শ্রীচরণদর্শনে গিয়েছি, প্রণাম করতেই বললেন, "এস, মা, বস। ভারি গরম, বসে একটু ঠাণ্ডা হও। তারা গিয়ে পৌঁচেছে—সুমতিরা?"

"হ্যাঁ, মা, তারা গেলে পরেই আমি এসেছি।"

মা—একখানা পাখা রাধুকে দিয়ে এস, আর এই মরিচাদি তেলটা নাও। পিঠে মালিশ

করে দাও। দেখেছ মা, হাতে পেটে আর জায়গা নেই—আমবাতে ঘামাচিতে ভরে গেছে।

আমি মালিশ করতে বসতেই আরতির ঘণ্টা বেজে উঠল। মা উঠে বসে করজোড়ে ঠাকুরকে প্রণাম করলেন। অন্য সকলে আরতি দেখতে ঠাকুরঘরে চলে গেলেন।

মা—দেখ, মা, সকলেই বলে 'এ দুঃখ, ও দুঃখ—ভগবানকে এত ডাকলুম, তবু দুঃখ গেল না।' কিন্তু দুঃখই তো ভগবানের দয়ার দান।

সেদিন আমার মনটা বড় দুঃখ-ভারাক্রান্ত ছিল, তাই কি মা টের পেয়ে ঐ কথাগুলি বললেন? মা বলতে লাগলেন, "সংসারে দুঃখ কে না পেয়েছে বল? বৃন্দে বলেছিল কৃষ্ণকে, 'কে বলে তোমাকে দয়াময়? রাম-অবতারে সীতাকে কাঁদিয়েছ, কৃষ্ণ-অবতারে রাধাকে কাঁদাচ্ছ। আর কংস-কারাগারে দুঃখ-কষ্টে দিনরাত কৃষ্ণ কৃষ্ণ করেছে তোমার পিতামাতা। তবে যে তোমাকে ডাকি তা এইজন্য যে তোমার নামে শমনভয় থাকে না'।"

শচীন ও দেবব্রত মহারাজের কথা উঠল। মা বললেন, "শচীন বড় ভাগ্যবান ছিল। দেবব্রত যে রাতে দেহ রাখলে, সেই রাতে বৃষ্টি ঝড়, লোকজন এ মঠে তখন কেউ ছিল না। আর শচীন সকালে গেল—মঠ লোকে ভরপুর।"* দেবব্রত মহারাজের কথায় বললেন, "দেবব্রত যোগী পুরুষ ছিল।"

একটি স্ত্রীলোকের কথা উঠল। মা বললেন, "ওরূপ চেহারার লোকের ভক্তি বড় একটা হয় না—ঠাকুর বলতেন শুনেছি।"

আমি বললুম, "হ্যাঁ, মা, আবার কান-তুলসে ভিতরবুঁদে ইত্যাদি আছে, ঠাকুরের বইয়ে পড়েছি।"

মা—ওঃ সেই কথা বলছ! সে নারায়ণদের বাড়ি গিয়ে ওকথা হয়েছিল। একজন একটি স্ত্রীলোককে রেখেছিল। সে স্ত্রীলোকটি এসে ঠাকুরের নিকট আক্ষেপ করে বলেছিল, 'ওই তো আমাকে নষ্ট করেছে। তারপর আমার যত গহনা, টাকা ছিল সে সব নিয়েছে।' ঠাকুর তো সকলের অন্তরের সব কথাই জানতে পারতেন, তবু জিজ্ঞাসা করতেন। স্ত্রীলোকটির কথা শুনে বললেন, 'তাই নাকি? মুখে কিন্তু, ও তো খুব ভক্তির কথা সব বলে!' ঐ কথা বলে তিনি ঐ শ্লোকটি বললেন। যা হোক, মাগী তো তাঁর কাছে পাপের কথা সব ব্যক্ত করে খালাস পেয়ে গেল।

নলিনী—তা কি হয়, মা? পাপের কথা একবার মুখে বললে, আর সব ধুয়ে গেল—তাই যায় কি?

মা—তা যাবে না? তিনি যে মহাপুরুষ, তাঁর কাছে বললে যাবে না? আর এক কথা শোন, পাপ-পুণ্যপ্রসঙ্গ যেখানে হয় সেখানে যত লোক থাকে, তাদের সকলকেই সেই

* দেবব্রত মহারাজ যখন দেহত্যাগ করেন তখন শ্রীশ্রীমায়ের (দেশে) কোয়ালপাড়ায় খুব অসুখ। তজ্জন্য পূজনীয় শরৎ মহারাজ প্রভৃ   সব তথায় গিয়েছিলেন। শচীন মহারাজ যখন দেহ রাখেন তখন সকলেই এখানে, শ্রীশ্রীমাও ছিলেন

ভালমন্দের একটু না একটু অংশী হতে হয়।

নলিনী—তা কেন হবে ?

মা আমাদের বললেন, "শোন, মা, কেমন করে হয়। মনে কর, একজন তোমাদের কাছে তার পাপপুণ্যের কথা বলে গেল। মনে কখনো সেই লোকের কথা উঠলেই সঙ্গে সঙ্গে তার ঐ ভালমন্দ কাজগুলিরও চিন্তা এসে পড়বে। এইরূপে সেই ভাল বা মন্দ দুই-ই তোমাদের মনের উপর একটু কাজ করে যাবে। কি বল, মা, তাই না ?"

আবার লোকের দুঃখকষ্ট ও অশান্তির কথা ওঠায় মা বলতে লাগলেন, "দেখ, লোকে আমার কাছে আসে, বলে—জীবনে বড় অশান্তি, ইষ্টদর্শন পেলুম না ; কিসে শান্তি হবে, মা !—কত কি বলে ! আমি তখন তাদের দিকে চাই, আর আমার দিকে চাই, ভাবি—এরা এমন সব কথা কেন বলে ! আমার কি তাহলে সবই অলৌকিক ! আমি অশান্তি বলে তো কখনো কিছু দেখলুম না। আর ইষ্টদর্শন, সে তো হাতের মুঠোর ভিতর—একবার বসলেই দেখতে পাই।"

মার 'ডাকাত বাবা'র কথাটি বইয়ে পড়েছিলুম। তাঁর নিজমুখ হতে সেইটি শোনবার ইচ্ছা হওয়ায় মাকে এখন জিজ্ঞাসা করলুম, "মা, বইয়ে পড়েছি একবার আপনি দক্ষিণেশ্বরে আসছিলেন, লক্ষ্মীদিদি প্রভৃতি সঙ্গে ছিলেন। আপনি না-কি তাঁদের সমান দ্রুত চলতে না পেরে ও সন্ধ্যা হয়ে আসছে দেখে তাঁদের এগিয়ে যেতে বলে নিজে অনেক পিছিয়ে পড়েছিলেন ! এমন সময়ে আপনার সেই বাগদি মা-বাপের সঙ্গে দেখা হয়।"

মা—আমি একেবারে একলা ছিলুম, তা ঠিক নয়। আমার সঙ্গে আরও দুজন বৃদ্ধা-গোছের স্ত্রীলোক ছিলেন—আমরা তিনজনেই পিছিয়ে পড়েছিলুম। তারপর সেই রূপোর বালা পরা, ঝাঁকড়া চুল, কালো রং, লম্বা লাঠি হাতে পুরুষটিকে দেখে আমি বড্ড ভয় পেয়েছিলুম। তখন ওপথে ডাকাতি হতো। লোকটি, আমরা যে ভয় পেয়েছি, তা বুঝতে পেরে জিজ্ঞাসা করলে, 'কে গা, তোমরা কোথায় যাবে ?' আমি বললুম, 'পুবে'। লোকটি বললে, 'সে এ পথ নয়, ঐ পথে যেতে হবে।' আমি তবুও এগুই নে দেখে সে তখন বললে, 'ভয় নেই, আমার সঙ্গে মেয়েলোক আছে, সে পেছিয়ে পড়েছে।' তখন 'বাপ' ডেকে তার আশ্রয়ে যাই। তখন কি এমনি ছিলুম মা ? কত শক্তি ছিল, তিনদিনের পথ হেঁটে এসেছি, বৃন্দাবন-পরিক্রমা করেছি, কোন কষ্ট হয়নি।

তারপর মা বললেন, "দক্ষিণেশ্বরে নবত দেখেছ ? সেইখানে থাকতুম। প্রথম প্রথম ঘরে ঢুকতে মাথা ঠুকে ঠুকে যেত। একদিন কেটেই গেল। শেষে অভ্যাস হয়ে গিছল। দরজার সামনে গেলেই মাথা নুয়ে আসত। কলকাতা হতে সব মোটাসোটা মেয়েলোকেরা দেখতে যেত, আর দরজায় দুদিকে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলত, 'আহা, কি ঘরেই আমাদের সীতা লক্ষ্মী আছেন গো—যেন বনবাস গো ! (নলিনী ও মাকুকে লক্ষ্য করে)—তোরা হলে কি একদিনও সেখানে থাকতে পারতিস ?"

তাঁরা বললেন, "না, পিসিমা, তোমার সবই আলাদা।"

আমি বললুম, "গুরুদাস বর্মণের বইয়ে পড়েছি, শেষে না-কি আপনাকে একখানি আটচালা ঘর করে দিয়েছিল এবং ঠাকুর একদিন সেই ঘরে গিয়ে খুব বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায়, নিজের ঘরে আসতে পারেন নি।"

মা—কৈ, মা, কোথায় আটচালা ? অমনি চালাঘর। শরতের বইয়ে সব ঠিক ঠিক লিখেছে। মাস্টারের বইও বেশ—যেন ঠাকুরের কথাগুলি বসিয়ে দিয়েছে। কি মিষ্টি কথা ! শুনেছি, ঐ রকম বই আরও চার-পাঁচ খণ্ড হতে পারে এমন আছে। তা এখন বুড়ো হয়েছে, আর পারবে কি ? বই বিক্রি করে অনেক টাকাও পেয়েছে—শুনেছি সে টাকা সব জমা রেখেছে। আমাকে জয়রামবাটীতে বাড়িটারি করতে প্রায় এক হাজার টাকা দিয়েছে (বাড়ির জন্য ৪০০্ ও খরচের জন্য ৫৩০্) আর মাসে মাসে আমাকে দশ টাকা দেয়। এখানেথাকলে কখনো কখনো বেশি—বিশ পঁচিশ টাকাও দেয়। আগে যখন স্কুলে চাকরি করত, তখন মাসে দুটাকা করে দিত।

আমি—গিরিশবাবু না-কি মঠে অনেক টাকা দিয়েছেন ?

মা—সে আর কি দিয়েছে ? বরাবর দিয়েছিল বটে সুরেশ মিত্তির। তবে হ্যাঁ, কতক কতক দিয়েছে বই কি। আর আমাকে দেড় বছর রেখেছিল বেলুড়ে নীলাম্বরের বাড়িতে। দুহাজার, পাঁচ হাজার মঠে যে দিয়েছে তা নয়। দেবেই বা কোত্থেকে ? তেমন টাকাই বা কোথা ছিল ? আগে তো পাষণ্ড ছিল, অসৎসঙ্গে থিয়েটার করে বেড়াত। বড় বিশ্বাসী ছিল, তাই ঠাকুরের অত কৃপা পেয়েছিল। এবারে ঠাকুর ওর উদ্ধার করে গেলেন। এক এক অবতারে এক এক পাষণ্ড উদ্ধার করেছেন ; যেমন গৌর-অবতারে জগাই-মাধাই—এই আর কি ! ঠাকুর এক সময়ে এও বলেছিলেন, 'গিরিশ শিবের অংশ।' টাকাতে কি আছে, মা ? ঠাকুর তো টাকা ছুঁতেই পারতেন না। হাত বেঁকে যেত। তিনি বলতেন, 'জগৎটাই যে মিথ্যা। ওরে রামলাল, যদি জানতুম জগৎটা সত্যি তবে তোদের কামারপুকুরটাই সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়ে যেতুম। জানি ও সব কিছু না—ভগবানই সত্যি !'

মাকু আক্ষেপ করছে, 'কী—এক জায়গায় থির হয়ে বসতে পারলুম না !' মা বললেন, "থির কি গো ?যেখানে থাকবি সেইখানেই থির। স্বামীর কাছে গিয়ে থির হবি ভাবছিস, সে কি করে হবে ? তার অল্প মাইনে, চলবে কি করে ? তুই তো (এখানে যেন) বাপের বাড়িতেই রয়েছিস। বাপের বাড়ি লোকে থাকে না ? এই দ্যাখ না, এ রয়েছে নিজের সংসার ছেড়ে। তোরা এতটুকু ত্যাগ করতে পারিস নে ? দ্যাখ না একে, কি শান্ত মূর্তি ! আর আমি আছি বলে আছে, আর তোরা থাকতে পারিস নে ?"

আমি—থাক মা, ঠাকুরের কথা আর একটু বলুন।

মা—বইয়ে যে লেখে, সব ঠিক হয় না। আমাকে যে ঠাকুর ষোড়শীপূজা করেছিলেন সে কথা রামের বইয়ে যা লিখেছে তা ঠিক হয়নি।

ঘটনাটি বলে শেষে বললেন, "বাড়িতে তো নয়ই—দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে যেখানে গোল বারাণ্ডার কাছে গঙ্গাজলের জালাটি রয়েছে ঐখানে। হৃদয় আয়োজন করে দিয়েছিল।"

এই সময়ে যোগেন-মা এসে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে মার সঙ্গে কি কথা বলতে যেতেই মা তাঁকে বললেন, "এদিকে এস-না, তোমাদের যে দেখতেই পাই নে।" যোগেন-মা হাসতে হাসতে মায়ের কাছে এলেন। আসবার সময় আমার গায়ে তাঁর পা ঠেকে গেল। তিনি হাতজোড় করে প্রণাম করছেন দেখে আমি শশব্যস্তে উঠে প্রণাম করে বলছি, "একি যোগেন-মা, যে আপনার চরণধূলিরও যোগ্যা নয় তার গায়ে পা ঠেকেছে বলে প্রণাম !"

যোগেন-মা—সে কি, মা ! ছোট সাপটাও সাপ, বড় সাপও সাপ, তোমরা সব ভক্ত যে !

মায়ের পানে চেয়ে দেখি মুখে সেই করুণামাখা হাসি। রাত্রি অনেক হয়েছে দেখে কিছুক্ষণ পরে প্রণাম করে বিদায় নিলুম।

১২ শ্রাবণ, ১৩২৫

সন্ধ্যার পরে গিয়েছি। এখনো আরতি আরম্ভ হয়নি। মা রাস্তার ধারের বারাণ্ডায় একটি আসন পেতে বসে জপ করছেন। ভারি গরম, কাছে গিয়ে প্রণাম করে বসতেই মা বাতাস করবার জন্য পাখাখানি হাতে দিলেন। বাতাস করছি, এমন সময়ে একটি বর্ষীয়সী বিধবা এসে মাকে প্রণাম করতেই মা জিজ্ঞাসা কবলেন, "কার সঙ্গে এলে ?"

"দারোয়ানের সঙ্গে এসেছি" বলে তিনি আমার কাছে পাখাখানি চাইলেন—মাকে বাতাস করবেন। আমি তখনি দিলুম।

মা বললেন, "থাক, থাক, ও-ই দিক।"

তিনি বললেন, "কেন, মা, আমার হাত দিয়ে একটু হবে না ? ওরা তো দিচ্ছেই।" মা যেন একটু বিরক্ত হলেন। তিনি দু-এক মিনিট বাতাস করেই বললেন, "তবে আসি, মা, মহারাজের কাছে একবার যেতে হবে।" মায়ের পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করতেই মা মহা বিরক্ত হয়ে বললেন, "আঃ, পায়ে কেন ? একে তো দেহ খারাপ—ঐ করে করে তো এই সব (অসুখ) হলো।" তিনি চলে যাবার পরে জল দিয়ে পা ধুয়ে ফেললেন। বিধবা স্ত্রীলোকটি গোলাপ-মাকে একটু দেখে এসে (তাঁর খুব অসুখ) পুনরায় মায়ের কাছে বিদায় নিতে এলেন। মা বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, এস গে।" এর পূর্বে মাকে কারো সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে আমি চক্ষে দেখিনি।

পরে মা আমাকে বললেন, "আমার আসনখানা তুলে ঘরে নিয়ে যাও আর বিছানাটা

নিচে পেতে দাও।" মা এসে শয়ন করলেন এবং হাঁটুতে ঘি মালিশ করে দিতে বললেন। কিছু পরে বললেন, "এখন পিঠে মরিচাদি তেল মালিশ করে দাও।"

ললিতবাবুর কথা উঠল। আমি বললুম, "মা, তিনি তো শুনেছি আপনার কৃপাতেই বেঁচে গেছেন।"

মা—তার অনেক বাসনা ছিল। তার যা অবস্থা হয়েছিল, মা, বালতি বালতি জল বেরুত পেট থেকে। একেবারে শেষ অবস্থাতেই দাঁড়িয়েছিল। তখন বড় কাতর হয়ে বললে, 'মা, কামারপুকুরে, জয়রামবাটীতে মন্দির করব, হাসপাতাল দেব, আমার বড় আশা ছিল, কিছুই করতে দিলি নি !' আহা ! ঠাকুর বাঁচিয়েছেন। ওখানে সব করবার ইচ্ছা ওর মতো আর কোন ভক্তের নেই। বেঁচেছে, এখন কাজ করুক। আমাকে একটি পুকুর কিনে দিয়েছে।

১৩ শ্রাবণ, ১৩২৫

আজ বৈকালে প্রেমানন্দ স্বামীজী দেহত্যাগ করলেন। রাত্রে মায়ের নিকট গেলুম। মা বললেন, "এসেছ, মা, বস ! আজ বাবুরাম আমার চলে গেল। সকাল হতে চক্ষের জল পড়ছে।" এই বলে কাঁদতে লাগলেন ! "বাবুরাম আমার প্রাণের জিনিস ছিল। মঠের শক্তি, ভক্তি, যুক্তি সব আমার বাবুরামরূপে গঙ্গাতীর আলো করে বেড়াত। বাবুরামের মা ছিল আঁটকুড়ো ঘরের মেয়ে, বাপের বিষয় পেয়েছিল। সেজন্য একটু অহঙ্কার ছিল। নিজেই বলত, 'হাতে বাউটি, কোমরে সোনার চন্দ্রহার পরে মনে করতুম ধরা যেন সরা।' চারটি সন্তান রেখে সে গেছে। একটি কেবল তার পূর্বে মারা গিয়েছিল।"

খানিক পরে দেখি, মাঝের ঘরের দক্ষিণের দেয়ালে ঠাকুরের যে বড় ছবি ছিল তার পায়ে মাথা রেখে করুণস্বরে বলছেন, "ঠাকুর, নিলে !"—সে কি মর্মভেদী স্বর ! আমাদেরও বড় কান্না পেতে লাগল।

এদিকে গোলাপ-মার খুব অসুখ—মরণাপন্ন রক্ত আমাশয় চলেছে।

১৪ শ্রাবণ, ১৩২৫

রাত সাড়ে সাতটা। শ্রীশ্রীমা ঠাকুরঘরে বসে আছেন। গিয়ে প্রণাম করে উঠতেই বললেন, "বারাণ্ডায় আমার আসনখানি পেতে দাও তো মা, আর তক্তপোশের পাশে মেজেয় পাতা ঐ বিছানাটা গুটিয়ে রাখ, আরতির সময় ওরা ওখানে বসে ঝাঁজ বাজাবে।" বিলাস মহারাজ আরতির আয়োজন করছিলেন। বারাণ্ডায় আসন পেতে দিতে, মা

বললেন, "কমণ্ডলুতে গঙ্গাজল আছে, নিয়ে এস।" গঙ্গাজলে হাতমুখ ধুয়ে জপে বসলেন এবং পাখাখানি আমার হাতে দিয়ে বাতাস করতে বললেন। একটু পরেই আরতি আরম্ভ হলো। শ্রীশ্রীমা 'গুরুদেব, গুরুদেব' বলে জোড়হাতে প্রণাম করলেন এবং জপ শেষ করে আরতি দেখতে লাগলেন। আরতি হয়ে গেলে বিলাস মহারাজ শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে উঠে বললেন, "মা, আজ ভারি গরম।" মা ব্যস্ত হয়ে বললেন, "একটু বাতাস করবে ?"

তিনি বললেন, "কে করবে, মা ?"

"কেন, এই মা করবে, কর তো মা।" আমি তাঁর দিকে দু-একবার বাতাস করতেই তিনি বললেন, "না, মা, উনি আপনাকে বাতাস করছেন আপনাকেই করুন।" এই বলে বাইরে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে মা প্রেমানন্দ স্বামীজীর কথা তুলে বললেন, "দেখ, মা, বাবুরামের দেহেতে আর কিছু ছিল না কেবল কাঠামখানি ছিল।" এমন সময়ে চন্দ্রবাবু উপরে এসে ঐ কথায় যোগ দিলেন এবং বাবুরাম মহারাজের দেহ-সৎকারের জন্য কয়েকজন ভক্ত যে চন্দনকাঠ, ঘি, ধূপ,গুগ্‌গুল, ফুল ইত্যাদি চার-পাঁচ-শ টাকার জিনিস দিয়েছেন তাই বলতে লাগলেন। মা বললেন, "আহা ! ওরাই টাকা সার্থক করে নিলে। ঠাকুরের ভক্তের জন্য দেওয়া। ভগবান ওদের দিয়েছেন, আরও দেবেন।" চন্দ্রবাবু প্রণাম করে উঠে গেলেন। মা বলতে লাগলেন, "শোন মা, যত বড় মহাপুরুষই হোক, দেহধারণ করে এলে দেহের ভোগটি সবই নিতে হয়। তবে তফাত এই, সাধারণ লোক যায় কাঁদতে কাঁদতে, আর ওঁরা যান হেসে হেসে—মৃত্যুটা যেন খেলা !

"আহা ! বাবুরাম আমার বালককালে এসেছে। ঠাকুর কত রঙ্গের কথা বলতেন, আর নরেন বাবুরাম এরা আমার হেসে কুটিপাটি হতো। একদিন কাশীপুরে আড়াই সের দুধসুদ্ধ একটা বাটি নিয়ে সিঁড়ি উঠতে গিয়ে আমি মাথা ঘুরে পড়ে গেলুম। দুধ তো গেলই, আমার পায়েব গোড়ালির হাড় সরে গেল। নরেন, বাবুরাম এসে ধরলে। পরে পা খুব ফুলে উঠল। ঠাকুর তাই শুনে বাবুরামকে বলছেন, 'তাই তো, বাবুরাম, এখন কি হবে, খাওয়ার উপায় কি হবে ? কে আমায় খাওয়াবে ?' তখন মণ্ড খেতেন। আমি মণ্ড তৈরি করে উপবের ঘরে গিয়ে তাঁকে খাইয়ে আসতুম। আমি তখন নথ পরতুম, তাই বাবুরামকে নাক দেখিয়ে হাতটি ঘুরিয়ে ঠারে ঠোবে বলছেন, 'ও বাবুরাম, ঐ যে ওকে তুই ঝুড়ি করে মাথায় তুলে এখানে নিয়ে আসতে পারিস ?' ঠাকুরের কথা শুনে নরেন, বাবুরাম তো হেসে খুন। এমনি রঙ্গ তিনি এদের নিয়ে করতেন। তারপর তিন দিন পরে ফোলাটা একটু কমলে ওরা আমাকে ধরে ধরে নিয়ে যেত—আমি খাইয়ে আসতুম। ও-কয়দিন গোলাপ-মা মণ্ড তৈরি করে দিয়েছিল, নরেন খাইয়ে দিত।

"বাবুরাম তার মাকে বলত, 'তুমি আমাকে কি ভালবাস ! ঠাকুর আমাদের যেমন ভালবাসেন, তুমি তেমন ভালবাসতে জান না।' সে বলত, 'আমি মা, আমি ভালবাসি না,

বলিস কিরে ?' এমনি তাঁর ভালবাসা ছিল। বাবুরাম চার বছরের সময়ই বলত, ' আমি বে করব না—বে দিলে মরে যাব।' ঠাকুর যখন বলেছিলেন, 'আমি পরে সূক্ষ্ম শরীরে লক্ষ মুখে খাব,' বাবুরাম বলেছিল, 'তোমার লক্ষ-টক্ষ আমি চাই নে, আমি চাই তুমি এই মুখটিতে খাবে, আর আমি এই মুখটিই দেখব।'

"অনেকগুলো ছেলেপিলে হয় যার, ঠাকুর তাকে গ্রহণ করতেন না। একটা দেহ হতে পঁচিশটা ছেলে বেরুচ্ছে, ওরা কি মানুষ! সংযম নেই, কিছু নেই—যেন পশু !"

গোলাপ-মার অসুখ আজ একটু কম। কি ঔষধ দিয়ে ডুস দেওয়া হয়েছে—সরলা এসে বললেন ; ডাক্তার বিপিনবাবু বলেছেন, "তিন মাস লাগবে সারতে।"

মা বললেন, রক্তামাশয় কি সোজা ব্যারাম ! তা লাগবে বইকি। ঠাকুরের অমনি আমের ধাত ছিল। দক্ষিণেশ্বরে এই সময় (বর্ষাকালে) প্রায় আমাশয় হতো। নবতের দিকে লম্বা বারাণ্ডার ধারে একটা কাঠের বাক্স ফুটো করে নিচে সরা পেতে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে শৌচে যেতেন। আমি সকালেরটা ফেলে আসতুম। বিকালেরটা ওরা ফেলত। সেই সময়ে একটি মেয়ে আসে, বললে কাশীতে থাকে। সে প্রদীপের শীষে আঙুল তাতিয়ে প্রত্যহ ঠিক একুশবার করে তাপ দিতে মলদ্বারের ফুলো টনটনানি কমে গেল। আমি তখন ভাবতুম—একে আমাশয়, তাতে গরম সেক, বেড়েই বা যায়। কিন্তু বাড়ল না, সেরে গেল। সেই মেয়েটিই আমাকে সে বাড়ি* থেকে নবতে নিয়ে এসেছিল ; বলল, 'মা, তাঁর এমন অসুখ, আর তুমি এখানে থাকবে ?' আমি বললুম, 'কি করব, ভাগ্নে বউটি একা থাকবে, ভাগ্নে (হৃদয়) সেখানে ঠাকুরের কাছে রয়েছে।' মেয়েটি বললে, 'তা হোক, ওরা লোক-টোক রেখে দেবে। এখন তোমার কি তাঁকে ছেড়ে দূরে থাকা চলে ?' আমি তাঁর কথা শুনে তাঁর সঙ্গে চলে এলুম। কয়েক দিন পরে তিনি একটু সারলে সে মেয়েটি চলে গেল। কোথায় গেল আর কোন খোঁজ পেলুম না। তারপর আর দেখা হয়নি। সে আমার বড় উপকার করেছে। কাশী গিয়েও তাঁর খোঁজ করেছিলুম, পাইনি। তাঁর (ঠাকুরের) প্রয়োজনে সব কোথা হতে আসত, আবার কোথা চলে যেত।

"আমিও এক বছর আমাশয়ে ভুগেছি, মা। সে কি শরীর হয়ে গেল। দেশে আমাদের কলুপুকুরের ধারে শৌচে যেতুম। বারবার যেতে কষ্ট হতো বলে সেখানটিতেই শুয়ে পড়ে থাকতুম। একদিন পুকুরজলে শরীর পানে চেয়ে দেখি শুধু হাড় সার হয়েছে, দেহেতে আর কিছু নেই। তখন ভাবলুম—আরে ছিঃ ! এই দেহ, তবে আর কেন ? এইখানেই দেহটি থাক, দেহ ছাড়ি। পরে নিবি (মা কি নাম বললেন ঠিক মনে নেই) এসে বললে, 'ওমা, তুমি এখানে পড়ে কেন ? চল চল, ঘরে চল'—বলে ঘরে নিয়ে এল। এখন আর পুকুরধারে সে সব জায়গা নেই। ভাগ করে সব ঘিরে-ঘুরে নিয়েছে।"

---

* দক্ষিণেশ্বরে—গ্রামের ভিতর এখন যেখানে ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল-দাদার বাড়ি হয়েছে, তার পাশেই তখন শ্রীশ্রীমায়ের বসবাসের জন্য কুঁড়েঘর হয়েছিল। হৃদয়ের দ্বিতীয় পক্ষের পরিবারও তথায় থাকতেন

রাত্রি সাড়ে দশটা হয়েছে। কিছুক্ষণ পরে আমি বিদায় নিলুম

১৫ শ্রাবণ, ১৩২৫

আজ দর্শন করতে গিয়ে সুবিধা থাকায় মায়ের সঙ্গে অনেক কথা হয়েছিল। সবই কিন্তু মঠের সন্ন্যাসী ছেলেদের কথা। প্রেমানন্দ স্বামীজীর দেহরক্ষায় বোধ হয় তাঁর মনে আজকাল ছেলেদের কথা সর্বক্ষণ উদিত হচ্ছিল, তাই তাঁদের কথা তুলে মা বললেন, "ঠাকুরকে ছেলেরা সব বীড়ে (পরীক্ষা করে) নিয়ে তবে ছেড়েছে। বরানগর মঠে যখন ওরা ছিল, তখন আহা! নিরঞ্জন-টন ওরা সব কতদিন আধপেটা খেয়ে ধ্যানজপ নিয়ে কাটিয়েছে। একদিন সকলে বলাবলি করলে, 'আচ্ছা, আমরা যে ঠাকুরের নামে সব ছেড়ে ছুড়ে এলুম, দেখি তাঁর নাম নিয়ে পড়ে থাকলে তিনি খেতে দেন কি-না। সুরেশবাবু এলে কিছু বলা হবে না। ভিক্ষেটিক্ষেও কেউ করতে যাব না।' এই বলে সব চাদর মুড়ি দিয়ে ধ্যান লাগিয়ে দিলে। সারাদিন গেল—রাতও অনেক হয়েছে, এমন সময় শোনে দরজায় কে ঘা মারছে। নরেন আগে উঠেছে, বলছে—'দেখ্ তো দরজা খুলে, কে? আগে দেখ্ তার হাতে কিছু আছে কি-না।' আহা! খুলেই দেখে লালাবাবুর মন্দির থেকে (গঙ্গার ধারের শ্রীশ্রীগোপালের বাড়ি) ভাল ভাল সব খাবার নিয়ে একজন লোক এসেছে। দেখে তো সব মহা খুশি—ঠাকুরের দয়া টের পেল। তখনি উঠে ঠাকুরকে ভোগরাগ দিয়ে সেই রাতে সকলে প্রসাদ পেলে। এমনি আরও ক'দিন হয়েছে। সিঁথির বেণী পালের বাড়ি হতেও অমনি করে এক দিন লুচি এসেছিল। এখন ছেলেরা তো মহাসুখে আছে। আহা! নরেন, বাবুরাম ওরা সব কত কষ্ট করে গেছে। এখন তোমাদের মহারাজ—সেই রাখালকেও আমার কতদিন ভাতের হাণ্ডা মাজতে হয়েছে। নরেন একবার গয়া-কাশীর দিকে যেতে যেতে দুদিন না খেয়ে এক গাছতলায় পড়েছিল। খানিক পরে দেখে, কে তাকে ডাকছে। দেখে, একটি লোক খানকতক লুচি, তরকারি, মিষ্টি আর এক ঘটি ঠাণ্ডা জল সামনে ধরে বললে, 'রামজীর প্রসাদ এনেছি, গ্রহণ করুন।' নরেন বললে, 'আমার সঙ্গে তো তোমার কোন পরিচয় নেই, তুমি ভুল করছ—আর কাউকে দিতে বলেছেন।' লোকটি মিনতি করে বললে, 'না মহারাজজী, আপনার জন্যেই এই সব এনেছি। দুপুরে আমি ঘুমিয়েছি, দেখি কি স্বপ্নে একজন বলছেন—শিগ্‌গির ওঠ, অমুক গাছতলায় যে সাধু আছেন, তাঁকে খাবার দিয়ে আয়। স্বপ্ন ভেবে আমি তাতেও না উঠে পাশ ফিরে শুলুম। তখন আমার গায়ে ধাক্কা দিয়ে তিনি বললেন—আমি উঠতে বলছি, আর তুই ঘুমোচ্ছিস, শিগ্‌গিব যা। তখন মনে হলো মিথ্যা স্বপ্ন নয়, বামজীই হুকুম করছেন। তাই এই সব নিয়ে ছুটে এসেছি।' তখন নরেন, ঠাকুরেরই দয়া ভেবে ঐ সব খাবার গ্রহণ করে।

"আর একবার এমনি হয়েছিল। তিন দিন পাহাড়ে হেঁটে হেঁটে নরেনের খিদেয় মূর্ছা যাবার মতো অবস্থা, এমন সময়ে এক মুসলমান ফকির একটি কাঁকুড় দেয়, সেইটি খেয়ে তবে বাঁচে! নরেন আমেরিকা হতে ফিরে এসে এক সভায় (আলমোড়ায়) একদিন ঐ মুসলমানটিকে একধারে দেখতে পেয়ে উঠে গিয়ে তার হাত ধরে নিয়ে এসে সভার মাঝে বসালে। সকলে বললে, 'একি?' তখন নরেন বললে, 'এ আমার জীবনদাতা।'—এই বলে ঘটনাটি সকলকে বললে। তাকে টাকাও দিয়েছিল। সে কিছুতেই নেবে না; বলে, 'আমি কি করেছি যে টাকা দিচ্ছেন?' নরেন তা কি শোনে?—বলে দিয়ে দিলে।

"আহা! নরেন আমাকে মঠে নিয়ে গিয়ে প্রথম পূজা (দুর্গাপূজা) যেবার করায়—সেবার পূজককে * আমার হাত দিয়ে পঁচিশ টাকা দক্ষিণে দেওয়ালে। চৌদ্দশ টাকা খরচ করেছিল। পূজোর দিন লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। ছেলেরা সবাই খাটছে। নরেন এসে বলে কি, 'মা, আমার জ্বর করে দাও?' ওমা, বলতে না বলতে খানিক বাদেই হাড় কেঁপে জ্বর এলো। আমি বলি, 'ওমা, একি হলো, এখন কি হবে?' নরেন বললে, 'কোন চিন্তা নেই মা। আমি সেধে জ্বর নিলুম এইজন্য যে, ছেলেগুলো প্রাণপণ করে তো খাটছে তবু কোথায় কি ত্রুটি হবে আর আমি রেগে যাব, বকব, চাই কি দুটো থাপ্পড়ই দিয়ে বসব, তখন ওদেরও কষ্ট হবে, আমারও কষ্ট হবে। তাই ভাবলুম—কাজ কি, থাকি কিছুক্ষণ জ্বরে পড়ে।' তারপর কাজকর্ম চুকে আসতেই আমি বলুলম, 'ও নরেন, এখন তা হলে ওঠ।' নবেন বললে, 'হাঁ মা, এই উঠলুম আর কি।' এই বলে সুস্থ হয়ে যেমন তেমনি উঠে বসল!

"তাঁর মাকেও পূজার সময় মঠে নিয়ে এসেছিল। সে বেগুন তোলে, লঙ্কা তোলে আর এ বাগান ও বাগান ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। মনে একটু অহং যে, আমার নরেন এসব করেছে। নরেন তখন তাকে এসে বলে, 'ওগো, তুমি করছ কি? মায়ের কাছে গিয়ে বস না—লঙ্কা ছিঁড়ে বেগুন ছিঁড়ে বেড়াচ্ছ। মনে করছ বুঝি তোমার নরু এসব করেছে। তা নয়, যিনি করবাব তিনিই করেছেন, নরেন কিছু নয়।' মানে ঠাকুরই করেছেন। আহা! আমার বাবুরাম নেই, কে এবাব পূজো কববে?"

* সেবাব কৃষ্ণলাল মহারাজ পূজক ও শশী মহাবাজেব বাবা তন্ত্রধাবক ছিলেন। কৃষ্ণলাল মহাবাজ পূজা কবলেও তন্ত্রধাবকই সব দেখিযে শুনিযে দেওযায কার্যত তিনিই পূজক ছিলেন। শ্রীশ্রীমা পূজক বলতে তাঁকেই লক্ষ্য কবেছেন

২১ শ্রাবণ, মঙ্গলবার, অমাবস্যা—১৩২৫

আজ গিয়ে দেখি, মা উত্তরের বারাণ্ডায় বসে জপ করছেন। খানিক পরে পাঁচ-ছয়টি মেয়েলোক মাকে দেখতে এলেন। তাঁরা ঠাকুরপ্রণাম করে বসতেই মা জপ শেষ করে তাঁরা কোথা হতে আসছেন, জিজ্ঞাসা করলেন। নলিনী তাঁদের পরিচয় দিলেন। শুনলাম, তাঁদের মধ্যে একজন চিকিৎসার জন্য এসেছেন, পেটে 'টিউমার' (ফোড়া) হয়েছে, ডাক্তার সাহেব বলেছেন অস্ত্র করতে হবে, তাই শুনে তিনি বড় ভয় পেয়েছেন। কে জানে কেন, মা এদের কাউকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে দিলেন না। তাঁরা ঐজন্য বারবার প্রার্থনা করলেও স্বীকৃতা না হয়ে বললেন, "ঐ চৌকাঠ হতে ধুলো নাও।" তাঁরা শেষে অসুস্থ মেয়েটিকে দেখিয়ে বললেন, "আপনি আশীর্বাদ করুন যেন ও সেরে উঠে আবার আপনার দর্শন পায়।" মা ভরসা দিয়ে বললেন, "ঠাকুরকে ভাল করে প্রণাম কর, উনিই সব।" পরে যেন একটু অতিষ্ঠভাবে বললেন, "তবে তোমরা এখন এস, রাত হলো।" তারা ঠাকুরপ্রণাম করে চলে যাবার পর বললেন, "গঙ্গাজল ছিটিয়ে ঘর ঝাঁট দিয়ে ফেল, ঠাকুরের ভোগ উঠবে।" বউ আদেশ পালন করলে মা উঠে এসে নিচের বিছানায় শুয়ে গায়ের কাপড় খুলে ফেলে আমার হাতে পাখা দিয়ে বললেন, "বাতাস কর তো, মা, শরীর জ্বলে গেল! গড় (প্রণাম) করি, মা, কলকাতাকে। কেউ বলে আমার এ দুঃখ কেউ বলে আমার ও দুঃখ, আর সহ্য হয় না। কেউ বা কত কি করে আসছে, কারো বা পঁচিশটা ছেলেমেয়ে—দশটা মরে গেল বলে কাঁদছে—মানুষ তো নয়, সব পশু—পশু! সংযম নেই কিছু নেই! ঠাকুর তাই বলতেন, 'ওরে এক সের দুধে চার সের জল, ফুঁকতে ফুঁকতে আমার চোখ জ্বলে গেল! কে কোথায় ত্যাগী ছেলেরা আছিস—আয় রে, কথা কয়ে বাঁচি।' ঠিক কথাই বলতেন। জোরে বাতাস কর মা, আজ বেলা চারটা হতে লোক আসছে, লোকের দুঃখ আর দেখতে পারি না!

"আহা! আজ বলরামের পরিবারও এসেছিল, বাবুরামের জন্য কত কাঁদলে। বললে, 'একি আমার যে-সে ভাই।' তাই তো, মা, দেবতা ভাই।"

খানিক পরে তেল মালিশ করতে বললেন। মালিশ করতে করতে বললুম, "মা, ডাল রান্না করে এনেছি—ভক্তেরা খাবেন বলে।" মা বললেন, "বেশ করেছ, রাখালও দুটো ইলিশ মাছ পাঠিয়েছে। বাবুরাম গিয়ে অবধি সে এখনও মাছ খায়নি।"

এর পূর্বে একদিন রাধুর বর মাংস খেতে চেয়েছিল। সেই কথা এখন একজন বলায় মা বললেন, "এখন এখানে কেমন করে হবে? এই বাবুরামটি আমার চলে গেছে, সবারই মন খারাপ। এ ঠাকুরের সংসার, তাই কাজকর্ম সব হচ্ছে। তা না হলে কান্নার রোলে বাড়ি ভরে যেত, কেউ কি উঠতে পারত! তবে খেতে চেয়েছে, দিতেই হবে। তা এরা যদি রান্না করে আনে, তবে হতে পারে।" এই বলে আমার পানে চাইতেই বললুম, "জামাই যদি আমাদের হাতে খান তবে অবশ্যই আনতে পারব।" মা বললেন, "তা খাবে না কেন? খুব

খাবে। রান্না করে বামুন ঠাকুরকে দিয়ে পাঠিয়ে দিও। ছেলেদের কারু কারু অরুচি হয়েছে, জগদম্বার প্রসাদ হলে তারাও একটু একটু খাবে—তা কত হলে হবে যোগীন ?"

যোগীন-মা বললেন, "তা তিন-চার টাকার কম হবে না।"

মা বললেন, "তবে কিছু টাকা নিয়ে যেয়ো।"

আমি—তা হবে না, মা, শোকহরণ রাগ করবে।

মা হাসতে লাগলেন, বললেন, 'তবে থাক।'

পরের রবিবার কালীঘাট হতে মহাপ্রসাদ আনিয়ে রেঁধে পাঠানো হলো।

২৭ শ্রাবণ, সোমবার

আজ মায়ের কাছে যেতেই মা বললেন, "পাঁঠা বেশ হয়েছিল গো. সব্বাই বেশ খেয়েছে। কেমন করে রাঁধলে ? আমি যখন ঠাকুরের জন্য রাঁধতুম কাশীপুরে, কাঁচা জলে মাংস দিতুম, কখানা তেজপাতা ও অল্প মসলা দিতুম, তুলোর মতো সিদ্ধ হলে নামিয়ে নিতুম।"

আমি—সে বোধ হয় যুষ (সুরুয়া) হতো মা।

মা—তা হবে। নরেন আমার নানা রকমে মাংস রাঁধতে পারত। চিরে চিরে ভাজত, আলু চটকে কি সব রাঁধত—তাকে কি বলে ?

আমি—বোধ হয় চপ কাটলেট হবে।

মা জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি সেসব রাঁধতে পার ?"

আমি—পারি। কাল জামাইর জন্যে করে আনব। শোকহরণের বড় ইচ্ছা, আপনাকে কিছু খাবার তৈরি করে খাওয়ায়। তা আমি যদি রেঁধে আনি, খাবেন আপনি ?

মা—তা খাব না কেন, মা ? তুমি হলে আমার মেয়ে ; তবে বেশি করো না, অল্প-স্বল্প। দেহ সুস্থ নয় কি-না, আর এই রাস্তাটা দিয়ে আনতে হবে।

আমি—আচ্ছা, তাই হবে।

এই বলে সেদিন বিদায় নিলুম।

পর দিন কিছু খাবার করে নিয়ে যেতেই মা বলেছেন, "এই দেখ গো, আবার কত কষ্ট করে এসব নিয়ে এসেছে।"

নলিনীদিদি বললেন, "তুমি চাও কেন, তাই তো নিয়ে আসে।"

মা বললেন, "তা, ওদের কাছে চাইব না—আমার মেয়ে ? আর এটা কি কম সৌভাগ্যের কথা ! কি বল, মা ?"

আমি—সে তো ঠিক কথা। মা যে কৃপা করে আনতে বলেন, তাতেই আমরা ধন্য হয়ে যাই।

আজ অনেক রাত্রি হতে তবে গিয়েছিলুম। ভোগের পর প্রসাদ নিয়ে বাড়ি আসবার সময় বলুলম, "কাল বোধ হয় আসা হবে না, মা, এক বিয়ে বাড়িতে নিমন্ত্রণ আছে।"

—"আচ্ছা, তা কাল না এলে ভাবব বিয়ে বাড়ি গেছ।"

ঘিটা সেদিন ভাল ছিল না; "ভাজা জিনিসগুলো তেমন ভাল হয়নি"—মা বলতে আর একদিন ভাল ঘিয়ে কয়েক রকম খাবার, পিঠে, ডাল ও তরকারি রেঁধে নিয়ে গিয়েছিলুম। খেয়ে মা খুব আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। মায়ের ভাইঝি নলিনীদিদির একটু শুচিবাই ছিল। তিনিও সেদিন ঐ সব খাবার খেয়ে বলেছিলেন, "আমার তো কারুর রান্না রোচে না, কিন্তু এর হাতে খেতে তো ঘেন্না হচ্ছে না!" মা বললেন, "কেন হবে?—ও যে আমার মেয়ে।" পরে আমাকে বলছেন, "দ্যাখ, সেদিন যে কচুশাকের অম্বল দিয়েছিলে, তা আমাকে ওরা দেয়নি।"

২৯ শ্রাবণ, ১৩২৫

আজ গিয়ে দেখি মা ডাক্তার দুর্গাপদবাবুর ভগ্নীর সঙ্গে কথা কচ্ছেন। বোর্ডিং-এর দুটি মেয়ে ও ঢাকা হতে একটি বউ এসেছেন। সকলে মাকে ঘিরে বসে আছেন। প্রণাম করে আমি বসলুম। ডাক্তারবাবুর ভগ্নী অল্প বয়সে বিধবা হয়েছেন। তাঁর স্বামীর বিষয় নিয়ে গোল বেঁধেছে, ভাগ্নেরা গোল করছে, উইলের 'প্রবেট' পেতে দেরি হচ্ছে, এইসব অনেকক্ষণ কথাবার্তা হলো। শেষে মা বললেন, "দান-বিক্রয়ে যখন তোমার অধিকার নেই তখন ভাল লোকের হাতে বন্দোবস্তের ভার দিও। সংসারী বিষয়ী লোকদের কি বিশ্বাস আছে? টাকা-কড়ির লোভ সামলে কাজ করতে পারে প্রকৃত সাধু-সন্ন্যাসীতে; তা মা, তুমি অত ভেব না। যা করবার হরি করবেন। তুমি সৎপথে আছ; ঠাকুর কি আর তোমায় কষ্টে ফেলবেন? তবে এখন এস, (গাড়ি এসেছে, বাহির হতে তাগিদ আসছিল) চিঠিপত্র দিও, আবার এস।"

তিনি বিদায় নেবার পরে শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস কবিরাজ গোলাপ-মাকে দেখতে এলেন। তিনি যদি দেখা করতে আসেন ভেবে মা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। পরে তিনি চলে গেছেন শুনে শয়ন করলেন এবং আমার দিকে চেয়ে বললেন, "এইবার তোমার কাজটি কর।" আমি তেল মালিশ করতে বসলুম।

তেল মাখতে মাখতে মা বললেন, "আহা, গিরিশ ঘোষের বোন আমাকে বড় ভালবাসত, বাড়িতে যা রান্নাবান্না করত আমার জন্যে আগে রেখে নিয়ে আসত। কত রকম রান্না করিয়ে ব্রাহ্মণ দিয়ে নিয়ে এসে, বসে বসে আমাকে খাওয়াত। একদিন বলে কি, মা দুখানা ইলিশমাছ ভাজা খাও না, তোমার আর দোষ কি?' আমি বললুম, 'তা কি হয়, মা?'

তার ভালবাসা মুখ-দেখানো ছিল না। বড় ঘরের বউ ছিল, টাকা পয়সা ছিল, সেসব পাঁচজনে নিয়ে নষ্ট করলে। অতুল পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা খুলে বসল। তাছাড়া এক বৎসর স্বামীর চিকিৎসায় অনেক টাকা ব্যয় করেছিল। শেষে মরবার সময় আমার জন্যে একশ টাকা লিখে দিয়ে গিয়েছিল। বেঁচে থাকতে হাতে করে দিতে লজ্জাবোধ করেছিল—কি বলে মাত্র একশটি টাকা দেয়। দেহ রাখবার পরে, তার ভাই এসে আমাকে টাকাটা দিয়ে যায়। আহা! বোধনের দিন দুপুরে আমার সঙ্গে শেষ দেখা করে গেল। যতক্ষণ ছিল সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগল। সেবার পূজোর পরেই আমাদের কাশী যাওয়া হবে বলে সেদিন জিনিসপত্র গুছাতে এঘর ওঘর করে একটু ব্যস্ত ছিলুম। যাবার সময় বললে, 'তবে আসি, মা।' আমি অন্যমনস্ক হয়ে বললুম, 'হাঁ, যাও।' বলতেই থপ থপ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। সে যেতেই মনে হলো, 'বললুম কি ? যাও বললুম ?' এমন তো আমি কাউকে বলিনে ! আহা ! আর এল না।* কেনই বা অমন কথা মুখ দিয়ে বেরুল !" কিছুক্ষণ অন্য মনে চুপ করে থাকবার পর আমাকে বললেন, "কাল এলে না, মা, কেমন লাল পদ্মগুলো পাঠিয়েছিল শোকহরণ। আমি নিজেই তা দিয়ে ঠাকুরপূজো করেছিলুম। কেমন ঠাকুর সাজিয়েছিলুম। তুমি এসে দেখবে বলে সন্ধ্যার পরও অনেকক্ষণ রেখেছিলুম।"

* * *

আজ সন্ধ্যার সময় গিয়ে দেখি, মা শুয়ে আছেন ও রাধু তাঁর পাশে ভিন্ন পাটিতে শুয়ে গল্প বলবার জন্যে তাঁকে পীড়াপীড়ি করছে। আমাকে দেখেই মা বললেন, "একটি গল্প বল তো, মা।" আমি মুশকিলে পড়ে গেলুম, মায়ের কাছে কি গল্প বলি! তারপর সেদিন মীরাবাঈ পড়ে গিয়েছিলুম সেই গল্প বললুম। মীরার "বিন্ প্রেমসে নহি মিলে নন্দলালা" এই দোঁহাটি বলতেই মা বললেন, "আহা, আহা! তাই তো প্রেমভক্তি না হলে হয় না।" রাধুর কিন্তু এ গল্পটা বড় মনঃপূত হলো না, শেষে সরলা এসে দুয়ো-রানী সুয়ো-রানীর গল্প বলতে সে খুশি হলো। সরলাকে মা খুব ভালবাসতেন, তিনি এখন গোলাপ-মার সেবায় নিযুক্তা। সেজন্য একটু পরেই চলে গেলেন। রাধু বলছে, "আমার পা কামড়াচ্ছে।" তাই আমি খানিক টিপে দিতে লাগলুম। রাধুর কিন্তু আমার টেপা পছন্দ হলো না—বললে, "খুব জোরে দাও।" মা তাই শুনে বললেন, "ঠাকুর আমার গা টিপে দেখিয়ে দিয়ে বলতেন—এমনি করে টেপো।" ঐ কথা বলে মা আমাকে বললেন, "দাও তো, মা, তোমার হাতখানা।" আমি এগিয়ে দিতেই আমার হাত টিপে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, "ওকে এমনি করে টেপো।" আমি তেমনি করে খানিকক্ষণ টিপতেই রাধু ঘুমিয়ে পড়ল। মা বললেন, "এইবার আমার পায়ে হাত বুলিয়ে দাও, মশা কামড়াচ্ছে।" একটু চুপ করে মা

* তিনি সেই দিন রাত্রেই হঠাৎ দেহত্যাগ করেন। মা ঐ দিন বৈকালে মঠে পূজা দেখতে গিয়েছিলেন

আবার বললেন, "মঠের এবার বড়ই দুর্বৎসর পড়েছে। আমার বাবুরাম, দেবব্রত, শচীন সবাই চলে গেল।" দেবব্রত মহারাজের শরীরত্যাগের কয়েকদিন পূর্বে শ্রীশ্রীমহারাজ 'উদ্বোধনে'র-বাড়িতে ভূত দেখেছিলেন। সেই কথা মাকে জিজ্ঞাসা করতেই মা বললেন, "আস্তে—ওরা ভয় পাবে। ঠাকুরও অমন কত দেখতেন গো! একবার বেণী পালের বাগানে রাখালকে সঙ্গে করে গেছেন। তিনি বাগানের দিকে বেড়াচ্ছেন। ভূত এসে বলে কি—'তুমি কেন এখানে এসেছ, জ্বলে গেলুম আমরা! তোমার হাওয়া আমাদের সহ্য হচ্ছে না, তুমি চলে যাও, চলে যাও।' তাঁর পবিত্র হাওয়া, তাঁর তেজ ওদের সহ্য হবে কেন? তিনি তো হেসে চলে এসে কারুকে কিছু না বলে খাওয়াদাওয়ার পরেই একখানা গাড়ি ডেকে দিতে বললেন। কথা ছিল—রাতটা ওখানে থাকবেন। তারা বললে, 'এত রাতে গাড়ি পাব কোথায়?' ঠাকুর বললেন, 'তা পাবে, যাও।' তারা তো গিয়ে গাড়ি আনলে।তিনি সেই রাতেই গাড়ি করে চলে এলেন। অত রাতে ফটকে গাড়ির শব্দ পেয়ে কান পেতে শুনি—ঠাকুর রাখালের সঙ্গে কথা বলছেন। শুনেই ভাবলুম—ওমা, কি হবে, যদি না খেয়ে এসে থাকেন, কি খেতে দেব এই রাতে? অন্য দিন কিছু না কিছু ঘরে রাখতুম—এই সুজি হোক, যাই হোক। কেন-না, কখন খেতে চেয়ে বসবেন ঠিক তো ছিল না। তা সেদিন আসবেন না জেনে কিছুই রাখিনি। মন্দিরের ফটক সব বন্ধ হয়ে গেছে, রাত তখন একটা। তিনি হাততালি দিয়ে ঠাকুরদের সব নাম করতে লাগলেন, কি করে যেন দরজা খুলিয়ে নিলেন। আমি বলছি, 'ও যদুর মা (ঝি), কি হবে?' তিনি শুনে বুঝতে পেরে তাঁর ঘর থেকেই ডেকে বলছেন, 'তোমরা ভেবো না গো, আমরা খেয়ে এসেছি।' পরে রাখালকে সেই ভূতের কথা বলতে সে বলছে, 'ও বাবা, তখন বলনি ভালই করেছ, তা হলে আমার দাঁত কপাটি লেগে যেত; শুনে আমার এখনি ভয় পাচ্ছে'।"

এই বলে মায়ের এই হাসি।

আমি—মা, ভূতগুলো তো বড় বেকুব। ঠাকুরের কাছে কোথায় মুক্তি চাইবে তা নয়, চলে যেতে কেন বললে, মা?

মা বললেন, "ওদের কি আর মুক্তির বাকি রইল, ঠাকুরের যখন দর্শন পেলে? নরেন একবার মাদ্রাজে ভূতের পিণ্ড দিয়ে মুক্ত করে দিয়েছিল।"

আমি মাকে একটি স্বপ্নবৃত্তান্ত বললুম, "মা, একদিন স্বপ্নে দেখি কি যেন আমি স্বামীর সহিত কোথায় যাচ্ছি। যেতে যেতে দেখি—পথের মাঝে কূলকিনারা দেখা যায় না, এমনি এক নদী। গাছতলা দিয়ে নদীর ধারে যাবার সময় আমার হাতে সোনালি রং-এর একটা লতা এমন জড়িয়ে গেল যে আর খুলতে পারছি না। সেটাকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে নদীর কাছে গিয়ে দেখি, ওপার হতে একটি কালো ছেলে একখানা পারের নৌকা নিয়ে এল। সে বললে, 'হাতের লতাটা সব কেটে ফেল, তবে পার করব।' আমি সেটার প্রায় সবটা কেটে ফেলেছি, একটু কিন্তু আর কিছুতে পারছি না, ইতিমধ্যে আমার স্বামী যেন

কোথায় চলে গেলেন, তাঁকে আর দেখতে পেলুম না। শেষে আমি বললুম, 'একটু আর কাটতে পারছি না। আমাকে কিন্তু পার করতেই হবে।' এই বলে নৌকায় উঠে পড়লুম। উঠবামাত্র নৌকা ছেড়ে দিলে, স্বপ্নও ভেঙে গেল।"

মা—ঐটি যে দেখলে ঐ ওঁর রূপ ধরে মহামায়া পার করে নিলেন। স্বামী বল, পুত্র বল, দেহ বল, সব মায়া। এই সব মায়ার বন্ধন কাটাতে না পারলে পার হওয়া যায় না। দেহে মায়া দেহাত্মবুদ্ধি, শেষে এটাকেও কাটতে হবে। কিসের দেহ, মা, দেড় সের ছাই বই তো নয়—তার আবার গরব কিসের ? যত বড় দেহখানাই হোক না, পুড়লে, ঐ দেড় সের ছাই। তাকে আবার ভালবাসা! হরিবোল, হরিবোল, জয় মা জগদম্বা, গোবিন্দ, গোবিন্দ, রাধাশ্যাম, গুরুদেব, গঙ্গা গঙ্গা ব্রহ্মবারি। দুমাস আরা জেলায় কৈলোয়ার বলে এক দেশে ছিলুম—সেখানকার জল-বায়ু ভাল বলে। সঙ্গে গোলাপ, বাবুরামের মা, বলরামের পরিবার, এরা সব ছিল। সে দেশে কি হরিণ, মা, সব দল বেঁধে তিন কোণা 'ব'-এর মতো হয়ে চলেছে। দেখতে না দেখতে এমন ছুট দিলে, সে আর কি বলব, যেন পাখা ধরে উড়ে যাচ্ছে। এমন দৌড় দেখিনি। আহা! ঠাকুর বলতেন, 'হরিণের নাভিতে কস্তুরী হয়, তখন তার গন্ধে হরিণগুলো দিকে দিকে ছুটে বেড়ায়, জানে না কোথা হতে গন্ধটি আসছে।' তেমনি ভগবান এই মানুষের দেহের মধ্যেই রয়েছেন, মানুষ তাঁকে জানতে না পেরে ঘুরে মরছে। ভগবানই সত্য, আর সব মিথ্যা। কি বল, মা ?

মায়ের গায়ের আমবাত বড় বেড়েছে। মা বলছেন, "তিন বছর হলো, মা, এই যে আমবাতে ধরেছে, মলুম এর জ্বালায়। জানি না, মা, কার পাপ আশ্রয় করলে, নইলে এসব দেহে কি রোগ হয় ?"

একদিন সন্ধ্যার পর গিয়েছি। দেখি নিবেদিতা স্কুলের কয়েকটি মেয়ে এসেছে—ওখানে দুটি মাদ্রাজী মেয়ে আছেন। তাঁরাও এসেছেন আর মা তাঁদের পড়াশুনার কথা জিজ্ঞাসা করছেন। তাঁরা ইংরেজী জানেন শুনে মা তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, আমরা এখন বাড়ি যাব—এর ইংরেজী কর তো।" তাঁদের দুজনের মধ্যে একজন অন্যকে বলছেন, 'তুমি কর।' তারপর ওঁদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা যিনি তিনিই করলেন। মা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "বাড়ি গিয়ে কি খাবে ?—এর ইংরেজী কি হবে ?" উত্তর শুনে মা খুব খুশি, হাসতে লাগলেন। শেষে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা গান জান ?" তাঁরা 'জানি' বলাতে মাদ্রাজী গান গাইতে মা আদেশ করলেন। মেয়ে দুটি মাদ্রাজী গান গাইলেন। মাও শুনতে শুনতে খুব আনন্দ করতে লাগলেন।

কয়েকদিন পরে আবার মাকে দর্শন করতে গিয়েছি। কিছুক্ষণ পরে দুর্গাদিদি তাঁদের আশ্রমের দুটি বালিকাকে সঙ্গে নিয়ে মায়ের কাছে এলেন। তাঁরা মাকে প্রণাম করতেই মা আশীর্বাদ করে একটি ছোট মেয়েকে (বছর আট হবে) জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি গান গাইতে জান ?" মেয়েটি বললে, 'জানি'।

মা—গাও তো, শুনি।

মেয়েটি একটি গান গাইল। তার দুই-এক ছত্র মনে পড়ছে—

"জয় সারদাবল্লভ, দেহি পদবল্লব দীন জনে,
কিঙ্করী গৌরী তনয়া তোমারি রেখো মনে।"

মেয়েটি গৌরীমার শিক্ষিতা, অবিকল গৌরীমার স্বরে গাইল। মা বিস্মিতা হয়ে বললেন, "তাই তো, ঠিক যেন গৌরদাসী! সে বেঁচে আছে, তা নইলে বলতুম—তার প্রেতাত্মা এসে ভর করেছে!" মেয়েটিকে আদর করে চুমো খেয়ে আর একদিন এসে গান শুনাতে বললেন।

৫ ভাদ্র, ১৩২৫

আজ সন্ধ্যার পরে গিয়েছি। মা তাঁর তক্তপোশের পাশে মেজেতে একটি মাদুরে শুয়ে আছেন। প্রণাম করে কথাপ্রসঙ্গে মাকে জিজ্ঞাসা করলুম, "মা, অনেক দিন এসেছি, এখন কি আমার কালীঘাটের বাসায় যাওয়া উচিত?"

মা—থাক না আরও কিছুদিন, সেখানে গেলে এখানটিতে তো আর এমন করে আসতে পাবে না। একদিন যদি না আস তো ভাবি কেন এল না গো! এই কাল আসিনি, ভাবলুম অসুখ করল না-কি, আজ না এলে বামুন ঠাকুরকে পাঠিয়ে দিতুম। তবে যদি তোমার স্বামীর কোন অসুখ-বিসুখ করে, আর তার মনের ভাবে বোঝ যে তার ইচ্ছা তুমি এখনি যাও, তা হলে অবশ্যি যেতে হবে।

আমি—তিনি প্রসন্ন থাকলেও লোকে তো, মা, বলে, ঘর-সংসার ছেড়ে এতদিন বোনের বাড়িতে রয়েছে, স্বামীর সেবা, সংসার এ সবও তো করা কর্তব্য।

মা—ঢের দিন তো সংসার করলে। লোকের কথা ছেড়ে দাও, তারা অমন বলে থাকে। পূজোর সময় আশ্বিন মাসে তো সেখানে যেতেই হবে।

আমি—সংসারের জন্য বড় একটা ভাবনা কখনো ছিল বলে তো মনে হয় না, মা! আপনার কাছে এমন আসতে পাব না, সেই ভাবনাই এখন সর্বদা মনে হয়।

মা—তবে আর কি? থাক না এ মাসটা।

জনৈকা মহিলা মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, একজন ব্রহ্মচারী খবর দিয়ে গেলেন। ইতঃপূর্বে বিষম ক্লান্ত হয়ে মা শুয়ে ছিলেন। এই সংবাদ পেয়ে 'এই আবার একজনকে নিয়ে আসছে। —আঃ গেলুম, মা'—বলে বিরক্তি প্রকাশ করে উঠে বসলেন। খানিক পরে সুন্দর বসন-ভূষণ-পরিহিতা একটি মহিলা মায়ের শয্যাপ্রান্তে এসে বসে মায়ের শ্রীচরণে মাথা রেখে প্রণাম করলেন। মা তাতে বললেন, "ওখানেই কর না, মা, পায়ে কেন?" তারপর কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করলেন।

তিনি বললেন, "জানেনই তো, মা, তাঁর অসুখ।"

মা—হাঁ শুনেছি। তা এখন কেমন আছেন? কি অসুখ, কে দেখছেন?

তিনি—অসুখ বহুমূত্র; ডাক্তার দেখছেন। পেটে জল হয়েছে, পা একটু ফুলেছে, ডাক্তার বলেছেন—খুব শক্ত ব্যারাম! তা ডাক্তারদের কথা আমি মানি নে। মা, আপনাকে এর উপায় করতেই হবে। আপনি বলুন—তিনি ভাল হবেন।

মা—আমি কি জানি, মা, ঠাকুরই সব। ঠাকুর যদি ভাল করেন তবেই হবে। তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাব।

তিনি—তা হলেই হলো। আপনার কথা কি ঠাকুর ঠেলতে পারেন?

এই বলে তিনি আবার শ্রীচরণে মাথা রেখে কাঁদতে লাগলেন।

মা তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, "ঠাকুরকে ডাকো। তিনি যেন তোমার হাতের নোয়া রাখেন। এখন খাওয়া-দাওয়া কি করেন?"

তিনি—এখন লুচি এই সব খান।

এইরূপ দুই-চারি কথার পরে তিনি মায়ের শ্রীচরণে প্রণাম করে বিদায় নিলেন এবং নিচে পূজনীয় শরৎ মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

"সব লোকের জ্বালা-তাপে শরীর জ্বলে গেল, মা!"—এই বলে গায়ের কাপড় ফেলে মা শুলেন। আমি তেল মালিশ করবার উদ্যোগ করছি এমন সময় আবার মহিলাটির কে আত্মীয় (সঙ্গে এসেছেন) প্রণাম করতে এলেন। আবার মাকে উঠতে হলো। তিনি চলে যেতে মা পুনরায় শুয়ে বললেন, "এবার যেই আসুক আমি আর উঠছি নে। পায়ের ব্যথায় বারবার উঠতে কত কষ্ট দেখছ তো, মা! তারপর আমবাতের জ্বালায় সারা পিঠটা এমন করছে। বেশ করে তেলটা ঘষে ঘষে দাও তো।" তেল মালিশ করবার সময় পূর্বোক্ত মহিলাটির কথা উঠায় মা বললেন, "অমন বিপদ, ঠাকুরের কাছে এসেছে, মাথা মুড়, খুঁড়ে মানসিক করে যাবে—তা নয়, কি সব গন্ধটন্ধ মেখে কেমন করে এসেছে দেখেছ? অমন করে কি ঠাকুরদেবতার স্থানে আসতে হয়? এখনকার সবই কেমন এক রকম!"

কিছুক্ষণ পরে বৌ এসে আমায় বললে, "লক্ষ্মণ (চাকর) নিতে এসে বসে আছে গো।" মা সাড়া পেয়ে বৌকে প্রসাদ দিতে বলে বললেন, "এই আমি মাথা তুলছি, প্রণাম কর গো।" আমি প্রণাম করে রওনা হলুম।

৬ ভাদ্র, ১৩২৫

সন্ধ্যার পর আজ মায়ের কাছে গিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করে মাকে প্রণাম করতেই শুনি মা বলছেন (জনৈকা স্ত্রী-ভক্তের সম্বন্ধে কথা উঠেছে), "বৌয়ের উপর তার অতিরিক্ত

শাসন। অত কি ভাল ? পেছনে থেকে সামনে একটু আলগা দিতে হয়। আহা ! ছেলেমানুষ বৌ, তার একটু পরতে খেতে ইচ্ছে হয় না ? অমন করে সে যে বলে, যদি আত্মহত্যাই করলে বা কোন দিকে বেরিয়েই গেল—তখন কি হবে ?"

আমাকে দেখে বলছেন, "একটু আলতা পরেছে, তা আর কি হয়েছে। আহা ! ওরা তো স্বামীকে চোখেই দেখতে পায় না—স্বামী সন্ন্যাস নিয়েছে। আমি তো চোখে দেখেছি, সেবাযত্ন করেছি, রেঁধে খাওয়াতে পেরেছি, যখন বলেছেন কাছে যেতে পেরেছি, যখন বলেননি এমন কি দুমাস পর্যন্ত নবত থেকে নামিইনি। দূর থেকে দেখে পেন্নাম করেছি। তিনি বলতেন, 'ওরে, ওর নাম সারদা, ও সরস্বতী। তাই সাজতে ভালবাসে।'* হৃদয়কে বলেছিলেন, 'দেখ্ তো তোর সিন্দুকে কত টাকা আছে। ওকে ভাল করে দু-ছড়া তাবিজ গড়িয়ে দে। তখন তাঁর অসুখ, তবুও আমায় তিনশ টাকা দিয়ে** তাবিজ গড়িয়ে দেওয়ালেন—তিনি নিজে টাকাকড়ি ছুঁতেই পারতেন না।

"ঠাকুর চলে যাবার পর আমার যখন এখানে (কলকাতায়) আসার কথা হলো, তখন আমি কামারপুকুরে। ওখানকার অনেকেই বলতে লাগল, 'ওমা, সেই সব অল্প বয়সের ছেলে, তাদের মধ্যে গিয়ে কি থাকবে !' আমি তো মনে জানি এখানেই থাকব। তবু সমাজ কি বলে একবার শুনতে হয় বলে অনেককে জিজ্ঞাসা করেছিলুম। কেউ কেউ আবার বলতে লাগল, 'তা, যাবে বই কি, তারা সব শিষ্য।' আমি শুধু শুনি। পরে আমাদের গাঁয়ে একটি বৃদ্ধা বিধবা আছেন, তিনি (লাহাদের প্রসন্নময়ী) ভারি ধার্মিক ও বুদ্ধিমতী বলে সকলে তাঁর কথা মানে, আমি তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'তুমি কি বল ?' তিনি বললেন, 'সে কি গো ? তুমি অবিশ্যি যাবে। তারা শিষ্য তোমার ছেলের মতো। একি একটা কথা। যাবে বই কি।' তাই শুনে তখন অনেকে যাবার মত দিলে। তখন এলুম। আহা ! ওরা আমার জন্যে—গুরুভক্তির জন্যে জয়রামবাটীর বেড়ালটাকেও পুষছে।

"মা দুঃখ করতেন, 'এমন পাগল জামায়ের সঙ্গে আমার সারদার বে দিলুম, আহা ! ঘর-সংসারও করলে না, ছেলেপিলেও হলো না, মা বলাও শুনলে না !' একদিন ঠাকুর তাই শুনতে পেয়ে বলছেন, 'শাশুড়ী ঠাকরুন, সেজন্য আপনি দুঃখ করবেন না—আপনার মেয়ের এত ছেলেমেয়ে হবে, শেষে দেখবেন মা ডাকের জ্বালায় আবার অস্থির হয়ে উঠবে।' তা যা বলে গেছেন তা ঠিক হয়েছে মা।"

কিছুক্ষণ পরে রাত্রি হতে আমি প্রণাম করে বিদায় নিলুম।

* * *

* ঠাকুর গোলাপ-মাকেও বলেছিলেন, "ও (শ্রীশ্রীমা) সারদা সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে, রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অকল্যাণ হয়, তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে।"

** তাবিজের জন্য ঠাকুর ৩০০ টাকাই দিয়েছিলেন, কিন্তু তাবিজ গড়াতে কম (২০০ টাকা) লেগেছিল। বাকি ১০০ টাকা শুনেছি শ্রীশ্রীমাকে নগদ দেওয়া হয়েছিল।

আজ বৈকালে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। মায়ের কাছে যাবার সময় হলো, কেমন করে যাই। সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। শোকহরণের ওয়াটারপ্রুফটা (সে বুদ্ধিটা শ্রীমানই দিয়েছিলেন) সারা গায়ে জড়িয়ে তো চললুম। বৃষ্টির ঝাপটা নাকে-মুখে লেগে অস্থির করতে লাগল তবু সে যে কি আনন্দে, কি টানে ছুটে চলেছি তা বলবার নয়! খিড়কিদরজা দিয়ে গেলুম। সামনে দিয়ে গেলে স্বামীজীরা দেখতে পেয়ে কি ভাববেন, লজ্জা হলো। মায়ের কাছে যেতেই আমার বেশ দেখে, মায়ের এই হাসি! কিন্তু যখন প্রণাম করতে গিয়ে তাঁর পায়ে ভিজে কাপড় লাগল (কারণ মাথার কাপড়টা ভিজে গিয়েছিল) তখন ব্যস্ত হয়ে মা বললেন, "এই যে ভিজে গেছ। শিগ্‌গির কাপড় ছাড়, এই রাধুর কাপড়খানা পর।"

আমি বললুম, "দেখুন মা, গায়ে হাত দিয়ে, আর কোথাও ভেজেনি, কাপড় ছাড়তে হবে না।"

মা দেখে বললেন, 'তাই বটে।'

মা একখণ্ড ফ্লানেলের কথা বলেছিলেন, তাও নিয়ে গিয়েছিলুম। পট্টি বাঁধবার সুবিধা হবে বলে দুদিকে নতুন কাপড় দিয়ে ফিতের মতো করে দিয়েছি দেখে মা ভারি খুশি হলেন। কথায় কথায় জয়রামবাটীর কথা উঠল।

মা—একবার সেখানে কি দুর্ভিক্ষই লাগল!* কত লোক যে খেতে না পেয়ে আমাদের বাড়ি আসত! আমাদের আগের বছরের ধান মরাইবাঁধা ছিল। বাবা সেই সব ধানে চাল করিয়ে কড়াইয়ের ডাল দিয়ে হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি রাঁধিয়ে রাখতেন, বলতেন, 'বাড়ির সবাই এই খাবে, আর যে আসবে তাকেও দেবে। আমার সারদার জন্যে খালি ভাল চালের দুটি ভাত করবে। সে আমার তাই খাবে।' এক একদিন এমন হতো, এত লোক এসে পড়ত যে খিচুড়িতে কুলাত না। তখনি আবার চড়ানো হতো। আর সেই গরম গরম খিচুড়ি সব যেই ঢেলে দিত, শিগ্‌গির জুড়োবে বলে আমি দুহাতে বাতাস করতুম। আহা! খিদের জ্বালায় সকলে খাবার জন্যে বসে আছে। একদিন একটি মেয়েলোক এসেছে, মাথায় রুখো চুল, চোখ উন্মাদের মতো। এসেই গরুর ডাবায় কুঁড়ো ভিজান ছিল তাই খেতে আরম্ভ করলে। আমরা এত বলছি বাড়ির ভিতরে খিচুড়ি আছে দিচ্ছি, তা আর তার ধৈর্য মানছে না। খিদের জ্বালা কি কম! দেহ ধরলেই খিদে তেষ্টা সব আছে। এবার বাড়িতে অসুখের সময় একদিন মাঝরাতে আমার এমনি খিদে পেলো! সরলা টরলা সব ঘুমিয়েছে। আহা! ওরা এই খেটে-খুটে শুয়েছে, ওদের আবার ডাকব? নিজেই শুয়ে শুয়ে চারদিকে হাতড়াতে লাগলুম। দেখি, চারটি খুদভাজা একটা বাটিতে রয়েছে। আবার মাথার বালিশের পাশে দুখানা বিস্কুটও পেলুম। তখন ভারি খুশি। তাই খেয়ে তো জল খেলুম—জল ঘটিতে সামনেই ছিল। খিদের জ্বালায় খুদভাজা যে খাচ্ছি তা জ্ঞান নেই।

* ১২৭১, মায়ের বয়স তখন ১১ বৎসর

এই বলে হাসতে লাগলেন।

তারপর মা বললেন, "সেই সময়ে রাঁচি থেকে একটি ভক্ত বড় বড় পেঁপে এনেছিল। পেঁপেটা আমি বড় ভালবাসি, মা। আমি টুক্ টুক্ করে তাকাচ্ছি—আহা! এই পেঁপে আমাকে ওরা একটু দেয় তো খাই। তা, ওরা দেবে কেন? তখন যে আমার খুব জ্বর। কোয়ালপাড়ায় কি অসুখই করেছিল, মা! বেহুঁশ—এই বিছানাতেই বাহ্যে, পেচ্ছাব সব। সে-সময় সরলা ও বৌ আমার খুব করেছে। (ক্রন্দনের স্বরে) তাই ভাবছি, মা, আবার তো তেমনি ভুগতে হবে। তা সেবারে কাঞ্জিলালের ওষুধে সেরে গেল। আহা! মা, কি হাত-পায়ের জ্বালা! কাঞ্জিলালের ঠাণ্ডা মোটা পেটটিতে হাত দিয়ে থাকতুম। শরৎও সেবার গিয়েছিল।"

একটু পরে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "আচ্ছা, মা, জয়রামবাটী থেকে চিঠি লিখে কেন সেই স্ত্রী-ভক্তটির সঙ্গে মিশতে নিষেধ করেছিলেন?"

মা—ওর ভাব আলাদা। এ ভাবের (ঠাকুরের ভাবের) নয়।

বিস্মিত হয়ে গেলুম। ঐ অসুখ-বিসুখে কত ঝঞ্ঝাটের মধ্যে দূরে থেকেও আমাদের কিসে মঙ্গল হবে তাই চিন্তা।

আমি তার পরদিন ভাল দেখে পাকা পেঁপে ও আম নিয়ে গেছি। মা কি খুশি, আর আমাদের খুশি করবার জন্য তাঁর কি আনন্দ প্রকাশ করা!

মা বলছেন, "এই যে গো কাল যে পেঁপের গল্প হলো ঠিক সেই রকম, বেশ আম।" তারপর এই আমটি শরৎকে দিও, এইটি গণেনকে, এইটি জামাইকে—এমনি করে কিছু ভাগ করা হলো। ভারি গরম, মায়ের বড় ঘামাচি বেরিয়েছে।

মা বলছেন, "চন্দন মাখলে ঘামাচি কমতে পারে, কিন্তু তাতে ঠাণ্ডা লাগে।"

আমি—কাল পাউডার নিয়ে আসব? মাখলে ঘামাচি কমবে।

মা—তা এনো গো, দেখি তোমাদের পাউডার-ই মেখে। এক ঘটি জল আনতে বল তো, মা, একবার বাইরে যাব।

বৌ বললে, 'জল রেখেছি।'

মা রাস্তার ধারের বারাণ্ডায় গিয়ে হাসতে হাসতে ডাকছেন, "ও মেয়ে, ও মেয়ে একবার এদিকে এস, শিগ্গির এস।" আমি কাছে যেতেই বলছেন, "দেখ, দেখ ঐ বেশ্যাবাড়ির সামনে জানালার ধারে একটা লোক, একবার এ-জানালা একবার ও-জানালা করে মরছে—ঢুকতে পারছে না। দেখ, কি মোহ, কি প্রবৃত্তি! ভিতর থেকে ঐ গানের শব্দ আসছে, আর ও ঢুকতে পারছে না। আহা! মলো গো ছট্ফটিয়ে।" মা এমনি করে কথাগুলি বলছেন যে, হাসি আর চাপতে পারলুম না। তখন মাও হাসেন, আমিও হাসি। হাসতে হাসতে দুজনে ঘরে এলুম।

আমি—আহা! ভগবানের জন্যে যদি ঐরূপ ছট্ফটানিটুকু হয়। তা হয় না, মা!

একটি মেয়ের কথা উঠল। মা বললেন, "কি মোহ হয়েছে, মা, ওর স্বামীর জন্যে! খেয়ে শুয়ে সুস্থির নেই, খেতে খেতে উঠে গিয়ে দেখে আসে। দিনরাত ঘরে বন্দী করে নিয়ে বসে আছে। ওর জন্যে সে তো কোন জায়গায় বেরুতে পর্যন্ত পারে না। ছি! ছি!! আর শরীর কি হচ্ছে দেখ! একটা ছেলে টেলে হলে যদি ওর এই ভাব কমে।"

বৌ এসে বললে, "তোমায় নিতে এসেছে গো।" রাতও হয়েছিল অনেক, প্রণাম করে বিদায় নিলুম।

পরদিন মা রাস্তার ধারের বারাণ্ডায় বসে জপ করছেন। ঘরে তাঁকে দেখতে না পেয়ে বারাণ্ডায় গিয়েছি। মা বলছেন, "কিগো এলে, বস!" জপ সারা হলো, হরিনামের ঝুলিটি নিজের মাথায় ঠেকিয়ে রেখে দিলেন। মার বাড়ির সামনে তখন মাঠ ছিল, তার পশ্চিম ধারে খোলার ঘরে যে কতকগুলি দরিদ্র লোক ভাড়াটে ছিল এইবার তাদের লক্ষ্য করে বললেন, "এই দেখ সারাদিন খেটে খুটে এসে এখন সব নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছে গো—দীনার্তরাই ধন্য!" যীশুখ্রীস্টের মুখ দিয়ে একদিন ঐ কথা বেরিয়েছিল বাইবেলে পড়েছিলুম, মনে পড়ল। আজ মায়ের মুখেও সেই কথা শুনলুম! একটু পরে মা বললেন, "চল, ঘরে যাই।" বৌ নিচে বিছানা করে রেখেছিল, এসে শুলেন। সকালেই লক্ষ্মণকে দিয়ে পাউডার পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। মা বলছেন, "ওগো, তোমার দেওয়া পাউডার মেখেছিলুম, তাই তো এই দেখ, ঘামাচিগুলো মিলিয়ে মজে এসেছে। এইখানটায় বড্ড হয়েছে,দাওতো মাখিয়ে। চুলকানিটাও যেন কমে গেছে। শরতের বড় ঘামাচি উঠেছে—আহা! তাকেও কেউ এইটি মাখিয়ে দেয়।"

আমি বললাম, "ও বাবা, তাঁকে একথা কে বলতে যাবে মা! ও জিনিসটা যে সৌখিন লোকেরাই ব্যবহার করে থাকে।" শুনে মা হাসতে লাগলেন।

মায়ের হাঁটুর বাত বড় বেড়েছে। কাল জনৈক ভক্তের দুটি ছেলে ইলেক্‌ট্রিক্ ব্যাটারী লাগিয়েছিল, তাতে একটু কমেছে। আজও সেই দুটি ছেলে এসেছে। ছোট মামী বলছেন, "আমারও কাল থেকে বাত বেড়েছে, আমিও ঐ কলটা লাগাব গো!" মা শুনে হাসতে লাগলেন, বললেন—"দাও তো বাছা, ওকে।" ছেলে দুটি তাড়াতাড়ি যন্ত্রপাতি ঠিকঠাক করে নিয়ে যেই মামীর পায়ে একবার ব্যাটারী ধরেছে, আর সে কি চিৎকার—"ওগো, মলুম গো, সর্ব শরীর ঝিন ঝিন করছে, ছাড় ছাড়!" শুনে সকলের হাসি। এ তো আর সর্বংসহা জননী নন। তখন ছোট মামী মাকে বলছেন, "কই তুমি তো এমন হবে বললেনি?"

মা—সেরে যাবে, চেঁচাস নে, একটু সহ্য কর।

তারপর মামী বললেন, "সত্যিই,যেন একটু কমেছে।"

বিলাস মহারাজ আরতি করতে গেলেন। বৌ বলছে, "আচ্ছা, এর নামে কোন 'আনন্দ' নেই?"

মা হেসে বলছেন, "আছে বই কি গো—ওর নাম বিশ্বেশ্বরানন্দ।" তারপর বলছেন,

"একজনকে ডাকে কপিল। আচ্ছা, ওর সঙ্গে কি আনন্দ আছে? কপিলানন্দ নাকি?" (এই সময়ে সরলাদিদি ঘরে ঢুকলেন)

মা—আচ্ছা, কপিল মানে কি?

সরলাদিদি বললেন, "কি জানি—বানর বোধ হয়।"

আমি—সে কি সরলাদিদি, কপি মানে বানর, কপিল মানে নয়। আর সকলের হাসি।

মা—আবার একজনের নাম আছে ভূমানন্দ। আচ্ছা, এর মানে কি?

আমি—সে তো আপনিই ভাল জানেন, মা।

মা—না, না, তোমরাই বল শুনি।

আমি—ভূমা মানে তো সেই অনন্ত বা সর্বব্যাপী পুরুষকেই বুঝায় শুনেছি, মা।

মা ঐকথা শুনে খুশি হয়ে মুখ টিপে টিপে হাসছেন। সত্যই মা এক এক সময় এমন ভাব দেখান যেন ছেলে মানুষটি—কিছুই জানেন না। আবার অন্য সময়ে দেখেছি, কঠিন আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কেমন ব্যাখ্যা করে দিচ্ছেন। যেখানে মানুষের পুঁথিগত বিদ্যায় কুলায় না, তখন আর এক ভাব, যেন সব বুঝেন। মা বললেন, "আর কপিল মানে কি হলো?" মা ওটি শুনতেই চান।

আমি—কি জানি, মা। কপিল নামে তো সাংখ্যদর্শন প্রণেতা এক মুনি ছিলেন, আবার কপিল রংও আছে। ওঁরা কি অর্থে নাম রেখেছেন কি জানি, ঐ কথার আরও হয় তো অর্থ আছে—মনে পড়ছে না। কাল অভিধান দেখে আসব।

এই সময়ে একদিন বৈকালে গিয়েছি। একজন সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করতে এসে বলছেন, "মা মাঝে মাঝে প্রাণে এত অশান্তি আসে কেন? কেন সর্বক্ষণ আপনার চিন্তা নিয়ে থাকতে পারি না? পাঁচটা বাজে চিন্তা কেন এসে পড়ে? মা, ছোটখাটো অনেক জিনিস তো চাইলেই পাওয়া যায়, পেয়েও এসেছি, আপনাকে কি কোন দিনই পাব না? মা, কিসে শান্তি পাব বলে দিন—আপনার কৃপা কি কখনো পাব না? আজকাল দর্শন-টর্শনও বড় একটা হয় না। আপনাকেই যদি না পেলুম তবে বেঁচে থেকেই বা লাভ কি? শরীরটা গেলেই ভাল।"

মা—সে কি বাছা, ও কথা কি ভাবতে আছে? দর্শন কি রোজই হয়? ঠাকুর বলতেন, "ছিপ ফেলে বসলেই কি রোজই রুই মাছ পড়ে? অনেক মাল-মসলা নিয়ে একাগ্র হয়ে বসলে কোন দিন বা একটা রুই এসে পড়ল, কোন দিন বা নাই পড়ল, তাই বলে বসা ছেড়ো না।" জপ বাড়িয়ে দাও।

যোগীন-মা—হ্যাঁ, নামব্রহ্ম। প্রথম প্রথম মন একাগ্র না হলেও হবে নিশ্চয়।

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করলেন, "কত সংখ্যা জপ করব আপনি বলে দিন, মা, তবে যদি মনে একাগ্রতা আসে।"

মা—আচ্ছা, রোজ দশ হাজার করো, দশ হাজার—বিশ হাজার, যা পার।

সন্ন্যাসী—মা, একদিন সেখানে ঠাকুরঘরে পড়ে কাঁদছি, এমন সময় দেখলুম, আপনি মাথার পাশে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'তুই কি চাস ?' আমি বললুম, 'মা, আমি আপনার কৃপা চাই, যেমন সুরথকে করেছিলেন।' আবার বললুম, 'না, মা, সে তো দুর্গারূপে ; আমি সেইরূপে চাই না, এইরূপে!' আপনি একটু হেসে চলে গেলেন। মন তখন আরও ব্যাকুল হলো, কিছুই ভাল লাগে না। মনে হলো, যখন তাঁকে লাভ করতে পারলুম না, তখন আর আছি কেন ?

মা—কেন, ঐ যেটুকু পেয়েছ তাই ধরে থাক না কেন ? মনে ভাববে, আর কেউ না থাক আমার একজন 'মা' আছেন। ঠাকুর যে বলে গেছেন, এখানকার সকলকে তিনি শেষদিনে দেখা দেবেনই—দেখা দিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

সন্ন্যাসী—যেখানে ছিলুম. তিনি খুব ভক্ত-গৃহস্থ। তাঁর স্ত্রী এক বড় লোকের কন্যা, খুব খরচ করেন। মাছ খাবার জন্যে আমাকে বড় অনুরোধ করেন। আমি খাই না।

মা—মাছ খাবে। খাবার ভিতর আছে কি ? মাছ খেলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে। তাকে বেশি বাজে খরচ করতে বারণ করবে। ভক্ত গৃহস্থের টাকা থাকলে সাধুদের কত উপকারে লাগে। তাদের টাকাতেই তো সাধুরা বর্ষাকালে একস্থানে বসে চাতুর্মাস্য করতে পারে। তখন তো সাধুদের ভ্রমণ করে ভিক্ষা করবার সুবিধা হয় না।

সন্ন্যাসীটি প্রণাম করে নিচে গেলেন।

১৭ ভাদ্র, ১৩২৫

আমার অসুখ করেছিল, একটু ভাল হতে আজ সন্ধ্যারতির পরে গেছি। মা তখন শুয়েছিলেন। দেখেই বললেন, "কি গো, ভাল আছ ? অসুখ সেরেছে ?"

আমি বললাম, 'হ্যাঁ. মা।' মা সাংসারিক কুশলপ্রশ্নাদি করতে লাগলেন। ঢাকার একটি শিষ্যা মাসখানেক হতে চলল 'উদ্বোধনে' আছেন, তিনি বললেন, "মা, তেল মালিশ করে দেব ? দিদির (আমার) তো শরীর ভাল নয়।"

মা—"তা হোক, ও দিতে পারবে।" তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করবার পরও বললেন, "না, না, ও তেল দিতে পারবে। তুমি না হয় একটু বাতাস কর।" তিনি বাতাস করতে লাগলেন। একটু বাতাস করার পর মা বললেন, "হয়েছে, ঠাণ্ডা লাগছে, এখন একটু শোওগে। জল খেয়েছ ? মিষ্টি নিয়ে জল খাও না।" মা এমনি করে সকলের মনস্তুষ্টি করে থাকেন। তিনি উঠে মায়ের কথামত জল খেয়ে শুলেন।

মা—(আমাকে) কাল কেমন ঠাকুরের বই পড়া হলো, সরলা পড়েছিল। কি সব কথা!

তখন কি জানি মা, এত সব হবে। কি মানুষই এসেছিলেন! কত লোক জ্ঞান পেয়ে গেল! কি সদানন্দ পুরুষই ছিলেন! হাসি কথা, গল্প কীর্তন চব্বিশ ঘণ্টা লেগেই থাকত। আমার জ্ঞানে তো আমি কখনো তাঁর অশান্তি দেখিনি। আমাকে এমন কত সব ভাল ভাল কথা বলতেন। আহা! যদি লেখাপড়া জানতুম, তাহলে অমনি করে সেই সব টুকে টুকে রাখতুম। কই গো, সরলা আজ আবার একটু পড় না।

সরলাদি 'কথামৃত' পড়তে লাগলেন। রাখাল মহারাজের বাবা এসেছেন, ঐখান থেকে পাঠ আরম্ভ হলো। পড়া শুনতে শুনতে মা বলছেন, "ঐ যে রাখালের কথায় তার বাপকে বললেন, 'যেমন ওল তেমন মুখীটি তো হবে।' সত্যই তিনি অমনি করে রাখালের বাবার মন খুশি রাখতেন। তিনি এলেই যত্ন করে এটি ওটি দেখাতেন, খাওয়াতেন, কত কথা বলতেন—মনে ভয় পাছে রাখালটিকে ওখানে না রাখে, নিয়ে যায়। রাখালের সৎমা ছিল। সে যখন দক্ষিণেশ্বরে আসত, ঠাকুর রাখালকে বলতেন, 'ওরে, ওঁকে ভাল করে দেখাশুনা, যত্ন কর, তাহলে জানবে ছেলে আমাকে ভালবাসে'।" পড়তে পড়তে বৃন্দেঝির লুচির কথা এল, মা বললেন, "হ্যাঁ গো, সে কি কম ছিল ? তার জলখাবারের বরাদ্দের লুচি যদি কোনদিন খরচ হয়ে যেত, তবে বকে অনর্থ করত ; বলত—'ওমা, কেমন সব ভদ্দর-লোকের ছেলে গো, আমারটি সব খেয়ে বসে থাকে—মিষ্টিটাও পাই না' !" •

"ঐ সব কথা পাছে ছেলেদের কানে যায়, তাই ঠাকুর আবার ভয় করতেন। একদিন ভোরে উঠে এসেই নবতে আমাকে বলছেন, 'ওগো, বৃন্দের খাবারটি তো খরচ হয়ে গেছে, তা তুমি তাকে রুটি লুচি যা হয় করে দিও, নইলে এক্ষণি এসে বকাবকি করবে। দুর্জনকে পরিহার করে চলতে হয়'।

"আমি তো বৃন্দে আসতেই তাড়াতাড়ি বললুম, 'বৃন্দে, তোমার খাবার তৈয়ের করে দি, খরচ হয়ে গেছে!' তখন সে বললে, 'থাক আর তৈয়ের করতে হবে না, এমনি দাও।' তখন যেমন সিধে সাজায়, তেমনি করে ঘি, ময়দা, আলু, পটল সব দিলুম।"

এক অধ্যায় পাঠ হলে সরলাদিদি গোলাপ-মার সেবায় গেলেন, তাঁর অসুখ।

মা আস্তে আস্তে বলছেন, "ঠাকুর ভগবানের বিষয় ছাড়া কোন কথাই বলতেন না। আমাকে বলতেন, 'দেখছ তো মানুষের দেহ কি!—এই আছে, এই নাই, আবার সংসারে এসে কত দুঃখ কত জ্বালা পায়! এ দেহের আবার পয়দা করা কেন ? এক ভগবানই নিত্যসত্য, তাঁকে ডাকতে পারলেই ভাল। দেহ ধরলেই নানা উপসর্গ।' সেদিন বিলাস এসে বলছে, 'কত সাবধানে আমাদের থাকতে হয়, মা, পাছে মনেও কিছু উঠে এই ভয়েও সশঙ্ক থাকতে হয়।' তাই তো, ওরা হলো সাদা কাপড় আর সংসারীরা হলো কালো কাপড়। কালো কাপড়ে কালি পড়লেও অত ঠাওর হয় না, কিন্তু সাদা কাপড়ে এক বিন্দু পড়লেই সকলের চোখে পড়ে। দেহ ধরলেই বিপদ। সংসার তো এই কাম-কাঞ্চন নিয়েই

আছে। ওদের (সাধুদের) কত ত্যাগ করে চলতে হয়। তাই ঠাকুর বলতেন, 'সাধু সাবধান'।"

ইতোমধ্যে হরিহর মহারাজ ঠাকুরের ভোগ দিতে এসেছেন। তাঁকে দেখিয়ে মা বলছেন, "এই দেখ একটি ত্যাগী ছেলে, ঠাকুরের নাম নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। সংসারী লোক খালি গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলের জন্ম দিতে থাকে, ঐ যেন কাজ। ঠাকুর বলতেন, 'দু-একটি ছেলে হওয়ার পর সংযত থাকতে।' ইংরেজেরা নাকি বিষয় বুঝে ছেলের জন্ম দেয়—যে এই (সম্পত্তি) আছে, এতে একটি ছেলে হলে বেশ চলবে এবং তাই হবার পর স্ত্রী-পুরুষ দুজনে বেশ আলাদা আপন আপন কাজ নিয়ে থাকে। আর আমাদের জাতের ?"

মা হাসতে হাসতে বলছেন, "কাল একটি বৌ এসেছিল, মা। গ্যাঁড়া, গোঁড়া ছোট্টটি, তার কোলে পিঠে ছেলে, ভাল করে সামলে নিতেও পারছে না। তারপর বলে কি, 'মা, সংসার ভাল লাগে না।' আমি বলি, 'সে কি গো, তোমার এই সব কাচ্চাবাচ্চা!' তাতে বললে, 'ঐ পর্যন্তই, আর হবে না।' বললুম, তা পার যদি ভালোই তো গো।" এই বলে হাসতে লাগলেন।

আমি—আচ্ছা, মা, সংসারে তো স্ত্রীলোকদের স্বামী একান্ত পূজ্য ও গুরু। তাঁর সেবায় সালোক্য, সাযুজ্য পর্যন্ত মিলে থাকে—শাস্ত্রে বলে। সেই স্বামীর কতকটা মতের বিরুদ্ধে কোন স্ত্রী যদি অনুনয়-বিনয় বা সদালাপ দ্বারা সংযমী হয়ে থাকতে চেষ্টা করে তাতে কি পাপ হয় ?

মা—ভগবানের জন্য হলে কোন পাপ হয় না, মা। কেন হবে ? ইন্দ্রিয়সংযম চাই, এই যে বিধবাদের এত ব্যবস্থা সব ইন্দ্রিয়সংযমের জন্যে। ঠাকুরের কোন বিষয়ই ভগবান ছাড়া ছিল না। আমাকে যে-সব জিনিস দিয়ে ষোড়শীপূজা করেছিলেন সেই সব শাঁখা শাড়ী ইত্যাদি—আমার তো গুরু-মা ছিলেন না—কি করব ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি ভেবে বললেন, 'তা তোমার গর্ভধারিণী মাকে দিতে পার'—তখন বাবা বেঁচে ছিলেন—'কিন্তু দেখো তাঁকে যেন মানুষজ্ঞান করে দিও না, সাক্ষাৎ জগদম্বা ভেবে দেবে।' তাই করলুম ; এমনি শিক্ষা তাঁর ছিল।

শোকহরণ মাসিক যে পাঁচ টাকা দেয়, তা মাকে দিতে দিয়েছিল। দিতেই মা বললেন, "কেন মা, এখন তার কষ্ট, এখন নাই বা দিলে।"

আমি—কত দিকে কত খরচ হয়ে যাচ্ছে, মা! এ তো আর বেশি নয়। যে আপনার সেবায় দিতে পারে তারই মনের তৃপ্তি, নইলে—

মা বললেন, "হ্যাঁ, তা বটে। এখানে দিলে সাধুভক্তদের সেবায় লাগে।"

মালপো এনেছিলুম, খুলে ঠাকুরের কাছে দিতে বললেন। রাত অনেক হয়েছিল, প্রায় সাড়ে দশটা—ভোগ হয়ে গেছে, মায়ের আহারের পর প্রসাদ নিয়ে বিদায় নিলুম।

১৮ ভাদ্র, ১৩২৫

মা জপের আসনে বসে আছেন। আরতি হয়ে গেছে। রাধুর স্বামীর জন্য মাংস রেঁধে এনেছিলুম, রাধুকে ডেকে তেতলায় তার ঘরে রেখে আসতে বললেন। আমি রেখে এসে প্রণাম করে বসলুম। মা কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন। একটি আত্মীয়া মেয়ে এসে মাকে বলছেন, "তুমি আমার মনটি ভাল করে দাও, আমার মনে বড় অশান্তি, আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে নেই, যা আছে তোমাকে লিখে পড়ে দিয়ে যাব। আমি মরবার পরে তুমি সেই মতো কাজ করো।"

মা হেসে বললেন, "তা কবে মরবি গো!" শেষে গম্ভীর হয়ে মা বললেন, "তাহলে আস্তে আস্তে বাড়ি চলে যাও, এসব জায়গায় যেন একটা বিপদ করে বসো না। এমন জায়গায় থেকে, আর আমার কাছে থে—(থে বলেই সামলে নিয়ে বললেন) এই সব সাধু-ভক্ত, ঠাকুর, এমন স্থানে থেকেও যদি তোর মনের অশান্তি না ঘোচে, তবে তুই কি চাস বল দেখি!... কি জীবন তুই পেয়েছিস বল্ দেখি? কোনও ঝঞ্ঝাট নেই। এ জন্মটা যে কিনে নিয়ে যেতে পারতিস্। এ স্থান যখন চিনলি নি—চিনবি একদিন যখন অভাব হবে, তবে এখন বুঝলিনি! তোর পাপ মন, তাই শান্তি পাস্ নে। কাজকর্ম না করে বসে থেকে থেকে মাথা গরম হয়ে উঠেছে। একটা ভাল চিন্তা কি তোর কিছু করতে নেই? কি অশুদ্ধ মন গো!" এই বলেই আবার হেসে উঠে আমার পানে তাকিয়ে বলছেন, "কি ঠাকুরের লীলা মা দেখছ। মায়ের বংশটি আমার কেমন দিয়েছেন! কি কুসংসর্গই করছি দেখ! এইটি তো পাগলই, আর একটিও পাগল হবার গতিক হয়েছে। আর ঐ দেখ আর একটি, কাকেই বা মানুষ করেছিলুম, মা, একটুও বুদ্ধি নেই। ঐ বারাণ্ডায় রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে, কখন স্বামী ফিরবে। মনে ভয়, ঐ যে গানবাজনা যেখানে হচ্ছে, পাছে ঐখানেই ঢুকে পড়ে। দিনরাত সামলে নিয়ে আছে, কি আসক্তি, মা! ওর যে এত আসক্তি হবে তা জানতুম না।"

আত্মীয়াটি বিষণ্ণমুখে উঠে গিয়ে শুলেন।

মা—কত সৌভাগ্যে, মা এই জন্ম, খুব করে ভগবানকে ডেকে যাও। খাটতে হয়, না খাটলে কি কিছু হয়? সংসারে কাজকর্মের মধ্যেও একটি সময় করে নিতে হয়। আমার কথা কি বলব, মা, আমি তখন দক্ষিণেশ্বরে রাত তিনটের সময় উঠে জপে বসতুম। কোন হুঁশ থাকত না। একদিন জোছনা রাতে নবতে সিঁড়ির পাশে* বসে জপ করছি, চারিদিক নিস্তব্ধ। ঠাকুর যে সেদিন কখন ঝাউতলায় শৌচে গেছেন, কিছুই জানতে পারিনি—অন্যদিন জুতোর শব্দে টের পাই। খুব ধ্যান জমে গেছে। তখন আমার অন্য রকম চেহারা

* শ্রীশ্রীমা নহবতে নিচের কুঠরিতে থাকতেন। উহার পশ্চিমের বারাণ্ডায় সিঁড়ির পাশে গঙ্গার দিকে দক্ষিণমুখ হয়ে তিনি ধ্যান করতেন

ছিল—গয়না পরা, লালপেড়ে শাড়ী। গা থেকে আঁচল খসে বাতাসে উড়ে উড়ে পড়ছে, কোন হুঁশ নেই। ছেলে যোগেন সেদিন ঠাকুরের গাড়ু দিতে গিয়ে আমাকে ঐ অবস্থায় দেখেছিল। সেসব কি দিনই গিয়েছে, মা! জোছনা রাতে চাঁদের পানে তাকিয়ে জোড় হাত করে বলেছি, 'তোমার ঐ জোছনার মতো আমার অন্তর নির্মল করে দাও।' জপধ্যান করতে করতে দেখবে—(ঠাকুরকে দেখিয়ে) উনি কথা কবেন, মনে যে বাসনাটি হবে তক্ষুণি পূর্ণ করে দেবেন—কি শান্তি প্রাণে আসবে! আহা! তখন কি মনই ছিল আমার! বৃন্দে (ঝি) একদিন আমার সামনে একটি কাঁসি গড়িয়ে (ঠেলা মেরে) দিলে, আমার বুকের মধ্যে যেন এসে লাগল (মা নবতে ধ্যানস্থা ছিলেন, তাই শব্দটা যেন বজ্রের মতো লেগেছিল—কেঁদে ফেলেছিলেন)। সাধন করতে করতে দেখবে আমার মাঝে যিনি, তোমার মাঝেও তিনি, দুলে বাগ্‌দি ডোমের মাঝেও তিনি—তবে তো মনে দীন ভাব আসবে। ওর (পূর্বোক্ত আত্মীয়ার) কথা কি বলব, মা, জয়রামবাটীতে ডোমেরা বিড়ে পাকিয়ে দিয়েছে, ঘরে দিতে এসেছে। আমি বললুম, 'ঐখানকে রাখ,' তা তারা কত সাবধান হয়ে রেখে গেল। ও বলে কি-না 'ঐ ছোঁয়া গেল, ওসব ফেলে দাও' এই বলে তাদের গালাগাল—'তোরা ডোম হয়ে কোন্ সাহসে এমন করে রাখতে যাস্?' তারা তো ভয়ে মরে। আমি তখন বলি, 'তোদের কিছু হবে না, কোন ভয় নেই। আবার তাদের মুড়ি খেতে পয়সা দি—এমন মন ওর! রাত তিনটের সময় উঠে আমার ঐ দিকের (উত্তরের) বারাণ্ডায় বসে জপ করুক না, দেখি কেমন মনে শান্তি না আসে। তা তো করবে না, কেবল অশান্তি অশান্তি—কিসের অশান্তি তোর? আমি তো, মা, তখন অশান্তি কেমন জানতুম না। এখন ঐ ওদের জন্যে, আর কিক্ষণে ছোট বৌ ঘরে এল, আর তার মেয়েকে মানুষ করতে গেলুম, সেই হতে যত জ্বালা। যাক সব চলে যাক, কাউকে আমি চাই নে। এ কি মেয়ে সব হলো গা! একটা কথা শোনে না। মেয়েলোক এত অবাধ্য!

গোলাপ-মা—আবার কেমন করে সাজে দেখ না! ভাবে, তবেই বুঝি বর ভালবাসবে।

মা—আহা! তিনি আমার সঙ্গে কি ব্যবহারই করতেন! একদিনও মনে ব্যথা পাবার মতো কিছু বলেননি। কখনও ফুলটি দিয়েও ঘা দেননি। একদিন দক্ষিণেশ্বরে আমি তাঁর ঘরে খাবার* রাখতে গেছি, লক্ষ্মী রেখে যাচ্ছে মনে করে তিনি বললেন, 'দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাস।' আমি বললুম, 'আচ্ছা।' আমার গলার স্বর শুনে তিনি চমকে উঠে বললেন, 'কে তুমি? তুমি এসেছ বুঝতে পারিনি। আমি মনে করেছিলুম লক্ষ্মী; কিছু মনে করোনি।' আমি বললুম, 'তা বললেই বা।' কখনো আমাকে 'তুমি' ছাড়া 'তুই' বলেননি। কিসে ভাল থাকব তাই করেছেন।তিনি বলতেন, 'কর্ম করতে হয়; মেয়েলোকের বসে

* সেদিন সরুচাকলি পিঠে অ র সুজির পায়েস করে অন্য লোক নেই দেখে শ্রীশ্রীমা নিজেই সন্ধ্যার পর ঐ সব ঠাকুরের ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন

থাকতে নেই, বসে থাকলে নানা রকম বাজে চিন্তা—কুচিন্তা সব আসে।' একদিন কতকগুলি পাট এনে আমাকে দিয়ে বললেন, 'এইগুলি দিয়ে আমাকে শিকে পাকিয়ে দাও, আমি সন্দেশ রাখব, লুচি রাখব, ছেলেদের জন্য।' আমি শিকে পাকিয়ে দিলুম আর ফেঁসোগুলো দিয়ে থান ফেলে বালিশ করলুম। চটের উপর পট্‌পটে মাদুর পাততুম আর সেই ফেঁসোর বালিশ মাথায় দিতুম। তখনও তাইতে শুয়ে যেমন ঘুম হতো এখন এই সবে (খাট বিছানা দেখিয়ে) শুয়েও তেমনি ঘুমোই—কোন তফাত বোধ হয় না, মা। তিনি বলতেন, 'ওরে হৃদু, আমার বড় ভাবনা ছিল যে পাড়া-গেঁয়ে মেয়ে, কে জানে—এখানে কোথায় শৌচে যাবে, আর লোকে নিন্দে করবে তখন লজ্জা পেতে হবে। তা, ও কিন্তু এমন যে কখন কি করে, কেউ টেরই পায় না, বাইরে যেতে আমিও কখনো দেখলুম না।' তাঁর ঐ কথা শুনে আমার এমন ভাবনা হলো যে কি বলব। ভাবলুম—ওমা, উনি তো যা চান তাই 'মা' ওঁকে দেখিয়ে দেন, এইবার বাইরে গেলেই ওঁর চোখে পড়তে হবে দেখছি। ব্যাকুল হয়ে জগদম্বাকে ডাকতে লাগলুম, 'হে মা, আমার লজ্জা রক্ষা কর।' তা আমার এমনি মা-টি যেন দুই পাখা দিয়ে আমাকে ঢেকে রাখতেন! এত বছর ছিলুম, একদিনও কারও সামনে পড়িনি। লোকে আমাকে ভগবতী বলে, আমিও ভাবি—সত্যিই বা তাই হব। নইলে আমার জীবনে অদ্ভুত অদ্ভুত যা সব হয়েছে! এই গোলাপ, যোগীন এরা তার অনেক কথা জানে। আমি যদি ভাবি—এইটি হোক, কি এইটি খাব, তা ভগবান কোথা হতে সব জুটিয়ে এনে দেন। আহা! দক্ষিণেশ্বরে কি সব দিনই গেছে, মা! ঠাকুর কীর্তন করতেন, আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা নহবতের ঝাপড়ির ভিতর দিয়ে* চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতুম, হাতজোড় করে পেন্নাম করতুম, কি আনন্দই ছিল! দিনরাত লোক আসছে, আর ভগবানের কথা হচ্ছে। আহা! বিষ্ণু বলে একটি ছেলে সংসারের ভয়ে আত্মহত্যাই করলে। তা ভক্তদের মধ্যে কে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, 'ও যে আত্মহত্যা করলে, ওর পাপ হলো না?' তিনি বললেন, 'ও ভগবানের জন্যে দেহ দিয়েছে, ওর আবার পাপ কি? কোন পাপ নেই, তবে এ কথাটি সবাইকে বলো না। সবাই ভাবটি বুঝবে না—তা দেখ এখন বইয়েই ছাপিয়ে দিয়েছে।'

"মন না মত্ত হস্তী, মা! হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোটে। তাই সদসৎ বিচার করে সব দেখতে হয়, আর খুব খাটতে হয় ভগবানের জন্যে। তখন আমার মন এমন ছিল—দক্ষিণেশ্বরে রেতে কে বাঁশী বাজাত, শুনতে শুনতে মন ব্যাকুল হয়ে উঠত, মনে হতো সাক্ষাৎ ভগবান বাঁশী বাজাচ্ছেন—অমনি সমাধি হয়ে যেত। আহা! বেলুড়েও কেমন ছিলুম! কি শান্ত জায়গাটি, ধ্যান লেগেই থাকত! তাই ওখানে একটি স্থান করতে নরেন ইচ্ছা করেছিল। আর এই বাড়িটি যে হলো, এই চার কাঠা জমি কেদার দাস দিয়েছিল। এখন জমির দাম কত! এখন কি আর হয়ে উঠত? কে জানে সব ঠাকুরের ইচ্ছা।"

* নহবতের বারাণ্ডায় দরমার বেড়া দেওয়া ছিল।

এমন সময়ে মাকু ছেলে কোলে করে এসে তাকে ঘরে ছেড়ে দিয়ে বসলেন, "কি করব, মা, ঘুম নেই।"

মা বললেন, "ও সত্ত্বগুণী ছেলে, তাই ঘুম নেই।"

আমবাতের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে মা বললেন, "আঃ, আমবাতের জ্বালায় গেলুম, মা, মুখেও আবার বেরিয়েছে। এই দেখ মুখে হাত বুলিয়ে। এ কি যাবে না ? এই দেখ পেটেও উঠেছে, দাও তো পেটে ঐ তেলটি দিয়ে। ঐটি আমার প্রাণ গো, দিলেই একটু কমে।"

তেলমালিশ করতে করতে বললুম, "মা, বাড়িতে একদিন ঠাকুরপূজো করে সংসারের কাজ করতে গেছি, কিছু পরে ঠাকুরঘরে এসে দেখি—ঠাকুরের ছবি বিন্দু বিন্দু ঘেমেছে। জানালা খোলা ছিল, ছবিতে রোদ লাগছিল। কিন্তু আমি ভাবলুম পূজা করবার সময় হয় তো জল লেগেছিল। বেশ করে মুছে রেখে গেলুম। রোদে ঘেমেছে কি-না বুঝবার জন্য কিছু পরে আবার এলুম। এবারও এসে দেখি ঠাকুর ঘেমে রয়েছেন। তখন জানালা বন্ধ করে দিলুম।"

মা—হ্যাঁ, মা, তা অমন দেখা যায়। ঠাকুর বলতেন, 'ছায়া, কায়া, ঘট, পট সমান।'

মা এইবার একটু চুপ করে রইলেন। বাসা হতে লক্ষ্মণ এসেছিল। মা বললেন, "তবে এস, মা, এস।" প্রণাম করে প্রসাদ নিয়ে বাসায় ফিরলুম।

একদিন মা উত্তরের বারাণ্ডায় বসে আছেন, জনৈক গৃহস্থ যুবক-ভক্ত মায়ের সঙ্গে কি কথা বলছেন। তিনি মায়ের পায়ে মাথা রেখে বলছেন, "মা, আমি সংসারে অনেক দাগা পেয়েছি, তুমি আমার গুরু, তুমিই আমার ইষ্ট, আমি আর কিছু জানি না। সত্যই আমি এত সব অন্যায় কাজ করেছি যে, লজ্জায় তোমার কাছেও বলতে পারি না। তবু তোমার দয়াতেই আমি আছি।"

মা স্নেহভরে মাথায় হাত বুলিয়ে বলছেন, "মায়ের কাছে ছেলে—ছেলে।"

তিনি—হ্যাঁ, মা, কিন্তু এত দয়া তোমার কাছে পেয়েছি বলে যেন কখন মনে না আসে যে তোমার দয়া পাওয়া বড় সুলভ।

২ আশ্বিন, ১৩২৫

রাত প্রায় সাড়ে আটটা। মায়ের তক্তপোশের পাশে নিচে মাদুর পাতা হয়েছে। মা শোবার উদ্যোগ করছেন। আমি যেতেই বললেন, "এস, এস, আমার কাছে এসে বস। একে একটু মিষ্টি দিয়ে জল খেতে দাও তো, সরলা, সারাদিন খেটে আবার এই ছুটে আসছে।" আমি জল খেতে আপত্তি করলুম, কিন্তু তা কানেও তুললেন না ; বললেন, "দেহের প্রতি একটু নজর রাখতে হয়, মা ; সুমতি তিন ছেলের মা হয়েই যেন বুড়ি হয়ে

গেছে।" মা তাঁর আমবাতের কথা তুলে বললেন, "এ কি হলো, মা! লোকের হয়, যায়; আমার যেটি হবে সেটি আর যেতে চায় না। ঠাকুর যে বলতেন, 'যত লোকে রোগ, শোক, দুঃখ, তাপ নিয়ে কত কি করে এসে ছোঁয়, সেই সব এই দেহে আশ্রয় করে,' তা ঠিক, মা, আমারও বোধ হয় তাই হবে। ঠাকুরের তখন অসুখ, কে সব ভক্তেরা (দক্ষিণেশ্বরের) মায়ের (কালীর) ওখানে পূজো দেবে বলে জিনিসপত্র এনেছিল, তা ঠাকুর কাশীপুরে জেনে সেই সব ঠাকুরের কাছেই ভোগ লাগিয়ে প্রসাদ পেলে। ঠাকুর বলতে লাগলেন, 'দেখেছ,কি অন্যায় করলে। জগদম্বার জন্যে এনে এখানেই সব দিয়ে দিলে*।' আমি তো ভয়ে মরি, ভাবি—এই অসুখ, কি জানি কি হবে। একি বাপু, কেন ওরা এমন করলে! ঠাকুরও তখন বারবার তাই বলতে লাগলেন। কিন্তু পরে যখন রাত অনেক হয়েছে তখন আমাকে বললেন, 'দেখ, এর পর ঘর ঘর আমার পূজো হবে। পরে দেখবে—একেই সবাই মানবে, তুমি কোন চিন্তা করো না।' সেইদিনই 'আমার' বলতে শুনলুম। কখনও 'আমার' বলতেন না। বলতেন, 'এই খোলটার' বা আপনার শরীর দেখিয়ে এই 'এর'। সংসারে কত রকমের লোক সব দেখলুম। ত্রৈলোক্য * আমাকে সাতটি করে টাকা দিত। ঠাকুর দেহ রাখার পর (দক্ষিণেশ্বরের) দীনু খাজাঞ্চী ও অন্য সকলে লেগে ঐ টাকাটা বন্ধ করলে*। আত্মীয় যারা ছিল তারাও মানুষ-বুদ্ধি করলে ও তাদের সঙ্গে যোগ দিলে। নরেনও কত বলেছিল, 'মায়ের ও-টাকাটা বন্ধ করো না।' তবু করলে। তা দেখ, ঠাকুরের ইচ্ছায় অমন কত সাত গণ্ডা এল, গেল। দীনু ফিনু সব কে কোথায় গেছে। আমার তো এ পর্যন্ত কোন কষ্টই হয়নি। কেনই বা হবে? ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন, 'আমার চিন্তা যে করে সে কখনো খাওয়ার কষ্ট পায় না।'

"ঠাকুরের দেহরক্ষার পর তাঁর সব ভাল জিনিসপত্র—বনাত, আলোয়ান, জামা কারা নেবে এই কথা নিয়ে গোল বাধে। তা ওসব হলো ভক্তদের ধন, তারা ওসব চিরকাল যত্ন করে রাখবে! তারাই শেষে ঐ সব গুছিয়ে নিয়ে বাক্সে পুরে বলরামের বৈঠকখানায় এনে রাখলে। কিন্তু মা, ঠাকুরের কি ইচ্ছা—সেখান থেকে চাকরদের কে চাবি দিয়ে খুলে তার অনেকগুলি চুরি করে নিয়ে বিক্রি করে ফেললে—কি, কি করলে। তা ওসব কি বৈঠকখানায় রাখতে হয়? বাড়ির ভিতরে নিয়ে রাখলেই পারত। তাঁর ব্যবহারের জিনিসপত্র আর জামা কাপড় যা বাকি ছিল, তা এখন বেলুড় মঠে আছে।

* কাশীপুবে এই ঘটনা হযেছিল। কয়েকটি ভক্ত মা-কালীব জন্য একদিন অনেক রকম মিষ্টি খাবাবদাবার এনে হলঘরে ঠাকুরেব ছবিব সামনে ভোগ দিয়েছিলেন।

* ত্রৈলোক্য বিশ্বাস রানী রাসমণির জামাতা মথুরবাবুর পুত্র। ঠাকুব যখন আর পূজা করতে পারলেন না তখন হতে তাঁর মাইনের টাকাটা বন্ধ না করে শ্রীশ্রীমাকে দিতেন।

* মা তখন বৃন্দাবনে। চিঠি যেতে মা বলেছিলেন, "বন্ধ করেছে করুক। এমন ঠাকুবই চলে গেছেন, টাকা নিয়ে আর আমি কি কবব"

"আমার যে শ্বশুর ছিলেন, মা, বড় তেজস্বী, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তিনি অপরিগ্রাহী ছিলেন। কেহ কোন জিনিস বাড়িতে দিতে এলেও নেবার নিষেধ ছিল। আমার শ্বাশুড়ির কাছে কিন্তু কেউ কিছু লুকিয়ে এনে দিলে তিনি রেঁধেবেড়ে রঘুবীরকে ভোগ দিয়ে সকলকে প্রসাদ দিতেন। শ্বশুর তা জানতে পারলে খুব রাগ করতেন। কিন্তু জ্বলন্ত ভক্তি ছিল তাঁর! মা শীতলা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফিরতেন। শেষ রাত্রে উঠে ফুল তুলতে যাওয়া তাঁর অভ্যাস ছিল। একদিন লাহাদের বাগানে গিয়েছেন, একটি ন-বছরের মতো মেয়ে এসে তাঁকে বলছে, 'বাবা, এদিকে এস। এদিকের ডালে খুব ফুল আছে। আচ্ছা, নুয়ে ধরছি, তুমি তোল।' তিনি বললেন, 'এ সময়ে এখানে তুমি কে, মা?' 'আমি গো, আমি এই হালদার বাড়ির।' অমন ছিলেন বলেই ভগবান তাঁর ঘরে এসে জন্মেছিলেন, তিনি এসেছিলেন আর তাঁর এই সব সাঙ্গোপাঙ্গরাও এসেছিল—নরেন, রাখাল, বলরাম, ভবনাথ, মনোমোহন—কত বলব, মা। ছোট নরেন শেষে বড় কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত হয়ে পড়ল, টাকা-পয়সায় জড়িয়ে পড়ল। ঠাকুর এদের যার যার সম্বন্ধে যা যা বলে গেছেন তা বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছে।

"কামারপুকুরের হরিদাসী বলে একটি মেয়ে নবদ্বীপ যাবে বলে এসে ওখানেই রয়ে গেল। আমাকে কত ভালবাসত! তার কি বিশ্বাস ছিল, মা! ঠাকুরের জন্মস্থানের ধুলো কুড়িয়ে রেখেছিল, বলত—'এই তো নবদ্বীপ, স্বয়ং গৌরাঙ্গ এইখানেই এসেছিলেন। আবার কি করতে নবদ্বীপ যাব?' আহা কি বিশ্বাস! ঠাকুরের দেহ রাখবার পর একজন উড়ে সাধু এসে কামারপুকুরে ছিলেন। আমি তাঁর চাল ডাল ইত্যাদি যা যা প্রয়োজন সব দিতুম, আর সকালে বিকালে খবর নিতুম, 'সাধু বাবা, কেমন আছ গো।'

"আহা! তাঁর একখানি কুঁড়ে কি করেই যে বেঁধেছিলুম, মা! রোজ আকাশ ভরে মেঘ হতো, এই বৃষ্টি হয়—হয় আর কি। তখন হাতজোড় করে বলতুম, 'ঠাকুর, রাখ গো, রাখ; ওঁর কুঁড়েটুকু হয়ে যাক, তারপর যত পার ঢেলো।' তা গ্রামের লোকেও কাঠকুটো যা লাগল দিয়ে সাহায্য করলে। রোজ বৃষ্টি আসব আসব করত। যা হোক, এমনি করে কুঁড়েখানি তো হয়ে গেল, কিন্তু তার কিছুদিন পরেই সাধুটি সেই কুঁড়েতে দেহ রাখলেন।"

মা বলছেন, "চল, এখন ঘরে যাই।" উঠতে উঠতে বললেন, "ঠাকুর বলতেন, 'এই দেহটি গয়া হতে এসেছে।' তাঁর মা দেহ রাখবার পর আমাকে বললেন, 'তুমি গয়ায় পিণ্ডি দিয়ে এস।' আমি বললুম, 'পুত্র বর্তমান; আমি দেব, সেকি হয়?' ঠাকুর বললেন, 'তা হবে গো, আমার কি ওখানে যাবার জো আছে? গেলে কি আর ফিরব?' আমি বললুম, 'তবে গিয়ে কাজ নেই।' পরে গয়া করতে আমিই গিয়েছিলুম*।" রাত প্রায় নয়টা হয়েছে। প্রণাম করে বিদায় নিলুম।

* ঠাকুরের দেহ-রক্ষার পর শ্রীশ্রীমা প্রথমবার বৃন্দাবন হতে ফিরে কামারপুকুর গিয়েছিলেন। বছর খানেক সেখানে থেকে পরে বেলুড়ে গঙ্গাতীরে রাজু গোমস্তার ভাড়াটে বাড়িতে বাস করেন। তারপর গয়া যাবার জন্যে মাস্টার মহাশয়ের বাড়ি এসে তথা হতে স্বামী অদ্বৈতানন্দের (বুড়ো গোপাল) সঙ্গে গয়া যান।

৩ আশ্বিন, ১৩২৫

আজও মায়ের ওখানে গিয়েছি। মা দেখেই বলছেন, "এসেছ, মা, এস।" নবাসনের বৌকে বললেন, "তেলটি এনেছ? দাও তো, বৌমা পিঠে মালিশ করে।" বৌ আমাকে দিতে বলায় মা বললেন, "আহা! ও এই সারাদিন খেটেখুটে ছুটে আসছে, ওকে একটু বিশ্রাম করতে দাও। (আমাকে) বস, মা, বস। এই ওরা ভাস্করানন্দের কথা বলছিল। আমিও কাশীতে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলুম। সঙ্গে অনেক মেয়েরা ছিল। তখন মন খুব খারাপ, ঠাকুরের দেহ রাখার পর। সেইবারই বৃন্দাবনে প্রথম গিয়েছিলুম। তা ভাস্করানন্দের ওখানে যখন গেলুম, দেখি নির্বিকার মহাপুরুষ উলঙ্গ হয়ে বসে আছেন। আমরা যেতেই মেয়েদের বললেন, 'শঙ্কা মৎ কর, মায়ী। তোমরা সব জগদম্বা, সরম কেয়া? এই ইন্দ্রিয়টি? এর জন্য? এ তো হাতের পাঁচটি আঙুল যেমন তেমন একটি।' আহা, কি নির্বিকার মহাপুরুষ! শীত-গ্রীষ্মে সমান উলঙ্গ হয়ে বসে আছেন।"

তেলমালিশ শেষ হবার পর মা বললেন, "চল, এখন ঠাকুরের বই একটু পড়বে। সরলাটি বোর্ডিং-এ চলে গেছে, মা, অন্য দিন সে পড়ত।" পড়তে পড়তে সাধনের কথা, দর্শনাদির কথা উঠল।

মা—এই গোলাপ, যোগীন, এরা কত ধ্যানজপ করেছে। এসব আলোচনা করা ভাল। পরস্পরেরটা শুনে ওদেরও (ঢাকার বৌ, নবাসনের বৌ প্রভৃতি) এতে মতি হবে।

দর্শনের কথা উঠলে, মা অনেক কথা চেপে গেলেন, সকলের সামনে সে সব বলবেন না বলে বোধ হয়।

নলিনী—পিসীমা, লোকের কত ধ্যানজপ হয়, দর্শন-স্পর্শন হয় শুনি, আমার কিছু হয় না কেন? তোমার সঙ্গে এতদিন যে রইলুম, কই আমার কি হলো?

মা—ওদের হবে না কেন? খুব হবে। ওদের কত ভক্তি বিশ্বাস! বিশ্বাস ভক্তি চাই, তবে হয়। তোদের কি তা আছে?

নলিনী—আচ্ছা, পিসীমা, লোকে যে তোমাকে অন্তর্যামী বলে, সত্যিই কি তুমি অন্তর্যামী? আচ্ছা, আমার মনে কি আছে তুমি বলতে পার?

মা একটু হাসলেন। নলিনী আবার শক্ত করে ধরলেন। তখন মা বললেন, "ওরা বলে ভক্তিতে।" তারপর বললেন, "আমি কি, মা? ঠাকুরই সব। তোমরা ঠাকুরের কাছে এই বল—(হাতজোড় করে ঠাকুরকে প্রণাম করলেন) আমার 'আমিত্ব' যেন না আসে।"

মায়ের ভাব দেখে হাসি এল, ধরাছোঁয়া না দেওয়ার ভান, আর আমরা তো এক একটি অহঙ্কারে ভরা। এ শিক্ষার মর্ম বুঝবার আমাদের ক্ষমতা কোথায়?

ঢাকার বৌ বলছেন, "আমার ছেলে বলে—মায়ের কাছে আর কি বলব, মা তো জগদম্বা, অন্তরের কথা সব জানেন।"

আমি বললুম, "অনেকেই তো মাকে জগদম্বা বলেন, কিন্তু কার কত বিশ্বাস তা ঠাকুরই জানেন। অবিশ্বাসী আমাদের মুখে এই কথা যেন নিতান্ত মুখস্থ করা কথার মতো শুনায়।"

মা হেসে বললেন, "তা ঠিক, মা।"

আমি—মা যে সাক্ষাৎ ভগবতী, একথা মা যদি নিজে দয়া করে বুঝিয়ে না দেন, তা হলে আমাদের সাধ্য কি বুঝি! তবে মায়ের ঈশ্বরত্ব এখানেই যে, মায়ের ভিতরে আদৌ 'অহঙ্কার' নেই। জীবমাত্রই অহং-এ ভরা। এই যে হাজার হাজার লোক মায়ের পায়ের কাছে 'তুমি লক্ষ্মী, তুমি জগদম্বা' বলে লুটিয়ে পড়ছে, মানুষ হলে মা অহঙ্কারে ফেঁপে ফুলে উঠতেন। অত মান হজম করা কি মানুষের শক্তি!

মা প্রসন্নমুখে একবার আমার দিকে চাইলেন মাত্র। মনে মনে বললুম,"মা, দয়া কর, মা, মুখে বলতে আমার লজ্জা করে, মনে যেন বলতে পারি।"

যাবার সময় হয়ে এসেছে। মা উঠে প্রসাদ হাতে দিয়ে বললেন, "প্রসাদে ও হরিতে কোন প্রভেদ নেই, (আমার বুকে হাত দিয়ে) মনে এটি স্থির বিশ্বাস রেখো।" আজ বিশেষ করে কেন এটি বললেন? আজ তিন মাস হলো, প্রায় রোজই আসি, যাই। যাবার সময় মা রোজই হাতভরে প্রসাদ দেন। অনেককে দেওয়ার জন্য কোন কোন দিন প্রসাদের অভাব হতেও দেখেছি। মা তাই নিজেব তক্তপোশের নিচে একটি সরায় করে প্রসাদ রেখে দিতেন এবং বলে রাখতেন, "ওরটি রেখে আর সবাইকে দিও গো।" তাতেও আমার লজ্জা করত। এই লজ্জা ভেঙে দেবার জন্যই কি আজ বিশেষ করে ও কথাটি বললেন?

১১ আশ্বিন, ১৩২৫
(নবম্যাদিকল্পারম্ভ দেবীর বোধন)

প্রাতে গিয়েছি। মা ফল কাটছিলেন, দেখেই বললেন, "এসেছ, মা, এস। আজ বোধন (আমার এই কথা মনেই ছিল না)। ঠাকুরের এই ফুলগুলি বেছে সাজিয়ে রাখ, ফলের থালা এই পাশটিতে রেখে দাও।" আদেশ পালন করলুম। ফল ইত্যাদি কাটা হয়ে গেলে মা পাশের ঘরে এলেন। স্নান করবেন। তেলের ভাঁড়, চিরুণি নিয়ে আমার কোলের কাছে এসে বসলেন। মাথায় হাত দিতে আমি ইতস্তত করছি দেখে মা বললেন, "দাও না গো মাথাটা আঁচড়ে।"—যেন বালিকাটি! আদেশ পেয়ে আমি আঁচড়ে দিচ্ছি। রাধু নেয়ে এসে বলছে, "চিঁড়ে দিয়ে দই খাব।"

মা সেখানেই একটি বাটিতে চিঁড়ে দই মেখে নিজে একটু মুখে দিয়ে রাধুকে দিলেন। আমি মাথা-আঁচড়ান শেষ করে তেল মাখিয়ে দিচ্ছি। মা বলছেন, "দেখ, জয়রামবাটীতে কটি

ছেলে দীক্ষা নিতে গিয়েছিল। তা, তাদের দিলুম না। তখন তারা কাকুতি করে বললে, 'তবে পায়ের একটু ধুলো দিন, মাদুলি করে রাখব'—এমনি তাদের ভক্তি-বিশ্বাস!"

মাথা আঁচড়াতে মায়ের অনেকগুলি চুল উঠেছিল। মা বললেন, "এই নাও গো, রাখ।" বস্তুতই আমি ধন্য হয়ে গেলুম—আমার নেবার ইচ্ছা ছিল।

মায়ের সঙ্গে গঙ্গায় নাইতে গেলুম। স্নান করে এসে পূজা শেষ হলেই মা প্রসাদ বিতরণ করতে লাগলেন। তাতে অনেক সময় কেটে গেল।

শ্যামাদাস কবিরাজ মশায় রাধুকে দেখতে এলেন। মা রাধুকে ডেকে দিতে বললেন। আমি ডাকতে গেলুম। একটু পরে রাসবিহারী মহারাজ গিয়ে কবিরাজ মহাশয়কে ডেকে নিয়ে এলেন। দেখবার পর মা (কবিরাজ মশায়কে) প্রণাম করতে রাধুকে বললেন। রাধু নত হয়ে প্রণাম করল। তিনি চলে যেতে, কেউ কেউ বললে, "উনি কি ব্রাহ্মণ?"

মা—না, বৈদ্য।

"তবে যে প্রণাম করতে বললেন?"

মা—তা করবে না? কতবড় বিজ্ঞ! ওঁরা ব্রাহ্মণতুল্য, ওঁকে প্রণাম করবে না তো কাকে করবে? কি বল, মা।

ঠাকুরের ভোগ হয়ে গেল। মায়ের খাওয়া হয়ে যেতে আমরা সকলে প্রসাদ পেতে বসলুম। মা আমাকে বললেন, "কড়াইয়ের ডালটি বেশ হয়েছে, খাও।" নলিনী দিদি বলছেন, "তুমি রোজ এসে চলে যাও, খাও তো না, আজ বেশি করে মাছ খাও।" এই বলে অনেকগুলি মাছ দেওয়ালেন। মাছের চেয়ে ডালটাই আমার বিশেষ প্রিয় মা ঠিকই ধরেছিলেন।

মা এইবার বিশ্রাম করবেন। গোলমাল হবে বলে আমরা পাশের ঘরে গেলুম। খানিক পরে এসেছি। মা বলছেন, "দেখছ, সব দরজা বন্ধ করে রেখেছে, গরমে প্রাণ গেল। খুলে দাও তো।" খুলে দিলুম। একটু পরেই মা উঠে কাপড় কাচতে গেলেন। ঠাকুরের বৈকালী ভোগ দেওয়া হলো। মা এসে উত্তরের বারাণ্ডায় আসন পেতে বসলেন। কিছু পরে বৌ, মাকু এরা সব থিয়েটার দেখতে গেলেন। মায়ের কাছে চুপ করে বসে তাকিয়ে দেখি মায়ের মাথার সামনে অনেকগুলি পাকা চুল দেখা যাচ্ছে। মনে হলো প্রাতে তখন যদি তুলতুম। মাও বলছেন, "এস তো, মা, আমার পাকা চুল তুলে দাও।" ঢের তোলা হলো, অনেক সময় লাগল। এইবার ভক্তেরা সব প্রণাম করতে আসবেন, আমারও গাড়ি এসেছে, কালীঘাটের বাসায় যেতে হবে। এখন থেকে মায়ের কাছে এমন করে রোজ রোজ যখন তখন আসবার সুবিধা হবে না ভেবে কষ্ট হতে লাগল। প্রণাম করে বিদায় নেবার সময় মা বললেন, "মহাষ্টমীর দিন আসতে পার যদি এস।"

২৬ আশ্বিন, রবিবার ১৩২৫

আজ মহাষ্টমী। মা আসতে বলেছিলেন। সকালেই আমরা দু-বোনে এসেছি। এসে দেখি কয়েকটি স্ত্রী-ভক্ত ফুল নিয়ে এলেন। মায়ের শ্রীচরণ পূজা করে তাঁরা গঙ্গায় নাইতে গেলেন। মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি থাকবে তো? আজ মহাষ্টমী।" আমি বললুম, 'থাকব'। কিছুক্ষণ পরেই পূজনীয় শরৎ মহারাজ মায়ের চরণে প্রণাম করতে এলেন। আমরা পাশের ঘরে গেলুম। মা তক্তপোশে বসে আছেন, পা দুটি মেজেয় রেখে। আরও অনেক ভক্ত প্রণাম করলেন।

পরে মাকু প্রভৃতির সঙ্গে গঙ্গাস্নানে গেলুম। মা আজ বাড়িতেই স্নান করলেন। কারণ, মা একদিন অন্তর একদিন গঙ্গাস্নান করতেন। বাতের জন্য রোজ যেতেন না। এসে দেখি বিস্তব মেয়েরা মাকে পূজা করছেন। অনেকেই কাপড় এনেছেন। কালীঘাটে মা-কালীর গায়ে যেমন কাপড় জড়িয়ে দেওয়া হয়, পূজান্তে তেমনি করে সকলে মায়ের গায়ে কাপড় জড়িয়ে দিচ্ছেন। মাও এক একখানি করে দেখে নামিয়ে রাখছেন। কাউকে বা বলছেন, "বেশ কাপড়খানি।" একজন ব্রহ্মচারী সংবাদ দিলেন— এখন সব পুরুষ ভক্তেরা মাকে প্রণাম করতে আসবেন। সে কি সুন্দর দৃশ্য! হাতে ফুল, প্রস্ফুটিত পদ্ম, বিল্বদল—একে একে সকলে পূজা ও প্রণাম করে সরে দাঁড়াচ্ছেন। এইরূপে অনেকক্ষণ গেল। ডাক্তার কাঞ্জিলাল সপরিবারে (প্রথম পক্ষের স্ত্রীসহ) এসেছেন। গোলাপ-মা বলছেন, "যার জিনিস সেই পেলে।" মাও বলছেন, "হ্যাঁ, যার—তারই হলো। মাঝখানে দুদিন কি গোলমাল হয়ে আর একজনের (পরলোকগতা দ্বিতীয়া স্ত্রীর) একটু ভোগ হয়ে গেল। এ জন্ম-জন্মান্তরেব যোগ।" বলরামবাবুর বাড়ির সকলে এসে পূজা করে গেলেন। শেষে আমি গেলুম। পূজা করে কাপড়খানি গায়ে দিতে যেতেই মা বললেন, "ওখানা পরব। আজ তো একখানি নতুন কাপড় পরতে হবেই।" এই বলে কাপড়খানা পরলেন। আমার চোখে জল এল। সামান্য কাপড়খানা! সকলে কত ভাল কাপড় দিয়েছেন। আমি মায়ের গরিব মেয়ে। মায়ের অত স্নেহে আমার লজ্জাও করতে লাগল। মা বলছেন, "বেশ পাড়টি গো।"

একটি গেরুয়াবসনধারিণী মেয়ে মাকে পূজা করে দুটি টাকা পদতলে রাখতে, মা বললেন, "ওকি! তুমি আবার কেন গো! গেরুয়া নিয়েছ, হাতে রুদ্রাক্ষের মালা।"

মা মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় দীক্ষিতা হয়েছ?"

মেয়েটি বললে, "দীক্ষা হয়নি।"

মা বললেন, "দীক্ষা নিয়ে, কোন বস্তু লাভ না করে এই বেশ ধরেছ, এ তো ভাল করনি। বেশটি যে বড়—আমারই যে জোড়হাত হয়ে প্রণাম আসছিল; ও করতে নেই,

আগে বস্তুলাভ হোক। সকলে যে পায়ে মাথা দিতে আসবে, তা নেবাব শক্তি লাভ হওয়া চাই।"

মেয়েটি বললে, "আপনাব কাছেই দীক্ষা নেবাব ইচ্ছা কর্বেছি।"

মা বললেন, "সে কি কবে হবে?" তবুও সেই মেয়েটি মিনতি কবতে লাগল। গোলাপ-মাও একটু সহায় হলেন। মা অনেকটা সদয হয়ে এসেছেন দেখলুম। মা বললেন, "দেখা যাবে পবে।"

গৌবীমা তাঁব আশ্রমেব মেয়েদেব নিয়ে এসেছেন। সকলেই পূজা কবে প্রসাদ নিয়ে বিদায নিলেন।

ঠাকুবপূজা শেষ কবে বিলাস মহাবাজ এসে চুপি চুপি মাকে বলছেন, "আজ ঠাকুব ভোগ নিলেন কি-না কি জানি, মা। একটা প্রসাদী শালপাতা উড়ে এসে নৈবেদ্যেব উপব পড়ল। এরূপ কেন হলো? অনেকেই বাড়ি হতে সব এনেছে, কি হলো কি জানি।"

মা বললেন, "গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিয়েছ তো?"

"তা তো দিয়েছি" বলে তিনি চলে গেলেন। শুনে মনটা বড় খুঁৎ খুঁৎ কবতে লাগল। মহাষ্টমী—মায়েব শ্রীচবণপূজা সমভাবেই চলতে লাগল। স্তূপাকাবেব ফুল বেলপাতা ব'বাণ্ডায বেখে আসতে না আসতেই আবাব তত ফুল পাতা শ্রীচবণতলে জমে উঠতে লাগল।

ক্রমে মধ্যাহ্ন ভোগেব সময হলো। এমন সময়ে দূব দেশ হতে তিনটি পুরুষ ও তিনজন স্ত্রীলোক মায়েব দর্শনার্থে এলেন। বড়ই দবিদ্র—একবস্ত্রে, ভিক্ষা কবে টাকা সংগ্রহ কবে পথ খবচ চালিয়ে এসেছেন। তাঁদেব মধ্যে একজন পুরুষ-ভক্ত মায়েব সঙ্গে গোপনে অনেক কথা বলতে লাগলেন। কথা আব ফুবায না। শ্রীশ্রীঠাকুবেব মধ্যাহ্ন ভোগেব বেলা হয়ে যাচ্ছে দেখে (কাবণ, মা ভোগ দেবেন) মায়েব ভক্ত ছেলেবা বিবক্ত হয়ে উঠতে লাগলেন। একজন স্পষ্টই বললেন, "আব যা বলবাব থাকে, নিচে মহাবাজদেব কাবো কাছে গিয়ে বলুন না।" মা কিন্তু একটু দৃঢ়ভাবেই বললেন, "তা এখন বেলা হলে কি হবে ওদেব কথাটি তো শুনতে হবে।" এই বলে বেশ ধৈর্যেব সহিত তাঁব কথা শুনতে লাগলেন। পবে ধীবে ধীবে কি আদেশ কবলেন। তাঁব স্ত্রীকেও ডেকে নিলেন। অনুমানে যতটা বুঝা গেল, স্বপ্নে কোন কিছু পেয়েছেন। পবে জানা গেল স্বপ্নে মন্ত্র পেয়েছিলেন। প্রায একঘণ্টা পবে তাঁবা প্রসাদ নিয়ে বিদায নিলেন। মা এসে বললেন, "আহা! বড় গবিব। কত কষ্ট কবে এসেছে।"

পবে ভোগ হয়ে গেলে সকলে প্রসাদ পেলুম। এবাব মা একটু বিশ্রাম কববেন। আমবা পাশেব ঘবে গেলুম।

চাবটে বেজেছে। মা উঠলেন। ঠাকুবেব বৈকালী ভোগ হয়ে গেল। বাসবিহাবী মহাবাজ এসে বললেন, "একটি মেম তোমাকে দর্শন কবতে এসেছেন। নিচে অনেকক্ষণ

অপেক্ষা কবছেন।" মা আসতে বললেন। মেমটি এসে মাকে প্রণাম কবতেই, মা এস বলে তাব হাত ধবলেন (হ্যাণ্ড-শেক কববাব মতো)। মা যে বলেন, 'যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যখন যেমন তখন তেমন' সেটি প্রত্যক্ষ কবা গেল। তাবপব মেযেটিব মুখে হাত দিযে চুমো খেলেন। মেমটি বাংলা জানেন, বললেন, "আমি তো আসিযা আপনাব কোন অসুবিধা কবি নাই? আমি অনেকক্ষণ হইল আসিযাছি। আমি বড কাতব আছি। আমাব একটি মেযে, বড ভাল মেযে, তাব কঠিন পীডা হইযাছে। তাই, মা, আপনাব করুণা ভিক্ষা কবিতে আসিযাছি। আপনি দযা কবিবেন, মেযেটি যেন ভাল হয। সে এত ভাল মেযে, মা! ভাল বলিতেছি কেন—আমাদেব মধ্যে স্ত্রীলোক ভাল বড একটা নাই। অনেকেই বড বদমাশ, দুষ্ট—এ আমি সত্য বলিতেছি। এ মেযেটি সেরূপ নহে—আপনি কৃপা কবিবেন।"

মা বললেন,"আমি প্রার্থনা কবব তোমাব মেযেব জন্যে—ভাল হবে।"

মেমটি এ কথায খুব আশ্বস্ত হলেন, বললেন, "তবে আব ভাবনা নাই। আপনি যখন বলিতেছেন 'ভাল হইবে' তখন ভাল হইবেই—নিশ্চয, নিশ্চয নিশ্চয।" কথায খুব জোব ও বিশ্বাস প্রকাশ পেল। মা সদয হযে গোলাপ মাকে বললেন, "ঠাকুবেব ফুল একটি একে দাও, একটি পদ্ম আন।" বিল্বপত্রেব সঙ্গে একটি পদ্ম এনে গোলাপ-মা মাযেব হাতে দিলে, মা ফুলটি হাতে কবে চোখ বুজে একটু বইলেন, পবে ঠাকুবেব পানে একদৃষ্টে চেযে ফুলটি মেমটিব হাতে দিযে বললেন, "তোমাব মেযেব মাথায বুলিযে দেবে।"

মেম হাতজোড কবে ফুল নিযে প্রণাম কবে বললেন, "তাবপব কি কবিব?"

গোলাপ মা বললেন, "কি আব কববে? শুকিযে গেলে গঙ্গায ফেলে দেবে।"

মেমটি বললেন, 'না, না, এ ভগবানেব জিনিস ফেলিযা দিব! একটি নূতন কাপডেব থলে কবিযা বাখিযা দিব, সেই থলেটি মেযেব মাথায গাযে বোজ বুলাইযা দিব।"

মা বললেন, "হ্যাঁ, তাই কবো।"

মেম—ঈশ্বব সত্য বস্তু, তিনি আছেন। আপনাকে একটি কথা বলিতে চাই। কিছুদিন পূর্বে আমাব একটি শিশুব খুব জ্বব হয, আমি খুব ব্যাকুল হইযা একদিন বসিযা বলি, 'হে ঈশ্বব, তুমি যে আছ ইহা তো আমি অনুভব কবি, কিন্তু আমাকে প্রত্যক্ষ কিছু দাও।' এই বলিযা কাদিতে কাঁদিতে একটি রুমাল পাতিযা বাখি। অনেকক্ষণ পবে দেখি সেই রুমালেব ভাজেব মধ্যে তিনটি কাঠি। আমি অবাক হইযা ঐই কাঠি তিনটি লইযা উঠিযা আসিযা শিশুটিব গাযে ক্রমান্বযে তিনবাব বুলাইযা দিলাম, সেইক্ষণে তাহাব জ্বব ছাডিযা গেল।

ইহা বলতেই টস টস কবে মেমটিব চোখ দিযে জল পডতে লাগল, তাবপব বললেন, 'আপনাব অনেক সময নষ্ট কবিলাম আমায মাফ কবিবেন।"

মা বললেন, "না, না তোমাব সঙ্গে কথা কযে আমি ভাবি খুশি, তুমি একদিন মঙ্গলবাবে এস।" মেমটি প্রণাম কবে বিদায নিলেন।

যোগীন-মার পিঠে ফোড়া হয়েছে ; অস্ত্র হয়েছে। মা বলছেন, "আহা ! আজকার দিনে যোগীন পড়ে রইল ! কত কি করবে মনে সাধ ছিল। একবার এ ঘরে আসতেও পারলে না।" আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি যোগীনের কাছে যাচ্ছ কি ! বোলো—আমি একটু পরেই আসছি।" যোগীন-মাকে দেখে মায়ের কাছে ফিরে এসে দেখি শ্রীমান প্রিয়নাথ প্রণাম করছে। মা মুখে হাত দিয়ে চুমো খেলেন। প্রিয়নাথের চোখে ছাতির শিকে ভয়ানক খোঁচা লেগেছে, ব্যাণ্ডেজ করা হয়েছে। তাই দেখে মা ভারি ব্যস্ত হয়েছেন ; বারে বারে বলছেন, "আহা ভাগ্যে চোখটি নষ্ট হয়নি গো।" এইবার আমার রওনা হবার সময় হয়ে এসেছে। একটু পরে প্রণাম করে বিদায় চাইতে মা বললেন, 'আবার এস।'

২ কার্তিক শনিবার, ঁলক্ষ্মীপূজা—১৩২৫

সকালেই আমরা দু-বোন মায়ের শ্রীচরণদর্শন করতে গিয়েছি। সুমতির ছেলেমেয়েরাও সঙ্গে গিয়েছে। মা ঠাকুরঘরে বসে ফল কাটছিলেন ; দেখে বললেন, "এই যে সব গো, বস। কবে এলে ?"

আমি বললুম, "মহাষ্টমীর দিন রাত্তিরেই চলে গিয়েছিলুম, আবার কাল রাত্তিরে এসেছি।"

মা—এখন কি থাকা হবে ?

না, মা।

মা সুমতিকে বললেন, "বৌমা, ভাল আছ ? ভাসুরঝিটি কেমন আছে ?"

দুটি মহিলা দীক্ষা নিতে এসেছেন। তাঁরা এসে প্রার্থনা জানাতেই মা বললেন, "হ্যাঁ, আরও দুটি ছেলে আছে।" বলতে বলতে আর একটি মহিলা এসে বললেন, তিনিও দীক্ষা নিতে এসেছেন। মা বললেন, "তবে তো অনেকগুলি হলো গো।"

সুমতি শ্রীশ্রীমাকে চণ্ডীজ্ঞানে পূজা করা ও লালপেড়ে শাড়ী দেওয়া স্বপ্নে দেখেছে। তাই দেবে বলে নিয়ে এসে লজ্জায় মাকে বলতে পারছে না ; বলছে, "দিদি, তুমি বল।" আমি ঐকথা মাকে বলতেই, মা হেসে বললেন, "জগদম্বাই স্বপ্ন দিয়েছেন কি বল, মা ? তা দাও, শাড়ীখানি তো পরতে হবে।" চওড়া লালপেড়ে শাড়ীখানি মা পরলেন ; কি চমৎকার দেখাতে লাগল ! মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলুম—চোখে জল এল। সুমতি বলছে, "একটু সিঁদুর দিলে বেশ হতো।"

মা সহাস্যে বললেন, 'তা দেয় তো'। কিন্তু সিঁদুর নিয়ে যায়নি বলে দেওয়া হলো না। আমরা বাসায় ফিরব বলে প্রণাম করছি। মা বললেন, 'তুমিও যাবে এখুনি' ?

আমি—হ্যাঁ, মা, যেতে হবে। বাসায় একটু বেশি রান্নার কাজ আছে।

মা—আবার আসবে ?

আমি—হ্যাঁ, বিকেলে আসব।

মা অনেকগুলি রসগোল্লা নিয়ে ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে ছেলেদের হাতে দিলেন। আমরা বিদায় নিলুম। বিকেলে লক্ষ্মীপূজা বলে নারকেলের খাবার সব নিয়ে গেছি। দেখে মা বলছেন, "কি গো, আজ লক্ষ্মীপূজা, তাই বুঝি এ সব।" ক্রমে ক্রমে অনেক স্ত্রী-ভক্ত নানারূপ মিষ্টদ্রব্য নিয়ে মায়ের শ্রীচরণদর্শন করতে এলেন। কোন বাড়ি থেকে মিষ্টির সঙ্গে ডাব চিঁড়ে এই সবও দিয়েছে। দেখে মা বলছেন, "কোন্ দিনে কি দিতে হয়, তা ওরা সব বেশ জানে।" সন্ধ্যারতির পর ঠিক সময়ের মধ্যে ভোগ দেওয়া হলো। শ্রীশ্রীমা নিচে ভক্তদের জন্য চিঁড়ে নারকেল ইত্যাদি প্রসাদ সব পাঠালেন। উপরে মেয়েরাও সকলে পেলেন।

একটি স্ত্রীলোক লক্ষ্মীপূজার তাবৎ উপকরণ নিয়ে এসে মায়ের শ্রীচরণপূজা করলেন। পরে চারিটি পয়সা পদতলে রেখে প্রণাম করলেন। মা আমাদের বললেন, "আহা ! ওর বড় দুঃখ,* মা, বড় গরিব।" মা তাঁকে আশীর্বাদ করলেন।

মাকে জিজ্ঞাসা করলুম, "মঙ্গলবারে সেই মেমটি এসেছিলেন, মা ?"

মা বললেন, "হ্যাঁ, মা, এসেছিল।" মেমটির উপর মায়ের বিশেষ কৃপা। তাঁকে দীক্ষা দিয়েছেন, খুব ভালবাসেন। তাঁর মেয়েটিও সেরে উঠেছে।

রাত হলো দেখে প্রণাম করে বিদায় নিলুম।

১১ চৈত্র, ১৩২৬

শ্রীশ্রীমা দেশে গিয়েছিলেন, প্রায় এক বৎসর পরে ফাল্গুন মাসে বাগবাজারের বাটীতে শুভাগমন করেছেন। শরীর নিতান্ত অসুস্থ। অনেকদিন যাবৎ মাঝে মাঝে জ্বর হচ্ছে—ম্যালেরিয়া। শ্রীচরণদর্শন করতে গিয়ে দেখি মা কাপড় কাচতে গেছেন। কলঘর হতে বেরিয়ে বললেন, "বস, আমি আসছি।" মিনিট পাঁচ পরেই কাপড় ছেড়ে, সর্ব দক্ষিণের ঘরে মায়ের বিছানা করা ছিল, সেখানে এসে দাঁড়ালেন। শ্রীচরণে প্রণাম করতেই মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন; বললেন, "বস, কেমন আছ ?" সেবার জন্য কিছু দিলুম—টাকা হাতে করে নিয়ে রাখলেন। মায়ের শরীর দেখে আমার আর কথা বেরুচ্ছে না—শুধু মুখের পানে চেয়ে আছি, আর ভাবছি—সেই শরীর এমন হয়ে গেছে ! সঙ্গে

* একমাত্র পুত্র বি-এ পাশ করে পাগল হয়েছে এবং তদবধি নিরুদ্দেশ। স্বামীও পুত্রশোকে প্রায় উন্মাদের মতো হয়েছেন।

সুমতিদের ঝি গিয়েছিল, সে প্রণাম করবার উদ্যোগ করতেই মা তাকে বললেন, "তুমি ওখান হতেই কর।" সে দরজার গোড়ায় প্রণাম করে চলে গেল।

মা এত দুর্বল যেন কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে বলে মনে হলো। নিচেই বসে আছি। ইতোমধ্যে রাসবিহারী মহারাজ এসে মাকে বেশি কথা কইতে নিষেধ করে গেলেন। তবু মা মাঝে মাঝে দুচারটি কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। যথাসম্ভব সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে বসে আছি, এই সময় রাধারানী ছেলে কোলে করে এলেন, ছেলেটির অসুখ। আমি ছেলেটির হাতে কিছু দিয়ে দেখলুম। রাধু তো কিছুতেই তা নেবে না। মা বললেন, "সে কি রাধু, দিদি আদর করে দিচ্ছে, আর তুই নিবি নে?" এই বলে নিজেই তুলে রাখলেন। ছেলেটি শুধু মা ও দিদিমার জন্যই নাইবার খাবার অনিয়মে অসুখে ভুগছে বলে কত আক্ষেপ করলেন। রাধু তো ঢের কটূক্তি করে তার প্রতিবাদ করতে লাগল। "ওকে বলে কোন ফল নেই" বলে মা চুপ করে গেলেন। খানিক পরে সরলা, কৃষ্ণময়ীদিদি প্রভৃতি এলেন। মা শুয়েই তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। সরলা-কৃষ্ণময়ীদিদির নাতনিব অসুখে শুশ্রূষা করতে গিয়েছিলেন, সেই সব কথা হতে লাগল।

১৭ চৈত্র, ১৩২৬

পাঁচ-ছদিন পরে গেছি সন্ধ্যারতি হচ্ছিল। শ্রীশ্রীমা খাটের ওপর শুয়েছিলেন। নিকটে গিয়ে দাঁড়াতে উঠে বসলেন। প্রণাম করে আদেশমত বসলুম। ঘরে সরলা, নলিনী ও বৌ আছেন; বৌ ও নলিনী জপ করছেন। কিছু সন্দেশ নিয়ে গিয়েছিলুম। আরতি শেষ হলে মা বিলাস মহারাজকে তা ভোগ দিতে বললেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "পরে দিলে হবে না?" মা বললেন, "না, এখনি দাও।" তিনি আদেশ পালন করলেন। তিনি সিদ্ধেশ্বরী কালীদর্শনে গিয়েছিলেন, প্রসাদ এনেছেন। ঐ কথা বলে দেবীর প্রসাদ একটু মাকে দিয়ে আমাদের সকলকেও কিছু কিছু দিলেন।

মা, সরলা নলিনী প্রভৃতিকে পূর্বোক্ত প্রসাদ নিয়ে জল খেতে বললেন এবং আমাকেও দিতে বললেন। শেষে কে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করে বললেন, "আজ দুদিন জ্বর হয়নি—একটু ভালই আছি, মা। আর, মা, এই রাধুর জন্যই আমার সব গেল—দেহ, ধর্ম, কর্ম, অর্থ, যা কিছু বল। ছেলেটাকে তো মেরেই ফেলবার জো করেছে। এই এখানে এসে সরলার হাতে দিয়ে তবে রক্ষে। আর কাঞ্জিলাল দেখছে। কাঞ্জিলাল বলেইছে, 'এ রাধুর কাছে থাকলে আমি চিকিৎসা করতে পারব না।' ঠাকুরের যে কি ইচ্ছে—ওকে আবার ছেলে দেওয়া কেন—যে নিজের দেহেরই যত্ন জানে না। আবার তো এক নতুন রোগ

করে বসেছে। একি হলো, মা? যা হোকগে, আমি আর ওদের নিয়ে পারি নে। বাড়িতে কি অত্যাচারই করত! আমাকে কি ওরা গ্রাহ্য করত?" এমন সময় খবর এল ডাক্তার কাঞ্জিলাল এসেছেন। আমরা পাশের ঘরে গেলুম। ডাক্তারবাবু মাকে দেখছেন এমন সময় রাধু এসে বললে, "আমার হাতটা দেখ তো। নিচে লোহার থামে লেগে ফুলেছে, ছড়ে গিয়ে জায়গায় জায়গায় রক্ত বেরিয়েছে।" বৌ তার ওপর একটা ময়লা ন্যাকড়া রেড়ির তেলে ভিজিয়ে বেঁধে দিয়েছিল। ডাক্তারবাবু বললেন, শিগ্‌গির খুলে ফেল, সাবান দিয়ে ধুয়ে দাও। অমন ন্যাকড়া দিয়েও বাঁধতে হয়? এখনি বিষিয়ে উঠবে। কলকাতার হাওয়ার সঙ্গে বিষ চলে।" এই বলে তিনি উঠে গেলেন। মা তখন দুঃখ করছেন, "আহা, বাছার আমার কতই লেগেছে! মরে যাই। আহা, ও জনমদুঃখী আমার। শরীরে কি আর আছে! আহা. কাঞ্জিলালকে একটু ওষুধ দিতে বল। ভাল করে দাও গো।"

একে একে ঠাকুরঘর থেকে সকলে উঠে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে বৌ এসে বললেন, "ভাল করে ধুয়ে দেওয়া হয়েছে।"

পরে মা শুয়ে বললেন, "পায়ে হাত বুলিয়ে দাও, মা।" পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললুম, "মা, একটি কথা বলতে চাই—আপনার কোন অসুবিধা হবে না তো?"

মা—না, না, বল না কি?

আমি বললুম।...শুনে মা বললেন, "আহা! সে আনন্দ কি আর রোজ রোজ হয়, মা? সব সত্যি, সব সত্যি, কিছু মিথ্যা নয়, মা—উনিই সব। উনিই প্রকৃতি, উনিই পুরুষ। ওঁ (ঠাকুর) হতেই সব হবে।"

আমি—মা, এক একদিন একমনে মন্ত্র জপ করবার পরে দেখি অনেক সময় কেটে গেছে। আর যেসব করতে বলেছেন সেসব কিছুই করা হয় নি। তখন তাড়াতাড়ি সেই সব সেরে উঠে পড়তে হয়, কারণ সংসারের কাজে ত্রুটি হলে তো আবার চলে না—এতে কি অপরাধ হয়, মা?

মা—না, না, এতে কোন অপরাধ হয় না.

আমি—একজন বললে, কোন কোন দিন গভীর রাত্রে ধ্যানে একটা ধ্বনি শুনতে পাই—বেশির ভাগই শুনি যেন শরীরের ডানদিক হতে উঠছে। কখনো (মন একটু নাবলে পর) বাঁদিক হতেও হচ্ছে শুনি।

মা—(একটু চিন্তা করে) হ্যাঁ, ডানদিক হতেই হয়। বাঁ দিক দেহভাবের। কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হলে এই সব অনুভব হয়—ডানদিক হতে যেটি হয়, এ-ই ঠিক। শেষে মনই গুরু হয়। মন স্থির করে দু-মিনিট ডাকতে পারাও ভাল।

'দেহভাবের' কথাটি যতটুকু বোঝা গেল, তা বিস্তারিত জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হলো না—মায়ের দেহ অসুস্থ।

বৌ এসে মশারি ফেলে দিতে চাইলে। আমি বিদায় নেব ভাবছি। মা অমনি মাথাটি

বালিশ হতে তুলে বললেন, "এই নাও গো, আমি মাথা তুলেছি।" শয়নাবস্থায় না-কি প্রণাম করতে নেই। প্রণাম করতেই বললেন, "এস, মা, আবার এস। একটু বেলাবেলি এস। কাজকর্ম সারা হয়ে ওঠে না বুঝি ? দুর্গা, দুর্গা এস মা, এস।" বৌ মশারি ফেলে দিয়েছে, তবু মশারি হতে মা শ্রীমুখখানি বের করে রেখে বিদায় দিচ্ছেন। ঘরের বাইরে বারাণ্ডায় এসেছি, তখনও শুনছি মা করুণাপ্লুত স্বরে বলছেন, 'দুর্গা, দুর্গা।' কি অসীম ভালবাসা! যতক্ষণ কাছে থাকা যায় সংসারের শোক-তাপ সব ভুল হয়ে যায়।

মায়ের অসুখ সমভাবেই চলেছে। শরীর ক্রমশ খুব দুর্বল হচ্ছে। সেদিন বিকেলবেলা গেছি। মা উঠে কলঘরে যাবেন ; বলছেন, "হাতখানা দাও তো, মা, ধরে উঠি। প্রায়ই জ্বর হয়, শরীর নিতান্ত দুর্বল।" মা কষ্টে উঠলেন। উঠে এসে বলছেন, "এই দেখ গো, দোর-গোড়ায় কে একগাছি লাঠি রেখে গেছে। কদিন থেকেই ভাবছি—একগাছি লাঠি পাই তো ভর দিয়ে একটু যেতে আসতে পারি। তা দেখ ঠাকুর ঠিক এনে জুগিয়ে রেখে দিয়েছেন।" হাতে করে তুলে লাঠিগাছা দেখালেন! হাসতে হাসতে বলছেন, "জিজ্ঞাসা করলুম—কে লাঠি ফেলে গেছে গো ? তা কেউ বলতে পারলে না।"

আর একদিন গিয়ে শুনি, মায়ের এত কষ্ট দেখে মায়ের সাধু ছেলেরা বলছেন, "এবার, মা, ভাল হয়ে উঠলে আর কাউকে দীক্ষা নিতে দেব না। যত লোকের পাপের ভোগ নিয়ে আপনার কষ্টভোগ।" মা শুনে মৃদু মৃদু হাসলেন, বললেন, "কেন গো ? ঠাকুর কি এবার খালি রসগোল্লা খেতেই এসেছেন ?" সকলেই নিরুত্তর। হায় মা, তোমার এ করুণাপূর্ণ কথায় যে কত কথাই না ব্যক্ত করলে, মূঢ় আমরা তার কি বুঝি!

এই কথায় মনে পড়ে—একটি সম্ভ্রান্ত কুলমহিলা কর্মবিপাকে দুষ্প্রবৃত্তিপরায়ণা হয়ে পড়েন ; তবে তাঁর পূর্বজন্মের সুকৃতিও ছিল, তাই একদিন কোন সাধুর দৃষ্টিপথে পড়ে সদুপদেশ পেয়ে নিজের দুষ্কৃতি ও ভ্রম বুঝতে পেরে বিশেষ অনুতপ্তা হন এবং সেই সাধুর উপদেশে একদিন বাগবাজারের বাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের চরণপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। ঠাকুরঘরে প্রবেশ করতে সঙ্কুচিত হয়ে দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে তিনি নিজের সমস্ত পাপের কথা মায়ের কাছে ব্যক্ত করে বললেন, "মা, আমার উপায় কি হবে ? আমি আপনার কাছে এই পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ করবার যোগ্যা নই।" শ্রীশ্রীমা তখন অগ্রসর হয়ে নিজের পবিত্র বাহুদ্বারা মহিলাটির গলদেশ বেষ্টন করে ধরে সস্নেহে বললেন, "এস, মা, ঘরে এস। পাপ কি তা বুঝতে পেরেছ, অনুতপ্ত হয়েছ। এস, আমি তোমাকে মন্ত্র দেব। ঠাকুরের পায়ে সব অর্পণ করে দাও—ভয় কি ?"

মানুষের পাপতাপ রোগশোকের ভার নিজের স্কন্ধে নিয়ে তাঁর মতো দয়াময়ী পতিতোদ্ধারিণীই হাসিমুখে বলতে পারেন, "কেন গো, ঠাকুর কি খালি রসগোল্লা খেতেই এসেছিলেন ?"

১ বৈশাখ, ১৩২৭

সন্ধ্যারতি শেষ হয়ে গেছে। গিয়ে দেখি মায়ের জ্বর। রাসবিহারী মহারাজ মায়ের হাতে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। ব্রহ্মচারী বরদা পদসেবা করছেন। থার্মোমিটার দেওয়া হয়েছে। মা চোখ বুঁজে শুয়ে আছেন। আমি একপাশে দাঁড়িয়ে। মা একবার তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কে ?' রাসবিহারী মহারাজ কি যেন মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন। বৌ কাছে আছে। জ্বর দেখে ১০০·১° বললেন যেন শুনলুম।

সুধীরাদিদি নববর্ষ বলে মেয়েদের ভোজ দিচ্ছেন। তাই সরলাদিদি চারটের সময় স্কুল বোর্ডিং-এ গেছেন। বরদা ব্রহ্মচারীকে মা বললেন সরলাদিদিকে ডেকে আনতে। তিনি এসে রাধুব ছেলেকে খাওয়াবেন। এখনো সময় হয়নি খাওয়াবার ; কিন্তু কাঁদছে বলে রাধু আবার তাকে এখনি খাওয়াতে চাইছে। মা বারণ করছেন বলে রাধারানী রেগে তাঁকে গালাগালি দিতে লাগল—"তুই মর, তোর মুখে আগুন।" শুনে আমাদের মহা বিরক্তি বোধ হতে লাগল—মায়ের এই অসুখ ! আর এই সময় অমন সব গালাগালি দেওয়া ! রাধু কিন্তু আরও কত কি বলে চেঁচাতে লাগল। এইরূপ প্রায়ই হয়, কিন্তু মায়ের অসীম ধৈর্য—চিরদিনই চুপ করে সহ্য করে যান। এবার দীর্ঘকাল অসুখে ভুগে আজ তিনিও বড় ত্যক্ত হয়ে উঠলেন ; বললেন, "হ্যাঁ, টের পাবি, আমি মলে তোর কি দশা হয় ! কত লাথি ঝ্যাঁটা তোর অদৃষ্টে আছে, জানি না। আজ এই বৎসরকার দিনে আমি সত্য বলছি তুই আগে মর, তারপর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যাই।" একথা শুনে রাধু যে-সব কথা বললে তা আর লিখতে ইচ্ছা হয় না। খানিক পরে সরলাদিদি এলেন এবং ছেলেকে খাওয়াবার ব্যবস্থা করতে গেলেন। আমাদের মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল। মা আবেগভরে বললেন, 'বাতাস কর, মা, আমার হাড় জ্বলে গেল ওর জ্বালায়।" একটু বাতাস করতেই আবার পায়ে হাত বুলুতে বললেন। পদসেবা করছি এমন সময় রাসবিহারী মহারাজ এসে মশারি ফেলে দিতে ব্যস্ত হলেন। অগত্যা আমি বলুলম, "তবে আসি, মা।"

মা বললেন, 'এস।' —এই-ই শেষ আদেশ ও শেষ কথা শুনে এলুম। আমাকে কালীঘাট চলে আসতে হলো। তারপর সকলের অসুখ-বিসুখে আর যাবার সুবিধা করেই উঠতে পারিনি। মায়ের দেহ ক্রমেই খারাপ হচ্ছে—খবর পাচ্ছি। শেষে যে দিন গেলুম, দেখে মনে হলো, আমাদের সব শেষ—তথাপি আশা।

সরযূবালা

(২)

১৯১০ খ্রীস্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে শিলং হইতে আমরা কয়েকজনে মিলিয়া জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন-মানসে যাই। মায়ের পূর্বেকার ফটোগ্রাফ আমরা সকলেই দেখিয়াছিলা। এই সময় পথে মায়ের বর্তমান সময়ের মূর্তি একজন স্বপ্নে

দেখিয়া এবং পরে জয়রামবাটী যাইয়া প্রত্যক্ষের সঙ্গে স্বপ্নদৃষ্ট চেহারার খুব মিল হওয়ায় আমাদের অপার আনন্দ ও বিস্ময় হইল। আমাদের একজন পূর্বেই জনৈক সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার দীক্ষার কথায় শ্রীশ্রীমা বলিলেন, "সন্ন্যাসীর মন্ত্র—চৈতন্য হবে।" তিনি ব্যতীত আমরা সকলেই এবারে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট মহামন্ত্র পাইলাম। দীক্ষার পরেই কামারপুকুর যাইবার ইচ্ছা করিয়া আমরা শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি প্রার্থনা জানাইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "তা কি হয়? আমি ছেলেদের আজ ভাল করে খাওয়াব।"

"কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তৎ তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥"

ইত্যাদি গীতায় পড়িয়াছি। অতএব ভব-বন্ধন-মোচনের জন্য শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভের পরে আমাকে আর কি করিতে হইবে জিজ্ঞাসা করিয়া লওয়া উচিত ভাবিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, আমাকে আর কি করতে হবে?"

মা—তোমার কিছুই করতে হবে না।

আমি—আমার কিছুই করতে হবে না?

মা—না।

আমি—কিছু না?

মা বলিলেন, "না, কিছুই না।" বারত্রয় এই একই উত্তরে তখনকার মতো বুঝিলাম যে তিনি কৃপা করিয়াছেন, তিনিই ভব-বন্ধন-মোচনের সব ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

আমি ভানু পিসীর* হাত দেখিয়া বলিয়াছিলাম, "পিসি, তুমি আরও ২৫ বৎসর বাঁচবে।" তিনি গিয়া মাকে বলিয়াছিলেন, "মা, তোমার ছেলে হাত গুণতে জানে।" মা আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বাবা, তুমি হাত দেখতে জান? বল তো আমার পায়ের অসুখ (বাত) সারবে কিনা?" প্রশ্ন শুনিয়া আমি তো অবাক! কারণ, জ্যোতিষের কিছুই জানি না। ভানু পিসীকে আন্দাজে অমনি একটা বলিয়াছিলাম। আমি শুনিয়াছিলাম—ভক্তদের শরীরস্থ পাপ গ্রহণ করিয়াই শ্রীশ্রীমায়ের এই পায়ের অসুখ; তাই বলিলাম, "আমাদের জন্যই তো এই অসুখ, তা আমরা থাকতে সারবে কি?" শুনিবামাত্র নিতান্ত ব্যথিতা হইয়া দাঁড়ানো অবস্থা হইতে হঠাৎ ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, "ও মা, বলে কি গো!" মাকে এরূপ দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া বলিলাম, "মা, তোমার ভাল হতে ইচ্ছা হয়?"

মা—হ্যাঁ।

আমি বলিলাম, "তবে তো ভাল হবেই।" তখন মায়ের মুখে প্রফুল্লতা আসিল। ক্ষণপরেই মা বলিলেন, "দেখছ গা, কি ভক্তি! সবই আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর!"

* জয়রামবাটীর জনৈকা প্রাচীনা স্ত্রী-ভক্ত, ঠাকুরের সমযকার।

দেশে ফিরিবার দিনে মাকে প্রণাম করিতে গেলাম। আমি বলিলাম, "মা, আমি জপের সংখ্যা ঠিক রাখতে পারি না। হাত চলে তো মুখ চলে না, হাত মুখ চলে তো মন স্থির হয় না।"

মা উত্তর করিলেন, "এর পর দেখবে, হাত, জিবও চলবে না—শুধু মনে।"

আসিবার সময় প্রণাম করিয়া বলিলাম, 'মা, যাই।' মা শুনিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, 'আসি' বল, 'যাই' বলতে নেই।"

ভুল সংশোধনপূর্বক মায়ের প্রসন্ন দৃষ্টি লাভ করিয়া রওনা হইলাম।

১৯১২ খ্রীঃ দুর্গাপূজার পরে শ্রীশ্রীমা যখন কাশী গিয়াছিলেন সেইবার মায়ের জন্মতিথির সময় ডিসেম্বর মাসে আমরা কাশীতে যাই। জন্মতিথিব দিনে সকাল বেলা 'লক্ষ্মী-নিবাসে' মাকে প্রণাম করিয়া ফুলের মালা দিয়া পূজা করিলাম। মা এক একটি প্রসাদী মালা সকলকে দিলেন। পরে শ্রীশ্রীমায়ের প্রসাদ (মিষ্টি) গ্রহণ করিয়া 'অদ্বৈত আশ্রমে' আসিলাম। তথায় জন্মতিথিপূজান্তে যখন হোম হইতেছিল এবং সকলে মিলিয়া হোমাগ্নিতে আহুতি দিতেছিলেন, আমরাও তখন আহুতি দিতে উদ্যত হইলে কেহ কেহ আপত্তি করিয়া বলিলেন, "তোমরা খেয়েছ, আহুতি দিওনা।" কিন্তু আমি বাদে অপর সকলে আহুতি দিলেন। শ্রীশ্রীমাও এই সময়ে আশ্রমে আসিয়াছিলেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া মা স্ত্রী ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন, "এরা তো আমার প্রসাদ পেয়েছে ; খেল কখন ? আহুতি দেবে বই কি।" স্ত্রী-ভক্তদের নিকট পরে এই কথা শুনিয়াছিলাম।

* * *

১৯১৩ খ্রীঃ মাঘী অষ্টমীতে শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি পাইয়া পরিবার ও বিধবা ভগ্নীকে মায়ের কৃপালাভের আশায় তাঁহার শ্রীচরণসমীপে লইয়া যাই। ঐদিন মা উভয়কেই দীক্ষা দেন। পরিবার মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মা, আমার শিবপূজা করতে ইচ্ছা হয়। তা করব কি ?" তদুত্তরে মা বলিয়াছিলেন, এখন তুমি ছেলেমানুষ, পারবে না। পরে সময় হলে শিখে নিয়ে শিবপূজা করো। এখন শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা কর।" মা আমার ভগ্নীর প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন, "ওর মন খুব ভাল।" আমরা আম লইয়া গিয়াছিলাম। ঐ সময় আমের মূল্য বেশি ছিল। মা ঐ আম দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "এত পয়সা দিয়ে আম কেন ? আর এই আম এখন খেতেও ভাল নয়—টক।"

* * *

১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের জন্মাষ্টমীর ছুটিতে আমরা কয়েকজন গুরুভ্রাতা মিলিয়া জয়রামবাটী যাই। সঙ্গে একজনের একটি অল্পবয়স্ক পুত্রও ছিল। সন্ধ্যায় কোয়ালপাড়া মঠে পৌঁছিলাম। ছুটির সময় অল্প বলিযা উক্ত মঠে থাকিবার অনুরোধ রক্ষা না করিয়া সেই রাত্রিতেই জয়রামবাটী রওনা হইলাম। পথে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভীষণ অন্ধকার।

পথঘাট কাদা জলে পূর্ণ। এই সব দুর্যোগ অতিক্রম করিতে করিতে জয়রামবাটী পৌঁছিলাম। কিন্তু আমাদের পৌঁছিতে রাত্রি অধিক হইয়া যাওয়ায় সে রাত্রে মাকে আর কোন সংবাদ দেওয়া হয় নাই। পরদিন সকালে যখন মাকে প্রণাম করিতে যাইলাম তখন মা এই সকল শুনিয়া আমাদের ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "বাবা, ঠাকুর রক্ষা করেছেন। অন্ধকারে অত বৃষ্টি-জল-কাদায় কত সাপ মাড়িয়ে এসেছ! এইভাবে চলায় আমার কষ্ট হয়। গোঁভরে চলা ভাল নয়।"

আমরা বলিলাম, "মা, তোমাকে দেখবার জন্য মন খুব ব্যাকুল হয়েছিল, তার উপর ছুটিও অল্প, তাই অত তাড়াতাড়ি।"

মা—তোমাদের তো এরূপ ইচ্ছা হবেই, কিন্তু এতে আমার কষ্ট হয়।

নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব প্রধানা পরিচালিকা শ্রীযুক্তা সুধীরাদিদি তখন জয়রামবাটীতে ছিলেন। এই দিন দুপুরবেলা মা আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "দেখ, সুধীরা তোমাদের সঙ্গে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত যাবে। খুব সাবধানে যেও। ওর গাড়ি তোমাদের দুই গাড়ির মধ্যে রেখো। তোমরা আমার আপনার জন, আমার ছেলে।"

আমি—হ্যাঁ, নেব বৈকি। তুমি যেমন বললে ঠিক তেমনি ভাবে নেব।

রাত্রিতে আহারের সময় মা আমাদের নিকট বসিয়া কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। সেই সময় সেই ছোট ছেলেটির দীক্ষার কথা উত্থাপন করায় মা বলিলেন, "এখন ছেলেমানুষ, হেগে ছোঁচাতে পারে না; (৭।৮ বছর বয়স) এখন কি দীক্ষা হয়? ছেলেটি ভক্ত, বেঁচে থাক। ভক্তদাস হোক।" আমাকে বলিলেন, "ওর ভাত মেখে দাও।"

আমি কথায় কথায় বলিলাম, "মা, আমরা যার তার খাই—এতে কোন হানি হয় কি?"

মা—শ্রাদ্ধের অন্নটা খেতে ঠাকুর বিশেষ নিষেধ করতেন, ওতে ভক্তির হানি হয়! সকল কর্মে যজ্ঞেশ্বর নারায়ণেব অর্চনা হয় বটে, তবু তিনি শ্রাদ্ধান্নটা খেতে নিষেধ করতেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আত্মীয়-স্বজনের শ্রাদ্ধে কি করব?

মা—আত্মীয়-স্বজনের বেলায় না খেয়ে উপায় কি?

পরদিন বৈকালে প্রায় ২টার সময় মাকে দর্শন করিতে গিয়াছি। মা আলুথালুভাবে মাটিতেই বসিয়া আছেন। ঐ বৎসরেই উঁহার কিছুদিন পূর্বে দামোদরের ভীষণ বন্যা হইয়াছিল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, বন্যায় লোকের কি খুব কষ্ট হচ্ছে?" খবরের কাগজে ও লোকমুখে যাহা জানিয়াছিলাম তাহাই বলিতে লাগিলাম। মা নিবিষ্টচিত্তে শুনিয়া করুণকণ্ঠে বলিলেন, "বাবা, জগতের হিত কর।" মায়ের এই কথা শুনিয়া মনে মনে তাঁহার এই বিরাট বিগ্রহের সেবাধিকার প্রার্থনা করিয়া বাহির বাটীতে আসিব বলিয়া প্রণাম করিতেই শুনি—মা আপন মনে বলিতেছেন, "কেবল টাকা, টাকা, টাকা।" মায়ের মুখে 'টাকা, টাকা' শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। মা বোধ হয় আমার ভিতর ভাবের আতিশয্য লক্ষ্য

করিয়াই এরূপ বলিতেছেন। অমনি মা আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "না বাবা, টাকাও দরকার। এই দেখ না কালী (মামা) কেবল টাকা টাকা করে।"

* * *

১৯১৫ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে (২৪শে) সপরিবারে মাকে দর্শন করিতে 'উদ্বোধনে' গিয়াছি। পরিবারের হাতে কিছু মিষ্টি ছিল। শ্রীযুক্তা গোলাপ-মা উহা অন্যদিন ঠাকুরকে দিবেন ভাবিয়া উঠাইয়া রাখিতেছিলেন। মা নিষেধ করিয়া বলিলেন, "না গো, না, বৌমা যে মিষ্টি নিয়ে এসেছে তা এবেলাই ঠাকুরকে দাও, এতে বৌমার কল্যাণ হবে।" পরদিন প্রত্যূষে পরিবার মায়ের নিকট গিয়াছিল এবং সন্ধ্যার সময় বাসায় ফিরিয়া আমাকে বলিল—

"আজ মা আমাকে কত কৃপা করেছেন! জীবনে চিরকাল তা আনন্দ দেবে। বেলা নটা-দশটার সময় মা তিন পয়সার মুড়ি ও কড়াইভাজা আনিয়ে আঁচলে নিয়ে মাটিতে বসে দু-চারিটি করে নিজে মুখে দিচ্ছিলেন এবং এক মুঠো, এক মুঠো করে আমাকে, দিচ্ছিলেন—বৌমা, খাও। জীবনে অনেক ভাল জিনিস খেয়েছি, কিন্তু আজকের ঐ মুড়ি খাওয়ার আনন্দের তুলনা মেলে না। দুপুরে আমাকে পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে বললেন এবং তাঁর বিছানাপত্র ঝেড়ে রোদে দিতে বললেন। এই সব ছোটখাট সেবা গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ করেছেন। আজ আমার সঙ্গে এই কথাবার্তাও হয়েছে—আমি বলেছিলাম, 'মা, ঠাকুরকে অন্নভোগ দেব ?"

মা—হ্যাঁ, ঠাকুরকে অন্নভোগ দেবে। তিনি সুক্ত খেতে ভালবাসেন।

আমি—ঠাকুরকে মাছভোগ দেব কি ?

মা—হ্যাঁ, তাঁকে মাছ দেবে। ঠাকুরের মন্ত্র উচ্চারণ করে তাঁকে নিবেদন করবে।

মা জিজ্ঞাসা করলেন, "ছেলে মাছ খায় কি ?"

আমি—হ্যাঁ, খান।

মা—খাবে বই কি, খুব খাবে।

কথায় কথায় আমি বলেছিলাম, "মা,এই যুদ্ধে দেশব্যাপী হাহাকার, লোকের কত কষ্ট, অন্নবস্ত্র দুর্মূল্য।"

মা—এতেও তো লোকের চৈতন্য হয় না।

আমি—মা, এই যুদ্ধে কি আমাদের ভাল হবে ?

মা—ঠাকুর যখনই আসেন, তখনই এরূপ হয়ে থাকে। আরও কত কি হবে।...

ঐ দিন বৈকালে আমি যখন মাকে প্রণাম করিতে গিয়াছিলাম, মা সেই জন্মাষ্টমীর ছুটিতে রাত্রে অন্ধকারে বৃষ্টিতে জয়রামবাটী যাওয়ার কথা উল্লেখ করিয়া আবার তিরস্কার করিলেন, "গোঁভরে চলা ভাল নয়।"

আমি—না, আর যাব না।

মা বোধ হয় এ কথায় বুঝিলেন আমি আর জয়রামবাটী যাইব না। অমনি মা বলিয়া উঠিলেন, "যাবে বই কি। বাবা, তোমাদের পায়ে কাঁটা ফুটলে আমার বুকে শেল বাজে।" পরিবারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বউ মা, তুমি ওকে দেখো, এইভাবে যেন না চলে।"

১৯১৭ খ্রীঃ দুর্গাপূজার ছুটিতে 'উদ্বোধন'-এর বাটীতে আমি ও আর একটি গুরুভ্রাতা (যতীন) শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে যাই। আমরা মায়ের জন্য দুইখানি বস্ত্র লইয়া গিয়াছিলাম। বস্ত্র দুইখানি মায়ের শ্রীচরণপ্রান্তে রাখিয়া প্রণাম করিলাম। আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "বাবা, তোমাদের অবস্থা খারাপ, তোমাদের কাপড় দেওয়া কেন ?" উভয়ে কিছু মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া বলিয়াছিলাম, "মা, তোমার ধনী ছেলেরা তোমাকে দামী কাপড় দেয়। তোমার গরিব ছেলেরা এই মোটা কাপড় নিয়ে এসেছে। তুমি গ্রহণ করে তাদের মনোবাসনা পূর্ণ কর।" শুনিয়াই সস্নেহে মা বলিলেন, "বাবা, এই আমার গরদ, ক্ষীরোদ, নীরদ।" ইহা বলিয়া বস্ত্র দুইখানি সযত্নে হাত পাতিয়া লইলেন। মা দাঁতের বেদনায় তখন খুব কষ্ট পাইতেছিলেন।সেই কথা উল্লেখ করিয়া আমাদের বলিলেন, "বাবা, ঠাকুর বলতেন, 'যাঁর দাঁতের বেদনা হয় নাই, সে দাঁতের যন্ত্রণা বুঝতে পারে না'।"

* * *

১৯১৭ খ্রীঃ রাঁচিতে ঠাকুরের উৎসবের পূর্বে মাকে পত্র লিখিয়া নিবেদন করিয়াছিলাম যাহাতে উৎসব সুসম্পন্ন হয়। মা তদুত্তরে জানাইয়াছিলেন, "তোমাদের পত্র পাইয়া কত আনন্দিত হইয়াছি তাহা চিঠিতে লেখা অসম্ভব। তোমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তান। তোমাদের এই সকল সৎকার্যের সহায় তিনি নিজে। তার জন্য তোমাদের ভয়-ভাবনা কি ?"

১৯১৯ খ্রীঃ জ্যৈষ্ঠ মাসে জয়রামবাটীতে আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মা, ঠাকুরের নিকট মনে মনে প্রার্থনা করলে তিনি শুনেন কি ? আর তোমার নিকট না বলে ঠাকুরের নিকট বললে হয় কি ?"

তদুত্তরে মা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর যদি সত্য হন, শুনেনেই শুনেন।"

এবারে আমি শ্রীশ্রীমার শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া জয়রামবাটী হইতে রওনা হইবার সময় তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "যদি দিনের বেলা বলে গরুর গাড়ি না পাই, তবে কোতলপুর হতে হেঁটেই বিষ্ণুপুর যাব, মা।"

মা বললেন, "বাবা, শরীরটাকে আর কষ্ট দেওয়া কেন ? গাড়ি পাবে।" মায়ের কথা ঠিক হইল। গাড়ি পাইলাম। ইহাই দেহাশ্রিতা মাকে আমার শেষ দর্শন।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র ঘটক

(৩)

১৯১৬ খ্রীঃ মঠে দুর্গাপূজা। শ্রীশ্রীমা সপ্তমী পূজার দিনে দুপুরে মঠে আসিয়া উত্তর পাশের বাগানবাড়িতে আছেন। অষ্টমীর দিন সকালবেলা আটটা-নয়টার সময়ে মঠ ও প্রতিমাদর্শন করিতে আসিয়াছেন। রান্নাঘরের পাশের 'হলে' ভক্তেরা ও সাধু-ব্রহ্মচারিগণ অনেক কুটনো কুটিতেছিলেন। মা দেখিয়া বলিতেছেন, "ছেলেরা তো বেশ কুটনো কুটে।" জগদানন্দজী বলিলেন "ব্রহ্মময়ীর প্রসন্নতালাভই হলো উদ্দেশ্য, তা সাধন-ভজন করেই হোক আর কুটনো কুটেই হোক।"

এই দিনে বহুলোক শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীমাকে বারবার গঙ্গাজলে পা ধুইতে দেখিয়া যোগীন-মা বলিয়াছিলেন,"মা, ও কি হচ্ছে? সর্দি করে বসবে যে।"

মা বলিলেন, "যোগেন, কি বলব, এক একজন প্রণাম করে, যেন গা ঠাণ্ডা হয়; আবার এক একজন প্রণাম করে, যেন গায়ে আগুন ঢেলে দেয়। গঙ্গাজলে না ধুলে বাঁচিনে।"

পরে একদিন কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মা, এক একজন প্রণাম করলে তোমার খুব কষ্ট হয়, একবার পূজার সময় তোমার এই কথা শুনেছিলাম।"

মা বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা, এক একজন প্রণাম করলে যেন বোলতার হুল ফুটিয়ে দেয়। কাউকে কিছু বলিনে।" এই কথা বলিয়াই সস্নেহ দৃষ্টিতে বলিলেন, "তা বাবা, তোমাদের কিছু বলছি না।"

আমি বলিলাম, "মা, ভয় হয় তোমার মতো মা পেয়েও কিছু যেন হলো না মনে হয়।"

মা—ভয় কি, বাবা সর্বদার তরে জানবে যে ঠাকুর তোমাদের পেছনে রয়েছেন। আমি রয়েছি—আমি মা থাকতে ভয় কি? ঠাকুর যে বলে গেছেন, 'যারা তোমার কাছে আসবে, আমি শেষকালে এসে তাদের হাতে ধরে নিয়ে যাব।' যে যা খুশি কর না কেন, যে-ভাবে খুশি চল না কেন, ঠাকুরকে শেষকালে আসতেই হবে তোমাদের নিতে। ঈশ্বর হাত পা (ইন্দ্রিয়াদি) দিয়েছেন, তারা তো ছুঁড়বেই, তারা তাদের খেলা খেলবেই।

একবার ঠাকুরকে ভোগ দিতে গিয়ে দেখি—ছবি হইতে একটা আলোর স্রোত নৈবেদ্যের উপর পড়িয়াছে। তাই মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মা, যা দেখি সে কি মাথার ভুল, না সত্যি? যদি ভুল হয় তবে যাতে মাথা ঠাণ্ডা হয় তাই করে দাও।"

মা একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "না বাবা, ও সব ঠিক।"

আমি—তুমি কি জান, কি দেখি?

মা—হ্যাঁ।

আমি—ঠাকুরকে ও তোমাকে যে ভোগ দিই তা কি ঠাকুর পান? তুমি কি তা পাও?

মা—হ্যাঁ।

আমি—বুঝব কি করে?

মা—কেন, গীতায় পড় নাই—ফল, পুষ্প, জল ভগবানকে ভক্তি করে যা দেওয়া যায়, তা তিনি পান।

এ উত্তরে বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "তবে কি তুমি ভগবান?" এই কথায় মা হাসিয়া উঠিলেন। আমরাও হাসিতে লাগিলাম।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার গাঙ্গুলী

(৪)

২৭ চৈত্র, ১৩২৩, জয়রামবাটীতে সন্ধ্যার পর মায়ের সঙ্গে কথা হইতেছিল।

আমি —মা, সবাই বলে কল্পতরুর কাছে গেলে কিছু চাইতে হয়। কিন্তু ছেলেরা আবার মায়ের কাছে কি চাইবে? যার যা দরকার মা তাকে তাই দেন। ঠাকুর যেমন বলতেন, 'যার যা পেটে সয়, মা তাকে তাই দেন।' তা কোন্‌টা ঠিক?

মা—মানুষের আর কতটুকু বুদ্ধি? কি চাইতে কি চাইবে। শেষে কি শিব গড়তে বানর হয়ে যাবে। তাঁর শরণাগত হয়ে থাকা ভাল। তিনি যখন যেমন দরকার, তেমন দিবেন। তবে ভক্তি ও নির্বাসনা কামনা করতে হয়—এ কামনা কামনার মধ্যে নয়।

আমি—ঠাকুর বলেছেন, 'এখানে যারা আসবে তাদের শেষ জন্ম।' আবার স্বামীজী বলেছেন, 'সন্ন্যাস না হলে কারো মুক্তি নেই।' গৃহীদের তবে উপায়?

মা—হ্যাঁ, ঠাকুর যা বলেছেন তাও ঠিক, আবার স্বামীজী যা বলেছেন তাও ঠিক। গৃহীদের বহিঃসন্ন্যাসের দরকার নেই। তাদের অন্তর-সন্ন্যাস আপনা হতে হবে। তবে বহিঃসন্ন্যাস আবার কারো কারো দরকার। তোমাদের আর ভয় কি? তাঁর শরণাগত হয়ে থাকবে। আর সর্বদা জানবে যে, ঠাকুর তোমাদের পেছনে আছেন।

* * *

১৩২১, চৈত্র—'উদ্বোধন' বাটীতে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। একবার আমার গর্ভধারিণী মাকে তীর্থদর্শনে কাশী লইয়া যাইতে ইচ্ছা করায় তিনি অকাল বলিয়া অমত করেন। আমি এই কথা শ্রীশ্রীমাকে নিবেদন করিলাম। তিনি তদুত্তরে বলিলেন, "বাবা, অকালে তীর্থদর্শন করলে পূর্ব ধর্ম নষ্ট হয় বলে, কিন্তু আবার পুণ্যকার্য শীঘ্র শীঘ্র সেরে ফেলা ভাল।"

মায়ের এই দ্ব্যর্থক বাক্য বুঝিতে না পারিয়া পুনরায় সংশয় জ্ঞাপন করিলাম এবং এইরূপ স্থলে কি করা কর্তব্য জিজ্ঞাসা করিলাম।

মা—সংসারীদের মতে একটা কথা আছে যে অকালে তীর্থদর্শন করে না। দেখ, কালাকালের অপেক্ষা করে পুণ্যকার্য স্থগিত রাখা যায়, কিন্তু কালের (মৃত্যুর) নিকট

কালাকালের বিচার নেই। মৃত্যুর যখন অবধারিত কাল নেই, তখন সুযোগ উপস্থিত হলেই কালাকালের অপেক্ষা না করে পুণ্যকার্য করে ফেলা ভাল।

* * *

অপর এক সময়ে আমার একটি বন্ধুর হাসপাতালে নিতান্ত নিঃসহায় অবস্থায় অকালে মৃত্যু হয়। তাহার বিমল স্বভাব ও ঈশ্বরানুরক্তির কথা মায়ের নিকট চিঠিতে জানাইয়া তাহার মুক্তিভিক্ষা করিয়াছিলাম। শ্রীশ্রীমা তদুত্তরে জানাইয়াছিলেন, "আমি আশীর্বাদ করি যে, তোমার বন্ধুটির মুক্তিলাভ হউক। ঠাকুর তাহাকে সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত করুন।"

শ্রী—

(৫)

১৯১০ খ্রীস্টাব্দের কার্তিক মাসে কালীপূজার পূর্বে শিলং-এর চন্দ্রকান্ত ঘোষের অনুরোধে ও উৎসাহে আমি শিলং হইতে শ্রীশ্রীমাকে প্রথম দর্শন করিতে আসি। কলিকাতা আসিয়া জনৈক বন্ধুর সহিত (ইনি পূর্বেই শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন) 'উদ্বোধনে'-র বাটীতে যাই। শ্রীশ্রীমাকে দর্শনের পর উক্ত বন্ধুটি হঠাৎ আমার দীক্ষার কথা মায়ের নিকট উত্থাপন করেন। উত্তরে মা বলিলেন, "বেশ তো, কালকে হবে।" হঠাৎ এ উত্তরে আমি প্রথমে চমকিয়া উঠিলাম; কারণ আমি দীক্ষার কথা বলিতে তাঁহাকে বলি নাই; এবং আমার মনেও দীক্ষার কথা উঠে নাই। যাহা হউক পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে পুনরায় তথায় যাইলাম। শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিয়া শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিতে যাইতেছি, তখন শ্রীশ্রীমা বলিলেন, "এখন নয়, আমি বলে দেব কখন দিতে হবে।" দীক্ষা হইয়া গেলে পর পা দুটি আমার সম্মুখে স্থাপন করিয়া তিনি বলিলেন, "এখন দিতে পার।" পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আমি অকপট ভাবে বলিলাম, "আমি যে ফুল দিয়ে পূজো করলুম এ আমার ভক্তি-বিশ্বাস থেকে নয়, চন্দ্রকান্তবাবু আমায় শিখিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি যেরূপ বলে দিয়েছেন তাই মাত্র করে গেলুম। চন্দ্রকান্তবাবুই আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন।"

শ্রীশ্রীমা সহাস্যে বলিলেন, "চন্দ্রকান্ত তো তোমায় ভাল পথই দেখিয়েছে, বাবা" এই বলিয়া সস্নেহে আমার মাথায় হাত দিলেন।

* * *

ইহার পর একবার শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে গিয়া কথাবার্তা বলিতেছিলাম, কথায় কথায় দুঃখ করিয়া মাকে বলিয়াছিলাম, "মা, সাংসারিক নানা ঝঞ্ঝাট, তার উপর চাকরি আছে, কাজেই জপ-তপ আর হয়ে উঠে না। মনের উন্নতিও হচ্ছে না।" মা অভয় দিয়া অমনি বলিলেন, "এখন যাই হোক, শেষটায় ঠাকুরকে আসতেই হবে (তোমাদের নিতে)। তিনি নিজে বলে গেছেন। তাঁর মুখের কথা কি ব্যর্থ হতে পারে? যা প্রাণে আসে করে যাও।"

আমি—মা, যারা তোমার কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছে তাদের না-কি আর আসতে হবে না?

মা—না, তাদের আর আসতে হবে না। তোমরা সর্বদা জেনো—তোমাদের পেছনে একজন রয়েছেন।

আমি—মা, তোমায় পেয়েছি, এই আমাদের ভরসা।

মা—তোমার চিন্তা কি, বাবা, তোমাদের কথা আমার খুব মনে হয়।

* * *

আর একবার কোয়ালপাড়া মঠে শ্রীশ্রীমায়ের সহিত কথাপ্রসঙ্গে মাকে বলিয়াছিলাম, "মা, সাধন-ভজন কিছু হয়ে উঠছে না।"

মা অভয় ও আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তোমাকে কিছু করতে হবে না, যা করতে হয় আমি করব।"

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "আমার কিছু করতে হবে না?"

মা—না।

আমি—তবে এখন হতে আমার ভবিষ্যৎ উন্নতি আমার নিজ কৃতকর্মের উপর নির্ভর করে না?

মা—না, তুমি কি করবে? যা করতে হয় আমি করব।

শ্রীশ্রীমায়েব এই অহেতুক কৃপায় আমি নির্বাক হইলাম। পুনরায় কথাপ্রসঙ্গে মায়ের পায়ের ব্যথার কথা উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "শুনেছি কেউ কেউ পা ছুঁলে তোমার কষ্ট হয়, মা?"

মা—হ্যাঁ বাবা, কেউ কেউ ছুঁলে শরীরটি যেন শীতল হয়ে যায়। আবার এক একজন আছে ছুঁলে মনে হয় যেন বোলতায় কামড়ে দিলে। কাউকে কিছু বলিনে।

মনে মনে ভাবছি—তবে আমরাও কি ঐ বোলতা শ্রেণীর? অন্তর্যামিনী বলিয়া উঠিলেন, বাবা, তোমরা নও।"

* * *

ইহার মাস খানেক পরে পুনরায় রথযাত্রার ছুটিতে কোয়ালপাড়া মঠে যাই। রথযাত্রার দিন শ্রীশ্রীমায়ের সহিত নিম্নলিখিত কথা হইয়াছিল ঃ

আমি—মা, তোমার কৃপা পেয়েছি এই আমার বল ভরসা।

মা—তোমার চিন্তা কি, বাবা, তুমি আমার অন্তরে রয়েছ। কোন অভাব, প্রয়োজনে মনে চিন্তা এলে অমনি তোমাদের কথা মনে ওঠে—ইন্দু টিন্দু রয়েছে, ভাবনা কি? তোমার কিছু করতে হবে না। তোমার জন্যে আমি করছি।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার যেখানে যত সন্তান আছে সকলের জন্যই

তোমার করতে হয় ?"

মা—সকলের জন্যেই আমায় করতে হয়।

আমি—তোমার এত ছেলে রয়েছে, সকলকে তোমার মনে পড়ে ?

মা—না, সকলকে কিছু মনে আসে না।

আমি—তবে যে বললে, তুমি সকলের জন্যেই করে থাক ?

মা—যাব যার নাম মনে আসে, তাদের জন্যে জপ করি। আর যাদের নাম মনে না আসে, তাদের জন্যে ঠাকুরকে এই বলে প্রার্থনা করি—"ঠাকুর, আমার অনেক ছেলে অনেক জায়গায় রয়েছে, যাদেব নাম আমার মনে হচ্ছে না, তুমি তাদের দেখো, তাদের যাতে কল্যাণ হয় তাই করো।"

শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত

(৬)

শ্রীশ্রীমা যখন কোঠারে ছিলেন সেই সময় আমার মেজদাদা আমাদের গ্রামবাসী তাঁহার জনৈক বন্ধুকে পুরীধাম 'শশিনিকেতন' হইতে পত্রে জানাইলেন—"শ্রীশ্রীমা এখন কোঠারে আছেন, তোমরা তাঁহার দর্শনে যাইতে পার।" ইহার পূর্বে একটা মোটামুটি ধারণা ছাড়া শ্রীশ্রীমা কিংবা শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতাম না বা কোন পুস্তকেও পড়ি নাই। কিন্তু এই সংবাদ পাইয়া অবধি আমার মন তাঁহার দর্শনলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। দু-চার দিন এইরূপ ব্যাকুল হওয়ার পর তাঁহাকে দর্শন করিতে কোঠারে গেলাম। তথায় বেলা প্রায় বারটার পর পৌঁছিলাম। কিন্তু সেখানে পৌঁছিয়া আর আমার এতটা ব্যাকুলতা ছিল না। এই সময় ভক্তদের প্রসাদ পাওয়ার ডাক পড়ায় আমিও সেই সঙ্গে গেলাম। প্রসাদ পাইয়া পূজনীয় কৃষ্ণলাল মহারাজ, কেদার বাবা ও আমরা বৈঠকখানায় বসিয়া আছি, এমন সময় রামবাবু (বলরামবাবুর পুত্র) আসিয়া কৃষ্ণলাল মহারাজকে বলিলেন, "যে ছেলেটি কটক থেকে এসেছে, মা তাকে ডাকছেন, সে এখন প্রণাম করে আসবে।" কৃষ্ণলাল মহারাজ বলিলেন, "তাকে আমি বলেছি, বিকেলে মাকে দর্শন করতে যাবে।"

রামবাবু বলিলেন, "না, মা অপেক্ষা করছেন, দর্শন করে আসলে তিনি খেতে যাবেন।" আমি রামবাবুর সঙ্গে গিয়া মাকে প্রণাম করিয়া আসিলাম, কোন কথাবার্তা হইল না। পরদিন আমি বাড়ি চলিয়া আসি।

বাড়ি আসিয়া আবার মন ব্যাকুল হওয়ায় পুনরায় কোঠারে যাই এবং সেখানে দুই-চারি দিন থাকার পর একদিন সকালে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনে গিয়া মাকে বলিলাম, "মা, কাল সকালে আমি বাড়ি যাব।"

মা বলিলেন, "আ , কাল থেকো, পরশু যেয়ো।" এই কথার পর আমি বাহিরে চলিয়া

আসি। কিছুক্ষণ পর জনৈক সন্ন্যাসী মহারাজ আসিয়া আমাকে বলিলেন, "তোমার উপর মায়ের দয়া হয়েছে, কাল সকালবেলা স্নান করে প্রস্তুত থাকবে।" আমি ভাবিতেছি—'দয়া' কি? কিন্তু কিছু বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া থাকিলাম। পরদিন সকালে স্নান করিয়া একা বসিয়া আছি এমন সময় রাধুদিদি আসিয়া বলিলেন, "বৈকুণ্ঠবাবু কে? তাঁকে মা ডাকছেন।"

আমি বলিলাম, "আমারই নাম বৈকুণ্ঠ। আমি মায়ের নিকট যাব?"

রাধুদিদির সম্মতি পাইয়া তাঁহার সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের সাক্ষাতে উপস্থিত হইলাম। মা দেখিয়া বলিলেন, "এস, এ ঘরের ভিতরে এস।" পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি মন্ত্র নেবে?"

আমি বলিলাম, "আপনার যদি ইচ্ছা হয়, দিন। আমি কিছু জানি না।"

মা বলিলেন, "বেশ, বস এখানে।"

মা—তুমি কোন্ দেবতার মন্ত্র নেবে?

আমি বলিলাম,"আমি কিছুই জানি না।"

তখন মা বলিলেন, "বেশ, তোমার এই মন্ত্রই ভাল।" মায়ের নিকট আমি সেই দিনই দীক্ষিত হইলাম—১৩১৭ সালের মাঘ মাসের সপ্তমী তিথিতে। এইখানেই একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মা, যোগশিক্ষার জন্য অন্য গুরু করতে পারা যায় কি-না?" উত্তরে মা বলিয়াছিলেন, "অন্যান্য বিষয় শিক্ষার জন্য তুমি গুরু করতে পার, কিন্তু দীক্ষাগুরু আর করতে নেই।"

যেদিন কোঠার হইতে রওনা হইব তাহার পূর্ব রাত্রিতে প্রায় বারটার সময় রামবাবু কিছু মিষ্টি হাতে লইয়া আমাকে ঘুম হইতে জাগাইয়া বলিলেন, "বৈকুণ্ঠ, মা এই মিষ্টি দিয়েছেন, তুমি সঙ্গে নিয়ে যেয়ো। রাস্তার কোন বাজারে-খাবার কিনে খেতে মা নিষেধ করলেন।"

* * *

আর একবার আমি একাকী শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনে গিয়াছিলাম। মা তখন কয়েক দিনের জন্য জয়রামবাটী হইতে কামারপুকুরে আসিয়াছিলেন। আমারও কামারপুকুরে এই প্রথম যাওয়া। শ্রীযুক্ত রামলালদাদা ও লক্ষ্মীদিদি তখন কামারপুকুরে। প্রথম দিন রামলালদাদা ও আমি বারাণ্ডায় খাইতে বসিয়াছি, মা মাঝে মাঝে আমাদিগকে পরিবেশন করিতেছিলেন এবং আমাকে বলিতেছিলেন, "বৈকুণ্ঠ, সমস্ত খেয়ো, পাতে কিছু ফেলো না।" এই কথা বলিতে বলিতে আরো জিনিস আমার পাতে দিতে লাগিলেন। রামলালদাদাও "আরো খাও, লজ্জা করো না"—এইরূপ বলিতেছিলেন। তখন আমি এত খেয়েছি যে পেটে আর ধরে না, অথচ সঙ্কোচবশত কিছু বলিতেও পারিতেছি না। রামলালদাদার এই কথা শুনিয়া মা বলিলেন, "থাক, ও ক্ষ্যাপা ছেলে, যা খেয়েছে—খেয়েছে, আর কিছু বোলো না" এবং

আমাকে বলিলেন, "বৈকুণ্ঠ, এখন পাতা গ্লাস বাটি উঠিয়ে নিয়ে যাও, গুরুগৃহে * ওসব রেখে যেতে নেই।"

দ্বিতীয় দিন যখন প্রণাম করিতে যাই তখন মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বাড়ি যাচ্ছ কবে?"

আমি বলিলাম, "মা, আমি বেলুড় মঠ দেখি নাই, মঠ হয়ে পরে বাড়ি যাব।"

তাহাতে মা বলিলেন, "এখন মঠে গিয়ে কাজ নেই, তুমি আজই বাড়ি যাও।"

আমি বলিলাম, "মা, এতদূর এসেছি। একবার মঠে না গিয়ে এখন বাড়ি ফিরছি না।"

মা বলিলেন, "না, তুমি বাড়ি যাও, গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করতে নেই।" এই কথার পর আমি আর কোন আপত্তি করিলাম না, কিন্তু মনে মনে ভাবিয়া রাখিলাম, এখান হইতে সরিতে পারিলেই মঠে যাইব, তখন আর মা জানিতে পারিবেন না। সেই সময় এলাহাবাদ হইতে একটি স্ত্রী-ভক্ত ও তাঁহার সঙ্গে একটি পুরুষ-ভক্ত আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে মা সেইদিনই দীক্ষা দিলেন। মা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি এদের সঙ্গে যাও।" কিন্তু আমি সঙ্গে যাইলে তাঁহাদের অসুবিধা হইবে বলায় আমি আর গেলাম না। তাঁহাদিগকে বিদায় দিবার জন্য মা সদর-দরজা পর্যন্ত আসিয়াছিলেন। ইতঃপূর্বে আমি আমার টাকার ব্যাগটি সদরের কুলুঙ্গিতে রাখিয়াছিলাম। উক্ত কুলুঙ্গিতে মায়ের দৃষ্টি পড়ায় তিনি উহা ঘরে রাখিয়াছিলেন। তারপর লক্ষ্মীদিদিকে দিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, "বৈকুণ্ঠ তার টাকার ব্যাগ কি করলে?" এই কথা শুনিয়া আমি সেখানে খুঁজিতে যাইয়া উহা পাইলাম না দেখিয়া লক্ষ্মীদিদি গিয়া মাকে এই সংবাদ জানাইলেন। মা আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন "এত অসাবধান হলে কি সংসার চলে? এইটুকু সাবধানতা যার নেই, সে আবার কিসের সংসার করবে? তোমার টাকার ব্যাগ আমার কাছে আছে। তুমি তাদের সঙ্গে গেলে না কেন?" আমি কারণ বলায় মা উঁহাদের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। আমি মাকে বলিলাম, "আপনি সেজন্য এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, আমি একটা লোক ঠিক করে কাল যাব।" মা এই কথা শুনিয়া নিজের ঘরে গেলেন।

সেইদিন দুপুরবেলা আমাকে ভিতরে ডাকাইয়া বলিলেন, "এ চিঠিগুলি খুলে পড়, দেখি কি সংবাদ আছে।" আমি চিঠিগুলি পড়িলাম। তন্মধ্যে একখানির কথা বিশেষ মনে আছে—বাগবাজার মঠ হইতে আসিয়াছে এই মর্মে লেখা ছিল যে, পূজনীয় শশী মহারাজ শ্রীশ্রীমাকে একবার দেখিতে চান এবং মা তাঁহাকে যে চিকিৎসায় থাকিতে বলিবেন, তিনি সেই চিকিৎসাতেই থাকিতে চান। মা চিঠি শুনিয়া বলিলেন, "আমি আর কি চিকিৎসার কথা বলব? শরৎ, রাখাল, বাবুরাম আছে, তারা পরামর্শ করে যেটি ভাল মনে করে তাই

---

* এখানে গুরুগৃহ বলিতে শ্রীশ্রীমা ঠাকুরকেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন। কারণ তিনি নিজে এইসব ভক্তদের গুরু হইলেও জয়রামবাটী—অবস্থানকালে কখনও তাহাদিগকে উচ্ছিষ্ট ফেলিতে দিতেন না। ঝি চাকর দ্বারা পরিষ্কার করাইতেন। অনেক সময় নিজেই করিতেন। গুরু হইলেও তিনি যে মা, তবে উচ্ছিষ্ট পাতা হাওয়ায় উড়িয়ে অসুবিধা করবে বলে কখনো কখনো ভক্তেরা শুধু পাতাটি তুলে নিয়ে যেতেন।

করুক। আমি সেখানে গেলে তো রোগীকে সরাতে হবে। সেটা ভাল হবে? এমন রোগীকে কি সরাতে আছে? আমি যাব না। যদি শশীর কিছু ভালমন্দ হয়, তবে কি আমি সেখানে থাকতে পারব? তুমি বুঝিয়ে লিখে দাও তো—আমি এজন্য যাব না।"

পরদিন প্রসাদ খাওয়ার পর বাড়ি রওনা হইবার জন্য বিদায় লইতে বাড়ির মধ্যে গিয়া দেখি—মা তাঁহার ঘরের বারাণ্ডায় পান সাজিতেছেন। আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রঘুবীরকে প্রণাম করেছ?"

আমি বলিলাম, 'না মা।' তাহাতে মা বলিলেন, "এখানে এলে কিছু দিতে হয়, তুমি রঘুবীরকে প্রণাম করে কিছু প্রণামী দিও। তোমার কাছে যদি টাকা-পয়সা না থাকে, আমার কাছ থেকে নিও।"

আমি বলিলাম, "না, আমার কাছে টাকা আছে।" এই বলিয়া রঘুবীরকে প্রণাম করিয়া আসিলাম। বিদায় লইবার জন্য মাকে প্রণাম করিয়া উঠিতেছি, এমন সময় মা সহসা বলিয়া উঠিলেন, "বৈকুণ্ঠ, আমায় ডাকিস্।" এই কথার পরমুহূর্তেই আবার বলিলেন, "ঠাকুরকে ডেকো, ঠাকুরকে ডাকলেই সব হবে।" এই সময় লক্ষ্মীদিদি সেখানে ছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "না, মা, একি কথা? এ-তো বড় অন্যায়! ছেলেদের এমন করে ভুলালে তারা কি করবে!"

মা বলিলেন, "কই, আমি কি করলুম?"

লক্ষ্মীদিদি—মা, তুমি এই মুহূর্তে বৈকুণ্ঠকে বললে, 'আমায় ডাকিস্', আবার বলছ, 'ঠাকুরকে ডেকো।'

মা বলিলেন, "ঠাকুরকে ডাকলেই তো সব হলো।"

তখন লক্ষ্মীদিদি মাকে বলিলেন, "মা, এবকম ভাবে ভুলানো তোমার অন্যায়।" আর আমাকে বিশেষ করিয়া বলিলেন, "দেখ, বৈকুণ্ঠ, আমি আজ এই নতুন শুনলুম যে, মা বলছেন—'আমায় ডেকো'। তুমি একথা যেন ভুলো না! ঠাকুর আর কে? তুমি মাকেই ডেকো। তোমার বড় ভাগ্য যে মা নিজে তোমায় একথা বললেন। তুমি মাকেই ডেকো।" আমাকে এইরূপ বলিয়া মাকে বলিলেন, "কেমন মা, হয়েছে এখন?" লক্ষ্মীদিদির এই কথায় মা মৌন রহিয়া সম্মতির লক্ষণ জানাইয়াছিলেন।

আসিবার সময় মা আবার আমাকে বলিলেন, "তুমি এখান থেকে একেবারে ঘরে যেয়ো, এখন মঠে বা এখানে ওখানে কোথাও গিয়ে কাজ নেই। ঘরে গিয়ে বাপমায়ের সেবা কর। এখন বাবার সেবা করা উচিত।" এই কথা বলিয়া আমার হাতে চার খিলি পান দিয়া আমাকে আসিতে বলিলেন। আমিও মার আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া আমার পূর্ব সঙ্কল্প পবিত্যাগপূর্বক কোয়ালপাড়া মঠ হইয়া বাড়ি আসিলাম। যাইবার সময় বাবার শরীর ভাল দেখিয়া গিয়াছিলাম। বাড়ি ফিরিয়া দেখি—বাবার বড়ই শক্ত ব্যারাম হইয়াছে। আমার পৌঁছিবার ছয়সাত দিন পরেই বাবা দেহরক্ষা করিলেন।

এবার কামারপুকুর যাইবার সময় আমার এক গুরুভাই আমার হাতে মায়ের নিকট একখানি পত্র দিয়াছিলেন। উক্ত পত্র মাকে দিবার সময় মা বলিলেন, "তুমি খুলে পড়।" তাতে নিম্নলিখিত দুইটি প্রশ্ন ছিল ঃ (১) আমি চাকরি করিতে যাইতেছি, চাকরি করিলে মায়ায় জড়াইব কি, মা? শুনিয়া মা বলিলেন, "চাকরি করলে আবার মায়ায় কি জড়াবে?" (২) বিবাহ করিলে আমার ভাল হবে কি-না। মা এই প্রশ্নের উত্তরে কিছু না বলিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, তুমি বিয়ে করেছ কি?" আমি বলিলাম, "না, মা, আমি বিবাহ করি নাই।" শুনিয়া বলিলেন, "বেশ তো, তুমি বিয়ে করো না, বিয়ে করা বড় জঞ্জাল।"

কামারপুকুরে অবস্থানকালে একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মা, মাছ মাংস খেলে দোষ কি?" তদুত্তরে মা বলিলেন, "এদেশ মাছের দেশ, মাছ খেতে পার।"

সেই সময় আমি একবার মাকে বলিয়াছিলাম, "মা, আপনার পদ-চিহ্ন নিতে চাই।" তাহাতে মা বলিয়াছিলেন, "এখন এখানে সুবিধা নয়। তোমরা আমাকে যেমন (যে চক্ষে) দেখ, সকলে তো তেমন দেখে না। এই লাহাবাবুদের বাড়ির অনেকে এখানে আসে টাসে। সে জন্যে আমাকে লুকিয়ে থাকতে হবে--পায়ে আলতার চিহ্ন থাকবে কিনা।"

* * *

অন্য এক সময় আমাদের দেশের কয়েকটি গুরুভাই মিলিয়া জয়রামবাটী গিয়াছিলাম। সেখানে যাইয়া আমার এইরূপ মনে হইতেছিল যে, 'এতদূর ছুটিয়া আসিয়াছি। জীবনে তো কিছুই করিতে পারিলাম না। শ্রীশ্রীমায়ের যদি সেবা করিতে পারিতাম, নিজেকে বড়ই ধন্য মনে করিতাম।' একদিন সব গুরুভাইরা কামারপুকুর গেলেন। আমি কিন্তু গেলাম না। বৈকালে মায়ের কাছে গিয়াছি। তিনি ভাঁড়ার ঘরের বারাণ্ডায় (নূতন বাড়িতে) বসিয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "বাবা, ভাঁড়ার থেকে আটার হাঁড়িটা নিয়ে এস তো।" আমি আনিয়া দিলাম। তিনি খানিকটা আটা বাহির করিয়া জল মাখিলেন এবং উহা ঠাসিতে বলিলেন। আমি আটা ঠাসিয়া দিয়া বাহির বাটীতে আসিলাম। পুনরায় সন্ধ্যার সময় মায়ের কাছে গিয়াছি, তখন মা তাঁহার নিজের ঘরের বারাণ্ডায় বিশ্রাম করিতেছিলেন। আমি তথায় বসিয়া আছি, কিছুক্ষণ পরে মা আমাকে বলিলেন, "বৈকুণ্ঠ, পা-টা একটু টিপে দাও তো, বাবা।" আমি পা টিপছি, মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলেরা কামারপুকুর থেকে এখনো এল না কেন? রাস্তাটাস্তা ভুলে গেল নাকি?" এই কথা বলিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। ব্রহ্মচারী জ্ঞানকে ডাকিয়া বলিলেন, "জ্ঞান, একবার দেখ তো, ওদের এত দেরি কেন হচ্ছে?" ব্রহ্মচারী জ্ঞান দেখিবার জন্য কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গেলেন। বাস্তবিক তাঁহাদের সেদিন রাস্তা ভুল হইয়াছিল। খোঁজ না লইলে তাঁহাদের বাড়ি পৌঁছিতে আরো অনেক দেরি হইত!

রাত্রিতে আমরা সকলে মায়ের সদর-ঘরের বারাণ্ডায় ঘুমাইয়াছিলাম। শেষরাত্রে

চারটার সময় আমাদের সকলের ঘুম ভাঙিল। একজন বলিলেন, "এই সন্ধিক্ষণে যদি একবার মায়ের দর্শন মিলত।" এই বলিয়া তিনি একটি গান ধরিলেন, "ওঠ গো করুণাময়ী, খোল গো কুটিরদ্বার" ইত্যাদি। গান শেষ হইতেই দেখি, মা বাহির দরজা খুলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমরা হঠাৎ তাঁহার দর্শন পাইয়া মহানন্দে একে একে সকলে প্রণাম করিলাম। মা আবার দরজা বন্ধ করিয়া ভিতরে গেলেন।

* * *

আর একদিন আমরা কয়েকজন মিলিয়া বাসন্তীপূজার সময় জয়রামবাটী গিয়াছিলাম। রাস্তায় সাদা পদ্মফুল দেখিতে পাইয়া কিছু সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলাম। যখন আমরা ঐ ফুল শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে অঞ্জলি দিব বলিয়া প্রস্তুত হইতেছিলাম, সেই সময় মা বলিয়া পাঠাইলেন, "দেবীর পূজাতে সাদা ফুল লাগে না।" এ সংবাদ পাইয়া আমরা পুনরায় লালপদ্ম সংগ্রহ করিয়া তাঁহার পাদপদ্মে অঞ্জলি দিয়াছিলাম।

একদিন তাঁহার সাংসারিক কোন কথায় শুনিলাম—মা যেন কাহাকে বলিতেছেন, "আমাকে বেশি জ্বালাবে না, কারণ আমি যদি চটেমটে কাউকে কিছু বলে ফেলি তো কারো সাধ্য নেই যে আর রক্ষা করে।"

সেবার মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মা, আজকাল সরকার যে ছেলেদের ধরে ধরে আটক করে রাখছে, এর পরিণাম কি হবে?" তদুত্তরে মা বলিয়াছিলেন, "তাই তো বড় অন্যায়। এর একটা প্রতিকার শীঘ্র হবে। আর বেশি দিন নয়—ভাল হবে।"

একদিন আমি মাকে বলিলাম, "মা, আমাব একটা কিছু করে দিন।" তাহাতে মা বলিলেন, "শরৎ, রাখাল এবা রয়েছে। ভয় কি?" তখন আমি বলিয়াছিলাম, "মা, আমার বড়ই ইচ্ছা হয় কিছুদিন মঠে গিয়ে থাকি।" মায়ের মত হইল না, বলিলেন, "এখন মঠে গিয়ে কাজ নেই, বাড়িতেই থাক।"

এবার আমাদের গ্রামের ক্ষীরোদ মুখোপাধ্যায়কে শ্রীশ্রীমা কৃপা করিয়াছিলেন। ক্ষীরোদবাবুর মুখে শুনিয়াছি দীক্ষার সময় মা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আজ থেকে তোমার ইহকাল ও পরকালের পাপ গেল।"

* * *

একদিন কলিকাতায় বাগবাজারে মায়ের বাটীতে (উদ্বোধন কার্যালয়ে) মাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া আছি। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাস্টার মশায়কে প্রণাম করেছ?"

আমি বলিলাম, "না, মা, আমি তাঁকে চিনি না।"

মা বলিলেন, "যাও, নিচে সে আছে। সে মহাপুরুষ লোক, তাকে প্রণাম করে এস।" এই বলিয়া পূজনীয়া গোলাপ-মাকে আমার সঙ্গে পাঠাইলেন মাস্টার মহাশয়কে চিনাইয়া দিতে। আমি নিচে আসিয়া মাস্টার মহাশয়কে প্রণাম করিয়া আবার উপরে গেলাম।

দুইজন লোক এই সময় মাকে প্রণাম করিয়া নিচে চলিয়া গেলেন। মা ঠাকুরঘরে নিজ তক্তপোষে বসিয়াছিলেন। তিনি আপনমনে বলিতেছিলেন, "যে-সে লোক পা ছুঁয়ে বড় যন্ত্রণা দিলে!"

* * *

একবার কোন বৈষয়িক ব্যাপার উপলক্ষে আমার সঙ্গে মেজদাদার ঝগড়া হওয়ায় আমি কিছুদিনের জন্য বাড়ি ছাড়িয়া অন্যত্র থাকিবার ইচ্ছা করিয়া ঐ বিষয় শ্রীশ্রীমাকে জানাইতে এবং তাঁহাব অনুমতি লইতে বাগবাজার গিয়াছিলাম। মাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া আছি। মা গোলাপ-মাকে বলিতেছেন, "ও গোলাপ, শুনেছ, বৈকুণ্ঠকে তার দাদা একটা চড় মেরেছে বলে সে এতদূরে ছুটে এসেছে! ঘর করলে কি ঝগড়া হয় না? তার জন্যে এতটা কেন? আমাকে বলিলেন, "যাও বাবা, বাড়ি যাও। ঘর করলে একটু আধটু ঝগড়া হয় বই কি।"

* * *

আমার এক গুরুভাই ঠাকুরের গায়ত্রী মন্ত্র ভুলিয়া গিয়া আমাকে উক্ত মন্ত্র জিজ্ঞাসা করায় আমি মাকে চিঠিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মন্ত্র কাহাকেও বলা যায় কি না।" মা তখন মাদ্রাজে। তদুত্তরে চিঠিতে মা আমাকে জানাইয়াছিলেন, "মন্ত্র কাহারও নিকট বলিতে নাই, তবে তোমার গুরুভায়ের নিকট বলিতে পার, তাহাতে দোষ নাই।"

* * *

একদিন মনের দুঃখে বাগবাজারে 'উদ্বোধন'-এর বাটীতে গিয়া শ্রীশ্রীমাকে বলিয়াছিলাম, "মা, আমি আপনার নিকট কিছু বলতে এসেছি।"

মা—কি, বল।

আমি—মা, কবে আপনার এ অভাগা ছেলেকে দয়া হবে?

মা—বাবা, ঠাকুর দয়া করবেন, তাঁকে ডাক। আর সৎসঙ্গ কর, সাধনভজন কর। ঠাকুরকে ডাকলেই সব হবে।

আমি—ঐ করে তো মা, কিছু হলো না। আমি ঠাকুরকে দেখিনি—কি ডাকব? আপনার দয়া পেয়েছি। যদিও আপনি বলছেন, তবে আপনার এ অভাগা ছেলের জন্যে আপনি-ই তাঁকে বলুন।

মা—জপ-ধ্যান না করলে কি হয়? সে-সব যে করতে হয়।

আমি—আর আমার জপটপ করতে মা ইচ্ছে নেই। করে তো কিছুই হচ্ছে না। কাম ক্রোধ মোহ আগেও যেমন ছিল, এখনো তেমনি আছে। মনের ময়লা একটুও কাটে নাই।

মা—বাবা, মন্ত্রজপ করতে করতে কাটবে। না করলে চলবে কেন? পাগলামি করো না। যখন সময় পাবে, মন্ত্রজপ করো। ঠাকুরকে ডেকো।

আমি—না, মা, আমার সে ক্ষমতা নেই। জপ করতে বসি তো মন চঞ্চল। হয়—আমার মন তন্ময় করে দিন যেন একটুও কুচিন্তা না আসে, না হয়—আপনার মন্ত্র আপনি ফেরত নিন। বৃথা আপনাকে কষ্ট দিতে আমার ইচ্ছে নেই। কারণ, শুনেছি—শিষ্য মন্ত্রজপ না করলে সেজন্য গুরুকেই ভুগতে হয়।

মা—দেখ, একি কথা! তোমাদের জন্যে যে আমি ভেবে ভেবে অস্থির হলুম। ঠাকুর তোমাদের যে কবে (অর্থাৎ পূর্বেই) দয়া করেছেন!

এই কথা বলিতে বলিতে মার চোখে জল আসিল। আবেগভরে বলিলেন, "আচ্ছা, তোমাকে আর মন্ত্রজপ করতে হবে না।"—অর্থাৎ যা হয় তিনি নিজেই আমার জন্য করবেন।

কিন্তু তখন তাঁহার কথার এই মর্ম বুঝিতে না পারিয়া ভয় ও আতঙ্কে আমার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে; ভাবিলাম—সব সম্বন্ধ বুঝি ফুরাইল। প্রাণের আবেগে বলিলাম, "মা, আমার সব কেড়ে নিলেন! এখন আমি করি কি? তবে কি, মা, আমি রসাতলে গেলুম?"

এই কথা শুনিয়া মা খুব জোরের সহিত বলিলেন, "কি, আমার ছেলে হয়ে তুমি রসাতলে যাবে? এখানে যে এসেছে, যারা আমার ছেলে, তাদের মুক্তি হয়ে আছে। বিধির সাধ্য নাই যে আমার ছেলেদের রসাতলে ফেলে।"

আমি—তবে, মা, এখন কি করব?

মা—আমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাক। আর এটা সর্বদা স্মরণ রেখ যে, তোমাদের পেছনে এমন একজন রয়েছেন যিনি সময় আসলে তোমাদের সেই নিত্যধামে নিয়ে যাবেন।

আমি—মা, যতক্ষণ আপনার নিকট থাকি, খুব ভাল থাকি। সংসারের কোন চিন্তা আমার থাকে না। আর যেমন বাড়ি যাই, অমনি মনে নানা কুচিন্তা আসে। আবার সেই পুরনো অসৎ সঙ্গীদের সঙ্গে মিশি, আর অন্যায় কাজ করি। যত চেষ্টা করি, কিছুতেই কুচিন্তা দূর করতে পারি না।

মা—ও তোমার পূর্বজন্মের সংস্কারে হচ্ছে। জোর করে (হঠাৎ) কি ও ছাড়া যায়? সৎসঙ্গে মেশো, ভাল হতে চেষ্টা কর, ক্রমে সব হবে। ঠাকুরকে ডাক। আমি রইলুম। তুমি এ জনমে মুক্ত হয়ে রয়েছ, জানবে। ভয় কি? সময় আসলে তিনিই সব করে দেবেন।

শ্রী—

(৭)

শ্রীশ্রীমাকে প্রথম দর্শন করি ইংরেজী ১৯১০ সনের ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের সময় উড়িষ্যার কোঠারে।* আমার সহিত হেমন্ত মিত্র ও বীরেন্দ্র মজুমদার নামক আরও দুইজন ভক্ত শিলং হইতে আসিয়াছিলেন। কোঠারে তখন রামকৃষ্ণবাবু, স্বামী ধীরানন্দজী, স্বামী অচলানন্দজী, স্বামী আত্মানন্দজী, শ্রীশ্রীনাগমহাশয়ের ভক্ত শ্রীযুক্ত হরপ্রসন্ন মজুমদার প্রভৃতি ছিলেন। আমরা কিছু ফল, কমলা-মধু প্রভৃতি লইয়া গিয়াছিলাম। বেলা প্রায় একটার সময় পৌঁছিলাম। জিনিসপত্র রামকৃষ্ণবাবু শ্রীশ্রীমায়ের নিকট পৌঁছাইয়া দিলেন। স্নানান্তে আমাদিগকে আহার করিতে ডাকা হইল। ইতোমধ্যে উপস্থিত সন্ন্যাসিগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—'যখন এত দূর দেশ হতে এসেছে, মাকে দর্শন করতে দিতেই হবে—তবে বেশি কথাবার্তার সুবিধা হবে না।' বীরেনবাবু শুনিয়া আমাকে এই কথা বলিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "মার যা ইচ্ছা তাই হবে। ভয় কি ?" সকলেই আহার করিতে গেলেন। আমি রামকৃষ্ণবাবুকে বলিলাম, "মাকে দর্শন না করে আমরা কিছু খাব না।" রামকৃষ্ণবাবু শ্রীশ্রীমাকে ঐ কথা জানাইলেন এবং আমাদের দর্শনের অনুমতি লইয়া আসিলেন। বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি—মা বারাণ্ডায় রীতিমতো ঘোমটা টানিয়া চাদর মুড়ি দিয়া বসিয়া আছেন। নিকটে যাইতেই গোলাপ-মা বলিলেন, "ছেলেমানুষ গো, ছেলেমানুষ ; মা, কোথায় শিলং আর কোথায় কোঠার, তোমাকে দেখতে সাত সমুদ্দর তের নদী পার হয়ে এসেছে !" এ কথা শুনিয়াই মা ঘোমটা টানিয়া মাথার উপর উঠাইলেন, মায়ের শ্রীমূর্তি ভাল করিয়া দেখিবার সুবিধা হইল। সেইদিন হইতে মা আর কখনো আমাকে দেখিয়া ঘোমটা দেন নাই। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া মনে মনে 'শরণাগত শরণাগত' এই কথা বলিলাম। মা আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন—"ভক্তিলাভ হোক।"

আমি—মা, এখানে দু-এক দিন থাকব ইচ্ছা। বড় মানুষের বাড়ি, তোমাকে দর্শন করা বড়ই মুশকিল।

মা—আমি তোমাদিগকে ডেকে পাঠাব। এখন খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করগে।

আমরা আহারান্তে বিশ্রাম করিলাম। বৈকালে পূজনীয়া গোলাপ-মা শ্রীশ্রীমায়ের প্রসাদী পায়েস একটি বাটিতে আমাদের দিয়া গেলেন ; বলিলেন, "মা তোমাদের এই পায়েস দিয়েছেন।"

কিছুক্ষণ পরে একজন আসিয়া বলিলেন, "মা আপনাদের ডেকেছেন।" আমরা পুনর্বার দর্শন পাইলাম। প্রণামান্তে মাকে বলিলাম, "মা, তোমাকে দু-একটি কথা বলব, তা সকলের সামনে বলতে ইচ্ছে হয় না।"

* কোঠার—শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত বলরাম বসুর জমিদারী। বায়ুপরিবর্তনেব জন্য শ্রীশ্রীমাকে কিছুদিন তথায নিয়ে যাওযা হযেছিল। মা এখান হতেই পরে মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর, রামেশ্বর প্রভৃতি দর্শন করতে গিয়েছিলেন।

মা বলিলেন, 'বেশ তো'। যিনি আমাদের ডাকিয়া আনিয়াছিলেন তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি একটু এখান থেকে যাও।" তিনি মায়ের কথামত বাহিরে চলিয়া গেলেন।

আমি ইতঃপূর্বে স্বপ্নে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাকে দর্শনাদি করিয়াছিলাম, সেই সকল কথা বলিলাম। মা ঐ সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, 'ঠিক দেখেছ'। অপর ভক্ত দুইটি সম্বন্ধে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, এদের কি ইচ্ছে ?

আমি বলিলাম, "মা, তোমার কাছে এসেছে দীক্ষার জন্যে, এখন তোমার যা ইচ্ছা।"

মা—বেশ, কাল সকালে স্নান করে এস।

আমি—মা, ঠাকুর তোমার পাদপদ্ম পূজা করেছিলেন, আমাদেরও ইচ্ছে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে তোমার পাদপদ্ম পূজা করব।

মা—আচ্ছা, তাই হবে।

আমি—ফুল কোথায় পাব ?

মা—এরা যোগাড় করে দেবে।

আমরা প্রণাম করিয়া বাহির বাটীতে আসিলাম।

শ্রীশ্রীমা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এদের কি ইচ্ছে ?' কিন্তু আমার নিজের সম্বন্ধে কোন কথাই তুলিলেন না। মায়ের নিকট হইতে চলিয়া আসিবার পর আমার একটু চিন্তা হইল, ভাবিলাম—মায়ের যা ইচ্ছা তাহাই হইবে, আমি নিজে বলিব না।

পরদিন আমরা স্নান করিয়া পুষ্পাদিসহ প্রস্তুত হইলাম। আদেশ হইল—'এক একজন করিয়া এস।' আমিই প্রথম গেলাম। পূজাদি সাঙ্গ করিয়া বসিয়া আছেন—মনে হইল। আমি প্রবেশ করিলে বলিলেন, "ঠাকুর তোমাকে যা দিয়েছেন, তা তুমি করবে। আমিও তোমাকে কিছু দিচ্ছি।" এই বলিয়া মহামন্ত্র দিলেন।

পরে শ্রীপাদপদ্ম পূজা করিলাম। মা দাঁড়াইয়া পূজা গ্রহণ করিলেন। আমি বলিলাম, "মা, আমি তো মন্ত্রতন্ত্র কিছুই জানি না।" মা বলিলেন, "অমনিই দাও না।" আমি 'জয় মা' বলিয়া পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম। একটি ধুতরা ফুল ছিল—মা বলিলেন, "ওটি দিও না—ও শিবের পূজায় লাগে।"

মায়ের জন্য কাপড় লইয়া গিয়াছিলাম, সেই কাপড়খানি আর একটি টাকাও দিলাম। টাকা দেওয়াতে মা বলিলেন, "তোমার টানাটানি অভাব—আবার টাকা কেন ?" সাংসারিক অভাব সম্বন্ধে তো কোন কথাই হয় নাই, অথচ দেখিলাম মা সবই জানেন ! আমি বলিলাম, "এ-তো তোমারই টাকা, তোমাকেই দেওয়া হচ্ছে ; আমাদের পরিশ্রমে যা কিছু আসে, তার সামান্যও যদি তোমার সেবায় লাগে, আমরা ধন্য মনে করি।"

মা বলিলেন, "আহা ! কি টান গো, কি টান !"

আমি—মা, তোমাকে ভক্তগণ সাক্ষাৎ কালী, আদ্যাশক্তি, ভগবতী এসব বলেন। গীতায় আছে, অসিত, দেবল, ব্যাস প্রভৃতি মুনিগণ শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলেছিলেন; স্বয়ং তিনিও একথা অর্জুনকে বলেছিলেন।* এই 'স্বয়ং' বলায় ঐ কথার আরও জোর হয়েছে। তোমার কথা যা শুনেছি, তা আমি বিশ্বাস করি। তবে তুমি স্বয়ং যদি সে কথা বল, তা হলে আর কোনই সন্দেহ থাকে না। তোমার নিজের মুখেই শুনতে চাই ও কথা সত্য কিনা।

মা—হ্যাঁ, সত্য।

ইহার পর ভবিষ্যতে আর কোনদিনই মায়ের স্বরূপ সম্বন্ধে আমি কোন প্রশ্ন করি নাই।

আমি বলিলাম, "মা, আমি এই চাই—যেমন তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখছি, কথাবার্তা বলছি, আমি যেন এইরূপই ইষ্টকে দর্শন, স্পর্শন, আলাপ করতে পারি—এই আশীর্বাদ কর।"

মা—হ্যাঁ, তাই হবে।

তার পরদিন বিদায়গ্রহণের সময় শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া মায়ের বড়ই প্রসন্ন মূর্তি ও হাসিমাখা মুখ দেখিলাম। গোলাপ-মা আমাকে বলিলেন, "পুরীধাম দর্শন করে যাও না।" আমি বলিলাম, "আর কি দেখব? মায়ের পাদপদ্মই আমার অনন্তকোটি তীর্থ। আর কিছুই চাই না।"

মা আমার কথা শুনিয়া বলিলেন, "থাকগে, নাই বা গেল, দরকার নেই।"

* * *

দ্বিতীয় দর্শন—১৯১২ সনে মে মাসে, 'উদ্বোধন'-এর বাটীতে। এবারে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ও আমার সহধর্মিণীর দীক্ষা হয়। শ্রীমতী রাধুর অসুখ থাকায় বিশেষ কোন কথাবার্তা হয় নাই। আমার গর্ভধারিণী ও মাতামহী আমার সঙ্গে ছিলেন। আমার দুটি ছেলেও ঐ সঙ্গে গিয়াছিল। তাঁহারাও শ্রীশ্রীমাকে দর্শন, স্পর্শন করিয়া ধন্য হইলেন।

* * *

তার পর দর্শন—জয়রামবাটীতে ১৯১৩ সনে; শ্রীশ্রীমায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ভূদেবের বিবাহের তিন-চার দিন পূর্বে। সেবার কোয়ালপাড়া মঠে পৌঁছিয়া শুনিলাম—সম্প্রতি একটি ভক্ত** শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিয়া ফিরিবার সময় উক্ত মঠে দেহরক্ষা করিয়াছেন। কেশবানন্দজী বলিলেন, "এখন জয়রামবাটী যাওয়া মায়ের নিষেধ—বড় গরম পড়েছে, বৃষ্টি না হলে

* আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষিনারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে।।

** দ্বারকানাথ মজুমদার

৯

কাউকে যেতে দেওয়া হবে না।" একটু চিন্তিত হইলাম—এতদূর আসিয়াছি, মায়ের নিষেধ ঠেলিয়া কেমন করিয়া যাই। আহারান্তে বিশ্রাম করিলাম। কিছুক্ষণ পরেই মায়েব কৃপায় খুব এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। পরদিন প্রাতে জয়রামবাটী গিয়া শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিলাম। কুশলাদি জিজ্ঞাসান্তে মা বলিলেন, "বাবা, কাল বেশ বৃষ্টি হয়েছে— আজ বেশ একটু ঠাণ্ডা।" পরলোকগত ভক্তটির কথা তুলিয়া মা বলিলেন, "সাধুর যা মৃত্যু, তা ওর হয়েছে ; আমি তাকে এখনো দেখছি। তবে ওর বুড়ো বাপ আছে, তার জন্যই কষ্ট হয়।" এই বলিয়া মা অশ্রুবিসর্জন করিলেন।

কাশীধাম হইতে ব্রহ্মচারী দেবেন্দ্রনাথ এই সময় জয়রামবাটী উপস্থিত হন। উক্ত ব্রহ্মচারী পূর্ব জন্মের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন—বলিতেন। চার পাঁচ বৎসর পূর্বে আমাকে বলিয়াছিলেন, "আমি না-কি পূর্ব জন্মে তাঁহাব গুরু ছিলাম।" আমি কিন্তু কিছুই জানি না। তাঁহার এবম্বিধ সকল কথাই পাগলের প্রলাপ বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম। আমরা দুইজন একত্র হইয়া শ্রীশ্রীমায়ের নিকট উপস্থিত হইতেই মা আপনা হইতে বলিলেন, "তোমরা দুজন এক জায়গায় ছিলে, আবার ঠিক এক জায়গায় এসেছ!"

ইহা শুনিয়া দেবেন্দ্র চুপি চুপি আমাকে বলিলেন, "কেমন, আমি যা বলেছিলুম, মায়ের কথায় বুঝলেন তো যে তা ঠিক ঠিক।"

আমি—হবে, আমি তো কিছু জানি না।

শ্রীশ্রীমায়ের নিকট হইতে বাহিরে আসিয়া দেবেন্দ্র আমাকে বলিলেন, "আমি মায়ের কাছে সন্ন্যাস নিতে এসেছি, কিন্তু যতক্ষণ আপনি মাকে সে বিষয়ে অনুরোধ না করবেন, ততক্ষণ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না। ঠাকুরের ইচ্ছায় আমি এ সময়ে এসেছি। আপনি না বললে হবে না বলেই ঠাকুর আমাকে এ সময়ে উপস্থিত করিয়েছেন। আমি শ্রীশ্রীঠাকুব ও মাকে কাশীতে প্রত্যক্ষ দর্শন করে এসেছি, কথাবার্তাও হয়েছিল—এ সব সত্য কথা।"

আমি বলিলাম, "আমি সহজে বলব না—দেখি কি হয়।"

দেবেন্দ্র—কিছুতেই হবে না।

আমরা সাত আট দিন ছিলাম। দেবেন্দ্র ইতোমধ্যে বড়ই উতলা হইয়া পড়িল ; আমারও উহাতে আশ্চর্য বোধ হইল। যাহা হউক, একদিন প্রাতে আমি একাকী শ্রীশ্রীমায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম, "মা, তোমাকে একটা কথা বলব।"

মা হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, একটু পরে এস, যখন আমি তরকারি কুটতে বসব, তখন।"

কিছুক্ষণ পরে মা তরকারি কুটিতে বসিলেন এবং আমি উপস্থিত হইলে বলিলেন, "তুমি কি বলবে, এখন বল।"

আমি বলিলাম, "তুমি তো সবই জান—কাশীতে দেবেন্দ্রকে দেখাও দিয়েছ,ঠাকুরও দর্শন দিয়েছেন। এখন তাব ইচ্ছে সন্ন্যাস গ্রহণ করে। সে তো আর সংসাব করবে না—তবে দাও না কেন ?"

শুনিয়া মা একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ও যদি সন্ন্যাস নেয তবে কি কাবো কোন কষ্ট হবে না ?"

আমি—তার বাপ মা কেউ জীবিত নেই। এক বড় ভাই আছে, সে ব্রাহ্ম এবং উপার্জনক্ষম। কারো যে কোন কষ্ট হবে এমন তো দেখি নে।

মা—আচ্ছা, তবে হবে। কোয়ালপাড়া থেকে নতুন কাপড় গেরুযা রং-এ ছুপিয়ে আনবে। কালই হবে।

আমি আসিযা দেবেন্দ্রকে সব বলিলাম। শুনিয়া দেবেন্দ্রের খুব আনন্দ—সকল জিনিস যোগাড় করা হইল।

পরদিন শ্রীশ্রীমায়ের ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্তি সম্মুখে রাখিয়া মা পূজাদি করিলেন এবং দেবেন্দ্রকে গেরুয়া বস্ত্র ও কৌপীন দিয়া বাহিবে যাইয়া পরিয়া আসিতে বলিলেন। আমি তখনো শ্রীশ্রীমায়েব নিকট বসিয়া। আমার মন্দ ভাগ্যের কথা ভাবিতেছিলাম এমন সময় মা যেন আমার মনের ভাব বুঝিয়াই সস্নেহে বলিলেন, "বাবা, ঠাকুরের প্রসাদী সরবৎ খাবে ?" আমি বলিলাম, "হ্যাঁ, মা, দাও।"

মা সরবৎ লইয়া নিজে একটু পান করিয়া সরবতেব গ্লাসটি সযত্নে আমার হাতে দিলেন। *আমি শ্রীশ্রীমায়ের প্রসাদী সরবৎ পান করিয়া ধন্য হইলাম, মনে হইল—'এর* কাছে আবার সন্ন্যাস কি ? এ যে দেবদুর্লভ।' এক আশ্চর্য ভাবে হৃদয় পূর্ণ হইল।

দেবেন্দ্র গেরুযা কাপড় পরিযা মাকে প্রণাম করিতে আসিলে মা আমাকে বলিলেন, "দেখছ, যেন আর একটি হয়েছে, সে মানুষ আর নেই।"

কালী মামা (শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যম ভ্রাতা, ভূদেবের পিতা) আসিয়া আমাকে অনুরোধ কবিতে লাগিলেন, আমি যাহাতে ভূদেবের বিবাহে যাই—কিন্তু আমার নিজের ইচ্ছা মায়ের নিকটেই থাকি। ভাব বুঝিয়াই মা বলিলেন, "না, ওর গিয়ে কাজ নেই, ও এখানেই থাকবে।"

বিবাহোপলক্ষে পাচক ব্রাহ্মণেরা রান্না করিতেছিল। দেবেন্দ্র ও আমি একটু দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম। তাহা দেখিয়া মা উহাকে বলিলেন, "এদের গলায় একটা পৈতা নেই—তাই ভাবছ এরা ছোট। আহা, এদের তুল্য কি আছে ?"

বিবাহে খেলুড়েদের একজন বুকে পাথর ভাঙিযা খেলা দেখাইয়াছিল। ভাঙিবার সময় মা কেবল বলিতেছিলেন, "ঠাকুব, রক্ষা কর ; ঠাকুর, রক্ষা কর।" পাথর ভাঙা হইয়া গেলে মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, ওরা কি মন্তর-টন্তর জানে ?"

আমি—না, মা, মন্তর-টন্তর কিছু নয় ; এই রকম ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করেছে। আমি একটা গল্প শুনেছি— আমেরিকার কোন সাহেব একটি বাছুরকে প্রত্যহ কোলে করে দূরে গোচারণের মাঠে নিয়ে যেত। ক্রমশ বাছুরটি বড় হয়ে ষাঁড় হলো। তখনো সে কোলে করে নিতে পারত, আর সকলকে এই খেলা দেখাত। এ সবই অভ্যাসের কাজ।

মা—বটে, দেখলে অভ্যাসের কত শক্তি ! এমনি, জপ অভ্যাস করতে করতে মানুষ সিদ্ধ হয়—জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ।

নাগমহাশয়ের জীবনচরিতে আছে, শ্রীশ্রীমা স্বয়ং প্রসাদ করিয়া নিজ হাতে নাগমহাশয়কে খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিয়াছিলেন, "বাপের চেয়ে মা দয়াল—বাপের চেয়ে মা দয়াল !" ইহা পড়িয়া আমার মনে হইয়াছিল—'মা কি আমাকে তেমনি করিয়া খাওয়াইয়া দিবেন ? একথা কিন্তু মাকে বলা হবে না, তিনি নিজে দয়া করিয়া দেন তো হবে।'

আশ্চর্য, সত্যসত্যই একদিন তিনি আমায় ঐরূপে প্রসাদ খাওয়াইয়া দিলেন।

এই সময় জয়রামবাটীতে একটি সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণ মঠের নহেন, কিন্তু দেখিলাম শ্রীশ্রীমায়ের পরিচিত। একদিন সকালে খাইতে বসিয়াছি, উক্ত সন্ন্যাসীও পাশে একটু দূরে বসিয়াছেন। মা আমাকে বলিলেন, "বাবা, গেরুয়া কি নিলেই হলো ? (উক্ত সন্ন্যাসীকে দেখাইয়া) ঐ দেখ না গেরুয়া নিয়েছে !"

আমাকে বলিলেন, "তোমার এমনিই সব হবে। গেরুয়ার দরকার কি ?"

শ্রীশ্রীমায়ের জন্য একজোড়া কাপড় লইয়া গিয়াছিলাম। মাকে বলিলাম, "মা, শুনেছি তুমি কাপড় সকলকে বিলিয়ে দাও। তুমি যদি নিজে কাপড় দুখানি পর, তবে আমার খুব আনন্দ হয়।" শুনিয়া মা কিছু বলিলেন না—একটু হাসিলেন। পরদিন আমি যাইতেই বলিলেন, "এই দেখ, বাবা, তুমি যে কাপড় এনেছ তা পরেছি।"

আমার প্রার্থনায় শ্রীশ্রীমা আমাকে তাঁহার ব্যবহৃত একখানি কাপড় দিয়া বলিয়াছিলেন, "বড় ময়লা, তুমি ধুইয়ে নিও।"

আমি বলিলাম, "না, মা তুমি যেমনটি দিয়েছ, ঠিক তেমনি রাখতে ইচ্ছা, ধোপার ঘরে দেওয়া হবে না।"

মা—আচ্ছা, সেই ভাল।

একদিন মা খাইতে বসিয়াছেন। আমি ও দেবেন্দ্র এমন সময় সেখানে উপস্থিত হইলাম। মা বলিলেন, 'প্রসাদ নেবে ?' আমরা উভয়ে হাত পাতিলাম। নিজমুখে একটু দিয়া আমাদের হাতে প্রসাদ দিলেন। হাত হইতে পড়িয়া যায় দেখিয়া নিজেই বেশ করিয়া চাপিয়া দিলেন। মায়ের ব্রাহ্মণ শরীর, আমি কায়স্থ—কোন বর্ণবিচার নাই, আমার হাতে দিলেন। পরে নিজে খাইতে আরম্ভ করিলেন। আমাদের দেখিতেন—ঠিক যেন নিজের ছেলে।

শ্রীশ্রীমাকে যখনই দর্শন করিতে যাইতাম, কিছু ফল কি অন্য জিনিস যাহা সুবিধা হইত লইয়া যাইতাম। আমি শুনিয়াছিলাম যে, মা সকলের জিনিস ঠাকুরকে দিতে পারেন না। এ জন্য অনেক সময় মনে ভয় করত—'কি জানি, আমরা তো ভাল মানুষ নই, মা গ্রহণ করতে পারেন কি-না, কে জানে।' মা কিন্তু প্রায়ই বলিতেন, "বাবা তুমি যে অমুক জিনিস এনেছিলে, ঠাকুরকে দিয়েছি, বেশ জিনিস, বেশ মিষ্টি—আমি খেয়েছি।"

একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, ভগবানের নাম করলেও কি প্রারব্ধ ক্ষয় হয় না?"

মা বলিলেন, "প্রারব্ধের ভোগ ভুগতেই হয়। তবে ভগবানের নাম করলে এই হয়—যেমন একজনের পা কেটে যাবার কথা ছিল, সেখানে একটা কাঁটা ফুটে ভোগ হলো।"

মাকে বলিয়াছিলাম, "মা, সাধন-ভজন তো কিছুই করতে পারি না, আর কখনো যে কিছু করতে পারব এমনও মনে হয় না!"

মা ভরসা দিয়া বলিলেন, "কি আর করবে, যা করছ তাই করে যাও। মনে রাখবে, তোমাদের পেছনে ঠাকুর আছেন—আমি আছি।"

রাধু একদিন অসুখে একটু ছটফট করিতেছিল। মা বলিলেন, "দেখ তো, বাবা, ওর কি হয়েছে?" আমার কোন নাড়ী জ্ঞান নাই, তবু মাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য আমি রাধুর নাড়ী টিপিয়া বলিলাম, "বিশেষ কিছু নয়, একটু দুর্বল হয়েছে। একটু দুধ খাইয়ে দাও।" মায়ের ছেলেমানুষের মতো স্বভাব—তখনই দুধ খাওয়াইতে বসিলেন। একটু পরে রাধুর মা আসিয়া রাধুর নিকটে বসিলেন। তাহাতে রাধু বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল, কারণ তাহার ইচ্ছা নয় যে তাহার গর্ভধারিণী নিকটে থাকেন। মা রাধুর মাকে একটু সরাইয়া দিবার ইচ্ছায় হাত দিয়া ঠেলিয়া বলিলেন, "তুমি এখন যাও না।" উহাতে হঠাৎ শ্রীশ্রীমায়ের হাত রাধুর মায়ের পায়ে ঠেকিয়া যাওয়াতে তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কেন তুমি আমার পায়ে হাত দিলে? আমার কি হবে গো।" তাহার ঐ ভাব দেখিয়া মায়ের হাসি আর থামে না। রাসবিহারীদাদা নিকটে ছিলেন, বলিলেন, "মা দেখেছ, এদিকে পাগলী তোমাকে এত গালাগাল করে, মারতে আসে, কিন্তু তোমার হাত তার পায়ে লেগেছে বলে তো খুব ভয়।"

মা বলিলেন, "বাবা, রাবণ কি জানত না যে রাম পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, সীতা আদ্যাশক্তি জগন্মাতা—তবুও ঐ করতে এসেছিল! ও (পাগলী) কি আমাকে জানে না! সব জানে, তবু এই করতে এসেছে!"

মায়ের পায়ের বাতের ব্যথার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলাম, "মা, শুনতে পাই ভক্তদের পাপ গ্রহণ করেই তোমার এই ব্যাধি। আমার একটি আন্তরিক নিবেদন—তুমি আমার জন্যে ভুগো না; আমার কর্মের ভোগ আমার দ্বারাই ভোগ করিয়ে নাও।"

মা—সে কি বাবা, সে কি বাবা, তোমরা ভাল থাক, আমিই ভুগি।

আহা! সে সময়ে মায়ের কি এক অপূর্ব করুণামূর্তিই দেখিলাম!

জয়রামবাটী হইতে রওনা হইবার সময় মাকে গিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি আমার মাথায় জপ করিয়া দিলেন এবং স্নেহভরে বলিলেন, "আহা! এদের ইচ্ছে আমার কাছে থাকে, কিন্তু কি করবে সংসারের অনেক কাজ করতে হয়।"

ছেলে বিদেশে যাইবার সময় মায়ের মতো তিনি সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর আসিলেন এবং সজলনয়নে চাহিয়া রহিলেন।

* * *

একবার আমি তিন সপ্তাহ কলিকাতায় থাকি। বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে গিয়া তাঁহাকে দর্শন ও প্রণামানন্তর বলিয়াছিলাম, "মা, কিছুদিন কলকাতায় থাকব। এখানে তোমাকে দর্শন করবার নিয়ম হয়েছে সপ্তাহে মাত্র দুদিন।'যদি অনুমতি কর, তবে মাঝে মাঝে আসব।"

মা—আসবে বৈকি। যখন সুবিধা হয আসবে, আমাকে সংবাদ দেবে।

একদিন গিযা বলিলাম, "মা আমাব তো শান্তি হয় না। মন সর্বদা চঞ্চল—কাম যায় না।" এই কথা শুনিয়া মা একদৃষ্টে অনেকক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিছুই বলিলেন না। মায়ের মুখ দেখিয়া আমার আত্মগ্লানি আসিল—কেন মাকে ইহা বলিতে গেলাম। তাঁহার পদধূলি লইয়া শ্রীযুক্ত মাস্টার মহাশয়ের বাড়ি গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে উপস্থিত হইলাম। মাস্টার মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলাম, "আপনি ঠাকুরের অনেক পদসেবা করেছেন, আমাব মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিন—মাথাটা গরম।"

তিনি বলিলেন, "সে কি? আপনি মায়ের ছেলে, মা আপনাকে খুব স্নেহ করেন। আপনি আমার নিকট কিসের কাঙাল? মা কি আপনাকে চেয়ে দেখেন নাই?"

আমি—হ্যাঁ, অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে দেখেছেন।

মাস্টার মহাশয়—তবে আর কি? 'সদানন্দসুখে ভাসে শ্যামা যদি ফিরে চায।'

তিনবাব খুব আবেগের সহিত তিনি এই কথাটি বলিলেন। মায়ের অনেকক্ষণ চাহিযা দেখিবার অর্থ বুঝিলাম। আমি শান্ত হইলাম। মনে হইল—মা যেন তাঁহাব কৃপাদৃষ্টির অর্থ বুঝাইতেই মাস্টার মহাশয়েব নিকট আমায় পাঠাইয়াছেন।

একদিন ভোরে আমার পরিবার ও একটি মেয়েকে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট লইয়া গিয়া বলিলাম, "মা, ওরা তো সর্বদা আসতে পারে না। এরা আজ সারাদিন তোমার এখানে থাকবে, আমি বিকেলে এসে নিয়ে যাব।"

মা—আচ্ছা, বেশ তো।

আমার স্ত্রীর কপালে সিঁদুর ছিল না; স্ত্রী-ভক্তদের মধ্যে কে একজন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হ্যাঁ গা, তোমার কপালে সিঁদুর নেই কেন?" ঐ কথা শুনিয়া মা

বলিয়াছিলেন, "তা আর কি হয়েছে? ওর এমন স্বামী সঙ্গে, নাই বা পরেছে।" এই বলিয়া মা স্বয়ং তাহার কপালে সিঁদুর পরাইয়া দিলেন।

আমার স্ত্রীর মনে হইয়াছিল—'মা যদি অনুমতি করেন তবে পদসেবা করি।' মা কিছুক্ষণ পরে তাহাকে বলিলেন, "এস, বৌমা, আমার গায়ে মাথায় তেল মাখিয়ে দাও।" তেল মাখাইয়া চিরুনি দিয়া চুল আঁচড়াইয়া দিতে দিতে তাহার ইচ্ছা হইয়াছিল, 'যদি এই চুল কিছু নিতে অনুমতি দেন তো নিই।' মা ঈষৎ হাসিয়া নিজেই বলিলেন, "এই নাও, মা।" তারপর চিরুনির গাত্রসংলগ্ন চুল ছাড়াইয়া তাহার হাতে দিলেন।

একটি স্ত্রী-ভক্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এই বৌটি কে, মা?"

মা—রাঁচিতে সুরেন থাকে, তার বউ। ঠাকুরের উপর সুরেনের অগাধ বিশ্বাস।

সেদিন মা তাহাকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাস্নানে যান। আমরা যে কাপড় গামছা মায়ের জন্য লইয়া গিয়াছিলাম, ব্রহ্মচারিগণ তাহা অনেকগুলি নতুন কাপড়ের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিলেন। মা কিন্তু উহার ভিতর হইতে আমাদের দেওয়া কাপড় ও গামছা লইয়া স্নান করিতে গেলেন। গঙ্গাস্নান করিয়া ঘাটের ব্রাহ্মণকে মা একটি পয়সা দিয়া বলিলেন, "বৌমাকে চন্দন পরিয়ে দাও।" আহারের সময় নিজ পাত হইতে তাহাকে প্রসাদ দেন এবং আহারান্তে বিশ্রামের সময় পদসেবা করিতে বলেন। আমার মেয়েটি একখানি কম্বলে শুইয়া তাহা নোংরা করিয়াছিল। আমার স্ত্রী তাহা ধুইয়া দিতে উদ্যত হইলে মা তাহার হাত হইতে উহা কাড়িয়া লইয়া নিজেই ধুইয়া আনিলেন। পরিবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মা তুমি কেন ধোবে?" মা উত্তর করিয়াছিলেন, "কেন ধোব না, ও কি আমার পর?"

বৈকালে আমি 'উদ্বোধন' অফিসে গিয়া দেখি একমাত্র উপেনবাবু রহিয়াছেন। শুনিলাম—অন্য সকলে বিবেকানন্দ সোসাইটির উৎসবে গিয়াছেন। আমি নিজেই উপরে উঠিয়া মাকে প্রণাম করিতে তিনি বলিলেন, "দেখ, আজ ছেলেরা কেউ নেই, ভক্তদের দর্শনের দিন। তুমি আজ সকলকে ডেকে আনবে, প্রসাদ দেবে।" কিছুক্ষণ পরে আমি ভক্তদের ডাকিয়া আনিলাম ও প্রণামান্তে প্রসাদ বিতরণ করিলাম। ক্রমশ ভক্তগণ চলিয়া গেলেন।

মা বলিলেন, "আজ তুমি আমার ঘরের ছেলেটি হয়েছ—সকলকে ডেকে আনলে, প্রসাদ দিলে।"

আমি—কেন, আমি কি তোমার ঘরের ছেলে নই?

মা—হ্যাঁ, তা বই কি—তুমি আমার আপনার ছেলে।

এই বলিয়া আমার পরিবারকে বলিলেন, "হ্যাঁ, মা, সকলেই আমার ছেলে, তবে কারো কারো সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক। ওর সঙ্গে আমার বিশেষ সম্পর্ক। দেখছ না সর্বদা যায় আসে, খুব আপনার।"

তারপর আমাদিগকে প্রসাদ ও পান দিয়া মা আমার চিবুক ধরিয়া সস্নেহে বলিলেন, "আর ভয় কি? খুব সহজ হয়ে গেছ তো? তোমাদের এই-ই শেষ জন্ম।"

আমি বলিলাম, "সহজ বই কি? তোমার কৃপা হলেই সব সহজ।"

আমার স্ত্রী শ্রীশ্রীমায়ের জন্য একখানি আসন তৈয়ারি করিয়া লইয়া গিয়াছিল। তাহা পাইয়া মায়ের খুব আনন্দ। সকলকে দেখান আর বলেন, "আহা! দেখ, বৌমা কেমন সুন্দর আসন তৈরি করেছে।" ভক্তের একটি সামান্য জিনিস পাইয়াই তাঁহার এত আনন্দ!

* * *

আর একবার অপর চারিজন ভক্তসহ জয়রামবাটী গিয়াছিলাম। কোয়ালপাড়া মঠ হইতে এমন সময় রওনা হই যে বেলা থাকিতেই শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি পৌঁছিবার কথা। সঙ্গে ঐদেশী একটি কুলিও ছিল। আমার জানা রাস্তা, কিন্তু মায়ের বাড়ির নিকট গিয়া পথ ভুল হইয়া গেল। কিছুতেই আর পথ খুঁজিয়া পাই না। ঐদেশী লোকটিরও গোলমাল হইয়া গিয়াছে। ক্রমে রাত্রি হইল। সঙ্গীরা প্রমাদ গণিলেন। তখন আমরা সকলেই ক্লান্ত। কি করি—এক বাঁশবনের ভিতরে আমি কম্বল পাতিয়া বসিয়া পড়িলাম। মায়ের উপর বড় অভিমান হইল—'মা, আমরাই শুধু তোমাকে খুঁজব, আর তুমি কিছুই দেখবে না।' এমন সময় দেখি, একটি আলো লইয়া রাসবিহারীদাদা ও হেমেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। এই রাত্তিরে এ পথে তাঁহাদের আগমনে বিস্মিত হইলাম। তাঁহারা বলিলেন, "আমরা এ দিকে আসব—কোন কথাই ছিল না। ভাগ্যে এ পথে এসে পড়েছি।" শ্রীশ্রীমাকে দর্শন ও প্রণাম করিবার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ, বাবা, তোমরা বুঝি খুব ঘুরেছ?"

আমি—হ্যাঁ, মা, পথ ভুল হয়েছিল।

তখন শ্রীশ্রীমায়ের জন্য নতুন বাড়ি হইতেছিল। পূর্বোক্ত ব্রহ্মচারিদ্বয় ঐ কাজে খুব ব্যস্ত থাকিতেন। শ্রীহট্ট হইতে দুইটি ভক্ত আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি পূর্বে (অরুণাচলের) দয়ানন্দ স্বামীর ভক্ত ছিলেন। তিনি ইঁহাকে প্রহ্লাদের অবতার বলিয়া নিজ ভক্তগণ মধ্যে প্রচার করিতেন। আমি উক্ত ভক্ত দুইটিকে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট লইয়া যাই। তাঁহারা প্রণাম করিলে আমি বলিলাম, "মা, অরুণাচলে দয়ানন্দ নামে এক সাধু নিজেকে অবতার বলেন, এটি তাঁরই ভক্ত ছিল। তিনি বলিতেন—এ প্রহ্লাদ।" মা হাসিয়া উত্তর করিলেন, "অবতারই বটে!"

এবার মা এই ভক্ত দুটিকে দীক্ষা দিয়াছিলেন।

আমি আর একজন সাধুর নাম করিয়া বলিলাম যে, তিনিও অনেক লোককে দীক্ষা দিতেছেন। মা বলিলেন, "এসব অনেকটা ব্যবসাদার সাধু। তবে কি জান, এতেও উপকার হবে। মানুষ তো কিছু করে না, এদের কথাতেও কিছু কিছু ভগবানের নাম করবে।"

"আন্তরিক হলে শেষটা ক্রমে এখানেই এসে পড়বে। দেখছ না এখন তারকব্রহ্ম নামের ছড়াছড়ি। একটু সার থাকলে কেউ বড় বাদ যাবে না।"

আমাদের সঙ্গী ভক্ত চারটিকে মা দীক্ষা দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি ছেলেমানুষ ভক্তকে মা দীক্ষান্তে বলিয়াছিলেন, "একশ আট বার জপ করবে।" তাহাতে সে সন্তুষ্ট হয় নাই। তাহার ইচ্ছা হাজার লক্ষ বার জপ করে। মা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "এখন মনে করছ বটে—সে তো তোমরা পারবে না, কত কাজ তোমাদের করতে হয়। বেশি পার ভালই।"

মাকে পূজা করিবার জন্য একদিন কিছু পদ্মফুল সংগ্রহ করিয়া আনিলাম। মা বলিলেন, "কয়েকটি সিংহবাহিনীকে দিয়ে এস, আর কিছু রেখে যাও।"

একটি ভক্ত বলিলেন, "সব ফুল আপনার পায়ে দিয়ে পূজো করব।"

মা—আচ্ছা, সে হবে! এইতো আমার পা, তার আবার পূজো!

মাকে বলিয়াছিলাম, "মা, ঠাকুর বলতেন—'শুদ্ধা ভক্তি সকলের সার।' আমাকে আশীর্বাদ কর যেন তাই লাভ হয়।" নিকটে আরও কয়েকজন ভক্ত ছিলেন; মা চুপ করিয়া রহিলেন। ক্রমে সকলে চলিয়া গেলে মা আমাকে একান্তে বলিলেন, "ও কি সকলেরই হয় গা? তবে তোমার হবে।"

মা রাধুকে বলিয়াছিলেন, "রাধু, তোর দাদা এসেছে, প্রণাম কর।" আমি ভাবিলাম—'সে কি? আমি যে কায়স্থ!' সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল—'মা তো আর আমার অমঙ্গল করবেন না।' তখন উভয়েই উভয়কে প্রণাম করিলাম।

একদিন পান্তাভাত খাইতে ইচ্ছা হওয়ায় মায়ের কাছে গিয়া চাহিলাম। মা বলিলেন, "দাঁড়াও, আমি লঙ্কা মরিচ আর বড়া ভেজে দিই। তোমাদের দেশে খুব লঙ্কা ভালবাসে!" গ্রামোফোনের অনুকরণে—"অষ্ট গণ্ডার একটাও কম দিমু না" বলিয়া মা খুব হাসিতে লাগিলেন।

জয়রামবাটীতে অন্য একদিন মা বলিয়াছিলেন, "বাবা, সারাদিন যেন কুস্তি করছি, এই ভক্ত আসছে তো এই ভক্ত আসছে। এ শরীরে আর বয় না। ঠাকুরকে বলে 'রাধু, রাধু' করে মনটা রেখেছি।" আমার মনে হইল—ঠাকুর যেমন 'জল খাব, তামাক খাব' বলিয়া মনকে বাহ্য জগতে একটু নামাইয়া রাখিতেন, একি তাই? এত কষ্ট সহ্য করিয়া মা বহুজনহিতায় শরীর রাখিতেছেন?

বিদায় গ্রহণের সময় বলিলাম, "মা, আমার মতো তোমার লাখ লাখ ছেলে আছে, কিন্তু তোমার মতো মা আর আমার নেই।" এই কথা শুনিয়া মা সজল-নয়নে সস্নেহে আমার চিবুকে হাত দিয়া চুম্বন করিলেন।

* * *

একবার শ্রীশ্রীমায়ের অসুখের পর হাওয়া-পরিবর্তনের জন্য তাঁহাকে রাঁচি আনিবার প্রস্তাব করিতে আমি জয়রামবাটী গিয়াছিলাম। তখন চৈত্র মাস। প্রস্তাব শুনিয়া মা বলিলেন, "চৈত্র মাসে কোথাও যেতে নেই। তারপর শরৎ* নিতে এসে এতদিন থেকে গেল, কলকাতায় না গিয়ে আর কোথাও কি করে যাই?"

সেই সময় স্বামী কেশবানন্দের একটি ভগ্নী মারা যান। আমি মাকে বলিয়াছিলাম, "মা, বুড়ো বয়সে স্বামী কেশবানন্দের মা একটা শোক পেলেন—বড়ই দুঃখের কথা।"

মা বলিলেন, "শোকে তার কিছু করতে পারবে না।"

মায়ের কথা শুনিয়া ফিরিবার পথে কোয়ালপাড়ায় আমি তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়া দেখিলাম—তাঁহার শোকের নামগন্ধও নাই, সেই সদা হাস্যমুখ! ভাবিলাম—'স্বয়ং বশিষ্ঠ ঋষির শোক হয়েছিল, এ ঘরের যেন সবই নতুন!'

* * *

'উদ্বোধনে'র বাটীতে একবার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে যাই। মাকে প্রণাম করিবার পর মা করজোড়ে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করিলেন, "ঠাকুর, এদের সকল বাসনা পূর্ণ কর।"

আমি বলিলাম, "সে কি, মা, সকল বাসনা পূর্ণ করলে তো উপায় নেই! মনে যে কত কু-বাসনা রয়েছে!"

মা হাসিয়া বলিলেন, "তোমাদের সে ভয় নেই। তোমাদের যা দরকার, যাতে ভাল হয়, ঠাকুর তাই দেবেন। তোমরা যা করছ করে যাও। ভয় কি? আমরা তো রয়েছি।"

* * *

জয়রামবাটীতে একদিন রাত্রি প্রায় ভোরের সময় বহির্বাটীতে একটি গো-বৎস বড়ই চিৎকার করিতেছিল। দুধের জন্য তাহাকে তাহার মায়ের নিকট হইতে দূরে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। চিৎকার শুনিয়া মা এই বলিতে বলিতে ছুটিয়া আসিলেন—"যাই মা, যাই, আমি এক্ষুণি তোকে ছেড়ে দেব, এক্ষুণি ছেড়ে দেব।" আসিয়াই গো-বৎসের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলেন। আমি অবাক হইয়া জগন্মাতার সর্বভূতে করুণাময়ী মূর্তি দেখিলাম। হায়! এমনি করিয়া ডাকিতে পারিলেই তো বন্ধন মুক্ত হয়।

শ্রীশ্রীমায়ের অপার স্নেহ, অসীম করুণা এবং অনন্ত দয়ার কথা লিখিয়া বুঝাইবার ভাষা নাই। আমরা তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন, স্পর্শন ও কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি—কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা। শত শত ভক্ত সেই পরশমণি স্পর্শে সোনা হইয়াছেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকার

---

* স্বামী সারদানন্দ

(৮)
১৫ পৌষ, মঙ্গলবার, শুক্লপক্ষ, তৃতীয়া তিথি
সন ১৩২০ সাল

কয়েক দিন যাবৎ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে দেখিবার জন্য মনটা বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে; কিন্তু দেখিতে যাইবার কোন উপায় নাই, কাহাকে লইয়া যাই। মা যদি অধম সন্তানকে দয়া করিয়া দর্শন দেন তবেই দেখিব—এইরূপ বসিয়া ভাবিতেছি এমন সময় কমলা ও বিমলা আসিয়া বলিল, "দিদি, তোমায় মা ডাকছেন।" এই কথা শুনিয়া আমার মনে হইল —অভিষ্টসিদ্ধির বুঝি একটি পন্থা বাহির হইবে। কে যেন কানে কানে বলিয়া দিল—'ওরে, মা ডেকেছেন।'

আমি শীঘ্র প্রস্তুত হইয়া বিমলাদের বাড়ি গেলাম, তখন সকাল ৭টা হইবে। গিয়া দেখি ললিত ও তাহার মা বসিয়া কথা বলিতেছেন; আমাকে দেখিয়াই ললিতের মা বলিয়া উঠিলেন, "এই তো বিনু এসেছে, মেয়ে আমার কি পাগল দেখ, অমনি ছুটে এসেছে।"

ললিত বলিল, "দিদি, আপনি নাকি শ্রীশ্রীমাকে দেখতে চেয়েছেন? যান তো আমি আজ নিয়ে যেতে পারি।"

আমি—সে তোমার অনুগ্রহ।

ললিতের মা বলিলেন, "সে কি গো! ছোট ভাইকে অনুগ্রহ বলতে আছে।"

আমি বললাম, "তবে আর কি বলি বলুন, যদি ওদের অনুগ্রহের উপর নির্ভব না করব তবে তা আমি অনেক আগেই মাকে দেখতে যেতে পারতুম।"

এই আনন্দ সংবাদ—সত্যিই মাকে দেখিতে যাইব, সহসা যেন বিশ্বাস করিতে পারিলাম না, তাই ললিতকে বলিলাম, "ভাই, সত্যি বল যাবে কি-না? যদি যাও তো গাড়ি নিয়ে এস।" এই সময় আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাই, মাকে তুমি দেখেছ?" আমার এই কথায় ললিত আনন্দিত হইয়া বলিতে লাগিল, "দিদি, আমি মাকে একবার দেখতে গিয়েছিলুম। আহা! মায়ের কি দয়া, অপূর্ব স্নেহ, দিদি তোমায় কি বলব! মা আবার আমায় যেতে বলেছেন।"

ললিত গাড়ি আনিতে চলিয়া গেল; যাইবার সময় বলিয়া গেল, "আমি গাড়ি আনতে যাচ্ছি, তোমরা প্রস্তুত হয়ে থেকো।"

আমি, ললিতের মা ও তাহার ভগ্নীগণ শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিবার জন্য যাত্রা করিলাম। আমার সঙ্গে পাঁচুও গেল।

পারুল বলিল, "দিদি, তুমি সত্যি জান তো মা বাগবাজারে আছেন?" আমি তাহার এই কথা শুনিয়া চমকিত হইলাম— মা আছেন কি-না তাতো ঠিক জানি না। প্রাণ শঙ্কিত হইয়া উঠিল; মনে মনে ঠাকুরকে বলিতে লাগিলাম, 'হে ঠাকুর, আমায় নিরাশ করো না।'

বেলা ১০টার সময় গাড়ি 'উদ্বোধন' অফিসের সম্মুখে আসিয়া লাগিল। গাড়ি থামিতেই আমি দ্রুত নামিয়া গেলাম। সম্মুখে 'উদ্বোধন' অফিস; মহারাজগণ কাজ করিতেছেন, সেদিকে আমার ভ্রূক্ষেপ নাই। আমার তখন জগৎ শূন্যময় বোধ হইতেছে! যদি এখনই শুনি মা এখানে নাই, তবে আমি কি করিব—ভাবিয়া যেন জ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছি। সম্মুখে যাঁহাকে দেখিতেছি তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি, 'মা আছেন?' আমার কথা শুনিয়া মহারাজগণ মস্তক অবনত করিয়া যাইতেছেন, কেহ কোন উত্তর দিতেছেন না। ইতোমধ্যে ললিত গাড়ি হইতে নামিয়া উপরে চলিয়া গেল দেখিয়া আমিও উহার পিছনে খানিক দূর গিয়াছি, এমন সময় ললিত ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'মা আছেন। আমার প্রাণের ভিতর হইতে একটা ভয়ানক দুশ্চিন্তা সরিয়া গেল, আমি তখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সম্মুখের ঘব ডান দিকে রাখিয়া আমি বাঁদিকের বারাণ্ডা দিয়া চলিলাম। সম্মুখে দেখিলাম—একটি স্ত্রীলোক অর্ধাবগুণ্ঠনে দাঁড়াইয়া আছেন। দুই-তিনটি পুরুষ-ভক্ত তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন দেখিয়া আমি বুঝিলাম ইনিই শ্রীশ্রীমা, যাঁহাকে দেখিবার জন্য আমি উন্মত্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছি। আমি যে তখন কি করিয়াছি মনে নাই। আমাকে দেখিয়াই ভক্তগণ চলিযা গেলেন। আমি ছুটিয়া গিয়া মায়ের পা দুটি ধরিযা বসিয়া পডিলাম।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা হতে এসেছ, কেন এসেছ?"

আমি—কেন এসেছি তা জানি না, মা। মা, আপনি এনেছেন তাই এসেছি।

এমন সময় ললিতেব মা প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন; খানিক দাঁড়াইয়া বলিলেন, "ইনিই কি শ্রীশ্রীমা?"

আমি—হাঁ।

তখন সকলেই তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। এবার শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজার ঘরে উপস্থিত হইলেন, আমরাও তাঁহার সঙ্গে গিযা ঠাকুর-প্রণাম কবিলাম। মা সম্মুখে তক্তপোশের উপর বসিয়া আমাদের বলিলেন "বস, মা বস।" আমরা তাঁহার পদতলে বসিলাম। ললিতের মা সংসারী লোক, মা তাঁহার সহিত সংসারীর ন্যায় কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন।

ললিতের মা বলিলেন, "মা, ঠাকুবেব কথা আমাদের কিছু বলুন, আমরা সংসারী লোক, আমাদের কিছু উপদেশ দিন।"

মা—আমি কিছুই জানি না, মা, ঠাকুরের মুখে যা শুনেছি; তা মা, ঠাকুরের 'কথামৃত' পড়ো, তাতেই সব উপদেশ পাবে।

নিচে গাড়িভাড়া মিটাইয়া ললিত উপরে আসিয়াই একেবারে মায়ের শ্রীচরণে মাথা রাখিয়া সাষ্টাঙ্গে লুটাইয়া পড়িল এবং নিতান্ত আর্তস্বরে দর্শকবৃন্দকে আকুলিত করিয়া অজস্র অশ্রুধারায় ভাসিয়া মায়ের চরণে প্রার্থনা জানাইতে লাগিল, "মা দয়াময়ি গো, দয়া

করুন। মাগো, আপনি এই জগৎ উদ্ধার করতে এসেছেন, আমাকেও টেনে নিন, মা। আমি আপনার চরণ ছাড়ব না, আমাকে পায়ে স্থান দিতেই হবে।" এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। মা স্থির নিশ্চল প্রতিমার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "অমন করো না, বাবা, ওঠ।"

ললিত পনের-ষোল বৎসরের বালক মাত্র। বালকের ছদ্মবেশে আবরিত মহাশক্তি এখন বিকাশোন্মুখ। দিব্য শ্যামবর্ণ সুগঠন চেহারা, ভিতরে ভগবদ্ভক্তিরূপ সুধাস্রোত যেন কানায় কানায় পরিপূর্ণ, বাহিরেও সেই অনুরাগ প্রতিভাত হইতেছে। "আমায় শ্রীচরণে স্থান দিন, মা। বলুন, না হলে আমি উঠব না, বলুন আমায় নিয়েছেন"—বলিয়া ললিত আবার কাঁদিতে লাগিল। এমন সময় সহসা একটি ঘিয়ের ভাঁড়ে পা ঠেকিয়া যাওয়ায় সে অপ্রস্তুত হইয়া উঠিয়া বসিল এবং বলিতে লাগিল, "আমি এ কি করলুম, কেউ ভক্তি করে মাকে ঘি দিয়েছে, আমার তাতে পা লেগে গেল, ছি! ছি! আমি এ কি করেছি!" ইহা বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। সেই সময় ঠাকুরঘরে মস্তকের ঊর্ধ্বভাগে চুল বাঁধিয়া এক গৌরবর্ণা বিধবা বৃদ্ধা ঠাকুরের সেবাকার্যে নিবিষ্টা ছিলেন। তিনি বলিলেন, "বাবা, তুমি মনে দুঃখ করো না, পা লেগেছে তা আর কি করবে? পা তো আর সৃষ্টিছাড়া নয়, এ সৃষ্টির ভিতরে পা দুটোও যে আছে, পা শরীরেরই একটা অংশ।" আমরা তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহার সৌম্য মুখমণ্ডল ও সরল উদার কথাগুলি আমাদের বড়ই ভাল লাগিল। ললিত তাঁহার কথায় যেন অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করিল এবং প্রকৃতিস্থ হইয়া মাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "মা, আমায় আশীর্বাদ করুন।" "ঠাকুর তোমায় আশীর্বাদ করবেন" বলিয়া মা তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। তারপর ললিত নিচে চলিয়া গেল।

একটি ষোল-সতের বছরের মেয়ের হাত ধরিয়া একটি প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোক এই সময়ে দরজার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং মাকে বলিলেন, "মা, এটি আমার মেয়ে। এর একটি মেয়ে হয়েছিল, আজ সকালে সেটি মারা গিয়েছে; এ বড়ই শোকবিহ্বলা, তাই আপনার কাছে নিয়ে এসেছি, সান্ত্বনা পাবে বলে।" ইহা শুনিয়া আমরা সকলে চমকিত হইয়া উঠিলাম। মা বলিলেন, "এস, মা, এস।" মেয়েটি ঘরের মধ্যে আসিয়া মায়ের কাছে বসিল এবং পদধূলি লইবার জন্য হাত বাড়াইল। মা ঈষৎ সরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ, গা, আমায় ছোঁবে কি? এর যে অশৌচ হয়েছে।" এই কথা শুনিয়া মেয়েটির মুখখানি আরও মলিন হইয়া গেল, সে সঙ্কুচিতা হইয়া বসিয়া রহিল। মা তাহার মুখপানে চাহিয়াই সকরুণ হইয়া বলিলেন, "আহা, বাছা! বড় ব্যথা পেয়ে আমার কাছে এসেছ সান্ত্বনা পাবে বলে। আমি তোমার মনে কি কষ্ট দিলুম! তা হোক অশৌচ; এস, মা, আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কর।" এই বলিয়া মেয়েটির আরও কাছে সরিয়া বসিলেন। সে তখন অশ্রুজলে ভাসিয়া মায়ের শ্রীচরণে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল; মাও তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। মা মেয়েটির কাছে বসিয়া মিষ্টবাক্যে তাহাকে প্রবোধ দিতে

লাগিলেন—"আমি তোমায় কি বলব, মা, আমি তো কিছুই জানি না। ঠাকুরের একখানি ছবি নিজের কাছে রেখো, আর জানবে তিনি সত্য—ঠাকুর তোমার কাছে রয়েছেন। তাঁর কাছে কেঁদে কেঁদে মনের দুঃখ জানাবে, ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে বলো—ঠাকুর, আমায় তোমার দিকে নাও, আমায় শান্তি দাও। এ রকম করতে করতে তোমার প্রাণে শান্তি আপনি আসবে। ঠাকুরে ভক্তি রেখো, যখনই কষ্ট হবে, ঠাকুরকে জানিয়ো।" তারপর আমাদের দিকে চাহিয়া মা বলিলেন, "আহা! আজই শোক পেয়েছে! আজ কি স্থির হতে পারে?" মেয়েটির পিতা দ্বারদেশে দাঁড়াইয়াছিলেন; পিতাপুত্রী উভয়ে মাকে প্রণামপূর্বক দুঃখ নিবেদন করিয়া শান্ত হইয়া চলিয়া গেলেন।

এখন ঘর নীরব দেখিয়া আমি বলিলাম, "মা, আমার একটি কথা আছে। যদি আপনি অনুমতি করেন তবে বলি।" আমাকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া সেই সেবানিরতা সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধাটি (পরে জানিলাম তিনি পূজনীয়া গোলাপ-মা) বলিলেন, "বল, মা, বল, তোমার মনের কথা নিঃসঙ্কোচে মায়ের কাছে বল, মার কাছে লজ্জা কি!" তখন আমি বলিলাম, "মা, কথা আর কিছু নয়—আমি স্বপ্নে ঠাকুরকে ও আপনাকে দেখেছিলুম, যেন আপনি আমায় মন্ত্র দিচ্ছেন, কিন্তু তা সম্পূর্ণ হয়নি। সেই থেকে আপনার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় নেবার জন্যে আমি বড় ব্যাকুল হয়েছি।"

মা প্রসন্নমুখে বলিলেন, "বেশ তো, আজই তোমায় দীক্ষা দেব, কিন্তু তোমার স্বামীর মত আছে তো?"

আমি—আমার স্বামীকে আমি একথা বলেছিলুম, তিনি বলেছেন, 'আমার অমত নেই, আমি এখন দীক্ষা নেব না, তুমি নিতে পার।'

মা—তোমার স্বামী কোথায়?

আমি—রায়পুরে।

মা কলের ঘর দেখাইয়া বলিলেন, "ওখান হতে হাত পা ধুয়ে এস।"

আমি—মা, আমি এখনো স্নান করিনি।

মা—তা হোক, স্নান করতে হবে না।

আমি কলঘর হইতে হাত পা ধুইয়া মায়ের নিকট ঠাকুরঘরে গিয়া দেখি মা দুখানা আসন পাতিয়াছেন। সামনের কোশাকোশীতে গঙ্গাজল লইয়া নিজে ঠাকুরের পানে মুখ করিয়া বসিলেন। তাঁহার বাম হাতের নিকট আসনে আমাকে বসিতে বলিলেন, কোশা হইতে গঙ্গাজল লইয়া মা আচমন করিলেন এবং আমায় সেইরূপ করাইলেন; পরে বলিলেন, "কোন্ দেবতায় তোমার ভক্তি?" আমি বলিলে, তিনি আমায় দীক্ষা দিয়া কিরূপে জপ করিব, দেখাইয়া দিলেন। সেইমুহূর্তে একটা পরমানন্দের প্রবাহ হৃদয়মধ্যে বহিয়া গেল, ভিতরে বাহিরে বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাস উঠিয়া আমায় অভিভূত করিয়া ফেলিল। আমি কিছুই জানি না, মা সব শিখাইয়া দিলেন। দীক্ষান্তে মা বলিলেন, 'দক্ষিণা দাও।'

আমি—মা, আমি তো কিছুই জানিনে, আপনি বলে দিন আমি কি করব, আমি তো কিছুই আনিনি।

মা তখন উঠিয়া গিয়া ফুল, কমলালেবু, কুল প্রভৃতি দুই হাতে অঞ্জলি করিয়া আনিয়া আমার হাতে দিলেন এবং বলিলেন, "বল—আমার পূর্বজন্মের ইহজন্মের জানত অজানত যাহা কিছু পাপপুণ্য করিয়াছি, সব তোমাকে সমর্পণ করিলাম।" আমিও তাই বলিলাম, মা হাত পাতিয়া সব গ্রহণ করিলেন।

মা! এই দীন হীন কাঙাল অধমের উপর একি অহৈতুকী দয়া তোমার ! আমার প্রাণ মন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল—একি দেখিলাম! একি শুনিলাম! আমি কায়-মন-প্রাণ মায়ের শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া আজ ধন্য হইলাম। মাকে প্রণাম করিয়া বারাণ্ডায় আসিয়া আবিষ্টের ন্যায় ঘণ্টাখানেক রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। এমন সময় ঘরে একটি বালিকার চিৎকার কোলাহল আর মায়ের কথা শুনিয়া ঘরের ভিতরে গেলাম। আমাকে দেখিয়া মা বলিলেন, "বস, মা, বস।" আমি বসিলে মা বলিলেন, "এটি আমার ভাইঝি, নাম রাধারানী। ওর মা পাগল হতে আমিই ওকে মানুষ করি!" মা তাহাকে ধরিয়াছিলেন, কিন্তু সে অস্থির হইয়া পালাইবার চেষ্টা করিতেছিল। মা তাহাকে কতরকম বুঝাইতেছিলেন। তাহার চুল বাঁধিয়া দিলেন, তাহাকে কাপড় পরাইলেন, নিজের হাতে খাওয়াইয়া দিলেন আর কতই স্নেহপূর্ণ কথা বলিতে লাগিলেন! আমি শ্রীশ্রীমায়ের এই প্রাকৃত লোকের ন্যায় ব্যবহার অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলাম। এমন সময় আমায় গঙ্গাস্নান করিবার জন্য ডাকায় আমি উঠিয়া গেলাম। স্নানের পর ফিরিয়া আসিয়া দেখি, মা ঠাকুরের ভোগ দিতেছেন। ঠাকুরঘর হইতেই আসিয়া তিনি ঠাকুরের ভোগের ঘরে গেলেন, সেখানে ভোগ সজ্জিত রহিয়াছে; পরে সেই ঘরের দোর বন্ধ করিয়া আমাদের ঘরে আসিলেন। কিছুক্ষণ পরে মহারাজগণ আহারে বসিলেন। গোলাপ-মা পরিবেশন করিতেছেন, আহার শেষ হইলে মহারাজগণ চলিয়া গেলেন। ঠাকুরের ভোগের থালা মায়ের জন্য মাঝের ঘরে আনা হইল এবং আমরা যে কয়েকটি স্ত্রীলোক আছি আর পাঁচু (পাঁচ বৎসরের একটি বালক, যে আমার সঙ্গে আসিয়াছিল) এই কয়জনের জন্য সেই ঘরে জায়গা হইল। শ্রীশ্রীমা এবং আমরা সকলেই আহারে বসিলাম। আমার ইচ্ছা মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করিব, তাই চুপ করিয়া বসিয়া আছি। সকলে ভাত মাখিয়া লইলেন, আমি হাতও দিলাম না। মা দুই-তিন বার বলিলেন, 'খাও, খাও।' এমন সময় গোলাপ-মা আসিয়া জিজ্ঞসা করিলেন, "কি হয়েছে গা?" তাঁহাকে বলিলাম, "আমাকে দুটি প্রসাদ দিন।" মা তখন ভাত মাখিয়া অল্প দুটি খাইয়া আমার পাতে তুলিয়া দিলেন। আহা! কি অমৃতই সেদিন খাইলাম, কি বলিব! অড়হর ডাল, কপির চচ্চড়ি, চালতের অম্বল, আর গোলাপ-মা মাছ রাঁধিয়াছিলেন, ভারি সুন্দর হইয়াছিল। পাঁচু তো "আরো চচ্চড়ি খাব" বলিয়া

গোলমাল আরম্ভ করিয়া দিল। তাহাকে চুপি চুপি ধমকাইলেও শুনে না। এ সময় গোলাপ-মা আবার আসিয়া বলিলেন, "কি হয়েছে, অমন করছে কেন ছেলেটি ?"

আমি বলিলাম, "ওকে আনতে চাইনি, মা। আমি লুকিয়ে আসছিলুম, গাড়ি যেই কিছুদূরে গিয়েছে, ও রাস্তায় খেলা করছিল, অমনি ছুটে এসে গাড়িতে উঠল, আর এখন 'আরও চচ্চড়ি খাব' বলে গোলমাল করছে।" এই কথা শুনিয়া মা, গোলাপ-মা, সকলে হাসিতে লাগিলেন। গোলাপ-মা বলিলেন, "তুমি ওকে ফাঁকি দিতে চেয়েছিলে—পারবে কেন ? ওর সুকৃতি ছিল, তাই মাকে দেখতে পেলে, এ কি কম ভাগ্য গা ! ওর ভাল হবে।" মা-ও "হ্যাঁ, তাই তো" বলিয়া 'সায়' দিলেন।

আহারের পর আমি সারাদিন মায়ের কাছে বসিয়া রহিলাম। আমার রায়পুর যাইবার কথা ছিল। সে দূর দেশ, আর শীঘ্র যদি মাকে না দেখিতে পাই সেই আশঙ্কায়, পারুল ও কমলা আমায় ডাকিয়াছিল, তবুও আমি গেলাম না। ছাদে মা চুল শুকাইতেছিলেন, শীতকাল তাই রোদে বসিয়াছেন আর আমার কাছে বাপের বাড়ির গল্প করিতেছেন, "রাধুকে মানুষ করলুম, সেটি পাগল, খাইয়ে না দিলে খায় না ; আব আমারও শরীর ভাল নয়, মা, বাতের বেদনায় কষ্ট পাচ্ছি। এই অসুখের জন্যে কাশী বৃন্দাবন গেলুম, কিন্তু কিছুই হলো না।"

আমি—কাশী বৃন্দাবন গিয়েছিলেন ?

মা—কি করে বলব।

একথা সেকথার পর মা বলিলেন, "তোমার এই অল্প বয়স, ছেলেমানুষ তুমি, তোমার এ সময় দীক্ষা নেবার ইচ্ছা কেন হলো ?"

আমি—কি জানি, মা, সংসার আমার ভাল লাগে না। প্রাণ যেন সংসার চায় না, প্রাণে বড়ই অশান্তি ছিল, আজ আমি শান্তি লাভ করেছি। আর এ সংসারও অনিত্য, দুদিনের জন্য, দেখছি সবই মিথ্যা। কি করে তাতেই বা মন বসবে, মা ?

এই সময়ে মায়ের সমবয়স্কা একটি স্ত্রীলোক আসিয়া তাঁহার নিকট বসিলেন। আমি মায়ের খুব কাছে বসিয়াছিলাম, তাঁহার ছায়া আমার গায়ে পড়িয়াছে দেখিয়া উক্ত স্ত্রীলোকটি আমায় ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "তুমি কেমন মেয়ে গা, মায়ের ছায়ার উপর বসেছ ? পাপ হবে যে, সরে বস।" আমি ইহা জানিতাম না। মা যে আপন হইতেও আপনার, তাই একেবারে কাছে বসিয়াছিলাম, এখন একটু অপ্রতিভ হইয়া সরিয়া বসিলাম। উক্ত স্ত্রীলোকটি মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মেয়েটি কে ?"

মা—এ মেয়েটি আজ দীক্ষা নিয়েছে, বড় ভক্তিমতী মেয়ে।

মায়ের এই কথায় আমি লজ্জিতা হইয়া পাশের ঘরে পারুলরা গল্প করিতেছিল সেখানে উঠিয়া গেলাম। এমন সময় ললিত আসিয়া বলিল, "দিদি, চল, গাড়ি প্রস্তুত। বেলা গিয়েছে।" আমি মায়ের নিকট বিদায় লইতে গেলাম।

মা বলিলেন, "আবার কবে আসবে, মা?"

আমি—আপনি যেদিন মনে করে আনবেন সেই দিনই আসব; আমার কোন সাধ্য নেই। মা, আশীর্বাদ করুন; আমায় মনে রাখবেন মা।

মা—আবার এস, মা।

আমি কাতর নয়নে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলাম; তিনি দুই খিলি পান আনিয়া আমায় দিলেন। আমি মায়ের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া যেন 'আমাকে রাখিয়া' দেহটি লইয়া বিদায় লইলাম। মা-ও সজল নয়নে সিঁড়িতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমার অন্তর-বাহির আজ পরিপূর্ণ; গাড়িতে বসিয়াও যেন তাঁহার কথা শুনিতে লাগিলাম। মায়ের কথা মা রক্ষা করাইয়াছিলেন; দুই বৎসর পরে রায়পুর হইতে ফিরিয়া মায়ের অসুখের সময় আবার তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলাম।

শ্রীমতী—

(৯)

শ্রীশ্রীমায়ের শেষ অসুখের সময় একদিন সকাল বেলা মাকে দর্শন করিতে যাই। তখন ঘরে আর কেহ ছিলেন না। মা সর্ব-দক্ষিণের ঘরে ছিলেন। সেই সময় কয়েক দিন একটু ভাল ছিলেন। দিনের বেলায় ঐ ঘরেই মায়ের বিছানা করিয়া দেওয়া হইত। চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহ। শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিতেই মা বাড়ির সব কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। মায়ের শরীর খুব রুগ্ন দেখিয়া আমি বলিলাম, "মা, আপনার শরীর এবার বিশেষ খারাপ হয়ে গেছে। এত দুর্বল শরীর কখনও দেখি নাই।"

মা বলিলেন, "হ্যাঁ, বাবা, দুর্বল খুব হয়েছে। মনে হয় এ শরীর দিয়ে ঠাকুরের যা করবার ছিল, শেষ হয়েছে। এখন মনটা সর্বদা তাঁকে চায়, অন্য কিছু আর ভাল লাগে না। এই দেখ না, রাধুকে এত ভালবাসতুম, ওর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কত করেছি, এখন ভাব ঠিক উলটে গেছে। ও সামনে এলে ব্যাজার বোধ হয়, মনে হয়—ও কেন সামনে এসে আমার মনটাকে নিচে নামাবার চেষ্টা করছে? ঠাকুর তাঁর কাজের জন্যে এত কাল এই সব দিয়ে মনটাকে নামিয়ে রেখেছিলেন। নইলে তিনি যখন চলে গেলেন, তারপর কি আমার থাকা সম্ভব হতো?"

আমি—মা, আপনি এরূপ কথা বললে আমাদের বড় কষ্ট হয়। আপনি যদি চলে যান, আমাদের উপায় কি হবে? আমাদের ত্যাগ-তপস্যার বিশেষ অভাব। বৈরাগ্য তো একেবারে নেই বললেই চলে। আপনার শরীর না থাকলে আমরা কিসের জোরে মহামায়ার রাজত্বে বেঁচে থাকব? মনে যখন কোন দুর্বলতা এসেছে, আপনার কাছে বলে তা হতে বাঁচবার রাস্তার খবর পেয়েছি। এখন আমরা কোথায় যাব? আমাদের যে একেবারেই নিরাশ্রয় হয়ে পড়তে হবে।

মা—(দৃঢ়তার সহিত বলিলেন) কি! তোমরা নিরাশ্রয় হবে কেন? ঠাকুর কি তোমাদের ভালমন্দ দেখছেন না? অত ভাবো কেন? তোমাদের যে তাঁর পায়ে সঁপে দিয়েছি। একটা গণ্ডির মধ্যে তোমাদের ঘুরতে হবেই, অন্য কোথাও যাবার জো নেই। তিনি সর্বদা তোমাদের রক্ষা করছেন।

আমি—ঠাকুরের দয়ার কথা অনেক সময় মনে হলেও সব সময় ঠিক বুঝতে পারি না। অনেক সময় বিশ্বাস হয়, অনেক সময় সন্দেহও আসে। আপনাকে সাক্ষাৎ দেখছি, ভাল মন্দ অনেক কথা বলেছি, আপনিও তার ভাল মন্দ বিচার করে কখন কিভাবে চললে আমার ভাল হবে, বলে দিয়েছেন। এতে আপনার কাছে আশ্রয় পেয়েছি, এটা বিশ্বাস হয়।

মা বলিলেন, "ঠাকুর একমাত্র রক্ষাকর্তা—এটি সর্বদা মনে রাখবে। এটি ভুললে সব ভুল! আজ যে তোমার বাড়ির কথা, মার কথা এত জিজ্ঞাসা করলুম, কেন জান? প্রথম গণেনের মুখে তোমার বাপ-মরার খবর শুনলুম। ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তোমার মার আর কে আছে, খাবার সংস্থান আছে কি-না, তুমি না থাকলে তাঁর চলবে কি-না; যখন শুনলুম তুমি না থাকলেও তাঁর চলবে, তখন মনে হলো, 'যাক, ছেলেটার যদি একটু সৎ বুদ্ধি হয়েছে, ঠাকুরের ইচ্ছায় তার সৎপথে থাকবার বিশেষ বাধা পড়বে না।'

"মার সেবা করা সকলের উচিত, বিশেষ যখন তোমরা সকলের সেবা করবার জন্য এখানে এসেছ। তোমার বাপ যদি টাকা না রেখে যেতেন তা হলে তোমাকে টাকা রোজগার করে মার সেবা করতে বলতুম। ঠাকুরের ইচ্ছায় তিনি তোমার কোন উৎপাত রাখেননি। কেবল মেয়েমানুষের হাতে থেকে টাকাগুলো নষ্ট না হয়ে যায়, এর একটা বন্দোবস্ত করা ও দেখাশুনা করলেই হয়ে যাবে। এটা কি কম সুবিধে? টাকা রোজগার মানুষ সৎভাবে করতে পারে না—মন বড় মলিন করে দেয়। এজন্যে তোমায় বলছি, টাকা-কড়ির ব্যাপার যত শিগ্গির সম্ভব সেরে ফেল। বেশি দিন ওসব নিয়ে থাকলেই ওতে একটা টান পড়বে, টাকা এমনি জিনিস! মনে করছ ওতে আমার টান নেই, যখন একবার ছাড়তে পেরেছি তখন আর টান হবে না, যখন ইচ্ছে চলে আসব। না, একথা কখনো মনে ভেব না। কোন ফাঁক দিয়ে তোমার গলা টিপে ধরবে, তোমায় বুঝতে দেবে না। বিশেষ তোমরা কলকাতার ছেলে, টাকা নিয়ে খেলা করতে তোমরা জান। যত শীঘ্র পার মার বন্দোবস্ত করে কলকাতা থেকে পালিয়ে যাও। আর মাকে যদি কোন তীর্থস্থানে নিয়ে যেতে পার, দুজনে বেশ ভগবানকে ডাকবে, মা-ব্যাটা-সম্পর্ক ভুলে। এই শোকের সময় মার মনে খুব কষ্ট, এটি হলে বেশ হয়। তোমার মারও তো বয়স হয়েছে। তাঁকে খুব বোঝাবে। এই সব কথা মার সঙ্গে কইবে।

"মার পথের সঞ্চয় করবার সাহায্য করতে পার তবেই তো ঠিক ছেলের কাজ করলে। তাঁর বুকের রক্ত খেয়ে যে এত বড় হয়েছ, কত কষ্ট করে তোমায় মানুষ করেছেন! তাঁর সেবা করা তোমার সব চেয়ে বড় ধর্ম জানবে। তবে তিনি যদি ভগবানের পথে যেতে বাধা

দেন তখন অন্য কথা। তোমার মাকে একবার এখানে নিয়ে এস না, দেখব কেমন। যদি ভাল বুঝি, দু-একটা কথা বলে দেব। কিন্তু সাবধান, মার সেবা করছি ভেবে বিষয় নিয়ে মেতো না, একটা বিধবার খাওয়া-পরা বই তো না! কত টাকাই বা চাই! কিছু লোকসান দিয়েও যদি তাড়াতাড়ি বন্দোবস্ত হয়, তার চেষ্টা করবে। ঠাকুর তো টাকা ছুঁতেই পারতেন না। তোমরা তাঁর নামে বেরিয়েছ, সব সময় তাঁর কথা মনে ভাববে। জগতে যত অনর্থের মূল—টাকা। তোমাদের কাঁচা বয়স, হাতে টাকা থাকলেই মন লোভ দেখাবে। সাবধান!"

আমি—আমার মনে হয়েছিল আমার মাকে একদিন আপনার কাছে আনব। কিন্তু আপনার শরীর দেখে আর আনবার ইচ্ছ হচ্ছে না।

মা—না, না, একদিন নিয়ে এস। কত লোক তো আসছে। আর শরীর তো দিন দিন খারাপ হবেই। শিগ্‌গির শিগ্‌গির নিয়ে এস। সকাল বেলাটায় শরীর মন্দ থাকে না। সকাল বেলা আনতে পারবে না? বেশি বেলা করো না, দেরি হলে এরা তো আসতে দেবে না।

আমি—মা, আপনার কথা শুনে বড় কষ্ট হচ্ছে। বারবার নিজের শরীর সম্বন্ধে যে সব কথা বলছেন, তাতে মনে হয়, শরীর ধরবার আর আপনার ইচ্ছে নেই।

মা বলিলেন, "এ শরীর থাকা না থাকা আমার হাত নয়—তাঁর ইচ্ছা। তোমরা এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? এই আমার কাছে তোমরা কত সময়ই বা থাক? কখন মঠে, কখন বা বাইরে থাক। আমার সঙ্গে কথাবার্তা কইবার বা কাছে থাকবার কয়জনের সুবিধা হয়? তোমরা তো কখন কোথায় থাক খবর পর্যন্ত দাও না।"

আমি—আমাদের থাকবার সুবিধা হয় না বটে, কিন্তু আমাদের মনে বিশ্বাস আছে আপনি আছেন, মনে যখন দুর্বলতা আসবে আপনার কাছে আসলেই দূর হয়ে যাবে।

মা—তোমরা কি মনে কর, যদি ঠাকুর এ শরীরটা না রাখেন, তা হলেও যাদের ভার নিয়েছি তাদের একজনও বাকি থাকতে আমার ছুটি আছে? তাদের সঙ্গে থাকতে হবে। তাদের ভাল-মন্দের ভার যে নিতে হয়েছে। মন্ত্র দেওয়া কি চারটিখানি কথা! কত বোঝা ঘাড়ে তুলে নিতে হয়! তাদেব জন্যে কত চিন্তা করতে হয়! এই দেখ না, তোমার বাপ মারা গেলেন, আমারও মনটা খারাপ হলো। মনে হলো—ছেলেটাকে ঠাকুর কি আবার এক পরীক্ষায় ফেললেন! কিসে ঠেলেঠুলে বেঁচে উঠবে—এই চিন্তা। সেইজন্যই তো এত কথা বললুম। তোমরা কি সব বুঝতে পার? যদি তোমরা সব বুঝতে পারতে, আমার চিন্তার ভার অনেক কমে যেত। ঠাকুর নানান ভাবে নানা জনকে খেলাচ্ছেন—টাল সামলাতে হয় আমাকে। যাদের নিজের বলে নিয়েছি, তাদের তো আর ফেলতে পারিনে।

আমি—মা, আপনার অবর্তমানে কার কাছে যাব, কি হবে, ভাবতে গেলে বড় ভয় হয়।

মা বলিলেন, "কেন, এই রাখাল টাখাল এই সব ছেলেরা রয়েছে, এরা কি কম? তুমি তো রাখালকেও খুব ভালবাস। তার কাছে জিজ্ঞাসা করে নেবে। কি আর জিজ্ঞাসাই বা করবে। বেশি জিজ্ঞাস করা ভাল নয়। একটা জিনিস হজম করতে পারে না, আবার দশটা

জিনিস মনের মধ্যে পুরে এটা না ওটা কেবল এই চিন্তা। যে জিনিস পেয়েছ, তাইতে ডুবে যাও। জপধ্যান করবে, সৎসঙ্গে থাকবে, অহঙ্কারকে কিছুতেই মাথা তুলতে দেবে না। দেখছ না রাখালের কেমন বালকভাব, এখনও যেন ছোট ছেলেটি! শরৎকে দেখ না, কত কাজ করে, কত হাঙ্গামা পোহায়—মুখ বুঁজে থাকে। ও সাধু মানুষ, ওর এত সব কেন? ওরা ইচ্ছা করলে দিনরাত ভগবানে মন লাগিয়ে বসে থাকতে পারে। কেবল তোমাদের মঙ্গলের জন্যে এদের নেমে থাকা। এদের চরিত্র চোখের সামনে ধরে রাখবে, এদের সেবা করবে; আর সর্বদা মনে ভাববে আমি কার সন্তান, কার আশ্রিত! যখনই মনে কোন কু-ভাব আসবে, মনকে বলবে—তাঁর ছেলে হয়ে আমি কি এ কাজ করতে পারি? দেখবে, মনে বল পাবে, শান্তি পাবে।"

ব্রঃ অশোককৃষ্ণ

(১০)

শ্রীশ্রীমা আমাকে দীক্ষাদানের পর বলেছিলেন, "দেখ, মা, আমি কড়ে রাঁড়ীকে মন্ত্র দিই না, তবে তুমি ভাল, তাই দিলুম। দেখো, যেন আমায় ডুবিয়ো না। শিষ্যের পাপে গুরুকে ভুগতে হয়। সব সময় ঘড়ির কাঁটার মতো ইষ্ট-মন্ত্র জপ করবে।"

আর একবার শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় বলেছিলেন, "কারু সঙ্গে মিশবে না, কারু জামাই, বেয়াই কুটুম আসুক, তার কোন কিছুতেই থাকবে না। 'আপনাতে আপনি থেকো, যেয়ো না মন কারো ঘরে।' ঠাকুর নারকেলের লাড়ু ভালবাসতেন, দেশে গিয়ে তাই করে তাঁকে ভোগ দেবে, আর তাঁর সেবা জপ-ধ্যান বাড়াবে, ঠাকুরের বই সব পড়বে।"

একদিন মা ও আমি ছিলুম, আর কেউ ছিলেন না। মা বললেন, "দেখ মা, পুরুষ-জাতকে কখনো বিশ্বাস করো না—অন্য-পরের কথা কি, নিজের বাপকেও না, ভাইকেও না, এমনকি স্বয়ং ভগবান যদি পুরুষরূপ ধারণ করে তোমার সামনে আসেন, তাঁকেও বিশ্বাস করো না।"

মঠে বা যে-সব স্থানে সাধু-সন্ন্যাসীরা থাকেন সে-সব জায়গায় বেশি যেতে বারণ করতেন। বলতেন, "দেখ, মা, তোমরা তো ভাল মনে ভক্তি করেই যাবে কিন্তু তাতে তাদের মনে ক্ষতি হলে সেই সঙ্গে তোমারও পাপ হবে।"

যখন-তখন যার-তার সঙ্গে তীর্থে যেতে বারণ করেছিলেন। বলেছিলেন, "তোমার হাতে যখন দু-পয়সা হয়, দশ-বিশ জন বামুন খাইয়ে দিও।" একটি স্ত্রী-ভক্ত সামনে বসেছিলেন, তাঁকে দেখিয়ে বললেন, "এই দেখ একজন, তীর্থ করতে গিয়ে কেমন ঠোক্কর খেয়ে এসেছে—'তীর্থগমন দুঃখভ্রমণ মন-উচাটন হয়ো নারে'; 'ভ্রমিয়ে বারো, ঘরে বসে তের, যদি করতে পার'।"

একদিন স্ত্রী-ভক্তেরা অপর একজনের নামে পাঁচ জনে পাঁচ রকম সমালোচনা করছিলেন ; সেই সময় মা আমায় বললেন, "তুমি তাকে ভক্তি করবে। সে-ই তোমায় প্রথমে এখানে এনেছিল।"

পরের একটি ছেলে নিয়ে মানুষ করতে চেয়েছিলুম। তার উত্তরে শধুর জন্য নিজের অবস্থা দেখিয়ে মা বলেছিলেন, "অমন কাজও করো না। যার উপর যেমন কর্তব্য করে যাবে,কিন্তু ভাল এক ভগবান ছাড়া আর কাউকে বেসো না। ভালবাসলে অনেক দুঃখ পেতে হয়।"

শ্রীশ্রীমায়ের নিকট আমার মন্ত্রগ্রহণের কথা শুনে আমাদের বাড়ির গুরু আমায় শাপ দিয়েছিলেন, মাকে সে কথা লিখেছিলুম। মা চিঠিতে উত্তর জানালেন, "যে ঠাকুরের শরণাগত হয়, তার ব্রহ্মশাপেও কিছু হয় না। তোমার কোন ভয় নাই।"

জনৈকা প্রাচীনা স্ত্রী-ভক্ত একদিন আমায় বলেছিলেন, "মঠে ফটে আর এখন কিছু নেই।" —তাই মাকে গিয়ে বলেছিলুম। মা শুনে চমকে উঠে বললেন, "যদি এখনও ধর্ম কিছু থাকে তো সে এখানে, আর মঠে।"

একদিন জনৈকা স্ত্রী ভক্তের কথা আলোচনা করতে করতে আমি ও নলিনীদিদি মাকে বললুম, "কিন্তু তার উপর তো আমাদের কোন অভক্তি আসছে না ?"

মা বললেন, "সে যে ঠাকুরকে ডাকে। যে ঠাকুরকে ডাকে সে যেমনই হোক, তার উপর অভক্তি হয় না।"

শ্রীমতী—

(১১)

১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে শ্রীশ্রীমাকে প্রথম দর্শন করি। ১৯০৮-এর মধ্যভাগে বর্ষাকালে দ্বিতীয়বার দর্শন হয়। এবার বেলা ১১৷৷ টার সময় জয়রামবাটী উপস্থিত হই। প্রণাম করিলে পর শ্রীশ্রীমা জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তুমি কি মাস্টার মশায়ের ছাত্র ?"

আমি—না, মা ; আমি তাঁর কাছে যাই।

মা—তিনি কেমন আছেন ? তুমি কি শিগগির গিয়েছিলে ?

আমি—ভাল আছেন। আমি আট দিন আগে গিয়েছিলুম।

মধ্যাহ্নে আহার করিবার সময় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন আপনার কলকাতা যাওয়া হবে কি ?"

মা—ইচ্ছে তো আছে,পূজোর সময় যাই। তারপর মা যা করেন। তোমাদের জমিতে ধান হয় ?

আমি—হ্যাঁ, মা, হয়।

মা—বেশ। আমাদের দেশে ভাল ধান হয় না। তোমাদের কলাই হয়?

আমি—হ্যাঁ, মা।

মা—বেশ ভাল।

রাত্রে আহারের সময় শ্রীশ্রীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বাড়িতেই থাক এখন?"

আমি—হ্যাঁ, মা, বাড়িতেই আছি। আমার বড় বিপদ—খুব অসুখ হয়েছিল, তার পর বিবাহ।

মা—বিবাহ কি হয়ে গেছে?

আমি—হ্যাঁ, মা।

মা—মেয়েটির বয়স কত?

আমি—প্রায় তের বছর।

মা—যা হয়েছে ভালর জন্যই হয়েছে; আর কি করবে?

আমি—মাস্টার মহাশয় বিবাহ করতে বারণ করেছিলেন।

মা—আহা! নিজে অনেক কষ্ট পেয়েছেন কি-না! তাই বলেন আর তোরা কেউ বিয়ে করিস নি রে!

আমি—সংসারে বড় ব্যাঘাত। সংসারে থাকলে মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলে।

মা—নিশ্চয়। কেবল টাকা, টাকা, টাকা।

আমি—বিষম যন্ত্রণা!

মা—ঠাকুরের সংসারী ভক্তও তো আছে। ভাবনা কি?

আমি নিস্তব্ধ হয়ে আছি।

মা—আমার ভায়েরা বিবাহ করেছে।

আমি—আপনার অনুমতি অনুসারে?

মা—কি করব। ঠাকুর বলতেন, 'বিষ্ঠার পোকা বিষ্ঠাতেই ভাল থাকে, ভাতের হাঁড়িতে রাখলে মরে যাবে।' আর আমরা খুড়ো-জ্যাঠার যেমন সেবা শুশ্রূষা করেছি, এখনকার ভাইঝিরা তেমন করে না।

আমি—ক্রমশ সব পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে।

মা—তা বটে। দেখ না, আগে আমি পিঁপড়ে মারতে পারতুম না, কিন্তু এখন বেড়ালকেও এক ঘা বসিয়ে দি।

"ঠাকুর বলতেন, 'এ-ও কর, ও-ও কর'। বলতেন 'তুঁহুঁ তুঁহুঁ'। জীব অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করে তবে বলে, তুঁহুঁ তুঁহুঁ।

"স্বার্থ! যতক্ষণ মুটো করে ততক্ষণ আপনার, তার পর আর নয়।"

"ভয় কি, বিবাহ করেছ—ঠাকুরের ইচ্ছাতে সেও ভাল হয়ে যাবে। হয়তো তার কোন

সুকৃতি আছে। বলতেন, "বিদ্যার চেয়ে অবিদ্যার জোর বেশি—অর্থাৎ অবিদ্যামায়া সংসারকে মুগ্ধ করে রেখেছে।'

জগদম্বা আশ্রম—কোয়ালপাড়া, বাঁকুড়া
এপ্রিল ২০, রবিবার, ১৯১৯

মণীন্দ্র, সাতু ও নারায়ণ আয়াঙ্গার (জনৈক মাদ্রাজী ভক্ত) প্রভৃতি সকাল বেলা প্রায় দশটার সময় শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিতে গিয়াছেন। মা এক মাসের উপর হইল আসিয়াছেন। পুরুষ-ভক্তেরা কোয়ালপাড়া মঠে থাকেন এবং তথায় খাওয়া-দাওয়া করেন।

শ্রীশ্রীমায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী মাকুর ছেলের খুব অসুখ—ডিপ্‌থিরিয়া হইয়াছে, জয়রামবাটীতে আছে। বৈকুণ্ঠ মহারাজ তাঁহাকে দেখিতেছেন। মা সেজন্য খুব চিন্তিতা—কি হয়!

ভক্তেরা প্রণাম করিয়া বসিতেই প্রথমে ঐ কথাই উঠিল।

নারায়ন আয়াঙ্গার—মা, আপনার আশীর্বাদে ছেলে ভাল হয়ে যাবে।

মা—(হাতজোড় করিয়া ঘরের ভিতরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবিকে দেখিয়া) উনি আছেন।

সাতু—মাকুর ছেলের জন্যে (নারায়ণ আয়াঙ্গার) অনেক করেছেন (ডিপ্‌থিরিয়ার ইন্‌জেক্‌সন্ আনিবার জন্য কলকাতায় লোক পাঠানো ইত্যাদি)।

মা—হ্যাঁ, ভাল লোক। কালোকে কলিকাতায় পাঠানো, টাকা খরচ করা—উনি না থাকলে কে এত করতো?

নারায়ণ আয়াঙ্গার—আমি যন্ত্র, ঠাকুর যন্ত্রী।আমাকে যন্ত্রের মতো কাজ করাচ্ছেন।

মা—ঠাকুর বলেছিলেন, 'যার (ধন-ধান্য) আছে সে মাপো (মেপে দেওয়া) : যার নাই সে জপো।'

নারায়ণ আয়াঙ্গার—জপ করবার সময় কি আচমন করা প্রয়োজন?

মা—হ্যাঁ; ঘরে হলে আসন আচমন প্রয়োজন। রাস্তায় বা অন্যত্র পথে ঘাটে নাম করলেই হবে।

নারায়ণ আয়াঙ্গার—শুধু নাম? মন্ত্রজপ নয়।

মা—হ্যাঁ, মন্ত্রজপও করবে বই কি। তবে মন স্থির করে একবার ডাকলে লক্ষ জপের কাজ হয়। নতুবা সারাদিন জপ করছে কিন্তু মন নেই, তাতে ফল কি? মন চাই, তবে তাঁর কৃপা।

নারায়ণ আয়াঙ্গার আমি যা করছি তাতেই হবে, না আরও প্রয়োজন?

মা—যা করছ তাই কর। তুমি তো তাঁর কৃপাপাত্র আছই।

নারায়ণ আয়াঙ্গার—দু-তিন দিন সরলভাবে ডাকলে দর্শন পাওয়া যায়; এতদিন ডাকছি দর্শন হয় না কেন?

মা—হ্যাঁ, হবে বই কি। শিববাক্য, আর তাঁর মুখের কথা—সে কথা মিথ্যা হবার জো নেই। সুরেন্দ্রকে (মিত্র) তিনি বলেছিলেন, 'যার আছে সে মাপো, যার নেই সে জপো। (সকলকে লক্ষ্য করিয়া) তাও না পার (ঠাকুরকে দেখাইয়া) শরণাগত, এটুকু মনে রাখলেই হলো—আমার একজন দেখবার আছেন, একজন মা কি বাবা আছেন!

নারায়ণ আয়াঙ্গার—আপনি বলছেন তাই আমার বিশ্বাস।...

রাধুর একটি সন্তান হইয়াছে। সন্তান হইবার পর হইতেই রাধু শয্যাগত। তাহাকে খাওয়াইবার সময় হইয়াছে, তাই মা এবার উঠিবেন।

মা—এখন রাধুকে খাওয়াতে যাব।

ভক্তেরা প্রণাম করিয়া উঠিতেছেন। নারায়ণ আয়াঙ্গাব শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্মে মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতেছেন, মা মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

মণীন্দ্র প্রণাম করিবার সময় মা বলিলেন, "বৌমাব (মণীন্দ্রের মার) কি বিশ্বাস! কাশীতে যেতে বলায় বলেছিল, 'এই আমার কাশী, আমি কোথাও যাব না'।"

মণীন্দ্রের মা শ্রীশ্রীমাযের কাছে থাকিতেন। এক বৎসরের উপব হইল তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছে। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের খুব সেবা করিয়াছিলেন। মা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আমার এখানে কেউ বেশি দিন থাকতে পারেনি। কেদারের মা ছিল আর তুমি আছ।"

সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় সংবাদ আসিল মাকুর ছেলেব অবস্থা খুবই খারাপ। শুনিয়া মা অতিশয় উদ্বিগ্না হইলেন। ব্রহ্মচারী বরদাকে বলিলেন, "পাল্কি ঠিক করে রাখ, কাল সকালেই আমি যাব যদি ছেলে ততক্ষণ বেঁচে থাকে। সকালেই আমাকে সংবাদ এনে দেবার কি হবে?"

মণীন্দ্র—আমি ও সাতু খুব ভোর ভোর সংবাদ এনে দেব।

একটু পবেই বৈকুণ্ঠ মহারাজ জয়রামবাটী হইতে ফিরিলেন। মাকে এই সংবাদ দিতেই চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি ছেলে নেই?"

সকলকে নিরুত্তর দেখিয়া বলিলেন, "কতক্ষণ মারা গেল?"

বৈকুণ্ঠ মহারাজ—সাড়ে পাঁচটার সময়।

মা—এখন গেলে দেখতে পাব?

বৈকুণ্ঠ মহারাজ—না, মা, নিয়ে গেছে।

মা খুব কাঁদিতে লাগিলেন। একটু থামছেন তো আবার কাঁদছেন।

স্বামী কেশবানন্দ মাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করাতে মা কাঁদিয়া বলিলেন, "কেদার গো, আমি ভুলতে পারছি নে।"

ছেলেটি একবার মাকুর সঙ্গে জয়রামবাটী যাইবার সময় কোথা হইতে কতকগুলি

গুলঞ্চ ফুল কুড়াইয়া আনিয়া মায়ের পায়ে দিয়া বলিয়াছিল, "দেখ, পিসীমা—কেমন হয়েছে?" তারপর সে প্রণাম করিয়া শ্রীশ্রীমায়ের পায়ের ধুলা লইল। পরে ফুলগুলি জামার পকেটে পুরিয়া লইয়া গিয়াছিল। শরৎ মহারাজ তাহাকে খুব ভালবাসিতেন। অসুখের সময় ছেলেটি 'লালমামা লালমামা' বলিয়া শরৎ মহারাজকে খুব ডাকিয়াছিল। মা বলিলেন, "হয় তো কোন ভক্ত এসে জন্মেছিল। শেষ জন্ম হবে। নইলে তিন বছরের ছেলের অত বুদ্ধি, অমন করে পূজো করে গা! লালনপালন করে আমার কষ্ট।"

এই সব কান্নাকাটি ও শোকে অনেক রাত্রি হইয়া গেল। রাত্রিতে শ্রীশ্রীমা মেয়েদের সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহাদের খাওয়া হইয়াছে কি না। যখন শুনিলেন তাঁহারা কিছুই খান নাই (মা খান নাই বলিয়া), তখন তিনি একটু দুধ ও দুখানি লুচি খাইলেন।

পরদিন সন্ধ্যার সময় মণীন্দ্র ও প্রভাকর মায়ের কাছে গিয়াছেন। মাকুর ছেলের মৃত্যুতে মায়ের মন বিষণ্ণ। তাহারই কথা হইতেছে।

মা—সে বলত, ফুল লাল করেছে কে? আমি বলতুম, 'ঠাকুর করেছেন।'—'কেন?' —'তিনি পরবেন বলে।'

"শরতের খুব লাগবে। সর্বদা কোলে করত, যদিও তার পায়ে ব্যথা। কোলে বসে বলত, 'তোমার মা কোথায়?' শরৎ মাকুকে দেখিয়ে বলত, 'এই যে আমার মা।' ছেলে বলত, 'তোমার মা, স্কুল বাড়িতে গেছে'।"

ঐ সময় রাধুর অসুখের জন্য মা তাহাকে লইয়া কিছুদিন নিবেদিতা স্কুল-বোর্ডিং-এ ছিলেন। 'উদ্বোধনে'-র বাড়িতে গোলমাল রাধুর সহ্য হইত না।

মণীন্দ্র—অক্ষয়ের মৃত্যুতেও ঠাকুরের খুব কষ্ট হয়েছিল।

মা—তিনি বলেছিলেন, 'গামছা যেমন মোচড় দেয় তেমনি হয়েছিল।' আমার এক ভাসুরপো (জ্ঞাতির ছেলে) দীনু বলে বিষ্ণু-ঘরে পূজো করত। হৃদয় কালীঘরে পূজো করত। দীনু 'যশোদা নাচাত তোমায় বলে নীলমণি'—এইসব গান ঠাকুরকে শুনাত। তার কলেরা হয়েছিল।

মণীন্দ্র—আপনি তখন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন?

মা—হ্যাঁ, আমি নবতে ছিলুম। ঠাকুরের পায়ের ধুলো, আমার পায়ের ধুলো, মা কালীর স্নানজল দিয়েছিলুম। তা বাঁচল না—মারা গেল। ঠাকুরের খুব কষ্ট হয়েছিল।

"আমার ছোট ভাই এন্ট্রান্স পাশ করেছিল—বেশ লেখাপড়া শিখছিল, ডাক্তারী পড়ছিল। নরেনের সঙ্গে দেখা করতে গেলে নরেন বলেছিল, 'মার এমন ভাই আছে? সব তো চালকলাবাঁধা বামুন।' নরেন বললে, 'পেটের ভিতর ফোঁড়া হবে, তোমাকে তা কাটতে হবে। যোগেন, তুমি এর পড়বার খরচ যোগাবে।' যোগেন মারা গেল। রাখাল ৪০ টাকার বই কিনে দিয়েছিল। রাখাল, শরৎ তার সঙ্গে একসঙ্গে তাস খেলত। সে ভাই মারা গেল।

"সংসার মায়ার বন্ধন।...(করুণ স্বরে) আহা! যাকে পাশ ফিরে শুইয়ে মনে প্রত্যয় হয় না, এমন ছেলে মাকুর! দেখ না কত যন্ত্রণা!

"এই রাধুকে লালনপালন করে কত কষ্ট—পালার বড় জ্বালা! রাধু যখন হয়, মা বলেছিলেন, 'ছোট বউকে ওর মা বাপের বাড়ি নিয়ে যেতে চায়, তা যাক না।' আমি সকালবেলা পূজোর সময় দেখলুম (কলিকাতায় ঠাকুরপূজো করিবার সময়) থিয়েটারে যেমন পর্দা (drop-scene) এইরূপে (দুই হাত মেলিয়া দেখাইয়া) সরে যায়, সেইরূপ দেখেছিলুম—দেশে রাধুর মা খুব কষ্ট পাচ্ছে, রাধুকে শুধু চারটি মুড়ি দিয়েছে, বাইরে উঠানে পড়ে খড় ধুলোর উপরে সে মুড়ি খাচ্ছে। রাধুর মা হাতে কোথাও একটা লাল সুতো, কোথাও নীল সুতো বেঁধেছে—পাগলের যেমন খেয়াল। অন্য সব ছেলেরা মুড়িটুড়ি মিষ্টি দিয়ে খাচ্ছে—এই দেখে, জলে চুবিয়ে ধরলে যেমন হাঁপিয়ে ওঠে তেমনি হাঁপিয়ে উঠলুম, বুঝলুম—আমি ছেড়ে দিলে রাধুর ঐ অবস্থা।"

শ্রীশ্রীমা তাঁহার ছোট ভাই অভয়কে খুব ভালবাসিতেন। ভাইদের তিনিই মানুষ করিয়াছেন। অভয় মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছিল, "দিদি, সব রইল—দেখো।" রাধু তখন মাতৃগর্ভে। প্রসবের পর রাধুর মা শ্রীশ্রীমায়ের সহিত কলিকাতায় আসেন। পরে পাগল হইলে তাঁহাকে জয়রামবাটী পাঠানো হয়। রাধু সেখানে খুব দুঃখ-কষ্ট পাইতে থাকে। শ্রীশ্রীমা বাগবাজারের ভাড়াটিয়া বাটীতে অবস্থানকালে একদিন সকালবেলা পূজা করিবার সময় জয়রামবাটীর এই চিত্র (vision) দেখেন এবং অভয়ের অন্তিম কথা স্মরণ করিয়া দু-চাব দিনের মধ্যেই দেশে গিয়া রাধুর লালনপালনের ভার গ্রহণ করেন। মা বলিতেন, "সেই হতেই আমাকে মায়ায় ধরল।" আর একবার কোয়ালপাড়ায় শ্রীশ্রীমায়ের খুব অসুখ। তখন হঠাৎ রাধু শ্বশুরবাড়ি যাইবে বলিয়া জযরামবাটী চলিয়া আসে। মাকে বলিয়াছিল, "তোমাকে দেখবার কত ভক্ত আছে, আমার স্বামী ছাড়া আর কে আছে?" মা এই ঘটনা উপলক্ষে বলিয়াছিলেন, "কাল রাধু তো অমন করে আমার মায়া কাটিয়ে চলে গেল। মনে ভয় হলো ভাবলুম—ঠাকুর কি তাহলে আমাকে এবার রাখবেন না?" মা আরও বলিয়াছিলেন, "এই যে 'রাধি রাধি' করি, এ একটা মায়া নিয়ে আছি বই তো নয়!"

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। মণীন্দ্র ও প্রভাকর বিদায় লইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। রাত্রেই তাঁহারা আরামবাগ যাইবেন।

মা বলিলেন, "তোমরা একটু কিছু খাও।"

প্রভাকর—আমরা খেয়ে এসেছি।

মা—একটু খাও না কেন? ওগো, একটু মিষ্টি এনে দাও তো।

পরে আমাদের বলিলেন, "তোমরা খাওয়া-দাওয়া করে যেও।"

মণীন্দ্র—আচ্ছা, মা।

মা—গাড়ি হয়েছে?

মণীন্দ্র—হয়েছে।

প্রণাম করিয়া বিদায়গ্রহণের সময় মা আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "ভগবানে মতি হোক।"

মণীন্দ্র—মা, আমাদের মায়া যেন কাটে।

মা এ কথায় প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিলেন।

২৩ এপ্রিল

ভক্তেবা মাকে প্রণাম করিতে গিয়াছেন। নারায়ণ আয়াঙ্গার মাকে বলিলেন, "মা, আপনার মনে এখন অশান্তি (মাকুর ছেলের মৃত্যুতে), আমি সেজন্য শীঘ্র রওনা হব মনে করছি।"

মা বলিলেন, "সুখ-দুঃখ আর কোথায় যাবে! এরা তো আছেই। তোমার তাতে কি? তুমি এখন থাক। আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসের ৪-৫ তারিখে যাবে।"

১২ জ্যৈষ্ঠ, সোমবার—১৩২৬

স্বামী শান্তানন্দ ও স্বামী হরানন্দ কাশী হইতে আসিযাছেন। মণীন্দ্রও পুনরায় আসিয়াছেন। সকালে শান্তানন্দ ও মণীন্দ্র প্রভৃতি শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম কবিতে গিয়াছেন। ভক্তেরা কোযালপাড়া মঠে থাকেন, মা 'জগদম্বা আশ্রমে'।

শান্তানন্দ—মা, আপনাব শরীর কেমন আছে?

মা—ভালই আছি।

Internment (রাজদ্রোহিতার সন্দেহে আটক) হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত একটি ছেলে পূর্বদিনে আসিয়াছে। পুলিশ-হাঙ্গামার ভয়ে ভক্তেরা তাহাকে তখনি বিদায় দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "ওকে রেখে দাও; আজ থাক, কাল যাবে।" স্বামী কেশবানন্দ তাহাকে মঠে না বাখিয়া অন্য স্থানে রাখিয়াছিলেন। কারণ, তখনও রোজ রাত্রে চৌকিদাব আসিয়া নবাগত ভক্তদের নামধাম লিখিয়া লইত। পরদিন মা তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "সেই ছেলেটি কোথায়? চলে গেল না-কি?

মণীন্দ্র—সে আছে। আজ খাওয়া-দাওয়া কবে যাবে।

মা—(শান্তানন্দকে) রাত্তিরে কোথায় ছিল?

শান্তানন্দ—জানি না, মা, আমাদের জানায় নাই।

মা—এখানে যখন জল হয়, কাশীতেও কি সেই সময় জল হয়?

শান্তানন্দ—না, মা, শ্রাবণ মাসে সেখানে বর্ষারম্ভ। তবে কখনো কখনো বৈশাখ মাসে ঝড় হয়ে আমটাম নষ্ট করে দেয়।

"কাশীতে যারা মরবে বলে যায়—বুড়িরা, তাদের, মা, বড় কষ্ট। হয়তো বাড়ি থেকে টাকা পাঠাত, বন্ধ করে দিয়েছে। নিচের স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘরে থাকতে হয়।"

মা—"হ্যাঁ, বুড়িদের খুব কষ্ট দেখেছি, যখন কাশীতে বংশী দত্তের বাড়িতে ছিলুম। সামান্য চাল ভিক্ষে করে এনে হয়তো ভিজিয়েই তা খেয়ে ফেলত, রাঁধত না।"

শান্তানন্দ—বুড়িরা মরতে গিয়ে আবার দীর্ঘজীবি হয়।

মা—বিশ্বনাথ-দর্শন-স্পর্শনে পাপক্ষয় হয়, তাতেই দীর্ঘজীবী হয়। বৃন্দাবনে শাঁখের জল গায়ে দেয়, প্রসাদ খাওয়ায় বলে দীর্ঘজীবী হয়।

মা এবার রাধুর কথা বলিতেছেন, "রাধু একটু দাঁড়াতে পারলে হয়। ঘরেই শৌচাদি করছে। এভাবে আমাকে আর কদিন রাখবেন, ঠাকুর যে কি করবেন, জানি না।"

মা শান্তানন্দ স্বামীকে মাকুর ছেলের কথা বলিতেছেন, "শোকে মানুষকে যা জব্দ করে এমন আর কিছুতেই পারে না! শরতেরও তার জন্য খুব কষ্ট হয়েছে। কালো ঔষধ আনতে কলকাতা গেল। এরা আবার তাকে বলে দিচ্ছিল শরতের সঙ্গে যেন দেখা না করে। আমি বলি 'কলকাতা যাবে শরতের সঙ্গে দেখা করবে না—কি রকম কথা'?"

মণীন্দ্র—হ্যাঁ, শরৎ মহারাজ লিখেছিলেন—কালো যেন সটান আমার কাছে আসে।

মা তরকারি কুটিতেছিলেন। চেলো (ফল) দেখিয়া শান্তানন্দ স্বামী বলিলেন, "এ কলকাতায় পাওয়া যায় না।"

মা—এতে ছেঁচকি হয়, অম্বলে দেওয়া চলে, ঠাণ্ডা গুণ, ভাল জিনিস। (মণীন্দ্রকে) জাহানাবাদে পাওয়া যায়?

মণীন্দ্র—হ্যাঁ, মা।

শান্তানন্দ স্বামী মায়ের নিকট দেশের দুঃখ-দুর্দশার কথা তুলিলেন।

শান্তানন্দ—ইনফ্লুয়েঞ্জাতে শুনছি যাট লক্ষ লোক মরেছে। ধান চাল সব দুর্মূল্য—লোকের বড় কষ্ট।

মা—হ্যাঁ, বাবা। লোকে খেতে পাচ্ছে না, আবার যার ঘরে ছেলেপিলে আছে তার আরও কষ্ট। এই তো কষ্ট আরম্ভ হয়েছে। বর্ষা হয়ে ধানচাল হলে তবে তো কষ্ট যাবে। কে সাহেব না-কি এসেছিল কলকাতায়—যেখানকার ধান চাল সেখানে থাকবে, আইন করবে বলে, সে না-কি চলে গেছে।

মণীন্দ্র—সেরূপ তো চেষ্টা হচ্ছে।

শান্তানন্দ—লোকের কষ্ট তো দিন দিন বাড়ছে। এত কষ্ট দেশে! এ কি, মা, কর্মফল?

মা—এত লোকের কি কর্মফল? কি একটা হাওয়া এসেছে।

শান্তানন্দ—যুদ্ধ থেমে গেছে, তবু জিনিসপত্র সস্তা হচ্ছে না কেন?

মা—তবে যে বলে, আবার যুদ্ধ হচ্ছে?

শান্তানন্দ—সে এখানে—কাবুলে। এত দুঃখকষ্ট, যুদ্ধবিগ্রহ! একি, মা, যুগপরিবর্তন হবে আবার?

মা—(হাসিয়া) কি করে বলব? তাঁর ইচ্ছায় কি হবে কেমন করে জানব? রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট হয়। হিংসা, খলতা, ব্রহ্মহত্যা—এইসব পাপ; রাজার পাপে প্রজার কষ্ট ও দৈব-উৎপাত—যেমন যুদ্ধ, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ। সবাই একটু নরম হলে তো যুদ্ধ থেমে যায়।

"আহা! ভারতেশ্বরী (ভিক্টোরিয়া) কেমন ছিলেন! লোকে কেমন সুখে স্বচ্ছন্দে ছিল! এখন একটি পাঁচ বছরের ছেলে—সেও দুঃখের কথা বোঝে, বলে আমার পরবার কাপড় নেই! আচ্ছা, শরৎ যে এখানে চাল দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। কতগুলি চাল দেওয়া হলো?"

মণীন্দ্র—কত তা ঠিক বলতে পাচ্ছি না। তবে প্রতি সপ্তাহে চৌত্রিশ টাকার চাল দেওয়া হয়।

মা—কত করে পাচ্ছে?

মণীন্দ্র—জন প্রতি এক পোয়া হিসাবে।

মা—প্রত্যেকে কত পেলে?

মণীন্দ্র—ছয় সের, সাত সের, আট সের, যাদের যেমন লোক খেতে।

মা—কতগুলি লোক পেলে?

মণীন্দ্র—ঠিক জানি না, মুসলমানের মেয়েরাই বেশি ভিখাবি।

মা—হ্যাঁ, এখানে মুসলমানেরা গরিব বেশি। আচ্ছা, শরৎ আর কোথায় চাল দিচ্ছে?

মণীন্দ্র—বাঁকুড়া, ইন্দপুর, মানভূম। যেখানে দুর্ভিক্ষ সেখানে দিচ্ছেন।

মা—ছেলেরা যাচ্ছে সেখানে?

শান্তানন্দ—মঠ থেকে যাচ্ছে।

মণীন্দ্র—ইন্দপুর, যেখানে সাতুর যাবার কথা হয়েছিল।

মা—সাতুর ভগ্নীটির শিওড়ে বিবাহ হয়েছে।

মণীন্দ্র—হ্যাঁ, মা: সাতু বিবাহে না যাওয়ায় তার বাপ মা—

মা—হ্যাঁ, বড় দুঃখিত হয়েছে; তা হবেই তো, কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ বিয়েতে যাবে কেমন করে? অন্য সময় যাবে বই কি।

"প্রভাকরের ছেলেটি ভাল হলে হয়। ছেলে হওয়া এক পাপ। তিনি বলতেন—সংসারে সব ভেঙ্কিবাজি। ভেঙ্কিবাজি বটে, তবে মনে থাকে না এই-ই দুঃখ।"

১৬ আষাঢ় বৈকালে মণীন্দ্র, প্রভাকর, শ্যামবাজারের প্রবোধবাবু প্রভৃতি মাকে দর্শন করিতে গিয়াছেন। প্রণাম করিতেই মা প্রভাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলে ভাল আছে তো? অসুখ করেছিল।"

প্রভাকর—ভাল আছে।

মা—তোমরা কতক্ষণ এলে? ভাত খাওয়া হয়েছে?

প্রভাকর—হয়েছে।

মণীন্দ্র ও প্রবোধবাবু নিবেদিতা স্কুলে মেয়েদের ভর্তি করিয়া দিতে ইচ্ছুক।

সে কথা উত্থাপন করিয়া মায়ের অনুমোদন প্রার্থনা করায় তিনি বলিলেন, "বেশ তো, শরৎকে লেখ।"

প্রবোধবাবু—তাঁকে লেখা হয়েছে।

স্ত্রী-ভক্তদের কে একজন বলিলেন, "থাকতে পারবে কি? ছেলেমানুষ।"

মা—খুব পারবে। পূর্ববঙ্গের মেয়েরা ছ-সাত বছর বয়স, থাকে তো? তাদের মা বাপ নিতে এলেও যেতে চায় না।

প্রবোধবাবু—আজ গ্রাম দেখতে গিয়েছিলাম। খুব কষ্ট লোকদের। পরনের কাপড় নেই—আমাদের সামনে বেরুতে পারলে না। চালে খড় নেই। (প্রবোধবাবু প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েত।)

মা—তাদের চাল দেওয়া হলো কি?

প্রবোধবাবু—কাল রবিবারে দেওয়া হয়েছে।

মা—কাপড় দেওয়া হয় কি?

প্রবোধবাবু—বেছে বেছে দেওয়া হয়।—মা, আপনি কি এক স্বপ্ন দেখেছিলেন শুনেছি—একটি স্ত্রীলোক কলসী ও ঝাঁটা নিয়ে দাঁড়িয়ে!

মা—হ্যাঁ, একটি মেয়ে একটি কলসী ও ঝাঁটা হাতে করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলুম, তুমি কে গো? সে বললে—আমি সব ঝেঁটিয়ে যাব। আমি বললুম—তারপর কি হবে? সে বললে—অমৃতের কলসী ছড়িয়ে যাব। তাই বুঝি হচ্ছে। মার মুখে শুনতুম যে, যখন হয় উপর উপর তিন বছর দুর্ভিক্ষ হয়। দু-বছর হয়েছে কি?

মণীন্দ্র—যুদ্ধ তো অনেক দিন হচ্ছে।

মা—যুদ্ধ তো চার-পাঁচ বছর হচ্ছে। তা নয়, দুর্ভিক্ষ কি দু-বছর হয়েছে? তাহলে আর এক বছর হবে।

"এখন ধানের দাম কত?"—মা জিজ্ঞাসা করিলেন। ও দেশের হিসাবে মূল্য বলা হইল।

মা বলিলেন, "এত দাম? আর সব জিনিসই—কাপড়, তেল, এসব তো খুব চড়েছে।

যাদের আছে, তাদেরও চিন্তাভাবনা। এবার 'তোমার চামড়া আমি খাব, আমার চামড়া তুমি খাবে'।"

"তিনি যত দুঃখকষ্ট দিচ্ছেন, তা তো বুক পেতে নিতে হবে। ভগবান যা করবেন তাই হবে।"

প্রবোধবাবু—মা, আপনাকেই যখন এত কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে তখন আর কারুরই কি পরিত্রাণ আছে?

মা—আমাকে ঠিক যেন খাঁচায় পুরে রেখেছে! নড়বার চড়বার জো নেই—কোন দিকে পালাবার উপায় নেই।

প্রবোধবাবু—কামারপুকুরে আবার গোলমাল হচ্ছে ঠাকুরের জায়গা নিয়ে।*

মা—কে গোলমাল করছে? মহিমবাবু?

প্রবোধবাবু—না, ফকিরবাবু আর হেমবাবু।

মা—আচ্ছা, গোলমালে কাজ কি? বেড়া সরিয়ে নিলে কি হয় না?

প্রবোধবাবু—আমি তো খুঁটো চারদিকে পুঁতে দিয়ে এসেছি। মহিমবাবু রাস্তার উপর মাটি পড়াতে বরং সন্তুষ্ট। আমাদের আরও খানিকটা এগিয়ে খুঁটো পুঁতলে ভাল হতো। তারপর যত আপত্তি করত, ক্রমশ সরিয়ে আনা হতো। যেমন ব্যবসাদার, তেমনি ব্যবসাদারী বুদ্ধি দরকার।

মা এই আশ্চর্য ব্যবস্থা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

প্রবোধবাবু—শরৎ মহারাজকে লিখেছি। তিনি যেমন বলবেন তেমনি করব।

মা—পূর্বে মুনিষের (মজুরের) দাম চার পয়সা ছিল। আমার মনে আছে, এতখানা একটা কাগজে লিখে কলকাতায় লোক পাঠাত। সে হেঁটে যেত। তখন ডাক ছিল না।

প্রবোধবাবু—এখন ডাক হয়ে কিন্তু সুবিধা হয়েছে, মা।

মা—তা হয়েছে। পূর্বে যা ছিল তাই বলছি। এক টাকায় অনেক তেল পাওয়া যেত। এখন ধান এক আঁজলাতেই টাকা বলে, সকলে ধান বেচে দিচ্ছে, টাকা বেশি পাওয়া যায় কি-না! বাকি সামান্য যা থাকছে তাও তো রাখতে পারবে না, কেন-না পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। খেতে হবে তো?

"প্রসন্ন (বড় মামা) চার-পাঁচ-শ টাকার ধান বেচে দিলে। তার কিছু ধান চুরি গিয়েছিল। রাজ ঘোষও ধান বেচে ফেলেছে। তার অনেক ধান। তাকে নাকি চিঠি দিয়েছিল—'তুমি এত টাকা দাও, না হলে তোমার বাড়িতে চুরি হবে।' সে পুলিশে চিঠি দেখিয়েছিল, বোধ হয় গ্রামের দুষ্ট লোকে ঐরূপ করছে।"

* ঠাকুরের জন্মস্থানে মন্দির করিবার জন্য যে নূতন জমি কেনা হইয়াছে তাহা লইয়া তখন গোলমাল হইতেছিল।

মণীন্দ্র ও প্রবোধবাবু পরদিন শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিতে গিয়াছেন। প্রবোধবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, জোর করে সংসার ত্যাগ করা চলে ?"

মা এ কথায় সস্মিত মুখে অমনি উত্তর দিলেন, "লোকে তো করছে গো।"

প্রবোধবাবু—মহামায়ীর প্রসন্নতা লাভ না করে যদি নিজের খেয়ালে কেউ সংসার ত্যাগ করে, তাহলে বোধ হয় গোল বাধে।

মা—ঘরে ফিরে আসে।

* * *

মণীন্দ্র—স্বামীজীও খুব কষ্ট করেছিলেন। তিনি কিন্তু উতরে গেলেন—শরীরে সয়ে গেল।

মা—না, তাঁকেও খুব ভুগতে হয়েছে, পেচ্ছাবের অসুখ। সর্বদাই গা জ্বালা করত। তবু খেটে খেটে মুখ দিয়ে রক্ত উঠিয়েছিলেন।

মণীন্দ্র—মুখ দিয়ে রক্ত পড়েছিল !

মা—মুখ দিয়ে রক্ত পড়েনি। এত পরিশ্রম করেছিলেন যে রক্তওঠা পরিশ্রম।

প্রবোধবাবু—শুনেছি, স্বামীজী হরি মহারাজের গলা ধরে কেঁদেছিলেন দার্জিলিং-এ—'ভাই, তোমরা শুধু তপস্যা নিয়ে থাকবে—আমি একা প্রাণ বার করছি !'

মা—হ্যাঁ, বাবা, তিনি (স্বামীজী) নিজের দেহের রক্ত দিয়েছিলেন পরের জন্যে। নরেনই তো বিলাত থেকে ফিরে এসে এই সব করলে। তাই ছেলেদের দাঁড়াবার একটু জায়গা হয়েছে। এখন বিলাতে (বিলাত বলিতে শ্রীশ্রীমা আমেরিকা বুঝিয়েছিলেন) চার জন ছেলে আছে ?

প্রবোধবাবু—হ্যাঁ ; স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী প্রকাশানন্দ, স্বামী পরমানন্দ ও স্বামী বোধানন্দ।

মা—কালীর নামটি কি ?

মণীন্দ্র—স্বামী অভেদানন্দ।

মা—বসন্ত [স্বামী পরমানন্দ] এখানে চিঠিপত্র লেখে, টাকা-কড়ি পাঠায়। সেখানে বক্তৃতা দেয়। যোগেন [স্বামী যোগানন্দ] খুব কঠোর করেছিল, তীর্থে গিয়ে আঁজলা (অঞ্জলি) করে জল খেত। রুটি শুকিয়ে গুঁড়িয়ে রেখে দিত। তাই কিছু কিছু খেত। তাতে খুব পেটের অসুখ করে। তাইতেই ভুগে ভুগে দেহ গেল।...সংসারে কি সুখ আছে ? এই আছে, এই নাই। সংসার বিষের গাছ। বিষে জেরে ফেলে। তবে যারা সংসার করে ফেলেছে, তারা আর কি করবে। বুঝতে পেরেও কিছু করতে পারে না।

ভক্তেরা প্রণাম করিয়া মঠে (কোয়ালপাড়া-মঠে) ফিরিলেন। বৈকালে আবার মণীন্দ্র ও প্রবোধবাবু শ্রীশ্রীমায়ের নিকটে গিয়াছেন।

প্রবোধবাবু—শরৎ মহারাজ পত্রের উত্তর দিয়াছেন ; পড়ব, মা ?

মা—পড়।

প্রবোধবাবু চিঠি পড়িয়া মাকে শুনাইলেন। অন্যান্য কথার মধ্যে এই লেখা ছিল—"আমার মত হইলে কি হইবে। বীণাকে (প্রবোধবাবুর মেয়ে) এখানে রাখা সম্বন্ধে ঠাকুরের ইচ্ছা অন্যরূপ।"

মা—তাই তো, এমন কথাটা কেন লিখলে বল দেখি ? একেবারে কাটিয়ে লিখে দিয়েছে। তা বোধ হচ্ছে—সুধীরার মত নেই। সুধীরা বলেছিল, 'মা, আর পারি নে। আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।' মেয়েদের জন্যে সে কত কষ্ট করে। যখন খরচ আর চলে না, বড়লোকের মেয়েদের গানবাজনা শিখিয়ে মাসে ৪০।৫০ টাকা আনে। স্কুলের মেয়েদের সব শিখিয়েছে—সেলাই করা, জামা তৈরি করা। সে বছর তিন-শ টাকা লাভ হয়েছিল। ঐ টাকায় ওরা হেথা সেথা যায়—পূজোর সময়। সুধীরা দেবব্রতের (স্বামী প্রজ্ঞানন্দ) ভগ্নী। তাই নিজে স্টেশনে আড়ালে থেকে ভগ্নীকে টিকিট কাটতে, একলা গাড়িতে উঠতে—এসব শিখাত।

"মাদ্রাজের দুটি মেয়ে বিশ-বাইশ বছর বয়স, বিবাহ হয় নাই, নিবেদিতা স্কুলে আছে। আহা ! তারা সব কেমন কাজকর্ম শিখেছে ! আর আমাদের ! এখানে পোড়া দেশের লোকে কি আট বছর হতে না হতেই বলে—'পরগোত্র করে দাও, পরগোত্র করে দাও।' আহা ! রাধুর যদি বিয়ে না হতো, তা হলে কি এত দুঃখ-দুর্দশা হতো !"

শ্রীপ্রবোধ ও শ্রীমণীন্দ্র

(১২)

শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে পরিচিত হইবার কিছুদিন পরে একদিন আমি দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলাম। তাড়াতাড়ি খাইয়া যাইতে পারি নাই। ঠাকুর তাহা শুনিয়া বলিলেন, "আহা, তুমি খাওনি, নহবতে যাও, সেখানে ভাত তরকারি আছে, খাও গে।" নহবতে মায়ের সঙ্গে সেই প্রথম দেখা হইল। রামের মা প্রভৃতির সঙ্গে দুই-এক বার মায়ের পরিচয় হইয়াছিল। তাহারা মাকে বলিল যে, আমি খেয়ে যাইনি। মা অমনি তাড়াতাড়ি ভাত তরকারি লুচি প্রভৃতি যা ছিল আমায় খাইতে দিলেন। সেই প্রথম দেখাতেই মায়ের সঙ্গে আমার খুব ভাব হইয়া গেল। ইহার পর রামলালদাদার বিবাহের সময় মা যেদিন দেশে যাইবেন সেই দিন আমি দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলাম। অনেক দিন মায়ের সহিত দেখা হইবে না ভাবিয়া আমার মনে খুব কষ্ট হইল। যাইবার সময় মা ঠাকুরকে প্রণাম করিতে আসিলেন। উত্তরের বারাণ্ডায় ঠাকুর গিয়া দাঁড়াইলে মা প্রণাম করিলেন, পায়ের ধুলা লইলেন। ঠাকুর বলিলেন, "সাবধানে যাবে। নৌকায় রেলে কিছু ফেলে টেলে যেও না।" মা ও ঠাকুরকে সেই আমি এক সঙ্গে দেখি। তাঁহাদিগকে একত্রে দেখিতে আমার সাধ ছিল। মা নৌকায় রওনা

হইলেন। যতদূর দেখা গেল আমি নৌকার দিকে চাহিয়া রহিলাম। নৌকা অদৃশ্য হইলে নহবতে মা যেখানে বসিয়া ধ্যান করিতেন সেখানে বসিয়া খুব কাঁদিতে লাগিলাম। নহবতের পশ্চিম ধারের বারাণ্ডায় দক্ষিণমুখে বসিয়া মা ধ্যান করিতেন। ঠাকুর এদিকে আসিবার সময় আমার কান্না শুনিতে পাইয়াছিলেন। নিজের ঘরে গিয়া আমায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি যাইলে তিনি বলিলেন, "ও চলে যেতে তোমার খুব দুঃখ হয়েছে?" এই বলিয়া আমায় যেন ভুলাইবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর যে-সব সাধনা করিয়াছিলেন সেই-সব কথা বলিতে লাগিলেন ; বলিলেন, "এ-সব কারুকে বলো না।" ঐ দিন ঠাকুরের খুব কাছে বসিয়া কথাবার্তা হইল। বৌ-মানুষ—এতদিন সঙ্কোচ ছিল। প্রায় দেড় বৎসর পরে মা দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিলেন। ঠাকুর লিখিয়াছিলেন, "আমার খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হচ্ছে।" মা আসিলে ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "সেই যে ডাগর-ডাগর চোখ মেয়েটি আসে সে তোমাকে খুব ভালবাসে। তুমি যাবার দিন সে নহবতে বসে খুব কেঁদেছিল।" মা বলিলেন, "হ্যাঁ, তার নাম যোগেন।" আমি যখনি দক্ষিণেশ্বরে যাইতাম, মা আমাকে সব কথা বলিতেন, পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। আমি মায়ের চুল বাঁধিয়া দিতাম। আমার হাতের চুলবাঁধা মা এত ভালবাসিতেন যে, তিন-চার দিন পরেও স্নানের সময় মাথার চুল খুলিতেন না ; বলিতেন, "না, ও যোগেনের বাঁধা চুল, সে যেদিন আসবে সেই দিন খুলব।" আমি সাত-আট দিন পর পর ঠাকুরের কাছে যাইতাম। দক্ষিণেশ্বর হইতে শিবপূজার জন্য বেলপাতা লইয়া আসিতাম, সেই সব বেলপাতা শুকাইয়া গেলেও সেই শুকনো বেলপাতা দিয়া শিবপূজা করিতাম। একদিন মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "যোগেন, তুমি শুকনো বেলপাতায় পূজো কর কি?"

"হ্যাঁ, মা, তুমি তা কি করে জানলে?"

"আজ আমি সকালে ধ্যান করবার সময় দেখতে পেলুম যে তুমি শুকনো বেলপাতায় পূজো করছ।"

একদিন নহবতে বসিয়া মা পান সাজিতেছিলেন, আমি পাশে বসিয়া দেখি—মা কতকগুলি পান ভাল করিয়া এলাচ দিয়া সাজিলেন, আর কয়েকটা শুধু সুপারি-চুন দিয়া সাজিলেন। আমি বলিলাম, "কই এগুলিতে মসলা-এলাচ দিলে না ? ওগুলি বা কার, এইগুলিই বা কার?"

মা বলিলেন, "যোগেন, এগুলি (ভালগুলি) ভক্তদের, এদের আমাকে আদর-যত্ন করে আপনার করে নিতে হবে। আর ওগুলি (এলাচ-না-দেওয়াগুলি) ওঁর জন্যে, উনি তো আপনার আছেন-ই।"

মা বেশ গাহিতে পারিতেন। লক্ষ্মীদিদি ও মা একদিন রাত্রিতে মৃদু গলায় গান করিতেছিলেন। বেশ জমিয়াছে—ঠাকুর তাহা শুনিতে পাইয়াছিলেন। পরদিন বলিতেছেন, "কাল যে তোমাদের খুব গান হচ্ছিল। তা বেশ বেশ, ভাল।"

দক্ষিণেশ্বরে সমস্ত দিন মায়ের একটুকুও বিশ্রামেব সময় ছিল না। ভক্তদের জন্য তিন সের—সাড়ে তিন সের আটার রুটি হইত। পানই সাজিতেন কত! তারপর ঠাকুরের দুধ খুব ঘন কারিয়া জ্বাল দিতেন; কারণ ঠাকুর সর ভালবাসিতেন। তাঁহার জন্য ঝোল হইত।

ঠাকুরের মা যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ঠাকুর ততদিন নহবতে খাইতেন। ঠাকুরের মা শরীর-রক্ষা করিবার পর তিনি নিজের ঘরেই খাইতেন। ছেলেরা কেহ না থাকিলে স্নানের সময় মা ঠাকুরকে তেল মাখাইয়া দিতেন। গোলাপদিদি আসিলে ঠাকুর একদিন তাহাকে ভাতের থালা আনিতে বলেন। তদবধি গোলাপদিদি প্রত্যহই ভাত লইয়া যাইত। ভাত দিতে গিয়া মা রোজ ঠাকুরকে একবাবটি দেখিতে পাইতেন, এইরূপে তাহাও বন্ধ হইল। গোলাপদিদি সন্ধ্যার পর অনেকক্ষণ ঠাকুরের কাছে থাকিত, কোন দিন হয়তো বা রাত দশটার সময় নহবতে ফিরিত। নহবতের বারাণ্ডায় মাকে গোলাপদিদির খাবার লইয়া বসিয়া থাকিতে হইত, সেজন্য তিনি একটু অসুবিধা বোধ করিতেন। একদিন ঠাকুর শুনিতে পাইয়াছিলেন—মা বলিতেছেন, "খাবার বিড়াল কুকুরে খায় খাক, আমি আর আগলাতে পারব না।"

পরদিন ঠাকুর গোলাপদিদিকে বলিলেন, "তুমি এতক্ষণ থাক, ওর কষ্ট হয়। ওকে খাবার আগলে থাকতে হয়।" গোলাপদিদি বলিলেন, "না, মা আমাকে খুব ভালবাসেন, মেয়ের মতো নাম ধরে ডাকেন।" গোলাপদিদির জন্য ঠাকুরের কাছে আসিবার সুযোগ বন্ধ হওয়ায় মা যে দুঃখিতা, একথা গোলাপদিদি বুঝিতে না পারিলেও ঠাকুর বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

একদিন গোলাপদিদি মাকে বলিয়াছিলেন, "মা, মনোমোহনের মা বলছিল—'উনি অত বড় ত্যাগী, আর মা এই মাকড়ি-টাকি এত গয়না পরেন, এ ভাল দেখায় কি'?"

পরদিন সকালে আমি দক্ষিণেশ্বরে গিয়া দেখি—কেবল হাতে সোনার বালা দুগাছি রাখিয়া মা সব গহনা খুলিয়া ফেলিয়াছেন।

আমি একটু আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মা, একি?'

মা বলিলেন, 'গোলাপ বললে-—।'

আমি অনেক বুঝাইতে তবে মা মাকড়ি আর সামান্য দুই-একটি গহনা পরিলেন। সেই যে গহনা খোলা হইল আর পরা হইল না। কারণ, তার পরই ঠাকুরের অসুখ আরম্ভ হইয়াছিল।

মা যখন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আসেন তখন তিনি সংসারের বিশেষ কিছুই বুঝিতেন না এবং ভাবটাবও হইত না। নিষ্ঠার সহিত ভগবানের নিত্য জপ-ধ্যান করিলেও তাঁহার ভাব-সমাধি হইত—এ ক থা আমরা শুনি নাই। বরং ঠাকুরের ভাব হইতে দেখিলে মা বড়ই

ভীতা ও চিন্তিতা হইয়া পড়িতেন। কারণ মায়ের মুখেই শুনিয়াছি—দক্ষিণেশ্বরে মা যেবার প্রথম আসেন, রাত্রে ঠাকুর তাঁহাকে নিজের কাছে রাখিতেন।* তখন মা ও ঠাকুর এক ঘরেই শুইতেন, ঠাকুর বড় তক্তপোশে আর মা ছোট খাটটিতে। মা বলিতেন, "সমস্ত রাত ঠাকুরের ভাব হতো, তাই দেখে আমার ঘুম হতো না। ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকতুম, ভাবতুম—রাত কখন পোহাবে। একদিন ভাব আর ভাঙে না! তখন অস্থির হয়ে কালীর মাকে (ঝি) দিয়ে হৃদয়কে ডেকে পাঠালুম। সে এসে নাম শুনাতে তবে ভাব ভাঙে। পরদিন ঠাকুর যে রকম ভাব দেখলে যে মন্ত্র শুনাতে হবে আমায় সব শিখিয়ে দিলেন।"

আমার সহিত মায়ের পরিচয় হইবার কিছুদিন পরে একদিন মা আমাকে বলিলেন, "ওঁকে বলো যাতে আমার একটু ভাবটাব হয়, লোকজনের জন্য ওঁকে এ কথা বলবার আমার সুযোগ হয়ে উঠছে না।"

আমি ভাবিলাম হবেও বা; মা যখন অনুরোধ করিতেছেন তখন ঠাকুরকে ঐ কথা বলিব। পরদিন সকালে ঠাকুর একা তক্তপোশে বসিয়া আছেন দেখিয়া আমি প্রণাম করিয়া তাঁহাকে মায়ের কথা বলিলাম। তিনি ঐ কথা শুনিলেন, কিন্তু কোন উত্তর না দিয়া গম্ভীর হইয়া রহিলেন। তিনি যখন ঐরূপ গম্ভীর হইয়া থাকিতেন, তখন কথা বলিতে কাহারও সাহস হইত না। তাই আমি কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। নহবতে আসিয়া দেখিলাম—মা পূজা করিতেছেন। দরজা একটু খুলিয়া দেখি—মা খুব হাসিতেছেন। এই হাসিতেছেন আবার একটু পরেই কাঁদিতেছেন। দুই চক্ষু দিয়া ধারার বিরাম নাই। কতক্ষণ এইভাবে থাকিয়া ক্রমে স্থির হইয়া গেলেন—একেবারে সমাধিস্থা। আমি ইহা দেখিয়া দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া আসিলাম, অনেকক্ষণ পর পুনরায় যাইতে মা বলিলেন, "(ঠাকুরের কাছ থেকে) এই এলে?" তখন আমি বলিলাম, "তবে, মা, তোমার না-কি ভাব হয় না?" মা তখন লজ্জা পাইয়া হাসিতে লাগিলেন। ঐ ঘটনার পর আমি দক্ষিণেশ্বরে কখন-কখনও রাত্রিতে মায়ের কাছে থাকিতাম। আমি আলাদা শুইতে চাহিলে মা কিছুতেই শুনিতেন না, আমায় কাছে টানিয়া লইয়া শুইতেন। একদিন রাত্রিতে কে বাঁশী বাজাইতেছিল। বাঁশীর স্বরে মায়ের ভাব হইল, থাকিয়া থাকিয়া হাসিতে লাগিলেন। আমি সঙ্কোচে বিছানার এক কোণে বসিয়া রহিলাম। ভাবিলাম—আমি সংসারী মানুষ, ওঁকে এই সময় ছোঁব না। অনেকক্ষণ পরে মায়ের ভাব উপশম হইল।

মা বলরামবাবুর বাড়িতে ছাতে বসিয়া একদিন ধ্যান করিতে করিতে সমাধিস্থা হইয়াছিলেন। হুঁশ আসিতে বলিয়াছিলেন, "দেখলুম, কোথায় চলে গেছি! সেখানে সকলে আমায় কত আদর যত্ন করছে! আমার যেন খুব সুন্দর রূপ হয়েছে! ঠাকুর রয়েছেন

* তোতাপুরি এক সময় ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, "তুমি যে কাম জয় করেছ তার প্রমাণ কি? স্ত্রীকে কাছে রেখে দাও তবে বুঝব।" ঠাকুর তাই আপনাকে পরীক্ষা করিবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে মা প্রথম যেবার আসেন সেবার রাত্রিতে তাঁহার সহিত এক শয্যায় আট মাস একত্রে শয়ন করিয়াছিলেন।

সেখানে। তাঁর পাশে আমায় আদর করে বসালে। সে যে কি আনন্দ বলতে পারি নে! একটু হুঁশ হতে দেখি যে, শরীরটা পড়ে রয়েছে। তখন ভাবছি, কি করে এই বিশ্রী শরীরটার ভেতরে ঢুকব। ওটাতে আবার ঢুকতে মোটেই ইচ্ছে হচ্ছিল না। অনেক পরে তবে ওটাতে ঢুকতে পারলুম এবং দেহে হুঁশ এল।"

বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে একদিন সন্ধ্যার পর মা, আমি ও গোলাপ-দিদি ছাতে পাশাপাশি বসিয়া ধ্যান করিতেছিলাম। আমার ধ্যান শেষ হইলে দেখি, মা তখনও একভাবে বসিয়া আছেন—স্পন্দনহীন, সমাধিস্থা। অনেকক্ষণ পরে হুঁশ আসিলে মা বলিতে লাগিলেন, "ও যোগেন, আমার হাত কই—পা কই?" আমরা মায়ের হাত ও পা টিপিয়া দেখাইতে লাগিলাম—এই যে পা—এই যে হাত; তবুও দেহটা যে রহিয়াছে অনেকক্ষণ পর্যন্ত মা বুঝিতে পারেন নাই।

বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে একদিন সকালে ধ্যান করিতে করিতে মায়ের সমাধি হইল। সমাধি কিছুতেই আর ভাঙে না! আমি অনেকক্ষণ নাম শুনাইলাম, তাহাতেও সমাধি ভাঙিল না। শেষে যোগেন স্বামী আসিয়া নাম শুনাইবার পর সমাধির একটু উপশম হইলে ঠাকুর সমাধিভঙ্গের সময় যেরূপ বলিতেন, মা সেইরূপেই বলিলেন, 'খাব'। কিছু খাবার, জল ও পান তাঁহার সম্মুখে দেওয়া হইলে, ঠাকুর ভাবাবেশে যেরূপে খাইতেন, মা সেইরূপে ঐ সকল একটু একটু খাইলেন। পানটি পর্যন্ত ঠাকুর যেভাবে সরু দিকটা কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া খাইতেন, মাও ঠিক সেই ভাবে খাইলেন। তখন তাঁহার ভাব-ভঙ্গি খাওয়া-দাওয়া সবই হুবহু ঠাকুরের মতো হইয়াছিল। আমরা দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। ভাব সম্পূর্ণ উপশম হওয়ার পর মা বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার উপর ঐ সময় ঠাকুরের আবেশ হইয়াছিল। যোগেন স্বামী মায়ের ঐরূপ ভাবাবস্থার সময় কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া ঠাকুর যেরূপ উত্তর দিতেন ঠিক সেইরূপ উত্তর পাইয়াছিলেন।

ঠাকুরের দেহরক্ষার কয়েকদিন পরেই রাম দত্ত প্রভৃতি গৃহী ভক্তেরা ভাড়া চুকাইয়া দিয়া কাশীপুরের বাগানবাড়ি হইতে বাসা উঠাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিলেন, সেইজন্য মাকে বলরামবাবুর বাড়িতে আনা হইল। তারপর মা তীর্থ-দর্শন-মানসে যোগেন মহারাজ, কালী মহারাজ, লাটু মহারাজ, লক্ষ্মীদিদি প্রভৃতির সঙ্গে কাশী আসেন। কাশীতে আট-দশ দিন থাকিবার পর বৃন্দাবনে আসিয়া কালাবাবুর কুঞ্জে প্রায় এক বৎসর ছিলেন। ঠাকুরের দেহ যাইবার দুই-এক সপ্তাহ পূর্বে আমি বৃন্দাবনে গিয়াছিলাম। বৃন্দাবনে আমার সহিত দেখা হইতেই মা শোকাবেগে 'যোগেন গো' বলিয়া আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর আমার সহিত তাঁহার এই প্রথম দেখা। বৃন্দাবনে মা প্রথম প্রথম খুব কাঁদিতেন। একদিন ঠাকুর আমাকে দেখা দিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ গা, তোমরা এত কাঁদছ কেন? এই তো আমি রয়েছি, গেছি কোথায়? এই যেমন এ ঘর, আর ও ঘর।"

বৃন্দাবনে থাকিবার সময় পত্রপুষ্পে সাজাইয়া কীর্তন করিতে করিতে একদিন একটি শব লইয়া যাইতেছিল। মা উহা দেখিয়া বলিলেন, "দেখ, দেখ, মানুষটি কেমন বৃন্দাবন প্রাপ্ত হয়েছেন। আমরা এখানে মরতে এলুম, তা একদিন একটু জ্বরও হলো না! কত বয়স হয়ে গেল বল দেখি, আমার বাপকে দেখেছি, ভাশুরকে দেখেছি!" আমরা শুনে হাসি আর বলি, "বল কি, মা বাপকে দেখেছ! বাপকে আবার কে দেখে না?" এমনি ছেলেমানুষের মতো কথা মা তখন বলিতেন। প্রথম প্রথম যেমন ঠাকুরের জন্য খুব কাঁদিয়াছিলেন, শেষে কিন্তু ঠাকুর তেমনি আনন্দে মাকে ভরপুর করিয়া রাখিয়াছিলেন। তখন মাকে দেখিলে যেন একটি বালিকা বলিয়া মনে হইত। নিত্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঠাকুর দর্শন করিতেন। একদিন রাধারমণ দেখিতে গিয়া মা দেখিয়াছিলেন—যেন নবগোপালবাবুর স্ত্রী রাধারমণের পাশে দাঁড়াইয়া হাওয়া করিতেছেন। তাই দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া মা আমাকে বলিলেন, "যোগেন, নবগোপালের পরিবার বড় শুদ্ধ। আমি এই রকম দেখলুম।"

বৃন্দাবনে ঠাকুর একদিন মাকে দেখা দিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি যোগেনকে (স্বামী যোগানন্দকে) এই মন্ত্র দাও।" প্রথম দিন মা ঐ দর্শন মাথার গোলমালে হইয়াছে মনে করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিনও ঐরূপ দেখিয়া গ্রাহ্য করেন নাই। তৃতীয় দিন ঐ দর্শন আবার উপস্থিত হইলে মা ঠাকুরকে বলেন, "আমি তার সঙ্গে কথা পর্যন্ত কই না, কি করে মন্ত্র দিই।"

ঠাকুর বলিলেন, "তুমি মেয়ে-যোগেনকে (আমাকে) বলো, সে থাকবে।"

মা আমার দ্বারা যোগানন্দ স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহার মন্ত্র হইয়াছে কি-না। যোগানন্দ স্বামী বলিলেন, "না, মা, বিশেষ কোন ইষ্টমন্ত্র ঠাকুর আমায় দেন নাই। আমি নিজের রুচিমত একটি নাম জপ করি।" ঐ কথা জানিয়া মা তাঁহাকে একদিন মন্ত্র দিলেন। ঠাকুরের ছবি ও দেহাবশেষরক্ষিত কৌটা সম্মুখে রাখিয়া মা পূজা করিতেছিলেন। তিনি যোগানন্দ স্বামীকে ডাকাইয়া বসিতে বলিলেন। পূজা করিতে করিতে মায়ের ভাবাবেশ হইল, সেই ভাবাবেশেই মা মন্ত্র দিলেন। এমন জোরে মন্ত্র বলিলেন যে পাশের ঘর হইতে আমি উহা শুনিতে পাইলাম।

বৃন্দাবন হইতে মায়ের সহিত আমরা সকলে হরিদ্বার গিয়াছিলাম; যোগানন্দ স্বামী সঙ্গে ছিলেন। পথে রেলগাড়িতে যোগেন মহারাজের ভীষণ জ্বর হয়। আমি তাঁহাকে বেদানা খাওয়াইতেছিলাম। মা দেখিয়াছিলেন, আমি যেন ঠাকুরকেই উহা খাওয়াইতেছি। যোগেন স্বামী জ্বরে বেহুঁশ হইয়া দেখিয়াছিলেন, ভীষণ এক মূর্তি সম্মুখে আসিয়া বলিতেছে, 'তোকে দেখে নিতুম, কিন্তু কি করব, পরমহংসদেবের আদেশ—এখনই আমাকে চলে যেতে হবে, একদণ্ড আর থাকতে পারছি না।' লালপেড়ে কাপড়-পরা একটি স্ত্রীলোককে দেখাইয়া বলিল, 'এই মাগীকে কিছু রসগোল্লা খাওয়াস।' আশ্চর্যের বিষয়, ঐ দর্শনের পরই তাঁহার জ্বর ছাড়িয়া গেল। পরে হরিদ্বার হইতে আমরা জয়পুরে গিয়াছিলাম। সেখানে

গোবিন্দজী দর্শন করিয়া অন্যান্য বিগ্রহ দেখিতে দেখিতে হঠাৎ এক মন্দিরের পার্শ্বের এক মূর্তি দেখিয়াই যোগানন্দ স্বামী বলিয়া উঠিলেন, "এই মূর্তিকেই রসগোল্লা খাওয়াতে বলেছিল।" আবার সামনে রসগোল্লার একটি দোকানও দেখা গেল। তখন আট আনার রসগোল্লা কিনিয়া ঐ মূর্তিকে ভোগ দেওয়া হইল এবং জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে উহা মা শীতলার মূর্তি।

তারপর মা কলিকাতায় ফিরিলেন এবং বলরামবাবুর বাড়িতে কয়েকদিন থাকিয়া কামারপুকুর গিয়াছিলেন। সেখানে প্রায় এক বৎসর থাকিবার পর ভক্তেরা তাঁহাকে বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর ভাড়াটিয়া বাড়িতে প্রায় ছয়মাস আনিয়া রাখেন (১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে)। পরে কার্তিক মাসে ভাড়াবাড়ি ছাড়িয়া কলিকাতায় বলরামবাবুর বাড়িতে দুই-এক দিন থাকিয়া মা শ্রীক্ষেত্র (পুরী) যাত্রা করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে চাঁদবালি বড় জাহাজে, চাঁদবালি হইতে কটক ক্যানাল স্টীমারে এবং কটক হইতে গরুর গাড়িতে পুরী যাওয়া হয়। শরৎ, রাখাল মহারাজ, যোগানন্দ স্বামী প্রভৃতি মায়ের সঙ্গে পুরী গিয়াছিলেন। পুরী গিয়া বলরামবাবুর 'ক্ষেত্রবাসী'র বাড়িতে অগ্রহায়ণ মাস হইতে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত থাকা হইয়াছিল। সামনের রোয়াকওয়ালা পাকা ঘরটিতে মা থাকিতেন। ঠাকুর জগন্নাথ দেখেন নাই বলিয়া মা কাপড়ের ভিতর ঠাকুরের ছবি লইয়া একদিন ঠাকুরকে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন করাইলেন।

জগন্নাথ দর্শন করিয়া মা বলিয়াছিলেন, "জগন্নাথকে দেখলুম যেন পুরুষসিংহ, রত্নবেদীতে বসে রয়েছেন, আর আমি দাসী হযে তাঁর সেবা করছি।" পুরী হইতে ফিরিয়া মা মাস্টার মহাশয়ের বাড়িতে তিন-চারি সপ্তাহ থাকিয়া আঁটপুর যান—সঙ্গে বাবুরাম, নরেন, মাস্টার মহাশয়, সান্যাল আ:ও সব ছিলেন। সেখানে ছয়-সাত দিন থাকিবার পর গরুর গাড়িতে তারকেশ্বর হইয়া মাস্টার মহাশয় প্রভৃতির সঙ্গে তিনি কামারপুকুর গেলেন। কামারপুকুরে প্রায় এক বৎসর থাকিয়া দোলের পূর্বে মা পুনরায় কলিকাতা আসেন এবং মাস্টার মহাশয়ের কম্বুলিয়াটোলার বাড়িতে মাসখানেক থাকেন। তারপর বলরামবাবুর শেষ অসুখের সময় তাঁহার দেহত্যাগ কাল পর্যন্ত তিনি বলরামবাবুর বাড়িতে ছিলেন। পরে বেলুড়ে শ্মশানের কাছে ঘুসুড়ীর বাড়িতে জ্যৈষ্ঠ হইতে ভাদ্র মাস পর্যন্ত (১৮৯০ খ্রীঃ) ছিলেন। সেখানে তাঁহার রক্ত-আমাশয় হওয়ায় বরাহনগরে সৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভাড়াটিয়া বাড়িতে তাঁহাকে রাখিয়া চিকিৎসা করানো হয়। তথায় কিছুদিন থাকিয়া তিনি বলরামবাবুর বাড়ি আসেন এবং দুর্গাপূজার পর কামারপুকুর হইয়া জয়রামবাটী যান। তারপর আষাঢ় মাসে বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর ভাড়াটীয়া বাড়িতে (১৮৯৩ খ্রীঃ) আসেন ও পরবর্তী মাঘ-ফাল্গুনে কৈলোয়ার যাইয়া দুই মাস তথায় থাকেন। কৈলোয়ার হইতে তাঁহার মাতা ও ভাইদের সাঃ • মা পুনরায় কাশী বৃন্দাবন গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া মাস্টার মহাশয়ের কলুটোলার বাড়িতে প্রায় একমাস ছিলেন। তারপর দেশে যান। এবার

দেশ হইতে ফিরিয়া বাগবাজার গঙ্গার ধারের গুদামওয়ালা বাড়িতে পাঁচ-ছয় মাস ছিলেন—এই বাড়িতে নাগ মহাশয় মাকে দর্শন করেন। পুনরায় দেশে যাইয়া প্রায় দেড়বৎসর পরে মা ফিরিয়া আসিয়া গিরিশবাবুর বাড়ির সামনের বাড়িতে থাকেন। এই বাড়িতেই নিবেদিতা মায়ের সহিত প্রায় তিন সপ্তাহ বাস করিয়াছিলেন। তারপর গিরিশবাবুর বাড়ির নিকটে ১৬নং বোসপাড়া লেনে—যেখানে নিবেদিতা প্রথম স্কুল করিয়াছিলেন—সেই বাড়িতে ছিলেন। ইহার পর বাগবাজার স্ট্রীটের বাড়িতে (রামকৃষ্ণ লেনের সম্মুখে) আসিয়া তিনি থাকেন। সেখানে শরৎ মহারাজ ছিলেন। তারপর মা দেশে যান। পুনরায় গিরিশবাবুর বাড়ির দুর্গাপূজা উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া বলরামবাবুর বাড়িতে ছিলেন। দেশে ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া মা তখন খুব রোগা হইয়া গিয়াছিলেন। পরে আবার দেশে গিয়া 'উদ্বোধনে'র নতুন বাড়ি হইলে তথায় আসিয়াছিলেন। তারপর কোঠার, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, রামেশ্বর প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া তিনি 'উদ্বোধনে' ফিরিয়া আসেন এবং অল্প কয়েকদিন পরে দেশে গিয়া রাধুর বিবাহ দেন। প্রায় এক বৎসর পর জয়রামবাটী হইতে কলিকাতায় (উদ্বোধনে) আসিযাছিলেন। 'উদ্বোধন' হইতে কার্তিক মাসে (১৯১২ খ্রীঃ) মা কাশী গেলেন এবং প্রায় তিন মাস কাশীতে থাকিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

মাকে বাল্যকালে প্রায়ই রান্না করিতে হইত। তাঁহার মাতা বিশেষ কারণবশত যখনই রান্না করিতে পারিতেন না, মা-ই তখন রান্না করিতেন। মা বলিতেন, "আমি রাঁধতুম, বাবা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে দিতেন।" ইদানীং আত্মীয়-স্বজন ও ভক্ত সেবাতেই মায়ের কাল কাটিত।

পূজনীয়া যোগেন-মা

(১৩)
১৫ কার্তিক, ১৩১৭

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, কিভাবে জীবনযাপন করব ?"

মা বলিলেন, "যেমন করছ ঐ ভাবেই কাটিয়ে যাও। তাঁকে ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করবে ; সদাসর্বদা স্মরণ-মনন রাখবে।"

আমি—বড় বড় মহাপুরুষদেরই পতন হয় দেখে মনে বড় ভয় হয়, মা।

মা—ভোগের জিনিস সব নিয়ে থাকলে তার ভোগের উপকরণও সব এসে থাকে। বাবা, কাঠেরও যদি মেয়েমানুষ হয়, তবে সেদিকে চাইবে না, সেদিক দিয়ে যাবে না।

আমি—মানুষ তো কিছুই করতে পারে না, তিনিই তো সব করাচ্ছেন।

মা—তিনি সব করাচ্ছেন বটে, কিন্তু সেরূপ বোধ থাকলে তো হয়? লোকে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে মনে করে, আমি সব করছি—তাঁর উপর নির্ভর করে না। যে তাঁর উপর নির্ভর করে, তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।

তারপর জনৈক সাধুকে লক্ষ্য করিয়া মা বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুর বলতেন—'সাধু সাবধান!' সাধুর সর্বদা সাবধানে থাকতে হয়। সাধু সর্বদা সাবধানে থাকবে। সাধুর রাস্তা বড় পিছল। পিছল পথে চলতে হলে সর্বদা পা টিপে চলতে হয়। সন্ন্যাসী হওয়া কি মুখের কথা? সাধু মেয়েমানুষের দিকে ফিরেও তাকাবে না। চলবার সময় পায়ের বুড়ো আঙুলের দিকে লক্ষ্য রেখে চলবে। সাধুর গেরুয়া কাপড় কুকুরের বগলসের মতো তাকে রক্ষা করবে। কেউ তাকে মারতে পারে না। সাধুর সদর রাস্তা। সকলেই তার পথ ছেড়ে দেয়।

"মন্দ কাজে মন সর্বদা যায়। ভাল কাজ কবতে চাইলে মন তার দিকে এগোতে চায় না। আমি আগে রাত তিনটার সময় উঠে প্রত্যহ ধ্যান করতুম। একদিন শরীর ভাল না থাকায় আলস্যবশত করলুম না; তা কদিন বন্ধ হয়ে গেল। সেজন্য ভাল কাজ করতে গেলে আন্তরিক খুব যত্ন ও রোক চাই। যখন নবতে থাকতুম, রাতে যখন চাঁদ উঠত, গঙ্গার ভিতর স্থির জলে চাঁদ দেখে ভগবানের কাছে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতুম—'চন্দ্রতেও কলঙ্ক আছে, আমার মনে যেন কোন দাগ না থাকে।' নবতে থাকবার সময় ঠাকুর এমনকি রামলালকেও আমার কাছে আসতে বারণ করতেন, রামলাল তো ভাশুরপো হয়! এখন তো সকলের সঙ্গে কথা কই, সকলের সামনে বেরোই।

"তুমি কলকাতার ছেলে, ইচ্ছা করলে বিয়ে করে সংসার করতে পারতে—সে সব যখন ত্যাগ করেছ, আবার সেদিকে লক্ষ্য কবছ কেন? থুথু ফেলে আবার সেই থুথু-ঘাঁটা?"

* * *

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, আসন-প্রাণায়াম করা কি ভাল?"

মা—আসন-প্রাণায়াম করলে সিদ্ধাই হয়। সিদ্ধাই লোককে পথভ্রষ্ট করে।

আমি—সাধুর তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করা কি ভাল?

মা—মন যদি একস্থানে শান্তিতে থাকে তবে তীর্থ-ভ্রমণের কি দরকার?

আমি—মা, ধ্যান হয় না। কুণ্ডলিনী জাগ্রত করে দিন।

মা—জাগবে বই কি। একটু ধ্যানজপ করলেই জাগবে। আপনি কি আর জাগে? ধ্যানজপ কর। ধ্যান করতে করতে মন এমন স্থির হয়ে যাবে যে ধ্যান আর ছাড়তে ইচ্ছা হবে না। যেদিন ধ্যান না হবে, জোর করে ধ্যান করবার আবশ্যক নেই—সেদিন প্রণাম করেই উঠবে। যেদিন হবে আপনিই হবে।

৫ আষাঢ়, (১৯-৬-১২)—উদ্বোধন

আমি—মা, মন স্থির হয় না কেন? যখন ভগবানের বিষয় চিন্তা করি, তখন মন নানা বিষয়ে যায়।

মা—বিষয় বলতে টাকাকড়ি, পুত্র-পরিবার—এই সব বিষয়ে মন যাওয়া খারাপ। কাজকর্ম সম্বন্ধে মন তো যাবেই। ধ্যান না হয় জপ করবে, 'জপাৎ সিদ্ধিঃ'। জপ করলেই সিদ্ধিলাভ করবে। ধ্যান হলো ভাল, না হয় জোর করে ধ্যান করবার দরকার নেই।

২৬ অগ্রহায়ণ, (১৯১২)—কাশীধাম

আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাশীতে মঠে থেকে সাধন-ভজন করা ভাল, না নির্জনে সাধন-ভজন করা ভাল?"

মা বলিলেন, "নির্জনে হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থানে কিছুকাল সাধন-ভজন করে মন পাকলে তারপর মনকে যেখানেই রাখ, যে-লোকের সঙ্গেই মেশো একরূপই থাকবে। যখন গাছ চারা থাকে তখন চারিদিকে বেড়া দিতে হয়। বড় হলে ছাগল গরুতেও কিছু করতে পারে না। নির্জনে সাধন করা খুব দরকার। যখন মনে কোন বিষয় উদিত হবে, জানবার ইচ্ছা হবে, তখন একাকী কেঁদে কেঁদে তাঁর নিকট প্রার্থনা করবে। তিনি সমস্ত মনের ময়লা ও কষ্ট দূর করে দেবেন, আর বুঝিয়ে দেবেন।"

আমি—আমার তো সাধন-ভজনের শক্তি নেই, আপনার পাদপদ্ম ধরে পড়ে আছি, যা হয় করুন।

মা হাতজোড় করিয়া ঠাকুরকে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "ঠাকুর তোমার সন্ন্যাস রক্ষা করুন। তিনি দেখছেন, তোমার ভয় কি? ঠাকুরের কাজ করবে, আর সাধন-ভজন করবে, কিছু কিছু কাজ করলে মনে বাজে চিন্তা আসে না। একাকী বসে থাকলে অনেক রকম চিন্তা আসতে পারে।"

১৭ পৌষ—কাশীধাম

আমি—কিরূপ ভাবে কিরূপ স্থানে গিয়ে সাধন-ভজন করতে হবে?

মা—কাশী তোমাদের স্থান। সাধন মানে তাঁর পাদপদ্ম সর্বদা মনে রেখে তাঁর চিন্তাতে মনকে ডুবিয়ে রাখা। তাঁর নাম জপ করবে।

আমি—অনুরাগ না থাকলে শুধু নামজপ করলে কি হবে?

মা—জলেতে ইচ্ছে করেই পড়, আর ঠেলেই ফেলে দিক—কাপড় ভিজবেই। নিত্য ধ্যান করবে। কাঁচা মন কি-না! ধ্যান করতে করতে মন স্থির হয়ে যাবে। সর্বদা বিচার

করবে। যে বস্তুতে মন যাচ্ছে, তা অনিত্য চিন্তা করে ভগবানে মন সমর্পণ করবে। একটি লোক মাছ ধরছিল--পাশে বাজনা বাজিয়ে বর যাচ্ছে, কিন্তু তার ফাতনার দিকেই দৃষ্টি।

আমি—জীবনের উদ্দেশ্য কি ?

মা—ভগবানলাভ করা ও তাঁর পাদপদ্মে সর্বদা মগ্ন হয়ে থাকা। তোমরা সন্ন্যাসী, তাঁর লোক। তোমাদের ইহকাল পরকাল তিনিই দেখছেন। তোমাদের ভাবনা কি ? সর্বদা কি ভগবানের চিন্তা করতে পারা যায় ? কখনো বেড়াবে, কখনো তাঁর চিন্তা করবে।

১৮ পৌষ, বৃহস্পতিবার—কাশীধাম

মা—সাধুর রাগদ্বেষ থাকবে না, সব সহ্য করা সাধুর দরকার। হৃদয়কে ঠাকুর বলতেন, 'তুই আমার কথা সহ্য করবি, আমি তোর কথা সহ্য করব, তবে হবে; তা না হলে খাজাঞ্চীকে ডাকতে হবে।'

২৩ পৌষ, মঙ্গলবার, বেলা ৯৷৷টা—কাশীধাম

মা—ঠাকুর আমাকে বলতেন 'একটু একটু বেড়াবে; না হলে শরীর খারাপ হবে।' আমি তখন নবতে থাকতুম। ভোর চারটায় গঙ্গাস্নান করে ঘরে ঢুকতুম। একদিন ঠাকুর আমায় বললেন, 'আজ একজন ভৈরবী আসবে, তার জন্যে একখানি কাপড় ছুপিয়ে রাখবে, তাকে দিতে হবে।' ঐদিন কালীঘরের ভোগরাগের পর ভৈরবী আসলে ঠাকুর তার সঙ্গে নানা কথা কইতে লাগলেন। ভৈরবীটির একটু মাথা গরম ছিল। সে আমায় সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করত। কখনো কখনো আমায় বলত, 'তুই আমার জন্যে পান্তা ভাত রাখবি। না রাখিস্ তো তোকে ত্রিশূলে করে মেরে রেখে যাব।' শুনে আমার ভয় হতো। ঠাকুর বলতেন, 'তোমার ভয় নেই, ও ঠিক ঠিক ভৈরবী, সেজন্য একটু মাথা গরম।' কখনো কখনো এত ভিক্ষা আনত যে সাত-আট দিন চলত। তাতে খাজাঞ্চী বলতেন, 'মা, তুমি কেন বাইরে ভিক্ষায় যাও, এখানেই নিতে পার।' সে বলত, 'তুই আমার কালনেমি, মামা, তোর কথায় বিশ্বাস কি ?'

"ঠাকুরের সাধন-অবস্থায় কত রকম প্রলোভনের জিনিস দেখে তিনি জড়সড় হতেন এবং সে-সব প্রলোভনের জিনিস তিনি চাইতেন না। একদিন তিনি পঞ্চবটীতে হঠাৎ দেখলেন, একটি ছেলে তাঁর নিকটে এল। তিনি তাতে চিন্তা করতে লাগলেন, এ আবার কি হলো ? তখন মা বুঝিয়ে দিলেন, মানস-পুত্ররূপে ব্রজের রাখাল আসবে। যখন রাখাল এল তখন তিনি বললেন, 'এই আমার সেই রাখাল এসেছে। তোমার নামটি কি বল দেখি ?'—'রাখাল।' 'হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক।' ঠাকুর যেমন পঞ্চবটীতে দেখেছিলেন ঠিক তেমনি।

"ঠাকুরকে হাজরা বলেছিল, 'আপনি কেন নরেন্দ্র, রাখাল, এ সবের জন্যে এত ভাবেন? সর্বদা ঈশ্বরের ভাবে থাকুন না।' ঠাকুর বললেন, 'এই দ্যাখ, ঈশ্বরের ভাবে থাকি।' এই বলে তাঁর সমাধি হলো। দাড়ি, চুল, লোম সব খাড়া হয়ে উঠল। এই অবস্থাতে তিনি ঘণ্টাখানেক ছিলেন। রামলাল তখন নানারূপ ঠাকুরদের নাম শুনাতে লাগল। নাম শুনাতে শুনাতে তবে তাঁর চৈতন্য হয়। সমাধিভঙ্গের পর তিনি রামলালকে বললেন, 'দেখ্‌লি, ঈশ্বরের ভাবে থাকতে গেলে এই অবস্থা। তাই নরেন্দ্র, এদের নিয়ে মনকে নিচে নামিয়ে রাখি।' রামলাল বললে, 'না, আপনি আপনার ভাবেই থাকুন'।"

আমি—একটু প্রাণায়াম-অভ্যাস করছি। করব কি?

মা—একটু একটু করতে পার, বেশি করে মাথা গরম করা ভাল নয়। মন যদি আপনিই স্থির হয়, তবে প্রাণায়ামের আর কি দরকার?

আমি—কুণ্ডলিনী না জাগলে কিছুই হলো না।

মা—জাগবে বই কি। তাঁর নাম করতে করতে সব হয়ে যাবে। মন স্থির না হলেও তো বসে বসে তাঁর লক্ষ লক্ষ নাম জপ করা যায়। কুণ্ডলিনী জাগবার পূর্বে অনাহতধ্বনি শোনা যায়। মা জগদম্বার কৃপা না হলে হয় না।

তারপর মা বলিলেন—"শেষরাত্রে মনে মনে ভাবছিলুম, বাবা বিশ্বনাথকে বুঝি আর দর্শন করতে পারব না। ছোট লিঙ্গমূর্তি—আর যা সব জল-বিল্বপত্রে ড়ুবিয়ে রাখে, বাবাকে আর দেখতে পাওয়া যায় না। এইসব ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ দেখি কি কালো কুচ্‌কুচে পাথরের শিবলিঙ্গ—বিশ্বনাথ! নটীর মা শিবের মাথায় হাত বুলুচ্ছে। আমিও তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁর মাথায় হাত দিলুম।"

আমি—মা, আমাদের আর পাথরের শিবলিঙ্গ ভাল লাগে না।

মা—সে কি বাবা! কত মহা মহা পাপী কাশীতে আসছে, আর বিশ্বনাথকে স্পর্শ করে উদ্ধার হচ্ছে! তিনি সকলের পাপ নির্বিকার ভাবে গ্রহণ করছেন।

"শনি-রবিবারে যখন সব লোক এসে প্রণাম করে, তখন পা একেবারে জ্বলতে থাকে। পা ধুয়ে এসে তবে বসতে পারি।"

আমি—তিনি যদি সকলের বাপ-মা, তবে তিনি কেন পাপ করান?

মা—তিনি জীবজন্তু সবই হয়েছেন বটে, তবে সংস্কার ও কর্ম-অনুসারে সকলে নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করে। সূর্য এক—কিন্তু জায়গা ও বস্তুভেদে তার প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন রকমের।

১ জানুয়ারি, ১৯১৭

আমি বলিলাম, "মা, আমার ধ্যান যাতে ভাল হয় এবং তাতে মগ্ন হয়ে যেতে পারি, এই আশীর্বাদ করুন।" মা মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন আর বলিলেন,"সর্বদা সদসৎ বিচার করবে।"।

আমি—মা, বসে বসে বিচার করতে পারি, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বিচার আসে না ; তখন কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায় ! শক্তি দিন যাতে সে সময় ঠিক থাকতে পারি।

মা—বাবা, ঠাকুর তোমায় রক্ষা করবেন।

তাবপর বলিলেন, "তোমার জ্ঞান চৈতন্য হোক।" জনৈক সন্ন্যাসী ভক্তকে মা বলিতেছেন, "তোমরা সন্ন্যাসী, তোমাদের গৃহস্থের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা অত্যন্ত খারাপ। বিষয়ী লোকদের বাতাস লাগাও খারাপ।

২৭ মে, ১৯১৯—কোয়ালপাড়া

আমি—মা, এতদিন গেল ! কি হলো ?

মা—তিনি সংসারের সব ঝঞ্ঝাট হতে টেনে এনে তাঁব পাদপদ্মে রেখেছেন, এ কি কম ভাগ্য ! যোগীন (স্বামী যোগানন্দ) বলত, 'জপ-ধ্যান করি আর না করি, সংসারেব কোন ঝঞ্ঝাট নেই।' দেখ না, আমি রাধুকে নিয়ে মায়ায় কত ভুগছি !

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "নির্জনে কোন বাগানে কিছুদিন সাধন করতে আমার ইচ্ছে হয়।"

মা—এই তো করবার সময়। এই বয়সেই করতে হয়। করবে বই কি। কিন্তু খাওয়া-দাওয়া বিষয়ে লক্ষ্য রাখবে। যোগীনের (স্বামী যোগানন্দ) কঠোর করে করে শেষে বড় কষ্ট পেয়ে শরীব গেল।

২৯ মে, ১৯১৯—কোয়ালপাড়া

আমি—বাবু আর মঠে আসেন না। আপনার বাড়িতেও আসেন না। তাঁর কেন এরূপ হলো ?

মা—হ্যাঁ, আমি যখন কলকাতায় ছিলুম তখনও আমার কাছে আসত না।

আমি—এত দিনের পুরনো ভক্ত, কেন এরূপ হলো ?

মা—সব কর্মফল। অনেক জন্মের কর্ম ছিল। শেষে আর থাকতে পারলে না। যে কটা ঢেউ আছে সব কেটে যাবে তো ! এক জন্মে যে মুক্তি হবে।

আমি—তাঁর ইচ্ছায় যদি সব হচ্ছে তবে তিনি কাটিয়ে দেন না কেন ?

মা—তাঁর ইচ্ছে হলে তিনি সব কাটিয়ে দিতে পারেন। দেখ না, কর্মের ফল তাঁকেও ভোগ করতে হয়েছে। ঠাকুরের বড় ভাই (রামকুমার) বিকারের সময় জল খাচ্ছিলেন, ঠাকুর তাঁর হাত থেকে গ্লাসটা টেনে নেন, তাতে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন, 'তুই যেমন আমায় জল খেতে দিলি নি, তুইও তেমনি শেষ সময় কিছু খেতে পারবি নি।' ঠাকুর বললেন, 'দাদা, আমি তো তোমার ভালর জন্যে করেছি, তুমি আমায় শাপ দিলে!' তাতে তিনি কেঁদে বললেন, 'ভাই, কেন আমার মুখ হতে এমন কথা বের হলো জানি নে।' দেখ, অসুখের সময় তাঁকেও কর্মফল ভোগ করতে হয়েছে। কোন জিনিস খেতে পারতেন না। এরও অনেক জন্মের সংস্কারের ফলে এরূপ হয়েছে। দেখ না, আ—র কি হলো? কোথা হতে যে কি হয়, বুঝতে পারা মুশকিল।

৪ জুন, ১৯১৯—কোয়ালপাড়া

আমি—মা, সংখ্যা রেখে জপ করব কি?

মা—সংখ্যা রেখে জপ করলে সংখ্যার দিকে লক্ষ্য থাকে। এমনি জপ করবে।

আমি—জপ করতে করতে মন কেন তাঁতে মগ্ন হয় না?

মা—করতে করতেই হবে। মন না বসলেও জপ করতে ছাড়বে না। তোমার কাজ তুমি করে যাবে। নাম করতে করতে মন আপনি স্থির হবে—বায়ুহীন স্থানে দীপশিখার মতো। বাতাস থাকলে প্রদীপের শিখা স্থির থাকে না, মনেও কল্পনাবাসনা থাকলে মন স্থির হয় না। ঠিক ঠিক মন্ত্র-উচ্চারণ না হলে দেরি হয়। একটি স্ত্রীলোকের মন্ত্র ছিল 'রুক্মিণী-নাথায়' সে 'রুকু' 'রুকু' জপ করত। সেজন্যে তাকে কিছুদিন ঠেকতে হয়েছিল। পরে আবার তাঁর কৃপায় সে ঠিক মন্ত্র পায়।

১২ জুন, ১৯১৯—কোয়ালপাড়া

আমি—কিছুদিন হলো আসন অভ্যাস করছি—শরীর ভাল থাকবার জন্যে। এই আসন অভ্যাস করলে হজম হয় ও ব্রহ্মচর্যের সহায়তা করে।

মা—শরীরের দিকে পাছে মন যায়, আবার ছেড়ে দিলেও পাছে শরীর খারাপ হয়, এই বুঝে করবে!

আমি—মা, আমি পাঁচ-দশ মিনিট করি, ভাল হজম হবার জন্যে।

মা—তা করবে। কোন ব্যায়াম করে ছেড়ে দিলে শরীর খারাপ হয়, তাই বলছিলুম। আশীর্বাদ করি, বাবা, চৈতন্য হোক।

স্বামী শান্তানন্দ

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

দ্বিতীয় ভাগ

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম সংস্করণের

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীমায়ের ইচ্ছায় তাঁহার অমৃতময়ী কথার দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। প্রথম ভাগের ন্যায় ইহারও অধিকাংশ উপকরণ তাঁহার সন্ন্যাসী ও গৃহী সন্তানগণের দিনলিপি হইতে সংগৃহীত। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে পাঠক ইহাতে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত মায়ের দিব্যলীলার অপূর্ব চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। প্রথম ভাগের ন্যায় এই দ্বিতীয় ভাগখানিও স্বামী অরূপানন্দের সাধু সঙ্কল্প ও ঐকান্তিক চেষ্টাব ফল। তাঁহার রচিত শ্রীশ্রীমায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী পুস্তকখানিকে আরও সমৃদ্ধ করিয়াছে। এজন্য সমগ্র ভক্ত-সমাজ তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শতবার্ষিকী মহোৎসবের পূর্ণাহুতিস্বরূপ এই গ্রন্থ সকল মুমুক্ষু নরনাবীর পরম কল্যাণ সাধন করুক ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

৩০ ফাল্গুন, ১৩৪৩

চতুর্থ সংস্করণের নিবেদন

শ্রীশ্রীমায়ের কথা, দ্বিতীয় ভাগ, চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। পূর্ব সংস্করণে যাঁহাদের বিবরণ অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করা হইয়াছিল, অনিবার্য কারণে তখন তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা সম্ভবপর হয় নাই। বর্তমান সংস্করণে অধিকাংশ বিবরণের নিম্নে তাঁহাদের নাম দেওয়া হইল।

'উদ্বোধন' ৫৪ তম বর্ষেব জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, ভাদ্র ও কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীমতী ক্ষীরোদবালা রায় লিখিত 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' এই সংস্করণে সংযোজিত হইল।

গুরু-পূর্ণিমা
১৩৬০

প্রকাশক

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী

শ্রীশ্রীমা বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী গ্রামে ১২৬০ সালের ৮ পৌষ বৃহস্পতিবার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মাতার নাম শ্যামা দেবী। মা তাঁহার জন্মকথা এইরূপ বলিয়াছেন, "আমার জন্মও তো ঐ রকমের (ঠাকুরের মতো)। আমার মা শিওড়ে ঠাকুরদেখতে গিয়েছিলেন। ফেরবার সময় হঠাৎ শৌচে যাবার ইচ্ছে হওয়ায় দেবালয়ের কাছে এক গাছতলায় যান। শৌচের কিছুই হলো না, কিন্তু বোধ করলেন, একটা বায়ু যেন তাঁর উদরমধ্যে ঢোকায় উদর ভয়ানক ভারী হয়ে উঠল। বসেই আছেন। তখন মা দেখেন যে লাল চেলি পরা একটি পাঁচ-ছ বছরের অতি সুন্দরী মেয়ে গাছ থেকে নেমে তাঁর কাছে এসে কোমল বাহু দুটি দিয়ে পিঠের দিক থেকে তাঁর গলা জড়িয়ে ধবে বলল, 'আমি তোমার ঘরে এলাম মা।' তখন মা অচৈতন্য হয়ে পড়েন। সকলে গিয়ে তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে এল। সেই মেয়েই মায়ের উদরে প্রবেশ করে; তা থেকেই আমার জন্ম। বাড়িতে ফিবে এসে মা এই ঘটনাটি বলেছিলেন।"

মায়ের পিতা তখন কার্যোপলক্ষে কলিকাতা গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি এই সকল কথা শুনিলেন। তদবধি মা ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত তিনি আর স্ত্রীর অঙ্গ স্পর্শ করেন নাই। শুনিয়াছি, মাকে তাঁহার পিতা দেবতার ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। মায়ের মা একবার যোগেন-মাকে বলিয়াছিলেন, "গর্ভাবস্থায় আমার এই রূপ! মাথায় চুল আর ধরে না। সেবার সাধে কত লোক যে কাপড় দিয়েছিল তার আর অবধি নেই।"

মায়ের জন্মস্থান এখন যেখানে মন্দির হইয়াছে সেইখানে ছিল। বসত ঘরখানি উত্তরের জমিতে ছিল। পূর্বদিকের জমিতে একখানি দোচালা ঘর ছিল।মধ্যে দেওয়াল, বহির্ভাগ সদর এবং ভিতরের ভাগ অন্দর। দক্ষিণের জমিতে রান্নাঘর, ঢেঁকিশাল প্রভৃতি ছিল। মা বলিয়াছিলেন, "পুরান (জন্মস্থানের) বাড়িতে বিয়ে হয়। আমার ন-বছর বয়সের সময় নতুন বাড়িতে (এখন যেটি বরদা মামার বাড়ি) আসি। ও বাড়িতে আর ধরে না।"

মায়ের পিতা দরিদ্র হইলেও অতি নিষ্ঠাবান এবং মাতা বিশেষ ভক্তিমতী ও কর্তব্যপরায়ণা ছিলেন। মা শৈশবে দরিদ্রের সন্তানের মতোই লালিত পালিত হইয়াছিলেন। রন্ধনাদি গৃহকার্যে তিনি নিজ মাতাকে সহায়তা করিতেন। আমাদের নিকট বলিয়াছিলেন, "ছেলেবেলায় গলা সমান জলে নেমে গরুর জন্য দলঘাস কেটেছি। ক্ষেতে মুনিষদের জন্য মুড়ি নিয়ে যেতুম। এক বছর পঙ্গপালে সব ধান কেটেছিল; ক্ষেতে ক্ষেতে সেই ধান কুড়িয়েছি।"

বাল্যকালে ছোট ভাইদের রক্ষণাবেক্ষণ করাই মায়ের প্রধান কাজ ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন. "ভাইদের নিয়ে গঙ্গায় নাইতে যেতুম। আমোদর নদীই ছিল যেন আমাদের গঙ্গা। গঙ্গাস্নান করে সেখানে বসে মুড়ি খেয়ে আবার ওদের নিয়ে বাড়ি আসতুম। আমার বরাবরই একটু গঙ্গাবাই ছিল।"

ছোট ভাইদের সঙ্গে মা কখন কখনও পাঠশালায় যাইতেন। তাহার ফলে তখন অতি সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। অবশ্য পরে তিনি বেশ পড়িবার অভ্যাস করিয়াছিলেন, এবং বাংলা রামায়ণাদি পড়িতেন কিন্তু পত্রাদি লিখিতে তাঁহাকে কখনও দেখা যাইত না।

পাঁচ বৎসর বয়সের সময় মায়ের বিবাহ হয়। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার সাত বছর বয়সের সময় ঠাকুর জয়রামবাটী এসেছিলেন। বিয়ের পর জোড়ে যায় না ? তখন আমাকে বলেছিলেন, 'তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, ক-বছরে বিয়ে হয়েছে, তখন পাঁচ বছব বলো, সাত বছর বলো না'।" জোড়ে যাওয়াকেই মা পাছে বিবাহ মনে করেন, এইজন্য ঠাকুর ঐ কথা বলিয়া থাকিবেন।

বিবাহের সময় সম্বন্ধে মা বলিতেন, "খেজুরের দিনে আমার বিয়ে হয়, মাস মনে নেই। দশ দিনের মধ্যে যখন কামারপুকুর গেলুম তখন সেখানে খেজুর কুড়িয়েছি। ধর্মদাস লাহা এসে বললে, 'এই মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে হয়েছে ?' সৃয্যির (জ্ঞাতিভাই) বাপ্ কোলে করে আমাকে কামারপুকুর নিয়ে গিয়েছিল।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের জয়রামবাটী যাওয়া সম্বন্ধে মায়ের এইটুকুই মনে ছিল যে, ভাগিনেয় হৃদয় কতকগুলি পদ্মফুল সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল এবং তিনি নিতান্ত সঙ্কুচিতা হইলেও তাঁহার পাদপদ্ম পূজা করিয়াছিল।

মায়ের সাত বৎসর বয়সেই ঠাকুর দ্বিতীয়বার জয়রামবাটী যান। তখন কেহ না বলিয়া দিলেও মা ঠাকুরের পা ধুইয়া দিয়া তাঁহাকে বাতাস করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া অন্যান্য সকলে হাসিয়াছিল।

মায়ের ছেলেবেলার খেলার সঙ্গী রাজ মুখুয্যের ভগিনী অঘোরমণি বলেন, "মা খুব সাদাসিদে ছিলেন। তাঁতে সরলতা যেন মূর্তিমতী ছিল। খেলায় তাঁর সঙ্গে কখনো কারও ঝগড়া হয়নি। মা প্রায়ই কর্তা বা গিন্নি সাজতেন। পুতুল গড়ে খেলা করতেন বটে, কিন্তু কালী ও লক্ষ্মী গড়ে ফুল বেলপাতা দিয়ে পুজো করতে ভালবাসতেন। অন্যান্য মেয়েদের মধ্যে মাঝে মাঝে ঝগড়া হলে মা এসে মিটিয়ে দিয়ে তাদের মধ্যে ভাব করিয়ে দিতেন।"

অঘোরমণি বলিয়াছিলেন, "একবার জগদ্ধাত্রী পূজোর সময় হলদেপুকুরের রামহৃদয় ঘোষাল উপস্থিত ছিলেন। মাকে জগদ্ধাত্রীর সামনে ধ্যান করতে দেখে তিনি অবাক হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন; কিন্তু কে জগদ্ধাত্রী, কে মা, কিছুই ঠিক করতে পারলেন না। তখন ভয়ে পালিয়ে গেলেন।"

মায়ের এগার বৎসর বয়সের সময়, ১২৭১ সালে, ওদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। মায়ের পিতার কিছু ধান্য সঞ্চিত ছিল। গরিব ব্রাহ্মণ, নিজের পোষ্যবর্গ কি খাইবে সেদিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, অন্নসত্র খুলিয়া দিলেন। কড়াইয়ের ডালের খিচুড়ি হাঁড়ি হাঁড়ি রন্ধন করাইয়া কয়েকটি ডাবায় ঢালিয়া রাখিতেন। গরম খিচুড়ি খাইতে লোকের কষ্ট হইত বলিয়া মা দুই হাতে পাখার বাতাস করিয়া তাহা ঠাণ্ডা করিয়া দিতেন। ক্ষুধার্ত লোকেদের দুর্দশা মা এইরূপে বর্ণনা করিতেন, "আহা, এই খিদের জ্বালায় সকলে খাবার জন্য বসে আছে। একদিন একটি বাগদী না ডোমের মেয়ে এসেছে। মাথায় চুলগুলো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া হয়ে গেছে তেলের অভাবে, চোখ উন্মাদের মতো। ছুটে এসে গরুর ডাবায় যে কুঁড়ো ভেজানো ছিল তাই খেতে আরম্ভ করেছে। এত যে সকলে ডাকছে, 'বাড়ির ভিতরে এসে খিচুড়ি খা'—তা আর ধৈর্য মানছে না। খানিকটা কুঁড়ো খেয়ে তবে কথা তার কানে গেল। এমন ভীষণ দুর্ভিক্ষ। সেই বছর দুঃখ পেয়ে তবে লোকে ধান মরাইয়ে রাখতে আরম্ভ করলে।"

তের বৎসর বয়সের সময় মা মাসখানেকের জন্য কামারপুকুর যান। ঠাকুর তখন দক্ষিণেশ্বরে। পাঁচ-ছয় মাস পরে পুনরায় কামারপুকুরে গিয়া প্রায় দেড় মাস থাকেন। তখনও ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে। তারপর ঠাকুর ব্রাহ্মণীকে লইয়া কামারপুকুরে যান এবং শ্রীশ্রীমাকে তথায় আনাইয়া লন। সেবার মা কামারপুকুরে মাস তিনেক ছিলেন।

এই সময়ে লৌকিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে ঠাকুর মাকে নানাপ্রকার শিক্ষা দিয়াছিলেন। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গেলে মাও জয়রামবাটী ফিরিয়া যান। কিন্তু এই সামান্য তিন মাসের ব্যবহারেই মায়ের মনে ঠাকুরের মহৎ জীবনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইয়াছিল।

তারপর মা সর্বদা লোকের মুখে শুনিতে লাগিলেন যে, ঠাকুর পাগল হইয়া গিয়াছেন। এই বিষয়ের সত্যাসত্যতা নির্ণয়ের জন্য তিনি নিজে দক্ষিণেশ্বরে গিয়া উপস্থিত হন। ইহার সাত-আট মাস পূর্বে মথুরবাবু দেহত্যাগ করিয়াছেন। ঠাকুর মাকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং নিজ জননীর সঙ্গে নহবতে তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা করেন। সেই অবধি ঠাকুরের শেষ অসুখের চিকিৎসার জন্য দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ পর্যন্ত মা প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে থাকিতেন। নহবতে নিচের তলায় অতি ক্ষুদ্র ঘরখানিতে বহু কষ্টে বাস করায় মধ্যে মধ্যে তাঁহার অসুখ হইত এবং বাধ্য হইয়া তাঁহাকে দেশে যাইতে হইত। তখন পল্লীগ্রামে চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। কঠিন অসুখ হইলে লোকে দেবস্থানে হত্যা দিত ও মানত করিত। মাও একবার সিংহবাহিনীর মন্দিরে হত্যা দিয়া কঠিন রোগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করেন।

মায়ের এই বিষম শারীরিক ক্লেশ সম্বন্ধে ঠাকুর উদাসীন ছিলেন না। অসুখ হইলে চিকিৎসাদির বন্দোবস্ত তো করিতেনই, এতদ্ভিন্ন তাঁহার শরীর যাহাতে ভাল থাকে তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য যত্ন করিতেন। মা বলিয়াছিলেন, "তিনি বলতেন, 'বুনো পাখি খাঁচায় রাত দিন থাকলে বেতে যায়, মাঝে মাঝে পাড়ায় বেড়াতে যাবে।' দুপুরে কালীবাড়ির সকলে খাওয়া দাওয়ার পর যখন বিশ্রাম করত, সেই সময় ঠাকুর পঞ্চবটীর দিকে গিয়ে দেখে

আসতেন কোন লোকজন আছে কিনা। যদি দেখতেন লোকজন নেই, তখন বলতেন, 'এই সময় যাও, কেউ নেই।' তিনি ঘরের কাছে একটু দাঁড়াতেন, আমি খিড়কি ফটক দিয়ে রামলালের বাড়ির দিকে পাঁড়ে গিন্নিদের ওখানে বেড়াতে যেতুম। সমস্ত দিন কথাবার্তা কয়ে, সন্ধ্যার পর যখন আরতি হতো, আর সব লোক আরতি-টারতি দেখতে যেত, আমি সেই সময়ে আসতুম।" গৌর-মা বলেন, "এই যে দুজনের মাত্র পনের-বিশ হাত দূরে থেকেও, কখন কখনও ছ-মাসেও হয়তো একদিন দেখা নেই, তবু দু-জনের ভাবই ছিল কত! দেখেছি, একদিন মায়ের মাথা ধরেছে, ঠাকুর তাই শুনে মহা ব্যস্ত হয়ে বার বার রামলাল দাদাকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'ওরে রামলাল, মাথা ধরল কেন রে?' আবার একাকী থাকাব অবসাদ নিবারণের জন্য যাহাতে মন্দ লোকের সঙ্গে মা না মিশেন, সে বিষয়ে ঠাকুর তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিতেন।"

মেয়েরা অলঙ্কার পরিতে ভালবাসেন। এই বিষয়েও মায়ের মনে যাহাতে কোন দুঃখ না থাকে সেইজন্য ঠাকুর হৃদয়কে দিয়া অলঙ্কার গড়াইয়া মাকে দিযাছিলেন। মা বলিতেন, "তখন তাঁর অসুখ, তবুও আমার জন্য অত টাকা দিয়ে তাবিজ গড়িয়ে দেওয়ালেন। ঠাট্টা করে বলতেন, 'ওরে, আমার সঙ্গে ওর এই সম্বন্ধ।' এদিকে নিজে তো টাকা ছুঁতে পারতেন না। পঞ্চবটীতে সীতাকে দেখেছিলেন—হাতে ডায়মন-কাটা বালা। সীতার সেই বালা দৃষ্টে আমাকে সোনার বালা গড়িয়ে দিয়েছিলেন।"

নহবতে থাকিতে মায়ের বড় কষ্ট হয় জানিয়া শম্ভুবাবু দক্ষিণেশ্বর গ্রামে মায়েব জন্য একখানি কুটির নির্মাণ করিয়া দেন। এখন যেখানে রামলাল দাদার বাড়ি আছে তাহারই পাশের জমিতে মায়ের ঘর ছিল। ঠাকুরের কঠিন আমাশয় হওয়ায তাঁহার সেবার জন্য মাকে পুনরায় নহবতে আসিয়া থাকিতে হয় এবং কিছুদিন পরে তাঁহার নিজেব ঐ অসুখ হয়। রোগ কিছুতেই না সারায়, মা পিত্রালয়ে যান। সেখানেও তাঁহাকে দীর্ঘকাল ভুগিতে হইয়াছিল। সুস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিলে হৃদয়ের অসদ্ব্যবহারে, যেদিন আসিয়াছিলেন সেইদিনই তিনি দেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। ইহার এক বৎসর পরে, ঠাকুরের খাওয়া-দাওয়াব বিশেষ অসুবিধা হইতেছে জানিয়া, মা পুনরায দক্ষিণেশ্বরে আসেন। তখন হৃদয় নির্বুদ্ধিতাব জন্য মন্দির হইতে বিতাড়িত হইয়াছে।

১২৯২-৯৩ সালে ঠাকুরের শেষ অসুখের সময় মা প্রাণপণে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। কিন্তু মা ও ভক্তগণের শত চেষ্টা সত্ত্বেও রোগের হ্রাস না পাইয়া উত্তরোত্তব বৃদ্ধি হয় এবং ১২৯৩ সালের ৩১ শ্রাবণ, রবিবার রাত্রি প্রায় একটাব সময় ঠাকুব হঠাৎ মহাসমাধিমগ্ন হন। পরদিন সন্ধ্যায় দেহসৎকারের পর শ্রীশ্রীমা যখন অন্যান্য অলঙ্কার খুলিয়া সর্বশেষে হাতের সোনার বালা খুলিতেছেন, তখন ঠাকুর তাঁহাকে দেখা দিয়া নিষেধ করেন। বলরামবাবু মায়ের জন্য সাদা কাপড় আনিয়াছেন। উহা মাকে দিবার জন্য গোলাপ-মাকে বলায় তিনি বলিলেন, "বাপরে, এ সাদা থান কে তাঁর হাতে দিতে যাবে!"

এদিকে গোলাপ-মা আসিয়া দেখেন, মা নিজের কাপড়গুলির পাড় ছিঁড়িয়া সরু করিয়া লইয়াছেন। সেই অবধি মা খুব সরু লালপেড়ে কাপড়ই পরিতেন। তৃতীয় দিন মধ্যাহ্নে ঠাকুরের অস্থির কলসের সম্মুখে ভোগ নিবেদন করা হয়। ৬ ভাদ্র বৈকালে মাকে বলরামবাবুর বাড়িতে আনয়ন করা হয়। সঙ্গে লক্ষ্মীদিদি। ঠাকুরের অস্থি লইয়া ভক্তগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় ত্যাগী শিষ্যগণ কলস হইতে অস্থিগুলি বাছিয়া লইয়াএকটি কৌটায় রাখিয়া দিয়াছিলেন। ঐ কৌটাও শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে আনা হইল। ঠাকুরের অস্থি লইয়া বিরোধের কথা শুনিয়া মা গোলাপ-মাকে বলিয়াছিলেন, "এমন সোনার মানুষই চলে গেলেন ; দেখেছ, গোলাপ, ছাই নিয়ে ঝগড়া কবছে !" ১৫ ভাদ্র সন্ধ্যায় মা বৃন্দাবন যাত্রা কবিলেন। সঙ্গে গোলাপ-মা, লক্ষ্মীদিদি, মাস্টার মহাশয়ের স্ত্রী, এবং পূজনীয় যোগীন মহারাজ, কালী মহারাজ ও লাটু মহারাজ ছিলেন।

বৃন্দাবন যাইবার পথে মা কাশীতে তিন দিন অবস্থান করেন। বৃন্দাবনে তিনি এক বৎসরকাল ছিলেন। মধ্যে একবার লক্ষ্মীদিদি, যোগেন-মা ও শ্রীযুক্ত যোগানন্দ স্বামীর সহিত মা হরিদ্বার গিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে ঠাকুরের নখ ও কেশ দেন এবং জয়পুর হইয়া বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসেন। তথায় কালাবাবুর কুঞ্জে থাকিতেন। বৃন্দাবনে মা, যোগেন-মা প্রভৃতি ঠাকুরের অদর্শনে খুব কাঁদিতেন। একদিন ঠাকুর তাঁহাদিগকে দেখা দিয়া বলেন, "তোমরা অত কাঁদছ কেন ? গেছি আব কোথায় ? এই এঘর আর ওঘর।" বৃন্দাবনে অনেক সময় শ্রীশ্রীমায়ের দেহে ঠাকুরের আবেশ হইত। কখনও বা তিনি ভাবাবেশে একাকী চড়া অতিক্রম করিয়া যমুনায় চলিয়া যাইতেন। সঙ্গীরা তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া খুঁজিতে খুঁজিতে সেখানে গিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিতেন।

বৃন্দাবনে এক বৎসর বাসের পর মা কলিকাতায় আসেন এবং কয়েকদিন বলরামবাবুর বাড়িতে থাকিয়া কামারপুকুর যান। সেখানেও তিনি প্রায়ই ঠাকুরের দেখা পাইতেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি কামারপুকুরে থাকবে। শাক বুনবে ; শাক ভাত খাবে, আর হবিনাম করবে।" মাকে এই সময় সেইভাবেই জীবনযাপন করিতে হইয়াছিল। অনেক সময়ে বাড়িতে অপর কেহ থাকিত না। এমন দিনও গিয়াছে যে শুধু দুটি ভাত সিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু লবণ আর জোটে নাই। শ্রীযুত যোগীন মহারাজ, শরৎ মহারাজ প্রভৃতি যাঁহারা পরে মায়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়াছিলেন, তাঁহারা তখন ঠাকুরের অদর্শনে তীব্র বৈরাগ্যের প্রেরণায় তীর্থাদি ভ্রমণ করিতেছেন। পূজনীয় শরৎ মহারাজ বলিতেন, "আমাদের এ ধারণাই তখন ছিল না যে, মায়ের নুনটুকুও জোটেনি।" কামারপুকুরে প্রায় এক বৎসর থাকিবার পর মাকে ভক্তেরা বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর ভাড়াটিয়া বাড়িতে প্রায় ছয়মাস কাল আনিয়া রাখেন (১৮৮৮ খ্রীঃ)।পরে কার্তিক মাসে সে বাড়ি ছাড়িয়া দিয়া

কলিকাতায় বলরামবাবুর বাড়িতে দুই একদিন থাকিয়া মা পুরী যাত্রা করেন। তখনও রেল হয় নাই। কাজেই চাঁদবালী পর্যন্ত জাহাজে * তথা হইতে কটক পর্যন্ত স্টিমারে এবং অবশিষ্ট পথ গোযানে যাইতে হইযাছিল। পুরীতে মা বলরামবাবুরদের 'ক্ষেত্রবাসীর' বাড়িতে অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন পর্যন্ত ছিলেন। বলরামবাবুদের পুরীতে বিশেষ নাম আছে। সেজন্য পাণ্ডা গোবিন্দ শিঙ্গারী শ্রীশ্রীমাকে পালকি করিয়া জগন্নাথ দর্শনে লইযা যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাহাতে মা বলিযাছিলেন, "না, গোবিন্দ, তুমি আগে আগে পথ দেখিযে চলবে, আমি দীনহীন কাঙালিনীর মতো তোমার পেছনে পেছনে জগন্নাথ দর্শনে যাব।"

পুরী হইতে ফিরিযা মা কলিকাতায মাস্টার মহাশযের বাড়িতে তিন চারি সপ্তাহ থাকিযা আঁটপুর ও তথা হইতে তারকেশ্বর হইযা কামারপুকুর যান। তথায প্রায এক বৎসর থাকিযা মা দোলের পূর্বে কলিকাতায আসেন ও মাস্টার মহাশযের কম্বুলিযাটোলার বাড়িতে মাসখানেক থাকেন। তারপর বলরামবাবুর শেষ অসুখের সময তাঁহার দেহত্যাগ পর্যন্ত মা বলরামবাবুর বাড়িতেই ছিলেন। পরে বেলুড়ে শ্মশানের নিকট ঘুসুড়ীর বাড়িতে জ্যৈষ্ঠ হইতে ভাদ্র মাস পর্যন্ত (১৮৯০ খ্রীঃ) ছিলেন। সেখানে রক্তামাশয হওযায বরাহনগরে সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভাড়াটিযা বাড়িতে তাঁহাকে চিকিৎসা করানো হয। তারপর তিনি বলরামবাবুর বাড়ি আসেন এবং দুর্গাপূজার পর কামারপুকুর হইযা জযরামবাটী যান। পর বৎসর (১৮৯৩ খ্রীঃ) আষাঢ় মাসে মা বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর ভাড়াটিযা বাড়িতে আসেন ও মাঘ কিংবা ফাল্গুনে কৈলোযার যাইযা দুই মাস থাকেন। তথা হইতে তাঁহার মাতা ও ভ্রাতাদের সহিত মা পুনরায কাশী ও বৃন্দাবন গিযাছিলেন। সেখান হইতে ফিরিযা মাস্টার মহাশযের কম্বুলিযাটোলার বাড়িতে প্রায একমাস থাকিযা মা দেশে যান। তথা হইতে ফিরিবার পর বাগবাজারে গঙ্গার ধারের গুদামওযালা বাড়িতে পাঁচ ছয মাস ছিলেন। এই বাড়িতে শ্রীযুক্ত নাগ মহাশয মাকে দর্শন করেন। পুনরায দেশে যাইযা প্রায দেড় বৎসর পরে মা কলিকাতা আসেন এবং বাগবাজারে বিভিন্ন ভাড়াটিযা বাড়িতে থাকিয়া আবার দেশে যান। ১৯০৪ সন হইতে তিনি প্রায দেড় বৎসর বাগবাজার স্ট্রীটের একটি ভাড়াটিযা বাড়িতে (রামকৃষ্ণ লেনের সামনে) ছিলেন। ১৯০৭ সনে গিরিশবাবুর দুর্গাপূজা উপলক্ষে জযরামবাটী হইতে কলিকাতা আসিযা মা বলরামবাবুর বাড়িতে থাকেন। পূজার কযদিন গিরিশবাবু শ্রীশ্রীমাকে প্রত্যহ বাটীতে আনিযা পূজা করেন। অষ্টমীর দিন রাত্রে সন্ধিপূজার সময মাকে আর সংবাদ দেওযা হয নাই। মা কিন্তু ঠিক সেই সময নিজেই বলরামবাবুর বাটি হইতে হাঁটিযা গিরিশবাবুর বাড়ির পিছনের ফটকে গিযা বলেন, "দরজা খোল, আমি এসেছি।" সকলে দরজা খুলিযা দেখিযা বিস্মিত হন।

* আগের জাহাজখানি সাতশত যাত্রীসহ ডুবিযা গিযাছিল

দেশে ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া মা এইবার খুব রোগা হইয়া গিয়াছিলেন। পরে আবার দেশে গিয়া উদ্বোধনের নতুন বাড়ি হইলে মা ১৯০৯ সনে তথায় শুভাগমন করেন। তারপর কোঠার, মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর, রামেশ্বর প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া উদ্বোধনে ফিরিয়া আসেন এবং অল্প কয়েকদিন পরে দেশে গিয়া রাধুর বিবাহ দেন। ইহার প্রায় এক বৎসর পরে উদ্বোধনের বাড়িতে আসেন। পরবর্তী কার্তিক মাসে কাশী গিয়া মা কিবণবাবুদের বাড়িতে তিন মাস থাকেন, এবং কলিকাতা ফিরিয়া অল্পদিন পরেই দেশে যান। পুরাতন বাটীতে (প্রসন্ন মামার বাটীতে) ভক্তদের স্থান সঙ্কুলান হইত না বলিয়া ১৯১৫ সনে জয়রামবাটীতে মায়ের জন্য পৃথক বাড়ি নির্মিত হয়—মাটির কোঠা, খড়ের চাল। অতঃপর মা যখনই দেশে যাইতেন, এই নতুন বাড়িতেই থাকিতেন।

বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর ভাড়াটিয়া বাড়িতে শ্রীশ্রীমায়েব গভীব নির্বিকল্প সমাধি হয়। বহুক্ষণ পবে একটু হুঁশ হইলেও হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গেব জ্ঞান অতি কষ্টে আসিযাছিল। মা কপিল মহারাজকে বলিয়াছিলেন, "এই সময় লাল জ্যোতি, নীল জ্যোতি, এই সব জ্যোতিতে মন লীন হতো। আর দু-চারদিন এ ভাব থাকলে দেহ থাকত না।" এই বাড়িতেই মা একদিন দেখেন যে, ঠাকুর গঙ্গায গিযা নামিলেন। অমনি গঙ্গাজলে তাঁহার দেহ গলিযা গেল। স্বামীজী "জয বামকৃষ্ণ, জয় বামকৃষ্ণ" বলিয়া সেই জল দুই হাতে চারিদিকে অসংখ্য লোকেব মাথায় ছিটাইযা দিতেছেন, আর তাহাবা ঐ জলস্পর্শে সদ্য মুক্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছে। এত লোক যে কোথাও একটু ফাঁক নাই! এই দৃশ্য মায়ের মনে এতই গাঁথিয়া গিয়াছিল যে, কয়েকদিন কিছুতেই গঙ্গায নামিতে পাবেন নাই। বলিতেন, "এ যে ঠাকুরের দেহ; কি করে আমি এতে পা দিই।" প্রতিমা বিসর্জনের পর দেবদেবীর দেহ জলে মিশিয়া গিয়াছে, মনে করিযাই হিন্দুগণ সেই 'শান্তিজল' সকলের মাথায় ছিটাইযা দিযা থাকেন।

মায়েব দৈনন্দিন জীবন বড় অদ্ভুত ছিল। তিনি রাত্রি প্রায় তিনটার সময় নিদ্রা হইতে উঠিতেন এবং সর্বপ্রথমে শ্রীশ্রীঠাকুবেব ছবি দেখিতেন। উঠিবার সময় ঠাকুরদেব নাম কবিতেন। তারপর প্রাতঃকৃত্য সমাপন কবিয়া ঠাকুব তুলিতেন এবং পবে জপে বসিতেন। সেই যে দক্ষিণেশ্বরে থাকিবার সময় শেষরাত্রে উঠিয়া শৌচস্নানাদি শেষ করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে ঘরে ঢুকিতেন, সেই অভ্যাস তাঁহার আজীবন ছিল। শরীর খুব খারাপ থাকিলেও যথাসময়ে উঠিয়া মুখ-হাত ধুইযা এবং পবে আবার একটু শুইতেন। তথাপি ঠিক সময়ে উঠা চাই। মা বলিতেন, "রাত তিনটে বাজলেই যেখানেই থাকি, কানের কাছে যেন বাঁশীর ফুঁ শুনতে পেতুম।" যখন যেটি করিবার সে বিষয়ে তাঁহাব আদৌ আলস্য ছিল না।

সকালের পূজার জন্য ফুল, বেলপাতা প্রভৃতি গুছানো, ফল ছাড়ানো ইত্যাদি সব কাজ মা নিজেই করিয়া আটটার সময আন্দাজ পূজায বসিতেন। ইদানিং স্ত্রী-ভক্তেরা এই সকল কাজে তাঁহাকে সাহায্য কবিলেও মা নিজে যথাসাধ্য প্রায় রোজই কবিতেন। তবে শেষ

কয়েকবার উদ্বোধনে যখন ছিলেন, সাধুদের কেহ কেহ পূজা করিতেন। মা নিজে যখন পূজা করিতেন, এক ঘণ্টার মধ্যে পূজা শেষ করিয়া প্রসাদ বিতরণের জন্য শালপাতা সাজাইতেন এবং সকলকে প্রসাদ দিতেন। কখন কখনও কাহারও পূজায় স্তবাদি পাঠের বিলম্ব হইলে মা বিরক্ত হইতেন। একদিন বলিয়াছিলেন, "আগে পূজা ও ভোগ সেরে নিয়ে পরে যত পারে স্তব পাঠ করুক না। এ কি, লোক সব জল খেতে পায় না, বেলা হয়ে যায়!" যথাসময়ে প্রয়োজনমত এই সকল কাজ শীঘ্র করাই মা পছন্দ করিতেন।

মধ্যাহ্নভোজনের পর মা একটু বিশ্রাম করিতে শুইতেন বটে, কিন্তু তখন আবার স্ত্রী-ভক্তেরা প্রায়ই আসিতেন, কারণ তাঁহাদের অনেককেই চারটা, সাড়ে চারটার মধ্যে গৃহে ফিরিতে হইত। এই সময়ে মা শুইয়া শুইয়াই তাঁহাদের সঙ্গে দু-একটি কথা বলিতেন, কখনও বা কিছু পরেই উঠিয়া পড়িতেন। সাড়ে তিনটা আন্দাজ উঠিয়া—দুপুরের খাওয়া শেষ হইতেই দুইটা বাজিত—শৌচাদির পর কাপড় কাচিয়া আসিয়া ঠাকুরের বৈকালের ভোগ দিতেন। ক্রমে অন্যান্য স্ত্রী-ভক্তেরা আসিয়া জুটিতেন। মা জপের মালা লইয়া বসিতেন। ঐ সঙ্গে মাঝে মাঝে তাহাদের সহিত কথাবার্তা কহিতেন, বা তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। যে সকল পুরুষ-ভক্ত বৈকালে আসিতেন, তাহাদের সাধারণত প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময় ডাক পড়িত। মা চাদরে মাথা অবধি ঢাকিয়া নিজের তক্তপোশের উপর মেঝেতে পা ঝুলাইয়া বসিয়া থাকিতেন। গ্রীষ্মকাল হইলে ঐ সময়ে আমাদের কেহ, কখনও বা কোন পরিচিত ভক্ত, তাহাকে বাতাস করিত। একে একে সকলে প্রণাম করিয়া যাইতেন। স্ত্রী ভক্তেরা তখন অন্য ঘরে থাকিতেন। এই সময়ে ভক্তদের 'কেমন আছেন?' ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে মা সাধারণতঃ ঘাড় নাড়িয়া, অথবা আস্তে সামান্য দুই এক কথায় উত্তর দিতেন। আমরা তাহা একটু উচ্চস্বরে বলিতাম। কাহারও বিশেষ কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে তিনি সবশেষে প্রণাম করিতেন। তখন, পরিচিত হইলে মা নিজেই আস্তে আস্তে কথা বলিতেন, আর অপরিচিত বা বেশি বয়সের ভক্ত হইলে মা অনুচ্চস্বরে যাহা বলিতেন, আমরা তাহা একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতাম।

মা সন্ধ্যার পর জপ সমাপন করিয়া ভোগের পূর্ব পর্যন্ত মেজেয় বিশ্রাম করিতেন এবং এই সময়ে কেহ তাঁহার পায়ে বাতের তেল বা আমবাতের জন্য মরিচাদি তেল মালিস করিয়া দিত। সাধারণতঃ নবাসনের বৌ দিতেন, কখন কখনও অপর একটি স্ত্রী-ভক্ত। রাত্রে ঠাকুরের ভোগ শেষ হইতে দশটা এবং আহারাদি শেষ করিয়া শুইতে এগারটা বাজিত।

মায়ের আহার সম্বন্ধেও অনেক বিষয় লক্ষ্য করিবার ছিল। তিনি বেশি মিষ্ট আম অপেক্ষা অম্লমধুর—"টক টক, মিষ্টি মিষ্টি"—আমই অধিক ভালবাসিতেন। বোম্বাই হইতে বরেনবাবু আলফানসো আম পাঠাইতেন, মা তাহা পছন্দ করিতেন। পেয়ারাফুলি ও ছোট ল্যাংড়া আমও তিনি ভালবাসিতেন। কিন্তু কেহ ভক্তির সহিত খুব টক আম দিলেও তাহা

পরম প্রিয় বোধে আহার করিতেন। উদ্বোধনের বাড়িতে একদিন জনৈক ভক্ত কতকগুলি আম কিনিয়া আনেন। অগ্রভাগ খাইতে নাই বলিয়া, তিনি দোকানদারের কথায় বিশ্বাস করিয়া না চাখিয়াই আমগুলি লইয়া আসেন। মধ্যাহ্ন ভোগের পর যখন সকলকে সেই আম-প্রসাদ দেওয়া হইল, টক বলিয়া কেহই উহা খাইতে পারিলেন না, এবং ভক্তটিকে বোকা বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মা কিন্তু একটি আম খাইয়া বলিলেন, "না, এ বেশ টক টক আম।" সাধারণতঃ মা জানিতেন না, কে কোন বস্তু দিয়াছে ; কিন্তু দেখা যাইত, কোন কোন মিষ্টি ইত্যাদি খারাপ হইলেও উহাব দুই একটি খাইতেন। শাকের মধ্যে ছোলাশাক, মূলোশাক প্রভৃতি ভালবাসিতেন। একবার দেশ হইতে ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া খুব অরুচি লইয়া আসেন। তখন তাঁহাকে এই ছোলাশাক খাইতে দেওয়া হইত। শীতকালে মুড়ি, ফুটকড়াই এবং উড়িয়ার দোকানের বেগুনি, ফুলুরি, ঝালবড়া, আলুর চপ ইত্যাদি সকালের পূজায় ঠাকুরকে মাঝে মাঝে ভোগ দেওয়া হইত। এই সব তেলে ভাজা জিনিস মা পছন্দ করিতেন। মুগের নাড়ু, ঝুরিভাজা ইত্যাদিও তাঁহার প্রিয় ছিল। তিনি রাতাবি সন্দেশ এবং (রাঙা আলুর) রসপুলি পিঠা প্রভৃতিও ভালবাসিতেন। ইদানিং আমরুল শাক মায়ের প্রিয় ছিল। তাঁহার আমাশয়ের ধাত ছিল বলিয়া কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ সেন এই শাক ব্যবস্থা করেন। তাই মঠ হইতে কেহ উদ্বোধনে যাইলে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ তাহাকে দিয়া মায়ের জন্য এই শাক পাঠাইতেন। সকালে মা একটু মিছিরির পানা খাইতেন। তাঁহার জন্য যে জলখাবার প্রসাদ রাখা হইত, আগত ভক্তদিগকে কিছু কিছু দিতে দিতে তাহা অনেক সময়ই নিঃশেষ হইয়া যাইত। আব যেদিন তিনি নিজ হাতে প্রসাদ ভাগ করিয়া দিতেন সেদিন মিছিরির পানাটুকুও অবশিষ্ট থাকিত না, অথবা অতি অল্পমাত্র থাকিত। ডানহাঁটুর বাতের জন্য মা দই ইত্যাদি নামমাত্র খাইতেন। কলাই-এর পাতলা ডাল ও (হাতায় করিয়া) পোস্তপোড়া তাঁহার খুব প্রিয় ছিল। পেটের অসুখ ও বাতের জন্য শেষাশেষি তিনি একটু করিয়া আফিম খাইতেন; সেইজন্য মধ্যাহ্নে ও রাত্রে আধসের করিয়া দুধের ব্যবস্থা ছিল। তিনি মধ্যাহ্নে দুধের অর্ধেক আন্দাজ খাইতেন এবং বাকি দুধে ভাত মাখিয়া ভক্তদের জন্য প্রসাদ রাখিয়া দিতেন: কারণ পূজনীয় শরৎ মহারাজ ও অন্যান্য ভক্তগণ প্রত্যহ অন্ন-প্রসাদ চাহিতেন। দুই এক দানা প্রায় সকলেই গ্রহণ করিতেন। যে-সব ভক্ত বৈকালে আসিতেন, তাঁহাদের জন্যও এই প্রসাদ রাখা হইত। তিনি নিজে খাইবার জন্য যে ভাত মাখিতেন তাহাতে ডাল, সুক্ত, ঝোল ইত্যাদি অল্প অল্প করিয়া মাখিতেন এবং উহাতে নেবুর রস মিশাইয়া লইতেন। সে প্রসাদ আমাদের বেশ ভাল লাগিত। কোন কোন দিন তাহাতে বড়ি, চচ্চড়ি ইত্যাদি মিশাইয়া একটি উপাদেয় খাদ্য তৈয়ার করিতেন। পূজনীয় শরৎ মহারাজ উহা খাইয়া প্রশংসা করিতেন। বৈকালে পান ও জল ছাড়া বিশেষ কিছু তাঁহাকে খাইতে দেখি নাই। রাত্রে লুচি তরকারি ও দুধ দেওয়া হইত। লুচি দুই-তিনখানার বেশি খাইতেন না, এবং দুধ প্রায় দেড় পোয়া খাইতেন।

তিনি দাঁতে প্রত্যহ চারিবার করিয়া গুল দিতেন। নারিকেল পাতা ও দোক্তা পোড়াইয়া উহা তৈয়ারি করা হইত। মায়ের দেহ যাইবার কিছুদিন পর, নীরোদ মহারাজের মা স্বপ্ন দেখেন যে, মা তাঁহাকে বলিতেছেন, "বউমা,ওরা আমাকে সবই দেয়, কিন্তু গুলটি দেয় না। তুমি গুল করে ওখানে (উদ্বোধনের বাড়িতে) শরৎকে পাঠিয়ে দিও।" তিনি তদনুযায়ী গুল তৈয়ারি করিয়া পাঠাইলে সকলে লক্ষ্য করিলেন, বাস্তবিকই মায়ের সেবার এই নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যটি বাদ পড়িয়াছে।

মা যখন জয়রামবাটীতে পুরাতন বাটীতে থাকিতেন সকালবেলা প্রায় সাতটা হইতে নয়টা পর্যন্ত বারান্দায় বসিয়া তরকারি কুটিতেন। এই সময়ে আমরা গিয়া নানা কথাবার্তা বলিতাম ও শাকসব্জির পাতা বাছিতাম। এমন সস্নেহে সুপ্রসন্ন মূর্তিতে মা এই সময় কথাবার্তা বলিতেন যে, যাঁহারা একদিনও সেই সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। সেইজন্য মা যখন কলিকাতায় আসিতেন তখন ভক্তেরা পত্রে প্রায়ই জানিতে চাহিতেন মা কতদিনে দেশে যাইবেন। জয়রামবাটীতে মায়ের সঙ্গে মিশিবার ও কথাবার্তা বলিবার যে সুযোগ ছিল, এমন আর কোথাও মিলিত না। ভক্ত সন্তানদের খাওয়া দাওয়া, থাকা ইত্যাদির ব্যবস্থা মা নিজেই সযত্নে করিতেন। ভক্তেরাও এখানে আপন মায়ের স্নেহযত্ন অনুভব করিতেন। মা নয়টার সময় স্নান করিয়া আসিয়া ঠাকুরপূজা করিতেন, এবং উহা সমাপ্ত হইলে ভক্তদের প্রসাদ দিতেন। সাধারণতঃ মুড়ি, মিষ্টি এবং হালুয়া তৈয়ারি করিয়া দিতেন— কখনও বা ঐ সঙ্গে ফলমূল যাহা ওখানে পাওয়া যাইত বা ভক্তেরা আনিতেন তাহাও থাকিত।

রাঁধুনীকে জল খাইতে বসাইয়া মা নিজেই ঐ সময়ে রান্না করিতেন। তাঁহার রান্নার বিশেষত্ব এই ছিল যে তিনি তরকারিতে নুন, ঝাল ও মশলা সাধারণতঃ একটু কম দিতেন।

খাওয়ার সময় ছাড়া অন্য যে সময় ভক্তেরা বাড়ির মধ্যে মাকে দর্শন করিতে যাইতেন তখনই তিনি তাঁহাদিগকে মিষ্টি, জল ও পান খাইতে দিতেন। পান কাহাকেও দু খিলির কম দিতেন না। এইসব দ্রব্য অতি সামান্য হইলেও এমন সস্নেহে দিতেন যে, সকলেই এক অপূর্ব আকর্ষণ অনুভব করিতেন। আবার কেহ তাঁহার জন্য অতি সামান্য জিনিস লইয়া যাইলেও তিনি কতই না আনন্দিত হইতেন। জয়রামবাটীর নিকটবর্তী শ্যামবাজারে ভাল পান পাওয়া যায়। ঐ অঞ্চলে গরিব ভক্তেরা কখন কখনও একগোছ পান লইয়া মাকে দর্শন করিতে আসিতেন। দেখিতাম, মা তাহা পাইয়াই কত খুশি। ভক্তেরা মিষ্টি ইত্যাদি যাহা লইয়া যাইতেন, মা তাহা সযত্নে তাঁহাদের জন্যই রাখিয়া দিতেন। পূজনীয় শরৎ মহারাজ কলিকাতা হইতে কড়াপাকের সন্দেশ পাঠাইলে মা তাহা ভক্তদের জন্য তুলিয়া রাখিয়া যেভাবে দুবেলা সকলকে দিতেন, তাহা দেখিয়া মনে হইত যেন উহা ভক্তসেবার জন্যই প্রেরিত হইয়াছে। আবার জয়রামবাটীতে পাড়ার অনেক বৃদ্ধ স্ত্রী-পুরুষ বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লইয়া একবার তাহাদের 'দিদি ঠাকরুনকে' প্রণাম করিতে প্রায়

রোজই আসিত। মাও যেজন্য যে আসিয়াছে তাহা বুঝিয়া তাহাদের হাত ভরিয়া ফল, মিষ্টি প্রভৃতি যাহা থাকিত প্রসাদ দিতেন। শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনীর প্রেরিত বেদানা এবং পূজনীয় শরৎ মহারাজ যে আম পাঠাইতেন, তাহা ভাগ করিয়া প্রথমে সিংহবাহিনীকে এবং ধর্মঠাকুর ও অন্যান্য দেবতাকে দিতেন; তারপর আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদিগকে দিতেন। একবার কোন পর্বোপলক্ষে পুলিপিঠা হইয়াছে। ছুটি পাইলেই বাঁকুড়া হইতে বিভূতি প্রায়ই জয়রামবাটী আসিয়া থাকে; তাই মা তাহার জন্য পিঠা রাখিয়া দিয়াছেন। দুইদিন গেল, কিন্তু বিভূতি আর আসিতেছে না। তথাপি মা রোজ ঐ পিঠা পুনরায় ভাজিয়া রাখিয়া দিতেছেন। ভাবিতেছেন, "কাল হয়তো আসিতে পাবে; যদি আসে, মনে হবে, আহা, খেতে পেলে না।" এইভাবে চারদিন রাখিবার পর বিভূতি গিয়া সেই পিঠা খাইয়াছিল।

মায়ের অপার স্নেহযত্ন যে পাইয়াছে সেই জানে। জ্ঞান যখন জয়রামবাটী থাকিত তখন তাহার একবার খুব পাঁচড়া হইয়াছিল। নিজ হাতে খাইতে পারিত না। এই সময় মা নিজে ভাত মাখিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া দিতেন এবং তাহার উচ্ছিষ্ট পাতা পর্যন্ত ফেলিতেন।

জয়রামবাটীতে মায়ের গৃহনির্মাণের সময় আমি একদিন সকালে কার্যোপলক্ষে পাশের গ্রামে গিয়াছিলাম। জরুরী কাজ থাকায় মধ্যাহ্নে খাইবার সময় আসিয়া পৌঁছিতে পারি নাই। তখন শীতকাল। সূর্যাস্তের ঘণ্টাখানেক পূর্বে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম, মা তখনও খান নাই, আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। বিস্মিত হইয়া মাকে গিয়া বলিলাম, "মা, তোমার শরীর ভাল নয়, আর তুমি এই সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাসী রয়েছ!" মা বলিলেন, "বাবা, তোমার খাওয়া হয়নি, আমি কি করে খাই?" আমি তাড়াতাড়ি খাইতে বসিলাম। আমার খাওয়া হইলে মা এবং মেয়েদের দুই-একজন যাঁহারা তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহারাও খাইতে বসিলেন। এরূপ ব্যবহার কয়জন জননী নিজের সন্তানের প্রতিই করিয়া থাকেন। তবে মা অন্তরে সকলকেই এইরূপ স্নেহ করিলেও বাহিরে সর্ববিধ ব্যবহারেই গাম্ভীর্য, সঙ্কোচ ও লজ্জাশীলতা রক্ষা করিয়া চলিতেন।

কখন কখনও মা আমাদিগকে পার্শ্ববর্তী গ্রামে মুদির দোকান হইতে জিনিসপত্র কিনিয়া আনিবার জন্য পাঠাইতেন। আমরা হয়তো ভক্তদের দুই-একজনকে সঙ্গে লইয়া যাইতাম। দেখিয়াছি, তাঁহারা মায়ের সেবার জন্য এতটুকুও করিতে পারিলে আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিতেন। ভক্তেরা যখন মায়ের সঙ্গে কথা বলিতে ইচ্ছা করিতেন, আমরা মায়ের অনুমতি লইয়া তাঁহাদিগকে ভিতরে লইয়া যাইতাম। মা বলিতেন, "আহা, লোকে কত কষ্ট করে এখানে আসে! গয়া, কাশী যাওয়া ববং সহজ, এখানে আসা তার চেয়েও কষ্টকর।" তাই দূরদেশাগত ভক্তগণকে মা প্রায়ই দুই-একদিন বিশ্রাম করিতে বলিতেন। আমরা বা আগন্তুক ভক্তেরা নিজেরাই তাঁহার অসুবিধার কথা ভাবিয়া যাইবার জন্য তাড়াতাড়ি করিলেও তিনি ছাড়িতেন না। যাঁহারা মায়ের কৃপালাভের জন্য আসিতেন, শরীর নিতান্ত

অসুস্থ না থাকিলে মা তাঁহাদের কাহাকেও বড় একটা ফিরাইতেন না। ভাল আধার দেখিলে কখন কখনও নিজেই যাচিয়া দীক্ষা দিয়াছেন, অথবা প্রার্থনামাত্র তৎক্ষণাৎ কৃপা করিয়াছেন।

একবার মা দেশ হইতে ম্যালেরিয়ায় জীর্ণশীর্ণ হইয়া কলিকাতা আসিয়াছেন। চিকিৎসায় জ্বর থামিয়াছে মাত্র, কিন্তু খুব দুর্বল আছেন। ভক্তদের কাহাকেও দর্শন করিতে দেওয়া হইতেছে না। এই সময় বোম্বাই হইতে একটি পার্শী যুবক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছে। অতদূর হইতে আসিয়াছে এবং ভিন্নধর্মাবলম্বী, ইহা মনে করিয়াই বোধ হয় পূজনীয় শরৎ মহারাজ তাহাকে দর্শন করিতে অনুমতি দিলেন। যুবকটির ভ্রাতা কার্যোপলক্ষে যখন আফ্রিকায় ছিলেন তখন 'প্রবুদ্ধ ভারত'-পাঠে আকৃষ্ট হইয়া স্বামীজীর কিছু পুস্তক আনাইয়া পড়েন। তিনি বোম্বাই ফিরিলে সেই সকল পুস্তক উক্ত যুবকটি পড়িয়াছে এবং ক্রমশঃ ঐ বিষয়ে আগ্রহ হওয়ায় কলিকাতা আসিয়াছে। যুবকটি মাকে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিল, "মাঈজী, কুছ মূলমন্ত্র দীজিয়ে জিসসে খোদা পহচান যায়।" শুনিয়াই মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "দেবো? দিই দিয়ে।" আমি বলিলাম, 'সে কি! কাউকে দর্শন পর্যন্ত করতে দেওয়া হয় না, সবে অসুখ হতে উঠেছ, শরৎ মহারাজ শুনলে কি বলবেন! এখন নয়, এর পরে হবে।" মা বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি শরৎকে জিজ্ঞাসা করে এস।' আমি তাড়াতাড়ি গিয়া পূজনীয় শরৎ মহারাজকে সব কথা বলায় তিনি বলিলেন, 'আমি আর কি বলব? মায়ের যদি একটা পার্শী চেলা করতে ইচ্ছা হয়ে থাকে, করুন। বলে আর কি হবে।' ফিরিয়া দেখি, মা ইতোমধ্যেই দীক্ষা দিবার জন্য নিজেই দুইখানি আসন পাতিয়া গঙ্গাজল লইয়া প্রস্তুত হইয়াছেন। দীক্ষা হইলে আমাকে বলিতেছেন, "বেশ ছেলেটি, যা বললুম, ঠিক বুঝে নিল।" বুঝিলাম, মা কেন বলিতেন, "এসব ঠাকুরই পাঠাচ্ছেন।' এই সকল ভিন্ন ভাষাভাষীদের দীক্ষার সময় মা যাহা বলিবার বাংলাতেই বলিয়া যাইতেন, কিন্তু তাহারা বুঝিতে পারিত। যখন দক্ষিণদেশে গিয়াছিলেন, সেখানেও মা বলিতেন, 'লোকে এসে বলত, 'মন্ত্রম' 'উপদেশম' আর কোন কথা তো বুঝতে পারছি নে।' সেখানেও তিনি ঐরূপে অনেককে দীক্ষা দিয়াছেন। দীক্ষা দেবার সময় তাঁহার মনের অন্তস্তল হইতে যে মন্ত্র উদিত হইত তাহাই দীক্ষাপ্রার্থীর যথার্থ মন্ত্র জানিয়া মা উহাই তাহাকে দিতেন। বলিতেন, 'কাউকে মন্ত্র দিতে গিয়েই মন থেকে ওঠে,'এই দাও, এই দাও। আবার কাউকে মন্ত্র দিতে গিয়ে মনে হয় যেন কিছুই জানিনে, কিছুই মনে আসে না। বসেই আছি পরে অনেক ভাবতে ভাবতে তবে দেখতে পাই।" ইহার কারণ মা বলিতেন, 'যে ভাল আধার তার বেলায় তক্ষুণি মন থেকে উঠে।"

অনেক সময় মা অল্প বয়সের ছেলেদেরও দীক্ষা দিয়াছেন। আমার মনে আছে, একবার উদ্বোধনে একটি ছেলে, বছর বার বয়সের, বৈকালে ভক্তদের সঙ্গে প্রণাম করিবার পর কাঁদিতে থাকে। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিল, "মায়ের কৃপা চাই।" আমি বলিলাম, "কৃপা

কিরে! হবে এখন, চল্।" তবুও কাঁদে। তখন বুঝা গেল, মন্ত্র চায়। ভাবিলাম, কাহারও কাছে শোনা কথা বলিতেছে; অত ছোট ছেলে মন্ত্রের কি বুঝে? পরদিন দেখি সেই ছেলেটি বাইরের রোয়াকে একা বসিয়া আছে। সেখানে ছেলে বুড়ো অনেকেই আসিয়া বসে, তাই কেহ তাহার খোঁজখবর নেয় নাই। আমি বাজার হইতে ফিরিবার সময় দেখি, সেই ছেলেটি হাসিতে হাসিতে চলিয়া যাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হয়েছে?' সে আনন্দে উত্তর দিল, 'আমার দীক্ষা হয়েছে।' শুনিলাম, মা রাধুকে বলেন, "দেখবে নিচে রোয়াকে একটি ছেলে বসে আছে, তাকে নিয়ে এস", এবং তাহার দ্বারা ছেলেটিকে ডাকাইয়া মন্ত্র দিয়াছেন; এখন সে বাজারে শ্রীশ্রীমায়ের জন্য ফলমিষ্টি কিনিতে যাইতেছে। মায়ের সঙ্গে দেখা হইতেই জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, অতটুকু ছেলেকে আবার কি দীক্ষা দিলে? ও কি বোঝে?" মা উত্তর দিলেন, "তা যা হোক, বাপু, ছেলেমানুষ—কাল তো অমন করে পায়ে পড়ে কাঁদলে। কে ভগবানের জন্য কাঁদছে বল দেখি? এ মতি ক-জনের হয়?"

মা নম্রতার প্রতিমূর্তি ছিলেন। এত লোক তাঁহার পদধূলি পাইলে আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিত, তথাপি তিনি নিজেকে ঠাকুরের একজন কৃপাপ্রাপ্তা চরণাশ্রিতা বলিয়াই মনে করিতেন। দীক্ষাপ্রদানের পর ঠাকুরকে দেখাইয়া বলিতেন, "ঐ উনিই গুরু।" যদিও কখন কখনও খুব অন্তরঙ্গভাবে কথা বলিতে বলিতে 'তিনি কে'—এই সব কথা অলক্ষ্যে মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িত, কিন্তু ঐ ভাবকে তিনি মনেও স্থান দিতেন না। তাঁহার যাহা কিছু সবই ঠাকুর। জনৈকা প্রাচীনা স্ত্রী-ভক্ত একদিন মায়ের শেষ অসুখের সময় তাঁহাকে "তুমি জগদম্বা, তুমিই সব" ইত্যাদি বলিয়া যেমন প্রশংসা করিতেছেন, অমনি মা রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "যাও, যাও, 'জগদম্বা'! তিনি দয়া করে পায়ে আশ্রয় দিয়েছিলেন বলে বর্তে গেছি। 'তুমি জগদম্বা! তুমি হেন!'— বেরোও এখান থেকে।" যদিও তিনি তাঁহার সম্বন্ধে কোন ভক্তের আন্তরিক বিশ্বাসকে বিচলিত করিতেন না, তথাপি এইরূপ প্রশংসাবাদ তাঁহার সহ্য হইত না।

তাঁহার নিজের ইচ্ছা বা ন্যায্য বিবেচনার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিলে তিনি প্রথমে উহা মানিয়া লইতেন। পরে ধীরে ধীরে নিজে যেটি ইচ্ছা করিতেন বা ন্যায্য বিবেচনা করিতেন তাহা বলিয়া প্রশ্নকারীকেই জিজ্ঞাসা করিতেন, "আচ্ছা, এ রকম হলে কেমন হয়?" এইরূপে ক্রমশঃ তাহাকে স্বমতে আনয়ন করিতেন। কখনও তাহার মুখের উপর "তোমার ওকথা কিছু না" বলিয়া উত্তর দিতেন না। একদিন পূর্ণবাবুর স্ত্রী দীক্ষার কথা উত্থাপন করিয়া মাকে বলিলেন, "মা, আপনি তো শীঘ্রই দেশে চলে যাচ্ছেন, আর আমরাও সিমলা পাহাড়ে যাব। আবার কবে দেখা হবে। মন্ত্র নেবার ইচ্ছা, কিন্তু আমার জাতাশৌচ হয়েছে।" গোলাপ-মা ও যোগেন-মা নিকটে ছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "অশৌচে কি দীক্ষা হয়? এখন কি করে নেবে?" মাও তাঁহাদের কথায় সায় দিয়া বলিলেন, "তাই তো,

কি করে হবে তাহলে?" সেই সময় বরেনবাবুর পিসিও সেখানে ছিলেন। একদিন তিনি মাকে একা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, আপনি কি জাতাশৌচ মানেন?" মা বলিলেন, "কায়াপ্রাণে ন সম্বন্ধ, আবার জাতাশৌচ! কালীপূজার দিন ওকে গঙ্গাস্নান করিয়ে নিয়ে এসো।" পরে পূর্ণবাবু নিজেই নির্দিষ্ট দিনে তাঁহাকে মায়ের নিকট লইয়া যান।

মায়ের গৃহ-প্রতিষ্ঠার সময় ললিতবাবু জয়রামবাটী গিয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি তথায় একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়া মাকে একদিন অনেক করিয়া বুঝাইয়া বলিতেছিলেন, "মা, আপনার নামে ভক্তদের কাছে আবেদন বের করলে এই গরিব লোকদের মহা উপকার হবে।" লোক-কল্যাণের জন্য তাঁহার এই পুনঃপুনঃ অনুরোধে চক্ষুলজ্জায় মা কিছুই বলিতে পারিতেছেন না। এই সময় হেমেন্দ্র (ব্রহ্মচারী রূপচৈতন্য) উপস্থিত হওয়ায় সে উহাতে ঘোর আপত্তি করিল। মা এতক্ষণে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। ললিতবাবু চলিয়া যাইবার পর আমি বাড়ির মধ্যে যাইলে মা আমাকে হেমেন্দ্রের কথায় বলিতেছেন, "এ দেখছি আমার যোগীনের মতো আমায় রক্ষা করলে। ছি! ছি! টাকা চাওয়া!"

যদিও তাঁহার ব্যবহার সর্বদা শিষ্টাচারপূর্ণ ছিল এবং তিনি উহাই পছন্দ করিতেন, তথাপি কলিকাতায় তিনি সকল সময়ে নিঃসঙ্কোচে কথাবার্তা বলিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন। একবার আমাকে বলিয়াছিলেন, "এখানে আমাকে সর্বদা হিসাব করে কথাটি বলতে হয়, চলতে হয়। কে কোন কথাটিতে অসন্তুষ্ট হবে। তার চেয়ে দেশে আমি থাকি ভাল। আমি তাদের হুড় হুড় করে যা মুখে এল দু-কথা বলে গেলুম! তারাও আমাকে যা হোক দু-কথা বলে গেল। তারাও কিছু মনে করলে না, আমিও কিছু মনে করলুম না, বাস। আর এখানকার লোকেরা কথার একটু এদিক ওদিক হলেই ক্ষুণ্ণ হয়ে গেল!"

মায়ের সরল, স্নেহপূর্ণ অথচ ধীর গম্ভীর ব্যবহারে সকলে তাঁহার নিকট নিঃসঙ্কোচে কিন্তু সসম্ভ্রমে কথা বলিত। জয়রামবাটীর কাছে শিরোমণিপুরে বহু মুসলমানের বাস। তাহারা পূর্বে তুঁতের (রেশমকীটের) চাষ করিত। বিদেশী রেশমের প্রতিযোগিতায় তাহাদের ঐ ব্যবসা ক্রমশঃ নষ্ট হওয়ায় শেষে চুরি ডাকাতিই তাহাদের জীবিকা হইয়া দাঁড়ায়। পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরা এই তুঁতে ডাকাতদের ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত। কোন গ্রামের মধ্য দিয়া একটি তুঁতে কোন দিন চলিয়া গেলে গ্রামবাসীরা শীঘ্রই গ্রামে ডাকাতি হইবে মনে করিয়া সশঙ্ক থাকিত। মায়ের শেষ জীবনে যখন ভক্তদের যাতায়াত বাড়িতে থাকে, তখন মা মামাদের বাড়িতে থাকিলে ভক্তদের অসুবিধা হয় দেখিয়া পূজনীয় শরৎ মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের ইচ্ছা অনুসারে তাঁহার জন্য নতুন স্থানে বাড়ি নির্মাণ করেন। সে বৎসর ওদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হওয়ায় আমরা বহু তুঁতে মজুর নিযুক্ত করিয়াছিলাম। গ্রামবাসীরা প্রথমে উহাতে ভয় পাইলেও শেষে বলিত, "মায়ের কৃপায় ডাকাতগুলো পর্যন্ত

ভক্ত হয়ে গেল রে!" একদিন মা একটি তুঁতে মুসলমানকে (যে মায়ের বাড়ির দেওয়াল নির্মাণ করিয়াছিল) বাড়ির ভিতরে তাঁহার নিজের ঘরের বারাণ্ডায় খাইতে দিয়াছেন। তাঁহার ভাইঝি নলিনী উঠানে দাঁড়াইয়া তাহাকে দূর হইতে ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া পরিবেশন করিতেছিল। মা তাহা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "অমন করে দিলে মানুষের কি খেয়ে সুখ হয়? তুই না পারিস আমি দিচ্ছি।" খাওয়ার শেষে মা উচ্ছিষ্ট স্থানটি নিজেই ধুইয়া দিলেন। নলিনী মাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া, "ও পিসিমা, তোমার জাত গেল," ইত্যাদি বলিয়া বড়ই আপত্তি করিতে লাগিল। মা তাহাকে এই বলিয়া ধমক দিলেন, "আমার শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) যেমন ছেলে, এই আমজদও তেমন ছেলে।" তিনি যে জগতেব মা। এইরূপ ব্যবহারেই তো দুর্বল, অধম মানবের প্রাণে বিশ্বাস আসিবে যে, সেও জগন্মাতার আপন সন্তান।

বাস্তবিকই তিনি মন্দকেও ভাল চক্ষে দেখিযা সকলকে উন্নত করিতেন। মা বলিতেন, "দোষ তো মানুষের লেগেই আছে। কি করে যে তাকে ভাল করতে হবে তা জানে ক-জনে?" একদিন একজন তুঁতে মুসলমান কয়েকটি কলা আনিযা বলিল, "মা, ঠাকুরের জন্য এইগুলি এনেছি, নেবেন কি?" মা লইবার জন্য হাত পাতিলেন; বলিলেন, "খুব নেব, বাবা, দাও। ঠাকুবের জন্য এনেছ, নেব বই কি!" মায়েব সাংসারিক কার্যে সাহায্যার্থ নিকটবর্তী গ্রামের জনৈকা স্ত্রী-ভক্ত কাছেই ছিলেন। তিনি বলিলেন, "ওরা চোর, আমরা জানি। ওর জিনিস ঠাকুবকে দেওয়া কেন?" মা এ কথার কোন উত্তর না দিয়া মুসলমানটিকে মুড়ি মিষ্টি দিতে বলিলেন। সে চলিয়া যাইলে মা ঐ স্ত্রী-ভক্তটিকে তিরস্কার করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কে ভাল, কে মন্দ, আমি জানি।" আমবা দেখিতাম, যাহাকে কেহ দেখিতে পারে না, মা ঠিক তাহাকেই আরও আদর যত্ন কবিতেন। কেহ কোন মহা গর্হিত কার্য করিয়াও যদি তাঁহার নিকট অনুতপ্ত হইয়া যাইত, তিনি তাহাকে অভয় দিতেন। একবার একটি যুবতী এইরূপে তাঁহার শরণাপন্ন হইলে মা তাহাকে কোল দিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, যা করেছ করেছ, আর করো না" এবং তাহার পাপরাশি নিজে গ্রহণ করিয়া তাহাকে মন্ত্রদীক্ষা দিলেন, যাহাতে তাহার সুমতি হয়।

একবার জনৈক যুবক ভক্তের কোন অন্যায় আচরণের জন্য ঠাকুরের কোন বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীশ্রীমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, যেন তাহাকে মায়ের নিকট আসিতে না দেওয়া হয়। তাহাতে মা বলিয়াছিলেন, "আমাব ছেলে যদি ধুলোকাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে!" এই মাতৃসুলভ স্নেহ ও ক্ষমা দ্বারাই তিনি বিপথগামীকে সুপথে আনিতেন।

মায়ের সহনশীলতার সীমা ছিল না। কত লোক নানাপ্রকার পাপতাপের বোঝা লইয়া তাঁহার চরণ স্পর্শ করিত; শরীরে ভীষণ জ্বালা অনুভব করিলেও মা উহা নীরবে সহ্য করিতেন। একদিন বৈকালে দর্শনার্থীদের প্রণামের পর দেখি, মা বারাণ্ডায় আসিয়া হাঁটু

অবধি পা কেবল ধুইতেছেন। জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "আর কাউকে পায়ে মাথা দিয়ে প্রণাম করতে দিও না। যতপাপ এসে ঢোকে, আমার পা জ্বলে যায় ; পা ধুয়ে ফেলতে হয়। এইজন্যই তো ব্যাধি। দূর থেকে প্রণাম করতে বলবে।" বলিয়াই আবার বলিতেছেন, "এসব কথা শরৎকে বলো না। তাহলে প্রণাম করা বন্ধ করে দেবে।"

নিজ পছন্দমত কাজ মানুষ যেরূপ প্রীতির সহিত দুই-চারি দিন করিয়া থাকে, মাকে জীবনব্যাপী দৈনিক কার্যগুলিও সেইরূপ প্রীতির সহিত করিতে দেখিতাম। জয়রামবাটীতে নিত্যকার সেই রান্নাবাড়া, খাওয়ানো ইত্যাদি একঘেয়ে কাজ, তাহার উপর যখন তখন ভক্তসমাগম, আবার তাঁহার সংসারের এক একজন এক এক রকমের ছিল ; ইহা সত্ত্বেও তিনি এই সকল কাজ আনন্দের সহিত করিয়া যাইতেন। অন্যে সাহায্য করে ভাল, না করিলেও কিছু মনে কবিতেন না। যেন তাঁহারই সকল দায়িত্ব, বাড়ির অপর সকলে অভ্যাগত! জয়রামবাটীতে দেখিতাম, সকালবেলা সেই ঘণ্টা দুই ধরিয়া শাক তবকারি কুটা, রান্নার জন্য ভাঁড়ার বাহির করিয়া দেওয়া, পূজার সব যোগাড় করিয়া নিজে পূজা করা, আবার দীক্ষাদান, প্রসাদ ও জলখাবাব বাঁটিয়া দেওয়া, অন্ততঃ একশ খিলি পান সাজা, ভক্তগণকে ও বাড়ির লোকদিগকে খাওয়ানো, বৈকালে নিজহাতে লুচি রুটি তরকারি প্রভৃতি করা, দুধ জ্বাল দেওযা, লণ্ঠন পরিষ্কার করা—সবই যেন নিত্য নতুন প্রীতির সহিত করিয়া যাইতেছেন। ইদানিং স্ত্রী-ভক্তেরা ও নলিনী প্রভৃতি তাঁহাকে সাহায্য করিতেন বটে, তথাপি অধিকাংশ কাজ তাঁহাকেই করিতে ও দেখিতে হইত। মা বলিতেন, "শরীর এদিকে পড়ে যাচ্ছে, আর কাজও ক্রমাগত বেড়েই যাচ্ছে।"

ছোট ছোট খুঁটিনাটি কাজেও মায়ের আচরণ আদর্শস্থানীয় ছিল। উদ্বোধনে আমরা স্নানের পর কাপড় শুকাইতে দিতাম। বৈকালে বর্ষা হইলে সেগুলি ভাল করিয়া শুকাইত না, কোনখানি হয়তো পুনরায় ভিজিত, কোনখানির জল হয়তো ভাল কবিয়া নিংড়ানো হইত না। দেখিতাম, মা আস্তে আস্তে সেই কাপড়গুলি আবাব নিংড়াইয়া দোতালার দক্ষিণের ঘরে লম্বা করিয়া দড়িতে বা জানালার গরাদের সহিত বাঁধিয়া শুকাইতে দিতেছেন। একদিন বৃষ্টির পরে তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া আমি বলিলাম, "মা, এত লোক রয়েছে, তুমি আবার কেন জল ঘাঁটছ? বৃষ্টিতে বারাণ্ডা সব ভিজে গেছে, পায়ে বাত—আর কি লোক নেই?" মা বলিলেন, "না, বাবা, এই যাচ্ছি, এই সামান্য একটু।" স্বামীজী বলিতেন, "ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় মানুষকে চিনতে হয়।"

সামান্য সামান্য বিষয়েও মায়ের অদ্ভুত দৃষ্টি ছিল। জয়রামবাটীতে তাঁহার নতুন বাড়ি হওয়ার পর গ্রাম্য পঞ্চায়েত চাব টাকা ট্যাক্স ধার্য করিয়া জ্ঞানানন্দের নিকট হইতে উহা আদায় করে। মা তখন কলিকাতায় ছিলেন। পর বৎসর মা দেশে যাইলে চৌকিদার যখন উহা আদায় করিতে আসিল তখন মা বলিলেন, "এত বেশি কেন? কমাবার চেষ্টা কর। আমি না হয় দিলুম। কিন্তু আমি যখন থাকব না তখন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী যে থাকবে সে কি করে দেবে? তার খাওয়া পরাই হয়তো ভিক্ষা করে চালাতে হবে।" আর একবার জ্ঞান

যখন জয়রামবাটীতে, তখন সে গোয়ালাকে খাঁটি দুধ দিবার জন্য বিশেষ করিয়া বলিত, "টাকায় আট সের দেবে, তবু খাঁটি চাই।" এইভাবে সে চড়া দরে দুধ কিনিত। একদিন মা উহা শুনিতে পাইয়া তাহাকে তিরস্কার করিলেন, "ওকি, জ্ঞান, এখানে পয়সায় পোয়া দুধ মেলে, গরিবে খেতে পায়। আর তুমি অমনি করে দর বাড়াচ্ছ! গোয়ালা— সে তো জল দেবেই। দর বাড়ালে তখন তো পয়সা বেশি পাবে বলে আরও জল মেশাতে চাইবে।"

অন্যদিকে কতকগুলি বিষয় মায়ের বড়ই চমৎকার ছিল। কেহ নির্লজ্জ হইয়া নাচুক না কেন, মা সেইস্থান দিয়া চলিয়া যাইলেও তাঁহার দৃষ্টি আদৌ সেদিকে পড়িবে না। যদি দৈবাৎ কখনও পড়িল, তথাপি তাঁহার তৎকালীন উদাসীন দৃষ্টি ও মুখের ভাব হইতে স্পষ্ট বোধ হইত, তিনি উহার কিছুই লক্ষ্য করেন নাই বা উহা বিসদৃশ বলিয়া মনে করেন নাই। যেন বালিকার দৃষ্টি—ভালমন্দের বোধই নাই।

লোককে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া তাহার দোষগুণ দেখাব অভ্যাস মায়ের কখনই ছিল না। একবার চাহিয়া দেখিলেন, এইমাত্র। দৃষ্টিমাত্র লোকের অন্তর-বাহির জানিবার শক্তি যাঁহার ছিল, অন্যায় করিয়াও তাঁহার কাছে নিঃসঙ্কোচে দাঁড়াইতাম। জানিতাম যে, তাঁহার দৃষ্টি ঐদিকে পড়িবে না অথবা যতক্ষণ না বলিব, তিনি জানিতে পারিবেন না। আর বলিলে তো ক্ষমা আছেই। যিনি যত বেশি শক্তি হজম করিতে পারেন, তিনি তত অধিক শক্তিমান। নিবেদিতা ঠিকই লিখিয়াছিলেন. "স্ত্রী-ভক্তেরা মায়ের সঙ্গে বসিয়া যখন কথাবার্তা বলিতেন, তাঁহারা কিছুতেই মনে কবিতে পারিতেন না যে, ঠাকুরের সঙ্গে মায়ের সম্বন্ধ বা তাঁহার উপব মায়ের দাবি তাঁহাদেব চেয়ে বেশি ছিল। মনে হইত যেন তিনি তাঁহাদের মতোই ঠাকুরের আশ্রিত ও কৃপাপ্রার্থীদের একজন।"

যদিও তাঁহার নিকট ত্যাগী ও গৃহস্থ সমান আদর পাইয়াছে, তথাপি ত্যাগীরা সমধিক প্রিয় ছিল। তিনি বলিতেন, "বাবা, ত্যাগীদের না হলে কাদের নিয়ে থাকব?" একবার বেলুড় মঠে ঠাকুরের উৎসবে মা গিয়াছেন। মধ্যাহ্নে তাঁহার আহারের পর আমি জাগ্ হইতে জল ঢালিয়া দিতেছি, মা দাঁড়াইয়া আঁচাইতেছেন। আঁচাইবার পর মা সাধারণতঃ পা ধুইয়া থাকেন ; আমি সেইজন্য পায়ে জল ঢালিয়া দিতেছি এবং হাঁটুর বাতের জন্য মায়ের নিচু হইতে কষ্ট হইবে মনে করিয়া নিজেই হাত দিয়া পায়ের পাতার উপরের জলটা একটু মুছিয়া দিতেছি। অমনি মা মহা সঙ্কুচিতা হইয়া বলিলেন, "না, না, বাবা, তুমি! তোমরা দেবের আরাধ্য ধন।" এই বলিয়া নিজেই হাত দিয়া পা মুছিলেন। আমি তো তখন কাছা দিয়া কাপড় পরি, আর তাঁহার পায়ে জল ঢালিয়া দিবারও যোগ্য নহি।

মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীরা আসিলে রাধু প্রভৃতিকে মা প্রায়ই বলিতেন, "দাদাদের প্রণাম কর।" একদিন উদ্বোধনের বাড়িতে কোন প্রাচীনা স্ত্রী-ভক্ত জনৈক সাধুর সঙ্গে কোন ব্যাপারে কথা কাটাকাটি হওয়ায় এই বলিয়া রাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, "ও এখানে থাকলে আমি কিছুতেই আসব না।" অনেকে তাঁহাকে অনুনয়-বিনয় করিয়া ফিরাইতে চেষ্টা করিয়াও পারিলেন না। মায়ের কানে সব ঘটনা পৌঁছিতেই মা উত্তেজিত হইয়া

বলিলেন, "ও কে ? গৃহস্থ ! যায় এখান থেকে, যাক না। সাধু আমার জন্য সব ত্যাগ করে এখানে রয়েছে।" অথচ যাঁহাকে মা এইরূপ তিরস্কার করিলেন, ঠাকুরের স্ত্রী-ভক্তদের মধ্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। জনৈক ত্যাগী ভক্ত মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মা, সন্ন্যাসীই হোক, আর গৃহস্থই হোক, ঠাকুরের যারা আশ্রয় নিয়েছে তারা সবই তো সমান—কারণ সকলেই মুক্ত হবে ?" মা বলিলেন, "সে কি ! ত্যাগী আর গৃহস্থ কি সমান ? ওদের কামনা বাসনা কত কি রয়েছে, আর এরা তাঁর জন্য সব ছেড়ে চলে এসেছে। এদের আর তিনি ভিন্ন কি আছে ? সাধুদের সঙ্গে কি ওদের তুলনা হয় ?"

যুবক ভক্তেরা অনেক সময় মাকে জিজ্ঞাসা করিত, "বিবাহ করিব কি না ?" তিনি মন বুঝিয়া কাহাকেও বলিতেন, "সংসারীদের কত কষ্ট ! তোমরা হাঁপ ছেড়ে ঘুমিয়ে বাঁচবে।" কাহাকেও বা বলিতেন, "আমি ও সম্বন্ধে কোন মতামত দিতে পারব না। বিয়ে করে যদি অশান্তি হয়, তখন বলবে, 'মা, আপনি বিয়ে করতে মত দিয়েছিলেন'।" আবার জনৈক ভক্ত যখন বলিল, "মা, আমি বিয়ে করব না", তখন মা হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "সে কি গো ? সংসারে সবই দুটি দুটি। এই দেখ না, চোখ দুটি, কান দুটি, হাত দুটি, পা দুটি—তেমন পুরুষ ও প্রকৃতি।" বাস্তবিক সে ভক্তটি পরে বিবাহ করিয়াছিলেন। আবার কেহ হয়তো লিখিয়াছে, "মা. আমার বিয়ে করতে ইচ্ছা নেই, বাড়িতে বাপ-মা জোর করে বিয়ে দিতে চায়।" মা শুনিয়াই বলিলেন, "দেখ, দেখ, কি অত্যাচার !" একবার একটি ভক্ত মাকে গিয়া বলিল, "মা, আমি এতকাল বিয়ে না করে থাকবার চেষ্টা করেছিলাম। এখন দেখছি পেরে উঠব না" ইত্যাদি। মা তাহাকে অভয় দিয়া বলিলেন, "ভয় কি ? ঠাকুরের কত গৃহস্থ ভক্ত ছিলেন। তোমার কোন ভয় নেই—তুমি বিয়ে করবে।" এই বলিয়া তাহাকে খুব আশীর্বাদ করিলেন। সে যে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাতেই মা খুব খুশি হইয়াছিলেন। নিবৃত্তির দিকে যাহাদের একটুও স্পৃহা হইয়াছে, তাহাদের বিবাহ না করাই ভাল—এইরূপ উপদেশ মা প্রায়ই দিতেন। মেয়েদের মধ্যেও যাহাদের বিবাহে তেমন ইচ্ছা নাই, মা তাহাদিগকে নিবৃত্তির উপদেশই দিতেন। একবার জনৈক ভক্তের কন্যা বিবাহে রাজি না হওয়ায় তাহার মাতা শ্রীশ্রীমাকে সব নিবেদন করিলেন যাহাতে তিনি মেয়েটিকে বিবাহের আদেশ দেন। তদুত্তরে মা বলিলেন, "সারাজীবন পরের দাসত্ব করা, পরের মন যোগানো, এ কি কম কষ্টের কথা !" তারপর এই মর্মে বলিলেন যে, যদিও অবিবাহিত জীবনে বিপদের সম্ভাবনা আছে, তথাপি যাহার বিবাহে ইচ্ছা নাই তাহাকে বিবাহ দিয়া স্থায়ী ভোগে লিপ্ত করা কিছুতেই উচিত নহে।

১৩২৬ সালের পৌষ মাসে মা জয়রামবাটীতে ছিলেন। জন্মতিথির দিন বৈকালে তাঁহার সামান্য জ্বর হয়। মাঝে মাঝে ভাল থাকিলেও এই জ্বরে ক্রমশঃ ভুগিতে ভুগিতে মা খুব দুর্বল হইয়া পড়েন। এই অসুস্থতার মধ্যেও অনেক ভক্ত তথায় দীক্ষা লইতে গিয়াছেন এবং তাঁহার কৃপালাভ করিয়াছেন। হয়তো একবার জ্বর হইয়া গেল; জ্বর ছাড়িতেই—অন্নপথ্য পাইবার পূর্বেও মা দীক্ষা দিয়াছেন, কারণ ভক্তেরা কত আশা করিয়া

তাঁহার নিকট যাইতেন। কলিকাতা আসিবার দুই-একদিন পূর্বে মা সিংহবাহিনীকে প্রণাম করিতে গিয়াছিলেন। তিনি তখন এত দুর্বল হইয়াছেন যে, ঐটুকু গিয়া ফিরিয়া আসিতেই অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ করেন। বলিয়াছিলেন, "কালঘাম ছুটিয়ে দিয়েছিল!" কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই নিজের জ্বর বা ঐরূপ অত্যধিক দুর্বলতার কথা প্রকাশ করিতেন না, পাছে ভক্তদের দর্শনাদিব ব্যাঘাত হয়, অথবা তাঁহার জন্য অপরে ভাবিত হয়।

তাঁহার এইরূপ অসুখের সংবাদ পাইয়া পূজনীয় শরৎ মহারাজ চিকিৎসাব জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় আনাইলেন। ফাল্গুন মাসের মধ্যভাগে মা কলিকাতা পৌঁছিলেন। তখন তাঁহার শবীর অতি শীর্ণ; খুব দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস কবিরাজের চিকিৎসায় কিছুদিন তাঁহার জ্বর বন্ধ থাকে। শরীর তখন অনেকটা ভাল মনে হইতেছিল। একদিন ভক্তেরা অনেকে প্রণামও করেন।

কবিবাজী ঔষধের মধ্যে একটি তিক্ত পাচন ছিল। সকালে মা তাহা খাইতেন। খুব তিক্ত বলিয়া অনেকক্ষণ ঐজন্য অস্বস্তি বোধ করিতেন, এমনকি দ্বিপ্রহরে আহারের সময়েও যেন মুখে সেই তিক্ত স্বাদ বোধ হইত; তাই ভাত খাইতে পাবিতেন না। ঔষধ বদলানোব কথায় কবিরাজ বলিলেন, ঐ রোগের তিক্ত ছাড়া তাঁহার ঔষধ নাই। তখন কবিরাজীর পরিবর্তে ডাক্তারী চিকিৎসা আরম্ভ হয় এবং ডাক্তার বিপিন ঘোষকে দেখানো হয়। জ্বরও পুনরায় দেখা দিল। বিপিনবাবু প্রায় দেড় মাস চিকিৎসা করেন।

তাবপর ডাক্তার প্রাণধন বসুকে দেখানো হয়। এই সময় ডাক্তার সুরেশ ভট্টাচার্য ও ডাক্তার নীলরতন সরকারকেও একদিন আনা হয। নীলবতনবাবু কালাজ্বর বলিয়া নির্দেশ করেন। প্রাণধনবাবু খুব যত্নের সহিত চিকিৎসা কবিয়াছিলেন। দুই-তিন দিন আসিবার পর বলিলেন, "আমাকেও আপনাদের মায়ের একজন সেবক মনে করবেন।" মা তাঁহাকে খুব ভালবাসিতেন; তাঁহার জন্য আম, লিচু প্রভৃতি পাঠাইযা দিতে বলিতেন। রোগের উপশম না হওয়ায় কবিরাজী চিকিৎসা আরম্ভ হয় এবং শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বিশেষ অসুস্থ থাকায় কবিরাজ রাজেন্দ্রনাথ সেন দেখিতে থাকেন। তাঁহার সঙ্গে শ্রীযুক্ত কালীভূষণ সেন ও শ্রীযুক্ত রাম কবিরাজকেও আনা হইত।

কিছুতেই কিছু হইল না। রোগ দিন দিন বাড়িতেই লাগিল। প্রত্যহ তিন-চারবার করিয়া জ্বর উঠিত। পিত্তপ্রধান জ্বর, শরীরে অসহ্য জ্বালা হইত। মা বলিতেন, "পানাপুকুরের জলে গা ডুবিয়ে থাকব।" বরফে হাত রাখিয়া আমরা সেই হাত মায়ের শরীরে বুলাইয়া দিতাম। জ্বরবৃদ্ধির সময় প্রায়ই হুঁশ থাকিত না। তখন গ্রীষ্মকাল। একদিন দ্বিপ্রহরে বহুদূর গিয়া তবে বরফ পাওয়া গেল। আসিয়া দেখিলাম অসহ্য গাত্রদাহ। বরফ কাপড় দিয়া ঢাকিয়া তাহার উপর মায়ের হাত রাখিয়া দিতেই মা আরাম পাইয়া চিৎকার কবিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ও রাসবেহারী, তুমি এ কোথায় পেলে!" গাত্রদাহের জন্য, যাহাদের গা ঠাণ্ডা তাহারা কাছে গেলেই মা তাহাদের গায়ে হাত রাখিতেন। ভুগিয়া ভুগিয়া তিনি যেন ছেলেমানুষের মতো হইয়া গিয়াছিলেন। একদিন সকালবেলা আমাকে ডাকাইলেন। আমি যাইবামাত্র

বলিলেন, "আমাকে কোলে করে বস।" এই দীর্ঘকাল শুইয়া থাকিতে থাকিতে রোগের যন্ত্রণা শরীরে যেন আর সহ্য হইতেছে না। সরলা কাছে ছিলেন। তাঁহাকে বলিলাম, "মাকে একটু কোলে করে বস। তোমরা মেয়েছেলে।" তিনি চুপ করিয়া থাকায় শেষে বালিশ উঁচু করিয়া তাহাই ঠেসান দিয়া মাকে বসাইয়া গায়ে ও মুখে একটু হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা করিলাম।

এইরূপ অসুখের মধ্যেও সকালবেলা কবিরাজের নিকট যাইবার পূর্বে রোগের বিবরণ লইতে যখন মায়ের কাছে যাইতাম, তিনি বলিতে ভুলিতেন না, "খেয়ে যাও, বেলা হবে।" কবিরাজেরা দেখিয়া যাইবার পর প্রায়ই বলিতেন, "বুড়োর (ঁদুর্গাপ্রসাদ সেনের) নাতিকে (কবিরাজ কালীভূষণকে) জল খেতে দাও, সন্দেশ দাও, আম দাও। রাম কবিরাজকে দাও, বুড়ো কবিরাজকে (শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ সেনকে) দাও।" ডাক্তার কাঞ্জিলাল, দুর্গাপদ, শ্যামাপদ প্রভৃতি যে কেহ আসিতেন, মা সকলেরই কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন। একদিন আরামবাগ হইতে প্রভাকরবাবু ও মণীন্দ্রবাবু আসিয়াছেন। খুব ক্ষীণস্বরে থামিয়া থামিয়া মা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ভাল আছ, বাবা ? বাঁচব কি ? কিছু খেতে পারি না, বড় দুর্বল। বরদা (শ্রীশ্রীমায়ের ভাই) মারা গিয়েছে।" দেশেরও খবর লইতেছেন, "জল হয়েছে কি ?" মণীন্দ্রবাবু বলিলেন, 'না, মা।' মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে প্রসাদ পাবে তো ?" মণীন্দ্রবাবু বলিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।' রমণী নামক একটি স্ত্রীলোক দ্বারা তিনি শ্রীশ্রীমায়ের জন্য কচি তাল পাঠাইয়াছিলেন। এই স্ত্রীলোকটি মণীন্দ্রবাবুর প্রেরিত জিনিসপত্র লইয়া কয়েকবার জয়রামবাটীও গিয়াছিল। মা তাহার কথায় বলিলেন, "রমণী কখন এসেছিল জানি না ; জ্বরে হুঁশ ছিল না। তাকে বলো, সে যেন মনে দুঃখ না করে।" কাশী হইতে শান্তানন্দ স্বামী প্রভৃতি যিনি যখন আসিয়াছেন সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতেন, "লাটু কেমন আছে ?" মা অসুখে পড়িয়া শুনিয়াছিলেন, পূজনীয় লাটু মহারাজের খুব অসুখ। কাশী হইতে ইঁহারা যখন আসেন তখন লাটু মহারাজের শরীর গিয়াছে। এ দুঃসংবাদ তাঁহাকে শুনানো হয় নাই। বোধ হয় মা অন্তরে জানিতে পারিয়াছিলেন, তাই বারংবার তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন।

নবাসনের বউ এবং সরলা মায়ের খুব সেবা করিয়াছিলেন। যতক্ষণ কিছুমাত্র সামর্থ্য ছিল, মা কাহাকেও সেবা করিতে দিতে এতই সঙ্কুচিত হইতেন যে, তাঁহার সেবা করার সুযোগই হইত না। এই শেষ অসুখের সময় একদিন বেলা প্রায় এগারটার সময় মায়ের পথ্য হইয়া গিয়াছে, তক্তপোশের উপর আড়ভাবে শুইয়া আছেন। একটু ঘুম পাড়াইবার জন্য হাওয়া করিতেছিলাম। চার-পাঁচ মিনিট পরেই বলিলেন, "আর না, তোমার হাত ব্যথা করছে।" আমি বলিলাম, "না মা, এ হাতপাখা, আমার একটুও হাত ব্যথা করছে না। করলে আমি আপনিই থামব।" একটু চক্ষু বুজিয়া থাকিয়াই আবার বলিলেন, "না, বাবা, তোমার হাত ব্যথা করবে। থাক, আমি অমনি ঘুমুচ্ছি।" একটু চুপ করিয়াই আবার বলিলেন, "বাবা, তোমার হাত ব্যথা করবে ভেবে আমার ঘুম আসছে না। তুমি পাখা বন্ধ কর, তাহলে আমি

নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুই।" অগত্যা আমি পাখা বন্ধ করিলাম। মাও চুপ করিয়া শুইয়া রহিলেন। বোধ হয় দশ মিনিটও হাওয়া করা হইল না।

ক্রমশঃ অসুখ খুব বাড়িতে লাগিল। ঘরের তক্তপোশ সরাইয়া দিয়া মেঝেতেই বিছানা করা হইল। এ রোগ যে সারিবে না, মা তাহা জানিতেন বলিয়াই মনে হয়। পূর্ববারের অসুখের পর বলিয়াছিলেন, "আবার তো সেই রকম ভুগতে হবে।" জীবের কল্যাণের জন্য যে রাধুর মায়া অবলম্বন করিয়া তিনি ঠাকুরের অদর্শনের পরও এই দীর্ঘকাল বর্তমান ছিলেন, সেই রাধুর সম্পর্কও তিনি ছিন্ন করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "কুটোছেঁড়া করে দিয়েছি।" একদিন অনেক অনুনয় করিয়া বলিয়াছিলাম, "মা, তুমি তো ইচ্ছা করলেই থাকতে পার।" তাহাতে শুধু বলিলেন, "মরতে কার সাধ?" তাঁহার নিজের ইচ্ছা বলিয়া কিছু ছিল না। বলিতেন, "ঠাকুর যখন নিয়ে যাবেন, যাব।"

ক্রমে রক্তহীনতায় হাত-পায়ে শোথ দেখা দিল। উঠিবার শক্তি না থাকায় বিছানাতেই শৌচাদি করানো হইত। শ্রীমতী সুধীরা ও নিবেদিতা স্কুলের মেয়েরা পালা করিয়া থাকিয়া সব সময়ে পরিচর্যা করিতেছিলেন। ভাল ব্রাহ্মণের দ্বারা যথাবিহিত শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদিও করানো হইয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই ফল হইল না। কবিরাজ রাজেন্দ্রনাথ সেন দুই মাস পূর্ব হইতেই বলিয়াছিলেন, "আপনাদের ভক্তদের মধ্যে যাঁহারা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে সংবাদ দিতে পারেন, কারণ এ রোগে আর আশা নাই।" দেহ যাইবার পাঁচদিন মাত্র বাকি আছে। জনৈক স্ত্রী-ভক্ত (অন্নপূর্ণার মা) দেখিতে আসিয়াছেন। ভিতরে যাইতে নিষেধ বলিয়া তিনি ঠাকুরঘরের দুয়ারেই বসিয়াছিলেন। হঠাৎ পাশ ফেরায় মা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া হাতে ইশারা করিয়া কাছে ডাকিলেন। তিনি প্রণাম করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "মা, আমাদের কি হবে?" চিরকরুণাময়ী অভয় দিয়া ধীরে ধীরে ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "ভয় কি? তুমি ঠাকুরকে দেখেছ, তোমার আবার ভয় কি?" একটু পরে আবার ক্ষীণকণ্ঠে থামিয়া থামিয়া বলিলেন, "তবে একটি কথা বলি—যদি শান্তি চাও, মা, কারো দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ, কেউ পর নয়, মা; জগৎ তোমার।"

যাহাদের দুঃখে কাতর হইয়া মা স্বয়ং তাহাদের পাপভার গ্রহণপূর্বক এই দুঃসহ রোগযাতনা ভোগ করিলেন, তাহাদের প্রতি ইহাই তাঁহার শেষ বাণী। ১৩২৭ সালের ৪ শ্রাবণ, মঙ্গলবার, রাত্রি দেড়টার সময় ভক্তসন্তানগণকে কাঁদাইয়া তিনি মহাসমাধিযোগে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত মিলিত হইলেন। পরদিন বেলুড় মঠে তাঁহার দিব্যদেহের যথারীতি সৎকার করা হইল। শ্রীশ্রীমায়ের স্থূলদেহ লোকচক্ষুর অন্তরাল হইলেও সূক্ষ্মশরীরে তিনি প্রতি ভক্তের হৃদয়মন্দিরে চিরবিরাজমানা রহিয়াছেন।

স্বামী অরূপানন্দ

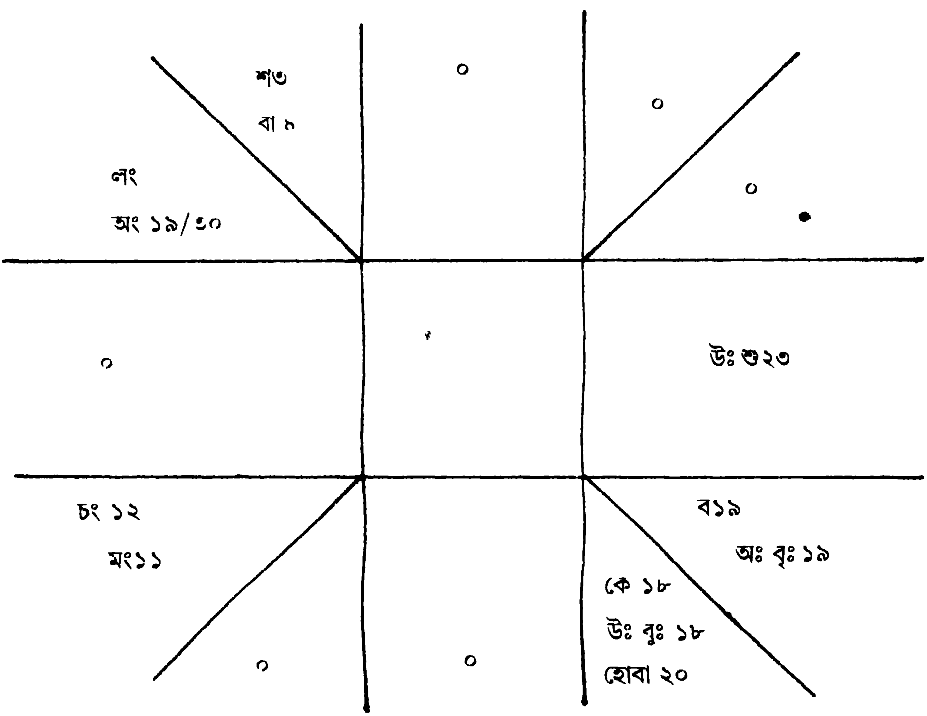
শ্রীশ্রীমায়ের কোষ্ঠী

(শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ-কৃত)

শুভমস্তু, শকাব্দাঃ ১৭৭৪/৮/৭/২৮/৩০

জাতাহঃ দিবা ২৬/২৩ রাত্রি ৩৩/৩৭ | পবাহঃ দিবা ২৬/২২ রাত্রি ৩৩/৩৮

৫	১১	৬	৬	১২	৪
২২	১৯	৩৯	২৩	২০	৩৫
৫০	৫৮	২৫	৪৮	১১	৪
০	০	৮	৮	২	৯



এতচ্ছকীয়সৌবপৌমস্যাষ্টমদিবসে, গুরুবাসবে, কৃষ্ণপক্ষীয় সপ্তম্যান্তিথৌ, উত্তরফাল্গুনীনক্ষত্রস্য প্রথমচবণে, আয়ুষ্মদযোগে, ববকরণে, এবং পঞ্চাঙ্গসংশুদ্ধে রাত্রিনবমপলাধিকদ্বিতীয়দণ্ডসময়ে, অয়নাংশোদ্ভবশুভমিথুনলগ্নে (লগ্নস্ফুটরাশ্যাদয়ঃ ২/১৯/৩০/০), বুধস্য ক্ষেত্রে, রবের্হোবায়াং, শুক্রস্য দ্রেক্কাণে, শুক্রস্য সপ্তাংশে, গুরোর্নবাংশে শনৈশ্চরস্য দ্বাদশাংশে, গুরোস্ত্রিংশাংশে, এবং সপ্তবর্গপরিশোধিতে বৃহস্পতের্যামার্ধে, রবের্দণ্ডে উত্তরফাল্গুনীনক্ষত্রাশ্রিতসিংহরাশিস্থিতে চন্দ্রে, অশেষগুণালঙ্কৃত শ্রীযুত বামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়মহোদয়স্য শুভা প্রথমা কন্যা শ্রীমতী সারদামণিদেবী সমজনি।

জয়রামবাটীতে প্রথম দর্শন। ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৭।

শিবচতুর্দশীর পূর্ব তৃতীয়া, সকাল প্রায় সাড়ে আটটা।

বরদা মামা আসিয়া সংবাদ দিলেন, 'মা ডাকছেন।'

বাড়ির মধ্যে গিয়া দেখি মা তাঁহার ঘরের ভিতরে দুয়ারে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। প্রণাম করিতেই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথা থেকে এসেছ?'

আমি জেলার নাম বলিলাম।

মা—এখন বুঝি ঠাকুরের কথাটথা নিয়েই আছ?

আমি ঐকথার কোন উত্তর দিলাম না। যেন পূর্বপরিচিতের মতো কথাবার্তা। সেই সস্নেহ দৃষ্টি আমার এখনও মনে পড়িতেছে।

মা—তুমি কায়স্থ? (আমার সব শরীর কিন্তু শীতকাল বলিয়া র‍্যাপারে ঢাকা।)

আমি—হাঁ।

মা—তোমরা কটি ভাই?

আমি—চার ভাই।

মা—বস, জল খাও।

এই বলিয়া নিজেই বারান্দায় আসন পাতিয়া দিয়া রাত্রের প্রসাদী লুচি ও গুড় একটা বাটিতে করিয়া আনিয়া দিলেন।

পূর্বদিন তারকেশ্বর হইতে হাঁটিয়া গিয়াছি। সন্ধ্যায় দেশড়া (জয়রামবাটীর উত্তর পাশের গ্রাম) পৌঁছি। সঙ্গে দেশড়ার একটি ছেলে (গোবিন্দ রায়ের বড় ছেলে)। তাহার সঙ্গে হরিপাল স্টেশনে আলাপ হয়। রাত্রিতে তাহাদের বাড়িতে ছিলাম।

মা এই সব শুনিলেন এবং আমার খাওয়ার পর বলিলেন, "স্নান করো না। অনেক পথ হেঁটে এসেছ।" পান দিলেন।

মধ্যাহ্নে ঠাকুরের ভোগ হইতেই আমাকে ডাকাইলেন এবং প্রথমেই খাইতে দিলেন। নিজেই শালপাতায় ভাত-তরকারি সব বাড়িয়া দিয়া গেলেন। আমি মায়ের ঘরের বারান্দায় বসিয়া খাইতেছি। খাওয়ার সময় মা বলিলেন, "পেট ভরে খেও, জান?" খাওয়ার পর পান দিলেন।

বৈকালে তিন-চারিটার সময় বাড়ির মধ্যে গিয়া দেখি মা ময়দা মাখিতেছেন। তাঁহার ঘরের বারান্দার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে পূর্বমুখে পা মেলিয়া বসিয়াছেন। পাশেই ছোট উনুন, বৈকালে লুচি, তরকারি ইত্যাদি সেখানেই রান্না হয়। আমাকে দেখিয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি চাও?'

আমি—তোমার সঙ্গে কথা আছে।

মা—কি কথা? বস।

এই বলিয়া বসিতে আসন দিলেন।

আমি—মা, এই যে ঠাকুরকে সকলে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বলে, তুমি কি বল?

মা—হাঁ, তিনি আমার পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।

'আমার' বলায় আমি বলিলাম, "তা প্রত্যেক স্ত্রীলোকেরই স্বামী পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। আমি সেভাবে জিজ্ঞাসা করছি না।"

মা—হাঁ, তিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন—স্বামিভাবেও, এমনি ভাবেও।

তখন আমার মনে হইল, তিনি পূর্ণব্রহ্ম হইলে মা জগদম্বা স্বয়ং—যেমন সীতা-রাম, রাধা-কৃষ্ণ পরস্পর অভিন্ন। আমিও এই বিশ্বাস লইয়াই মাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে যে তোমাকে এই দেখছি যেন সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো বসে রুটি বেলছ, এসব কি? মায়া, না কি!"

মা—মায়া বইকি! মায়া না হলে আমার এ দশা কেন? আমি বৈকুণ্ঠে নারায়ণের পাশে লক্ষ্মী হয়ে থাকতুম। বলিয়াই আবার বলিতেছেন, "ভগবান, নরলীলা করতে ভালবাসেন কি-না। শ্রীকৃষ্ণ গোয়ালার ছেলে ছিলেন। রাম দশরথের বেটা।"

আমি—তোমার কি আপনার স্বরূপ মনে পড়ে না?

মা—হাঁ, এক একবার মনে পড়ে; তখন ভাবি, এ কি করছি, এ কি করছি! আবার এইসব বাড়িঘর, ছেলে-পিলে (হাত চিৎ করিয়া সামনের সব দেখাইয়া) মনে আসে ও ভুলে যাই।

আমি প্রায় রোজই সন্ধ্যার পর মায়ের ঘরে গিয়া বসিতাম, মা খাটে শুইয়া থাকিয়া কথাবার্তা বলিতেন। রাধু (মায়ের ভাইঝি) মায়ের পাশে ঘুমাইয়া থাকিত। ঘরে পিলসুজের উপর প্রদীপ মিটমিট করিয়া জ্বলিত। কোন কোন দিন ঝিকে মায়ের পায়ের বাতের তেল মালিশ করিতে দেখিতাম।

কথাপ্রসঙ্গে মা বলিতেছেন, "যখন আমার কোন ভক্তকে মনে পড়ে, আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়, তখন হয় সে নিজে আসে, নয় তার চিঠিপত্র আসে।

"এই যে এখানে এসেছ, একটা কিছু ভাব নিয়ে এসেছ। হয়তো জগন্মাতা* ভেবে এসেছ।"

---

* শ্রীশ্রীমা নিজের সম্বন্ধে কদাচিৎ এই ভাবের কথা বলিতেন। পরে শিবুদাদার মুখে শুনিয়াছি ঠাকুরের দেহত্যাগের পর একবার মা কামারপুকুর হইতে জয়রামবাটী আসিতেছিলেন। সঙ্গে শিবুদাদা (তখন ছেলেমানুষ) কাপড়ের পুঁটলি লইয়া। জয়রামবাটীর প্রায় কাছে মাঠের মধ্যে আসিয়া শিবুদাদার হঠাৎ কিরূপ মনে হওয়ায় দাঁড়াইয়া পড়েন। মা কিছুদূর আসিয়া পিছনে কাহারও পায়ের শব্দ শুনিতে না পাইয়া ফিরিয়া দেখেন, শিবুদা দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। মা বলিলেন, "ও কিরে, শিবু, এগিয়ে আয়।' শিবুদাদা বলিলেন, "একটি কথা বলতে পার, তাহলে আসতে পারি।" মা—'কি কথা?' শিবুদাদা—' তুমি কে, বলতে পার?" মা—"আমি কে? আমি তোর খুড়ী।" শিবুদাদা—"তবে যাও, এই তো বাড়ির কাছে এসেছ। আমি আর যাব না।" (এদিকে বেলা শেষ হইয়াছে।) মা—"দেখ দেখি, আমি আবার কে রে? আমি মানুষ, তোর খুড়ী।' শিবুদাদা—"বেশ তো, তুমি যাও না।" শিবুদাদাকে না যাইতে দেখিয়া মা শেষে বলিলেন, "লোকে বলে কালী।" শিবুদাদা—"কালী তো? ঠিক?" মা—'হাঁ।' শিবুদাদা—'তবে চল।' বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে জয়রামবাটী যাইলেন।

আমি—তুমি কি সকলেরই মা ?

মা—হাঁ।

আমি—এইসব ইতর জীবজন্তুরও ?

মা—হাঁ, ওদেরও।

আমি—তবে ওরা এত কষ্ট পাচ্ছে কেন ?

মা—ওদের এসব জন্ম এই-ই (অর্থাৎ ইতর জীবজন্তুর এই সকল জন্মে এই প্রকারই হইয়া থাকে)।

মাকু (মায়ের আর এক ভাইঝি) ও রাধু পাঠশালে যাইত। সন্ধ্যার পূর্বে তাহারা আসিলে মা আগে তাহাদের খাওয়াইতেন। আমি বলিলাম, 'কি হচ্ছে ?'—তখন একটু একটু পশ্চিমবঙ্গের কথা বলিতে শিখিয়াছি।

মা হাসিয়া আমার 'হচ্ছে' কথাটির উচ্চারণ নকল করিয়া বলিলেন, "বালিকা-ভোজন হচ্ছে।"

সন্ধ্যার পর মায়ের ঘরে কথাবার্তা হইতেছে।

মা—এই যে তোমরা এসেছ ; আপনার না হলে আসবে কেন ?

আমি—আমি কি তোমার আপনার ?

মা—হাঁ, আপনার বই কি, 'যে যার সে তার, যুগে যুগে অবতার' (যে যাহার আপনার জন, সে তাহার সহিত যুগে যুগে আসে)।

কিছুক্ষণ কথার পর বলিতেছেন, "আবার সূক্ষ্ম শরীরে দেখা হবে।" বুঝিলাম দেহান্তে আমাদের আবার সাক্ষাৎ হইবে।

আমি—মা, আমি গত আশ্বিন মাসে এখানে আসব বলে হাওড়া স্টেশনে এক রাত্রি শুয়েই কাটালাম। পর দিনও বেলা ১১টা পর্যন্ত স্টেশনে। টিকিট আর কাটতে পারছি না। স্বদেশী আন্দোলনের জন্য ধর্মঘট করায় কেরানীরা আসে নাই, কাজকর্ম বন্ধ। মিনিট কয়েক থাকতে একটি মেম কেরানী এল। তখন টিকিটের জন্য লাঠালাঠি। পূজার সময় কি না। টিকিট কিনতে না পেরে বাসায় ফিরে যাই। শেষে বাড়ির চিঠি পাই, এক ভাইয়ের খুব অসুখ। তাই বাড়ি ফিরে গেলাম, সেবার আসা হলো না।

মা—একটা যোগাযোগ হওয়া চাই, তবে দেখা হয়।

আমি—সকলে তোমায় 'আপনি' বলেন, আমি কিন্তু বলতে পারলাম না, আমার মুখে এল না।

মা—তা ভাল। এ খুব আপনা-আপনি ভাব।

আমি কথায় কথায় বলিলাম, "মা, তুমি যাদের মন্ত্র দিয়েছ তাদের ভার তো তুমি নিয়েছ। তবে আমাদের কথা বললে 'ঠাকুরের কাছে বলব' একথা বল কেন ? আমাদের

ভার তুমি নিতে পার না ? (আমার তখনও মন্ত্রের আবশ্যকতা বোধ হয় নাই, তাই ঐরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলাম)।

মা—তোমার তো ভার নিয়েছি।

আমি—মা, আশীর্বাদ কর যেন শুদ্ধ মন আর অনুরাগ হয়। মা, আমি একটি ছেলের সঙ্গে পড়েছি, তাকে যা ভালবাসতাম, তার সিকি ভালবাসাও যদি ঠাকুরের প্রতি হতো, তাহলেও সন্তুষ্ট হতাম।

মা—আহা, তাই তো ; আচ্ছা, ঠাকুরের কাছে বলব।

আমি—কেবল 'ঠাকুরের কাছে বলব' বলছ কেন ? তুমি আব ঠাকুর কি ভিন্ন ? তুমি আশীর্বাদ করলেই হবে।

মা—বাবা, তোমার পূর্ণজ্ঞান আমার আশীর্বাদে যদি হয়, আমি হাড় ভেঙে আশীর্বাদ করব।

—মানুষের কি সাধ্য যে আপনি এ মায়ার হাত থেকে তবতে পারে ? তাই তো ঠাকুর এত সাধনা করলেন, সব ফল জীবোদ্ধারে দিযে গেলেন।

আমি—তাঁকে না দেখলে কি করে ভালবাসা যায় ?

মা—তাই তো, হাওয়ার সঙ্গে কে ভাব করতে পারে ?

আমি—মা, কবে ঠাকুরেব দেখা পাব ?

মা—পাবে পাবে, সময় হলেই ঠাকুরের দেখা পাবে।

অন্য একদিন সন্ধ্যার পর মা শুইয়া আছেন। কামিনী ঝি মায়ের পাযে (হাঁটুতে) বাতের তেল মালিশ করিতেছে।

মা বলিলেন, "দেহ একটি, দেহী একটি ! দেহী সব শরীর জুড়ে রয়েছেন, তাই পায়ে ব্যথা। যদি এখান (হাঁটু) থেকে মন তুলে নিই, তাহলে আর বেদনা নেই।"

আমি মন্ত্রদীক্ষার কথা তুলিয়া বলিলাম, "আচ্ছা মা, মন্ত্র নেবার কি দবকাব ? মন্ত্রজপ না করে কেউ যদি 'মা কালী, মা কালী' বলে ডাকে, তাতে হয় না ?"

মা—মন্ত্রেব দ্বাবা দেহশুদ্ধি হয়। ভগবানের মন্ত্র জপ করে মানুষ পবিত্র হয। ইহা বলিয়া একটি গল্প বলিলেন—

নারদ বৈকুণ্ঠে গিছলেন। বসে ঠাকুবের সঙ্গে অনেক কথা কইলেন। নারদ যখন চলে গেলেন, ঠাকুর লক্ষ্মীকে বললেন, 'ওখানে গোবর দাও।' লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন, ঠাকুর ? নারদ যে পরম ভক্ত, তবে কেন এরূপ বলছ।' ঠাকুর বললেন, 'নারদের এখনও মন্ত্র নেওয়া হয়নি। মন্ত্র না নিলে দেহ শুদ্ধ হয় না।'

অন্ততঃ দেহশুদ্ধির জন্যও মন্ত্র দরকার। বৈষ্ণবেরা মন্ত্র দিয়ে বলে, "এখন মন তোর।" তাই তো—

"মানুষ গুরু মন্ত্র দেন কানে।
জগদ্‌গুরু মন্ত্র দেন প্রাণে॥"

মনেতেই সব। মন শুদ্ধ না হলে কিছুই হয় না।

"গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব, এ তিনের দয়া হল।
একের দয়া বিনে জীব ছারেখারে গেল॥"

একের কি না মনের। নিজ মনের কৃপা হওয়া চাই।

আমি—মা, আমার কিন্তু জপতপে প্রবৃত্তি নাই।

মা—হয়তো তোমার পূর্বজন্মে ও সব করা আছে।

বাংলায় তখন খুব স্বদেশী আন্দোলন চলিতেছে। তাই জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, এ দেশের দুঃখ-দুর্দশা কি দূর হবে না?"

মা—ঠাকুর তো এসেছিলেনই তার জন্যে।

মায়ের মাতার কথা উঠিল। মা বলিতেছেন, "মা ছিলেন—কোন ভক্ত এলে 'নাতিন এসেছে, নাতিন এসেছে' বলে কত খুশি হতেন, কত যত্ন করতেন। এ-সংসারটি ছিল যেন তাঁর গায়ের রক্ত। কত করে এটি ঠিকঠাক রাখতেন। আমার মায়ের নাম ছিল শ্যামা।" (দিদিমা পূর্ব বৎসর—১৯০৬ সনের গোড়ায় দেহত্যাগ করিয়াছেন)।

ঠাকুরকে দর্শনের কথা বলিলেন—

"যখন ঠাকুর চলে গেলেন, আমারও ইচ্ছা হলো আমিও চলে যাই। তিনি দেখা দিয়ে বললেন, 'না, তুমি থাক। অনেক কাজ বাকি আছে।' শেষে দেখলুম, তাই তো অনেক কাজ বাকি।"

"তিনি বলতেন, 'কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখবে'।"

"তিনি শতবৎসর সূক্ষ্মশরীরে ভক্তহৃদয়ে বাস করবেন বলেছেন। আর তাঁর অনেক শ্বেতকায় ভক্ত আসবে।"

"যখন ঠাকুর চলে গেলেন, প্রথম প্রথম ভয় হতো। পরনে লাল কাপড় (সরু লালপেড়ে কাপড়), হাতে বালা— লোকে কি বলবে। তখন কামারপুকুরে রয়েছি। তারপর ঠাকুরের দেখা পেতে লাগলুম। তখন সে-সব ভয় ক্রমে দূর হলো। একদিন ঠাকুর এসে বললেন, 'খিচুড়ি খাওয়াও।' খিচুড়ি রেঁধে রঘুবীরকে ভোগ দিলুম। মারোয়াড়ী (অর্থাৎ হিন্দুস্থানী) কি না তাই খিচুড়ি! তারপর বসে ভাবে ঠাকুরকে খাওয়াতে লাগলুম।"

"হরিশ এই সময় কামারপুকুরে এসে কিছুদিন ছিল। একদিন আমি পাশের বাড়ি থেকে আসছি। এসে বাড়ির ভিতর যেই ঢুকেছি, অমনি হরিশ আমার পিছুপিছু ছুটছে। হরিশ

তখন ক্ষেপা। পরিবার পাগল করে দিয়েছিল। তখন বাড়িতে আর কেউ নেই। আমি কোথায় যাই। তাড়াতাড়ি ধানের হামারের (তখন ঠাকুরের জন্মস্থানের উপর ধানের গোলা ছিল) চারদিকে ঘুরতে লাগলুম। ও আর কিছুতেই ছাড়ে না। সাতবার ঘুরে আমি আর পারলুম না। তখন নিজ মূর্তি এসে পড়ল। আমি নিজ মূর্তি ধবে দাঁড়ালুম। তারপর ওর বুকে হাঁটু দিয়ে জিভ টেনে ধরে গালে এমন চড় মারতে লাগলুম যে, ও হেঁ হেঁ করে হাঁপাতে লাগল। আমার হাতের আঙুল লাল হয়ে গিছল। তারপর নিরঞ্জন এলে তাকে বললুম, 'ওকে পাঠিয়ে দাও'।"

যোগীন মহারাজের কথা উঠিল। মা বলিলেন, "যোগীনের মতো আমাকে কেউ ভালবাসত না। আমার যোগীনকে কেউ যদি আট আনা পয়সা দিত, সে রেখে দিত; বলত, 'মা তীর্থে টীর্থে যাবেন, তখন খরচ করবেন।' সর্বক্ষণ আমার কাছে থাকত, মেয়েদের কাছে থাকত বলে ওরা (ছেলেরা) সকলে তাকে ঠাট্টা করত।

যোগীন আমাকে বলত, 'মা, তুমি আমাকে যোগা, যোগা বলে ডাকবে।' যোগীন যখন দেহ রাখলে, সে বললে, 'মা, আমায় নিতে এসেছিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ঠাকুর'।

আমি মাকে বললাম, কোন্ কোন ভক্ত কে কে, আমাকে বলতে হবে।

মা—কাউকে না বলতে পার?

আমি—তা, তুমি দেখবে যাতে কাউকে না বলি।

বলিয়াই ভাবিলাম, হয়তো কাহাকেও বলিয়া ফেলিব, কথা রক্ষা হইবে না। তাই তখনই বলিলাম, 'তবে থাক।'

মা—যোগীনকে অর্জুন বলতেন। নরেনকে সপ্তর্ষি থেকে এনেছিলেন। ঈশ্বরকোটীর পূর্ণ। শরৎ আর যোগীন এ দুটি আমার অন্তরঙ্গ।

এইরূপ দুই-এক জনের কথা আপনা হইতেই বলিলেন।

নিজের কথা বলিতেছেন—"বলরামবাবু বলতেন, 'ক্ষমারূপা তপস্বিনী'।" বলিয়াই আবার বলিলেন, "দয়া যার শরীরে নেই, সে কি মানুষ? সে তো পশু। আমি কখন কখনও দয়ায় আত্মহারা হয়ে যাই, ভুলে যাই যে আমি কে।"

কথাবার্তাব শেষে মা বলিলেন, "বাবা, তোমার সঙ্গে আমার যেমন খোলাখুলি কথা হয়েছে এমন আর কারুও সঙ্গে হয়নি।" পরে মা বলিলেন, "আমি যখন কলকাতায় যাব তখন তুমি আসবে, আমার কাছে থাকবে।"

যদিও আমার ভিতরে ভিতরে সাধু হইবার খুব ইচ্ছা, তথাপি আমি তখন বাড়িতে থাকি। মনে ভাবিলাম, হয়তো ভবিষ্যতে মায়ের ইচ্ছায় আমার তাঁহার কাছে থাকা এবং সাধু হওয়া সম্ভব হইবে।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আশুকে চেন? কাঞ্জিলাল, কৃষ্ণলাল?"

আমি বলিলাম, "না, আমি চিনি না।"

আমি যখন জয়রামবাটী যাই তখন ছোট মামী (রাধুর মা) পাগল হইয়াছেন। রাধুর গহনাগুলি লইয়া তিনি বাপের বাড়ি গিয়াছিলেন; তাঁহার বাপ গহনাগুলি কাড়িয়া লইয়াছেন; তজ্জন্য আরও ক্ষেপিয়াছেন। পাগলী মামী সিংহবাহিনীর মন্দিরে "মা, গয়না দাও, মা, গয়না দাও" বলিয়া কাঁদিতেছেন। তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। ঘরে মা আর আমি। কথাবার্তা হইতেছে। হঠাৎ মা বলিলেন, "যাই, যাই, বাবা, ওর আমি ছাড়া কেউ নেই। পাগলী সিংহবাহিনীর কাছে গহনার জন্য কাঁদছে।" এই বলিয়া মা চলিয়া গেলেন। আমি কিন্তু কান্না আদৌ শুনিতে পাই নাই এবং অত দূর হইতে শোনাও সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁহার কানে পৌঁছিয়াছে। সিংহবাহিনীর মন্দিরে গিয়া ক্ষেপীকে লইয়া আসিলেন।

পাগলী বলিতেছেন, "ঠাকুরঝি, তুমিই আমার গয়না আটক করে রেখেছ। তুমিই দিচ্চ না।" মা বলিলেন, "আমার হলে আমি কাকবিষ্ঠাবৎ এই দণ্ডে ফেলে দিতুম।" ক্ষেপীর কথায় আমাকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "গিরিশবাবু বলতেন, এটা মায়ের সঙ্গের পাগলী।"

আমার প্রথম প্রথম 'মা' বলতে একটু লজ্জা বোধ হইত, কারণ গর্ভধারিণী মা অল্প বয়সেই চলিয়া গিয়াছেন। একদিন সকালবেলা আমাকে দিয়া এক জ্ঞাতি-ভাইকে সংবাদ পাঠাইতেছেন। যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলবে বল দেখি?" আমি বলিলাম, "তিনি আপনাকে এই এই বলতে বললেন।" শুনিয়া মা বলিলেন, "বলবে মা বললেন।" 'মা' শব্দটি জোর দিয়া উচ্চারণ করিলেন।

একদিন বেলা আটটা নয়টার সময় মা তাঁহার ঘর হইতে বাহিরে আসিতেছিলেন। উঠানে একটি ছেলে দাঁড়াইয়া অনন্যদৃষ্টিতে মাকে দেখিতেছিল। মা আসিতে আসিতে হঠাৎ ছেলেটির দিকে ফিরিয়া আসিয়া সস্নেহে তাহার চিবুকে হাত দিয়া সহাস্যে আমাকে বলিলেন, "এটি আমার গণেশ।" বোধ হইল, ছেলেটি কোন ভক্ত বা আত্মীয় হইবে।

একদিন সকালে মায়ের ঘরের বারান্দায় 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি পাঠ হইতেছিল। আমি পড়িতেছিলাম এবং মা ও আরও দুই একজন শুনিতেছিলেন। বিবাহের অংশটি পড়া হইতেছিল। সেখানে মাকে 'জগন্মাতা' বলিয়া উল্লেখ করিয়া খুব প্রশংসা ছিল; মা উহার খানিকটা শুনিয়াই উঠিয়া গেলেন। ইহারই অল্পক্ষণ পূর্বে তাঁহাকে মাঘ মাসের 'উদ্বোধন' হইতে পড়িয়া শুনাইতেছিলাম। মা একমনে শুনিতেছিলেন। ইহাতে মাস্টার মহাশয়ের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের' কিয়দংশ বাহির হইয়াছে। আর কেহ তথায় ছিল না। একস্থানে পড়িতেছিলাম—

"গিরিশ—একটি সাধ।

ঠাকুর—কি?

গিরিশ—অহেতুকী ভক্তি।

ঠাকুর—অহেতুকী ভক্তি ঈশ্বরকোটীর হয়, জীবকোটীর হয় না।"

আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, জীবকোটীর হয় না, ঈশ্বরকোটীর হয়, এর মানে কি ?"

মা—ঈশ্বরকোটী পূর্ণকাম কিনা, তাই অহেতুক। কামনা থাকতে অহেতুক ভক্তি হয় না।

আমি—মা, তোমার এইসব বিশেষ ভক্ত‍‍রা ও ভাইরা—এঁরা কি সমান ?

আমার মনের ভাব এই যে, ভাই হইয়া যখন জন্মিয়াছেন, তখন ইঁহারাও উচ্চ আধার ও অন্তরঙ্গ হইবেন, যেমন মঠের মহারাজরা।

মা তদুত্তরে ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া এরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন যেন কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা। শুধু ভাই হইলে কি হইবে ? অন্তরঙ্গ পৃথক বস্তু।

একদিন সকালে ধানভানা হইতেছিল ; মা উহাতে সাহায্য করিতেছিলেন। প্রায় রোজই ঐরূপ করিতেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "মা, তোমার এত খাটুনি কেন ?" মা বলিলেন, "বাবা, আদর্শ হিসাবে যা করতে হয় তার ঢের বাড়া (বেশি) করেছি।"

একদিন রাত্রে সকলে ঘুমাইতেছেন। নলিনীর (মায়ের আর একটি ভাইঝি) স্বামী গরুর গাড়ি লইয়া উপস্থিত ; নলিনীকে লইয়া যাইবে। সে শ্বশুরবাড়ি হইতে চলিয়া আসিয়াছে এবং ফিরিয়া যাইতে চাহে না ; স্বামীর আগমন-সংবাদ পাইয়াই ঘরের দুরজা বন্ধ করিয়াছে। আত্মহত্যা করিতে চাহে। অনেক সাধাসাধির পর, তাহাকে এবার শ্বশুরবাড়ি যাইতে হইবে না, মা এইরূপ কথা দেওয়ায় সে দরজা খুলিল। এইরূপ গোলমালে রাত্রি কাটিল। মা নলিনীর ঘরের বারান্দায় বসিয়াছিলেন। প্রভাত হইলে তিনি তাঁহার সম্মুখের লণ্ঠনটি নিবাইলেন ; বলিতে লাগিলেন, "গঙ্গা, গীতা, গায়ত্রী, ভাগবত, ভক্ত, ভগবান, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ।"

পরে নলিনীর কথায় মা আমাকে বলিলেন, "ওর পিসির (শ্রীশ্রীমায়ের) বাতাস লেগেছে, বাবা, তাই যেতে চায় না।"

একদিন সকালে মা আমাকে বাড়ির একজন পুরাতন চাকর সঙ্গে দিয়া পাগলীর বাপকে বুঝাইয়া লইয়া আসিতে, কিংবা গহনা ফিরাইয়া দিতে রাজি হইলে উহা আনিতে, তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। আমরা গিয়া অনেক অনুনয় করায় তিনি পরদিন আসিলেন, কিন্তু গহনা আনেন নাই। মা তাঁহাকে অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন, পায়ে হাত দিয়া পর্যন্ত অনুরোধ করিলেন, যাহাতে তিনি গহনাগুলি ফেরত দেন এবং বলিলেন, "আপনি আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করুন।" কিন্তু তথাপি সেই লোভী ব্রাহ্মণের মন গলিল না, তিনি নানা বাজে ওজর করিতে লাগিলেন।

শিবরাত্রির পূর্ব দিবস আমি রওয়ানা হইব স্থির করিলাম। কারণ মঠে ঠাকুরের উৎসব দেখিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল। মাকেও তাহাই বলিয়াছিলাম। মধ্যাহ্নে ভোজনের পর মাকে প্রণাম করিতে গেলাম—রওয়ানা হইব। মা বলিলেন, "এই শশীর সঙ্গে যাবে।" শশী

স্ত্রীলোক, ইহা দেখিয়া আমি একটু ভাবিতেছি। তখন মা বলিলেন, "ও যে আমাদের শশী গো। আমাব সঙ্গে থাকত দক্ষিণেশ্বরে।" শশীকে বলিলেন, "একে আমাদের ঘরে (যে ঘরে মা ও ঠাকুর কামারপুকুরে থাকিতেন) থাকতে দেবে। রামলালের মাসিকে বলে দেবে।" তখন আর কেহ ঠাকুরের বাটীতে ছিলেন না।

আমাকে বলিলেন, "কামারপুকুরে এক-আধ দিন থেকে শেষে মঠে যাবে। ঠাকুরের জন্মস্থান হয়ে যেতে হয়।" আমার কিন্তু কামারপুকুরে যাইবার পরিকল্পনা ছিল না। আমি শুধু মাকে দেখিতেই গিয়াছিলাম। তাঁহার জন্যই ব্যাকুল হইয়া বাড়ি হইতে ছুটিযাছিলাম; সঙ্গে কাপড়, ছাতাটি পর্যন্ত আনিতে ভুল হইয়াছিল। কিছুদূরে আসিয়া মনে পড়িলেও আর ফিরি নাই, পাছে কোন বিঘ্ন ঘটে।

আমার সঙ্গে কাপড় ছিল না। মা একখানি কাপড় পরিতে দিয়াছিলেন। বলিলেন, "ওখানা সঙ্গে নিয়ে যাও।" জিজ্ঞাসা করিলেন, "সঙ্গে টাকা আছে? গাড়ি-ভাড়া এসব লাগবে, টাকা নিয়ে যাও।" আমি বলিলাম, "আমার কাছে টাকা আছে, নিতে হবে না।" বলিলেন, "গিয়ে পত্র লিখবে।"

মা বলিতেছেন, "আমার ছেলেটিকে কিছুই খাওয়াতে পারলুম না, মাছ ধরাতে পারিনি।" কারণ তখন পাগলী ও নলিনীকে লইয়া বড় অশান্তি চলিতেছিল। আমি মাকে প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইলাম। মা সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত আসিলেন; পরে যতক্ষণ দেখা গেল চাহিয়া রহিলেন। মনের আবেগে কামারপুকুর পর্যন্ত সম্পূর্ণ পথ আমার আর চোখের জল থামিল না।

কামারপুকুরে পৌঁছিলাম। শশী মাসিমাকে আমার পরিচয় দিল। মায়ের ঘরে মায়ের ছবি দেখিয়া প্রাণ আরও ব্যাকুল হইল। যেন বিশ্বহিতধ্যানে মগ্না মাতৃমূর্তি!

রাত্রে মায়ের ঘরে শুইলাম। মাসিমা লেপ বিছানাদি দিলেন। পরদিন (শিবরাত্রির দিন) কামারপুকুরের বুড়ো শিব দর্শন করিলাম। বৈকালে মাস্টার মহাশয় ও প্রবোধবাবু কামারপুকুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলাম, মাস্টার মহাশয়ের (তখন চিনিতাম না) ঠাকুরের বাড়ি দেখিয়াই চক্ষে জল। গাড়ি বাড়ির দরজায় থামিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার কি নাম?" তিনি বলিলেন, "আমার নাম মাস্টার।" মাস্টার বলাতেই চিনিলাম। 'কথামৃত' পড়া ছিল। মাস্টার মহাশয় মায়ের জন্য মিঠাই আনিয়াছিলেন। উহা বাহিরবাড়ির ঘরে রাখা হইল। মাস্টার মহাশয় আমাকে বলিলেন, "দেখুন তো বাড়ির মধ্যে গঙ্গাজল আছে কিনা।" আমি গঙ্গাজল আনিয়া দিলাম। তিনি কাপড় কম্বল প্রভৃতিতে গঙ্গাজলের ছিটা দিলেন। মায়ের জন্য খাবার লইয়া যাইতেছেন, তাই।

তাঁহারা কামারপুকুরে রঘুবীরের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া জয়রামবাটী রওয়ানা হইলেন। আমি তাঁহাদিগকে ভূতির খালের ওপারে মানিক রাজার আমবাগান পর্যন্ত আগাইয়া দিয়া আসিলাম। তাঁহাদের সঙ্গে দুইজন ভারী। তখনও আমার ইচ্ছা, শীঘ্র মঠে যাইয়া উৎসব

দেখিব। সন্ধ্যাব কিছু পূর্বে ললিতবাবু—সামলা মাথায, পেন্টুলুন-চাপকান-পবা—কামাবপুকুবে পৌঁছিলেন। আমি তখন খাইতেছিলাম। তাডাতাডি খাওযা সাবিলাম। সন্ধ্যা হইল। শশী বলিল, "তুমি ললিতবাবুব সঙ্গে যাও। ওঁদেব সঙ্গেই মঠে যাবে। একা কোথা যাবে? সঙ্গে তেমন টাকা-পযসা নেই, পথও চেন না।" আমি সম্মত হইলাম। ললিতবাবু গ্রামেব দুইজন চৌকিদাব ডাকাইযা সঙ্গে লইলেন। জযবামবাটী যাইতে মাঠে বাস্তা ভুল হইল। চৌকিদাবেবা তখন বাস্তা ঠিক কবিবাব জন্য 'অম্বিকে' (জযবামবাটীব চৌকিদাবেব নাম) বলিযা একসঙ্গে হাঁক মাবিল। জযবামবাটীব একজন লোক কামাবপুকুবেব দিকে গিযাছিল, তখনও ফিবে নাই। তাই জযবামবাটীব লোকেবা মাঠে তাহাব উপব ডাকাত পডিযাছে মনে কবিযা লাঠি-ঠেঙ্গা লইযা চৌকিদাব সমেত মাঠেব দিকে দৌডিযা আসিল। তাহাদেব সহিত আমবা জযবামবাটী পৌঁছিলাম। বাডিব মধ্যে গিযা মাকে বলিলাম, 'মা, এসেছি।' মা খুব খুশি হইযা বলিলেন, "বেশ কবেছ, এদেব সঙ্গে যাবে।"

শিবচতুর্দশী উপলক্ষে ঘাটালেব উকিল শ্রীযুক্ত বামচন্দ্র মুখোপাধ্যায আসিযাছেন। ভক্তদেব কেহ কেহ উপবাস কবিযাছেন। পবদিন মধ্যাহ্নে তাঁহাবা মাযেব প্রসাদ চাহিলে মা বাধুকে দিযা একটি শালপাতায কবিযা প্রসাদ পাঠাইলেন। সকলে খাইতেছেন দেখিযা জিজ্ঞাসা কবিলাম, 'কি খাচ্ছেন?' তাঁহাবা বলিলেন, 'মাযেব প্রসাদ'। তখন আমিও একটু খাইলাম। মাকে গিযা বলিলাম 'মা, এঁবা সব তোমাব প্রসাদ খাচ্ছেন, তা আমাকে এত দিন দাও নাই কেন?' মা বলিলেন "বাবা, তুমি তো চাওনি, আমি কি কবে বলি?" কি নিবহঙ্কাব ভাব।

পব দিবস মধ্যাহ্নে পাল্কি চডিযা ললিতবাবু বাধুব গহনা আনিতে গেলেন। তিনি কলিকাতা পুলিশেব একজন খুব বড কর্মচাবীব চিঠি লইযা সবকাবী লোক সাজিযা গিযাছিলেন। মা মাস্টাব মহাশযকে সঙ্গে পাঠাইলেন, ললিতবাবুর ছোকবা বযস, ব্রাহ্মণ গহনা না দিলে পাছে তাঁহাব কোন অপমান কবেন। কিছু বেলা থাকিতে তাঁহাবা গহনা সমেত ছোট মামাব বাপকেই লইযা উপস্থিত হইলেন।

বাত্রি প্রায দুইটাব সময বাডিব ভিতব হইতে সংবাদ আসিল, মাযেব সমস্ত বাত্রি নিদ্রা হয নাই, মাথা ঘুবিতেছে। তৎক্ষণাৎ মাস্টাব মহাশয ও আমবা কেহ কেহ বাডিব মধ্যে গেলাম। সকলে ঔষধ খুজিতে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময আমি গিযা মাকে জিজ্ঞাসা কবিলাম, "মা, এমন কেন হলো?" মা এতক্ষণ কাহাকেও কাবণ বলেন নাই। জিজ্ঞাসা কবায বলিলেন, "ওবা তো সব চলে গেল গহনা আনতে। আমি সমস্ত দিন ভেবে ভেবে অস্থিব, পাছে ব্রাহ্মণেব কোনরূপ অপমান হয। এই ভাবনায বাযু প্রবল হযে এমন হযেছে।" আমি আব কাহাকেও কিছু না বলিযা মাস্টাব মহাশযকে সব কথা বলিলাম। ভাবিলাম, যে ব্রাহ্মণ এত ঝঞ্ঝাট ঘটাইল, কত কষ্ট দিল, তাহাব জন্য ভাবনা।

তৃতীয় দিন বৈকালে আমরা রওয়ানা হইলাম। মা ললিতবাবুকে বলিয়া দিয়াছিলেন, "ছেলেটি খুব ভক্ত। একে সঙ্গে করে নিও।" আমরা একে একে মাকে প্রণাম করিলাম। মায়ের চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল—কাঁদিতেছেন। সামনের ফটকের দুয়ার পর্যন্ত আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমরা দেশড়া হইয়া বিষ্ণুপুরের রাস্তায় আসিলাম। বিষ্ণুপুরে মাস্টার মহাশয়, প্রবোধবাবু প্রভৃতি লালবাঁধে মৃন্ময়ী দেবী দেখিতে গেলেন। আমি ও ললিতবাবু ট্রেনে উঠিয়াছি। দেখি মাস্টার মহাশয় প্রবোধবাবুকে পাঠাইয়াছেন। তিনি বলিলেন, "মাস্টার মহাশয় বলছেন, মৃন্ময়ী দেখে যাবেন।" আমরা চিন্ময়ী দেখিয়া আসিয়াছি, আর মৃন্ময়ী-দর্শনে সাধ হইল না। মঠে আসিয়া উৎসবাদি দর্শন করিয়া দেশে ফিরিলাম।

১৯০৭ সালে দুর্গাপূজার পর মাকে দর্শন করিতে কলিকাতায় আসি। একটি ভক্তের পত্রের উত্তরে মা জানাইয়াছিলেন, "আমি পূজা উপলক্ষে গিরিশবাবুর বাড়িতে আসিয়া এখন বলরামবাবুর বাড়িতে আছি" ইত্যাদি। আমি সকালবেলা বলরামবাবুর বাড়ি গিয়া উপস্থিত। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মা কোথায়'? তিনি মস্তকে হাত দিয়া দেখাইলেন, মা মাথায়। যাহা হউক, আমি কিছুক্ষণ একা হলঘরে বসিয়া থাকিয়া ভগবানকে (শান্তিরামবাবুর পুত্র) আমার নাম বলিয়া দিয়া মাকে সংবাদ পাঠাইলাম। মা তাহাকে বলিলেন, 'নিয়ে এস'। আমি বাড়ির ভিতরে গিয়া প্রণাম করিয়া বসিলাম। মা দেশে ম্যালেরিয়ায় খুব ভুগিয়া আসিয়াছেন। চেহারা শীর্ণ ও মলিন। পূর্বে জয়রামবাটীতে যেরূপ দেখিয়াছিলাম তদপেক্ষা অনেক রুগ্ন। মা বড় মামীর দেহত্যাগের কথা বলিলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর বলিলেন, "কাল শরৎ চক্রবর্তী এসেছিল। এখানে এসে আমাকে গান শুনালে। আহা, তার কি ভাব! কি গান! তুমি আসলে না!" আমি যে সেই বেলাই কলিকাতায় আসিয়াছি মা তখনও বুঝিতে পারেন নাই। একটু পরে গৌরবাবু আসিয়া বলিলেন, 'গাড়ি এসেছে'। মা গঙ্গাস্নান করিতে যাইবেন। আমি বাহিরে আসিলাম। মধ্যাহ্নে ওখানেই প্রসাদ পাইলাম। আমার একটু জ্বরভাব হওয়ায় বৈকালেই বরিশালে ফিরিব স্থির করিলাম। পূজনীয় শরৎ মহারাজ তখন এই বাড়িতে থাকেন। তিনি কুইনাইনের বড়ি দিলেন। সন্ধ্যার সময় মাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, "মা, আমি আজকেই যাব। রাত্রে গাড়ি, শরীর ভাল নয়।" কলিকাতায় আমার থাকিবারও কোন সুবিধা ছিল না। মা বলিতে লাগিলেন, "আহা, আজই চলে যাবে? আজ এলে, আবার আজকেই যেতে হবে?"

যাইবার সময় মাকে বলিলাম, "মা, যা ভাল হয় করো।"

ইহার পরের বারে মাকে বাগবাজারে তাঁহার নতুন বাটীতে দর্শন করি। পূর্বে কলিকাতায় আসিলে মা ভাড়াটিয়া বাড়িতে থাকিতেন। উহা সকল সময় পছন্দমত মিলিত না বলিয়া মায়ের যখন ইচ্ছা আসিতে এবং থাকিতে অসুবিধা হইত। তাই এই নতুন বাড়ি পূজনীয় শরৎ মহারাজের বহু চেষ্টায় নির্মিত হয়। আমি কলিকাতা পৌঁছিয়া সেই দিনই

বৈকালে অনেক খোঁজ করিয়া এই বাড়িতে আসি এবং দেখি কাঞ্জিলাল ডাক্তার রোয়াকে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছেন। মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "মায়ের বসন্ত হয়েছিল, এখনও আরোগ্যস্নান হয়নি। সম্প্রতি ভাল আছেন। পনর দিন পরে দেখা হতে পারে।" আমি এ সংবাদ জানিতাম না। শেষে পূজনীয় শরৎ মহারাজের সঙ্গে দেখা হইলে তিনি বলিলেন, "কাল সকালে এসে দেখা করো এবং এখানে প্রসাদ পেও।"

পরদিন সকালে আসিয়া দেখা করিলাম। মা তাঁহার হাতের ও মুখের বসন্তের দাগগুলি দেখাইতে লাগিলেন। অসুখের কথা সব বলিয়া বলিলেন, "বসন্তের দাগগুলি এখন আর তেমন নাই।" মায়ের গায়ে বসন্তের দাগ পরে মোটেই ছিল না।

এইবারেই পূজনীয় শরৎ মহারাজের কথায় এবং শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদে আমার মঠে থাকা হয়। মাকে বলায় বলিলেন, "আরে, এর সাধুর হাওয়া লেগেছে। আচ্ছা বেশ, মঠে থাকগে, ঠাকুরে ভক্তি হোক, আমি খুব আশীর্বাদ করছি।"

মঠ হইতে মাঝে মাঝে দুধ লইয়া যাইতাম এবং মাকে দেখিতে আসিতাম। এক সময় কিছুদিন না যাওয়ায়, মা একজনকে (তিনিও দুধ লইয়া যাইতেন) আমার কথা অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কই, সে—অনেক দিন আসে না কেন?"

ইহার পর একদিন দুধ লইয়া গিয়াছি। মাকে প্রণাম করিতে গিয়া দেখি, মা পাশের ঘরে পান সাজিতেছেন। কাছে নলিনী, সেও পান সাজিতেছিল। আমি যাওয়াতে নলিনী সরিয়া যাইতেছিল। মা তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "যেও না, যেও না, ও ছেলেমানুষ, তুমি এইখানেই বস" এবং আমাকে বলিলেন, 'বস'। কথায় কথায় মাকুর শ্বশুরবাড়ির কথা উঠিল। মা বলিলেন, "তাদের খুব আদর-যত্ন না করলে একটুতেই ফোঁস করে। তোমরা আমার ছেলে, তোমাদের আমি যা দিই, যা বলি, তাতে কিছু হয় না, ত্রুটি হলেও তোমরা কিছু মনে করবে না, কিন্তু তাদের ভাল জিনিস, ভাল সব না দিলে, একটু ত্রুটি হলে অমনি অসন্তুষ্ট হবে।" কিছুক্ষণ পরে আমি বলিলাম, "শুদ্ধ মন আর অনুরাগ কিসে হয়?"

মা—হবে, হবে; যখন ঠাকুরের শরণাগত হয়েছ, সব হবে। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করবে।

আমি—না, সে তুমি তাঁকে বলবে?

মা—আমি তো বলছি, ঠাকুর, আমার এর মনটি ভাল করে দাও, শুদ্ধ করে দাও।

আমি—হাঁ, তুমি বলবে, তাহলেই আমার হবে।

ইহার কয়েক মাস পরে ঘাটালে বন্যাক্লিষ্টদের সেবাকার্য হইতে তিনদিনের ছুটি লইয়া "জগদ্ধাত্রীপূজার সময় জয়রামবাটী যাই। মা তাহার কিছু পূর্বে দেশে আসিয়াছেন। আমার সঙ্গে অতুল। সে এইবার শ্রীশ্রীমাকে প্রথম দর্শন করে। আমরা কামারপুকুর হইয়া এবং রঘুবীরের প্রসাদ পাইয়া গিয়াছিলাম। যাইতেই আশু মহারাজ বলিলেন, "এসেছ, বেশ করেছ; মা কেবল বলছেন, 'ভক্তেরা কেউ এল না'; চল, প্রসাদ পেতে বস।" আমরা গিয়া

মাকে প্রণাম করিলাম। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা থেকে এলে?" বলিলাম, 'ঘাটাল থেকে'। মা বলিলেন, "বস, প্রসাদ পাও।" সকলে তখন প্রসাদ পাইতে বসিতেছেন। খাইবার সময় মা আমাদিগকে খুব করিয়া মাছ দেওয়াইলেন।

পরদিন সকাল আটটা-নয়টার সময় মায়ের উঠানে তরকারি কোটা হইতেছিল। কুসুম প্রভৃতি ভক্ত-মেয়েরা তরকারি কুটিতেছিলেন। ভানু পিসি নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। আমি বাড়ির মধ্যে গিয়া শুনিলাম, ভানু পিসি বলিতেছেন, "কুসুম দিদি তোমরা তো ভর্তি হয়ে আছ, তাই মুখে কথাটি নেই।" কুসুম বলিলেন, "কুসুম অত শত জানে না।" মা পাশ দিয়া যাইতেছিলেন, শুনিয়া বলিলেন, "ভর্তি হলে কি হবে? ভর্তি হলে তো উপচে পড়বে। স্বভাব বদলালে তো হয়।"

তার পরদিন সকালেই আমরা রওয়ানা হইব। ভোরে বাড়ির মধ্যে গিয়া দেখি মা ভিজা কাপড়ে উঠানে দাঁড়াইয়া আছেন। কাপড় ছাড়িলে মাকে প্রণাম করিয়া আমি বিদায় লইলাম। বলিলাম, 'আবার আসব'। অতুল স্কুলের ছেলের মতো বলিল, 'মনে রাখবেন'।

ঘাটালের সেবাকার্য শেষ করিয়া ১ পৌষ আমি পুনরায় জয়রামবাটী রওয়ানা হইলাম। অতুল বহুদূর অবধি সঙ্গে আসিয়া পথ দেখাইয়া দিয়া গেল। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে পৌঁছিয়া দেখি মা তাঁহার ঘরের বারান্দায় পা মেলিয়া হাঁটুতে (বাতের জন্য) ঔষধ দিতেছেন। আমি প্রণাম করিয়া বসিলাম এবং জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ আবার কি ওষুধ দিচ্ছ?" মা বলিলেন, "এ একজন বলেছিল এই পাতা বেঁটে দিতে। সমস্ত দিন খাওনি?" চেহারা দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন। আমি 'না' বলায় বলিলেন, "পথে মিষ্টি-টিষ্টি কিছু খেলে না কেন? রামজীবনপুরে দোকান আছে।"

উপেন মহারাজ ঘাটাল হইতে মঠে যাইবার খরচ বাবদ একটাকা দিয়াছিলেন। সেই টাকাটি মঠে ফিরিবার সময় প্রয়োজন হইবে ভাবিয়া ব্যয় করি নাই। কিন্তু মাকে আর এই কথা বলিলাম না। মা বলিলেন, "বস, আমি ভাত দিই, গরম ভাত হয়েছে।" আবার বলিতেছেন, "যার জগৎ সে দেখবে, তোমাদের ওসবে দরকার নেই।" (আমার খাওয়া হয় নাই দেখিয়া দুঃখ হইয়াছিল।) মা তাড়াতাড়ি ভাত, ডাল, তরকারি এবং আরও কি কি নিজেই আনিয়া দিলেন। খাওয়ার পর পান দিলেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা হইতেছে।

মা—তোমাকে দিয়ে ঠাকুর অনেক কাজ করিয়ে নেবেন। এই তো ঘাটালে তোমরা এসেছিলে, কত লোককে দিলে, কত লোকের উপকার হলো। কাজ শেষ হলে সময়ে আপনার ধন তিনি আপনার কোলে টেনে নেবেন।

আমি—কেন ঠাকুরের দেখা পাই না?

মা—পাবে, পাবে, সময় হলেই পাবে। ললিত (চাটুয্যে) আমায় এমন কথা কখনও

বলত না, 'কেন ঠাকুরের দেখা পাই না?' তার ভাব—তিনি আপনার জন, যখন হোক, দেখা পাবই।

আমি—মা, দেখো আমার যাতে ভাল হয়। যেন শুদ্ধা ভক্তি হয়।

মা—হবে, হবে। শুদ্ধা ভক্তি হবে।

একখানি কম্বল দিয়া বলিলেন, "এই কম্বল নাও, রাত্রে গায়ে দেবার জন্য।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কার কম্বল?" মা বলিলেন, "আমারই, আমি ব্যবহার করি।"

৩ পৌষ, জয়রামবাটী

মা তাঁহার ঘরের বারান্দায় দ্বারের সম্মুখে বসিয়া পান সাজিতেছিলেন। বেলা প্রায় নয়টা। আমাকে মুড়ি খাইতে দিয়াছেন। খাইবার পর কথা হইতেছে।

আমি—মা, এবার আমাকে বেশি দিন রেখো না।

মা—থাকতে ইচ্ছা না হয় আমার সঙ্গে যাবে। সময় হলে (দেহান্তে) সকলে (সব ভক্তরা) যাবে।

আমি—ঠিক মনে যেন থাকে।

মা— সে তো বললুম, তোমাকে এসে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

আমি—এবার আমাকে নিয়ে যাও, পববারে ঠাকুব যখন আসবেন তখন সঙ্গে আসব।

মা হাসিয়া বলিলেন, "আমি তো আর আসছি না।"

আমি—তুমি আস আর না আস, আমি আসব, আমার আসতে ইচ্ছা আছে।

মা—তুমি তখন হয়তো আর আসতে চাইবে না। এ জগতে কি আর আছে? কোন্ জিনিসটা ভাল, বল না? তাই ঠাকুর সজনে খাড়া (ডাঁটা), পলতা শাক, এই সব ছাড়া আর কিছু খেলেন না। মুখে সন্দেশ দিতে যেতুম, বলতেন "ওতে কি আর আছে? সন্দেশও যা, মাটিও তা।"

আমি—তা তুমি ঠাকুরের কথা কেন বলছ? তার কি তুলনা?

মা—তাই তো, অমন আর একটি কি আর আছে? থাকলে তো হতো।

এই সময় বরদা মামা মাকে চিঠি পড়িয়া শুনাইতে আসিলেন। এই চিঠির মধ্যে আমার সেজ ভাই-এর এক চিঠি ছিল। তাহাতে আমাকে বাড়ি পাঠাইতে মাকে অনুরোধ করিয়াছেন। চিঠিখানি সংক্ষিপ্ত হইলেও ভাষা ও ভাব বেশ ছিল। শুনিয়া মা বলিলেন, "আহা, কেমন লিখেছে!" আমাকে বলিতেছেন, "কেন, সংসারে থাকবে, ঘরকন্না করবে, টাকা করবে!" আমাকে পরীক্ষা করিতেছিলেন। আমি বলিলাম, "মা, ওগুলো আর বলো না।"

মা—তা এত লোক সংসার করছে, তুমি নয় না করলে।

আমি তখন কাঁদিতেছি। দেখিয়াই সকরুণ হইয়া বলিতে লাগিলেন, "কেঁদো না, কেঁদো

না, বাছা, তোমরাই ভগবান। ভগবানের জন্য কে সব ত্যাগ করতে পেরেছে! ঈশ্বরের শরণাগত হলে বিধির বিধি খণ্ডন হয়ে যায়। তাঁর নিজের কলম নিজ হাতে কাটতে হয়। ভগবান লাভ হলে কি আর হয়? দুটো কি শিং রেবোয়? না, সদসৎ-বিচার আসে, জ্ঞানচৈতন্য হয়, জন্মমৃত্যু তরে যায়। ভাবে লাভ—এ ছাড়া কে ভগবান দেখেছে, কার সঙ্গে ভগবান কথা কয়েছেন? ভাবে দর্শন, ভাবে কথাবার্তা, সব ভাবে হয়।"

আমি—না, মা, এছাড়াও কিছু আছে—প্রত্যক্ষ লাভ।

মা—সে এক নরেন পেয়েছিল; তাঁর (ঠাকুরের) হাতে মুক্তির চাবি ছিল।

"আর কি, জপ ধ্যান করা, আর ঠাকুরকে ডাকা, এই তো?" বলিয়াই আবার সহাস্যে বলিতেছেন, "আর 'ঠাকুর,ঠাকুরে'ই বা আছে কি? তিনি তো চিরদিনই আপন জন।"

আমি—মা, দেখো যেন আমার ঠিক ঠিক হয়। অমনটি, 'আপনার'।

মা—তা কি আর বারবার বলতে আছে? (দৃঢ়তার সহিত) হবে, হবে।

৪ পৌষ, জয়রামবাটী

রাত্রে মায়ের ঘরে কথা হইতেছে। মা তক্তপোশে শুইয়া আছেন। বেদান্তের কথা উঠিয়াছে। আমি বলিলাম, "নামরূপ ছাড়া আর কিছুই নেই। জড় পদার্থ বলে কিছুই প্রমাণ করা যায় না। তাই শেষে বলে, ঈশ্বর-টীশ্বর কিছুই নেই।" (আমার মনের ভাব—ঠাকুর, মা, এসবও মিথ্যা।)

মা শুনিয়াই আমার কথার ভাব বুঝিতে পারিয়াছেন। অমনি বলিতেছেন, "নরেন বলেছিল, 'মা, যে জ্ঞানে গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দেয় সে তো অজ্ঞান। গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দিলে জ্ঞান দাঁড়ায় কোথায়?' তুমি জ্ঞানচচ্চড়ি ছেড়ে দাও। তাঁকে কে জানতে পেরেছে? শুক, ব্যাস, শিব হদ্দ ডেও পিঁপড়ে।"

আমি—না, জানবার ইচ্ছা আছে, কিছু কিছু বুঝতেও পারি। কি করে বিচার বন্ধ হবে?

মা—ঠিক ঠিক পূর্ণজ্ঞান না হলে বিচার যায় না।

আবার সৃষ্টির কথা উঠিল।

আমি—আচ্ছা, এই যে সব অসংখ্য প্রাণী—ছোট, বড়, সব কি এক সময়ে সৃষ্টি হয়েছে না কি?

মা—চিত্রকর যেমন তুলি দিয়ে চোখটি, মুখটি, নাকটি—এমনি একটু একটু করে পুতুলটি তয়ের করে, ভগবান কি অমনি একটি একটি করে সৃষ্টি করেছেন? না, তাঁর একটা শক্তি আছে। তাঁর 'হাঁ'তে জগতের সব হচ্ছে, 'না'তে লোপ পাচ্ছে। যা হয়েছে সব এককালে হয়েছে। একটি একটি করে হয়নি।

মায়ের ঘরে ডেও পিঁপড়ে খাবারের গন্ধে আশেপাশে ঘুরিতেছিল। হঠাৎ তাহার একটি চক্ষে পড়ায় অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া বলিলাম, "তবে এই পিঁপড়েটা এত পাছে পড়ল কেন?

ওর তো মানুষ হতেই অনেক দেরি।" মা বলিলেন, "হাঁ, অনেক দেরি।" পরে এই সৃষ্টি-প্রসঙ্গেই বলিলেন, "কল্পান্তে সব যেন ঘুম থেকে ওঠে।"

ইহার পরে আমি জপতপের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। মা বলিলেন, "জপতপের দ্বারা কর্মপাশ কেটে যায়। কিন্তু ভগবানকে প্রেমভক্তি ছাড়া পাওয়া যায় না। জপ-টপ কি জান? ওর দ্বারা ইন্দ্রিয়-টিন্দ্রিয়গুলোর প্রভাব কেটে যায়।"

ললিতবাবুর (চাটুজ্যে) কথা উঠিল। কয়েক মাস যাবৎ তাঁহার খুব ব্যারাম, সঙ্কটাপন্ন অবস্থা। মা তাঁহাকে খুব ভালবাসেন এবং তাঁহার জন্য বিশেষ চিন্তিত আছেন। বলিতেছেন, "ললিত আমাকে কত টাকা দিত। তার গাড়িতে করে বেড়াতে নিয়ে যেত। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সেবায় ও (কামারপুকুরে) রঘুবীরের সেবায় অনেক টাকা দেয়। আমার ললিতের লাখ টাকার প্রাণ। অনেকে টাকা থেকেও কৃপণ।" পরে বলিলেন, "যার আছে সে মাপো, যার নেই সে জপো।" (যার অর্থাদি আছে সে ভক্ত-ভগবানের সেবা করুক। আর যার নেই সে ভগবানের নামজপ করুক। এই উভয় উপায়েই ভগবানের কৃপা লাভ করা যায়।)

আবার কথায় কথায় প্রেমভক্তির কথা উঠিল।

মা—বৃন্দাবনে রাখালরা কি কৃষ্ণকে জপধ্যান করে পেয়েছিল? না, তারা 'আয় রে, খা রে, নে রে'—এই করে কৃষ্ণকে পেয়েছিল।

আমি—তাঁর ভালবাসা না পেলে তাঁর জন্য প্রাণ কেন ব্যাকুল হবে?

মা—তাই তো, সেটি তাঁর কৃপা।

১৫ পৌষ, জয়রামবাটী

সকালে আটটা-নয়টার সময় আমি গিয়া দেখি মা ঘরে বসিয়া পান সাজিতেছেন। আমি কাছে বসিয়া কথা কহিতে লাগিলাম।

আমি—মা, এত দেখি শুনি, তবু আপনার মা বলে জানতে পারলাম না।

মা—বাবা, আপনার না হলে এত আসবে কেন? যে যার সে তার, যুগে যুগে অবতার। আপন মা, সময়ে চিনবে।

কিছুক্ষণ পরে আমি আমার মা-বাপ ও ভাইদের কথায় বলিলাম, "বাপ-মা মানুষ করেছেন, এখন (দেহান্তে) তাঁরা কোথায় কি ভাবে আছেন জানি না। মা, ভাইদের যাতে সুমতি হয়, তাই আশীর্বাদ কর।" মা বলিলেন, "সবাই কি তাঁকে চায়? এই বাড়িতেই এত লোক আছে, সবাই কি (আমাকে) চায়?" একটু পরে আমাকে বলিতেছেন, "বিয়ে করো না, সংসার করো না। বিয়ে না করলে আর কি? যেখানে থাক সেইখানেই স্বাধীন। বিয়ে করাই হচ্ছে মহাপাপ।"

আমি—মা, আমার ভয় হয়।

মা—না, কোন ভয় নেই, ঠাকুরের ইচ্ছা।

আমি—মন নিয়ে কথা। মন ভাল থাকলে যেখানেই থাকি না কেন। মা, তুমি দেখো, আমার মন যেন ভাল থাকে।

মা—তাই হবে।

১৮ পৌষ

আজ মায়ের জন্মতিথি। প্রবোধবাবু কয়েকদিন হইল আসিয়াছেন। গতকল্য তিনি মায়ের জন্মতিথি উপলক্ষে ঠাকুরকে ভোগ দিবার জন্য মামাদের পাঁচটি টাকা দিয়াছেন। মা আমাকে বলিলেন, "তোমরা তো আর বিশেষ কিছু করছ না। আমি একখানা নতুন কাপড় পরব, ঠাকুরকে একটু মিষ্টান্নাদি করে ভোগ দেওয়া হবে, আমি প্রসাদ পাব। এই আর কি?"

পূজার পর মা তাঁহার ঘরে চৌকির উপর দক্ষিণ পাশে দুয়ারের নিকট পা ঝুলাইয়া বসিয়াছেন। একখানি নতুন কাপড় পরিয়াছেন। প্রবোধবাবু গিয়া মায়ের পায়ে ফুল দিলেন। আমি দুয়ারের পাশে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছি। মা আমাকে বলিলেন, "কই, তুমি দেবে না? নাও, এই ফুল নাও।" আমি ফুল লইয়া পায়ে দিলাম। মধ্যাহ্নে খুব প্রসাদ পাওয়া গেল। প্রবোধবাবুর অফিস, তাই তিনি কলিকাতা রওনা হইলেন। আমার আমাশয় হওয়াতে যাওয়া হইল না।

২১ পৌষ

কথাপ্রসঙ্গে মা বলিলেন—"ভগবানকে কে বাঁধতে পেরেছে বল না। তিনি নিজে ধরা দিয়েছিলেন বলে তো যশোদা তাঁকে বাঁধতে পেরেছিল, গোপগোপীরা তাঁকে পেয়েছিল।

"বাসনা থাকতে জীবের যাতায়াত ফুরায় না, বাসনাতেই দেহ হতে দেহান্তর হয়। একটু সন্দেশ খাবার বাসনা থাকলেও পুনর্জন্ম হয়। তাই তো মঠে এত জিনিস আসে। বাসনাটি সূক্ষ্ম বীজ—যেমন বিন্দুপরিমাণ বটবীজ হতে কালে প্রকাণ্ড বৃক্ষ হয়, তেমনই। বাসনা থাকলে পুনর্জন্ম হবেই, যেন এক খোল থেকে নিয়ে আর এক খোলে ঢুকিয়ে দিলে। একেবারে বাসনাশূন্য হয় দু-একটি। তবে বাসনায় দেহান্তর হলেও পূর্বজন্মের সুকৃতি থাকলে চৈতন্য একেবারে হারায় না।

"বৃন্দাবনের গোবিন্দের এক কামদার (পূজারী) ঠাকুরের ভোগ নিয়ে তার উপপত্নীকে খাওয়াত। এই পাপে দেহান্তে তার প্রেতযোনি হয়। কিন্তু সে ঠাকুরের সেবা করেছিল, এই সুকৃতির ফলে একদিন সে সশরীরে সকলকে দেখা দেয়। সুকৃতিটুকু ছিল বলে দেখা দিতে পারল এবং সবাইকে তার অধোগতির কারণ বললে। তাদের বললে, তোমরা আমার উদ্ধারের জন্য ঠাকুরের মহোৎসব-কীর্তনাদি কর। তাহলেই আমার উদ্ধার হবে।"

আমি—মহোৎসব-কীর্তনে কি উদ্ধার হয় ?

মা—হাঁ, বৈষ্ণবদের ওতেই হয়। তাদের শ্রাদ্ধাদি করে না।

"যখন পুরীতে জগন্নাথদর্শন করি, এত লোকে জগন্নাথদর্শন করছে দেখে আনন্দে কাঁদলুম, ভাবলুম—আহা, বেশ, এত লোক মুক্ত হবে! শেষে দেখি যে না, যারা বাসনাশূন্য সেই এক-আধটিই মুক্ত হবে। যোগেনকে বলায় সেও তাই বললে, 'না মা,যারা বাসনাশূন্য তারাই মুক্ত হবে'।"*

একদিন সকালবেলা মায়ের বারান্দায় মুড়ি খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, মঠে থাকলে কি সন্ন্যাস নিতে হবে ?" মা বললেন, 'তা হবে'।

আমি—মা, বড় অভিমান আসে সন্ন্যাসে।

মা—হাঁ, বড় অভিমান—আমায় প্রণাম করলে না, মান্য করলে না, হেন করলে না! তার চেয়ে বরং (নিজের সাদা কাপড় লক্ষ্য করিয়া) এই আছি বেশ (অর্থাৎ অন্তরে ত্যাগ)। বৃন্দাবনে গৌর শিরোমণি † বুড়ো বয়সে সন্ন্যাস নিলেন, যখন ইন্দ্রিয়-টিন্দ্রিয়গুলোর প্রভাব কমে গেছে। রূপের অভিমান, গুণের অভিমান, বিদ্যার অভিমান, সাধুর অভিমান কি যায়, বাছা।

আমাকে ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিতেছেন, "বাড়ি গিয়ে ওদের (ভাইদের) একবার বলে আসবে 'চাকরি-বাকরি আমি করতে পারব না। মা তো নেই যে দাসত্ব করব। আমি ওসব পারব না। তোমরা ঘরকন্না কর, বেশ থাক'।"

সাধুজীবনের খাওয়া-দাওয়ার কঠোরতার কথা উঠিল। মা বলিলেন, "মঠে ছেলেরা সব কষ্ট করছে—না খাওয়া, না দাওয়া, না কিছু। ওসব আমার ভাল লাগে না। যোগীনের (যোগানন্দ স্বামী) কঠোর করে করে শেষটা অত ভুগে ভুগে দেহ গেল।"

রাত্রে মায়ের সঙ্গে কথা হইতেছে। আমি বলিলাম, "মা, ভগবানের কৃপা হলে যখন তখন হয়, সময়ের অপেক্ষা রাখে না।" উত্তরে মা বলিলেন, "তা বটে। কিন্তু জ্যৈষ্ঠ মাসে যে আমটি হয় তা যেমন মিষ্টি, অন্য মাসে কি তেমনটি হয় ? মানুষ অকালে ফলাবার চেষ্টা করছে। দেখ না এখন আশ্বিন মাসে কাঁঠাল হয়, আম হয়। কিন্তু কালের মতো কি (মিষ্টি) হয় ? ঈশ্বরলাভের পথেও অমনি। এজন্মে হয়তো জপতপ করলে, পরজন্মে হয়তো ভাব একটু ঘনীভূত হলো, তার পর জন্মে হয়তো আর একটু হলো—এই ভাবে আর কি।"

* যোগেন মা বলেন, "একদিন জগন্নাথের মন্দিরের ভিতর লক্ষ্মীর মন্দিরে মা ও আমি পাশাপাশি বসে ধ্যান করছি। আমি মনে মনে ভাবছি, আহা এত সব লোক রথে জগন্নাথ দেখছে, সব তো মুক্ত হবে। তখন শুনি কে যেন বলছে, 'না, যারা বাসনাশূন্য, তারাই মুক্ত হবে।' আমি মাকে যখন এই কথা বললুম, মা বললেন, 'ও যোগেন, আমার মনেও তখন এই চিন্তা উঠেছিল, আর আমিও এই উত্তর শুনতে পেলুম'।"

† একজন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব সাধু। ইনি কালাবাবুর কুঞ্জে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করেন।

হঠাৎ কিছু করিয়া দেওয়া সম্বন্ধে বলিলেন, "ভগবান বালকস্বভাব। কেউ চায় না, তাকে দেবে ; কেউ চায়, তাকে দেবে না—সব খেয়াল।"

আর একদিন সকালবেলা মা বারান্দায় পান সাজিতেছেন। আমি বলিলাম, "কালে তোমার জন্য লোকে কত সাধন করবে।"

মা হাসিয়া বলিলেন, "বল কি ! সকলে বলবে আমার মায়ের এমনি বাত ছিল, এমনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটত।"

আমি—তা তুমি বলগে।

মা—উটি ভাল। তাই তো ঠাকুর বলতেন—তখন কাশীপুরে ব্যারাম—"যারা লাভের আশায় এসেছিল, তারা সব চলে গেল, বললে, 'উনি অবতার, ওঁর আবার ব্যারাম কি ? ও সব মায়া!' কিন্তু যারা আমার আপনার জন তাদের আমার এ কষ্ট দেখে বুক ফেটে যাচ্ছে।" আমার জ্বর হয়েছে, বিকারে প্রলাপ বকছি। কুসুম গিয়ে বললে, "গোলাপ দিদি, দেখ এসে, মা প্রলাপ বকছেন।" গোলাপ বললে, "মা ওরকম বলে থাকেন।" "না, দেখ এসে, সত্য সত্যই।" "না, ও কিছু না।" শেষে কুসুম গিয়ে আশুকে ডাকলে। সকলে এসে দেখে সত্যই বিকার।

মন্ত্র লইবার পূর্বদিন গিয়া মাকে বলিলাম, "মা, আমি মন্ত্র নেব।" মা বলিলেন, "তুমি মন্ত্র নাওনি এখনও ?" আমি 'না' বলায় বলিলেন, "আমি ভেবেছিলুম তুমি বুঝি মন্ত্র নিয়েছ।" দীক্ষার পর বলিলেন, "ভগবানের মন্ত্রজপ করে দেহ-মন শুদ্ধ হোক।"

আমি—আঙুলে মন্ত্রজপ করবার কি দরকার ? এমনি জপ করলেই তো হয়।

মা—ভগবান আঙুল দিয়েছেন, মন্ত্রজপ করে এর সার্থকতা করবে।

২৫-৯-১০, উদ্বোধন, ঠাকুরঘর

সকালবেলা মায়ের সহিত কথা হইতেছে।

আমি—মা, যদি ঈশ্বর বলে কেউ থাকেন তবে জগতে এত দুঃখকষ্ট কেন ? তিনি কি দেখছেন না ? তাঁব কি এসব দূর করবাব শক্তি নেই ?

মা—সৃষ্টিই সুখদুঃখময়। দুঃখ না থাকলে সুখ কি বোঝা যায় ? আর সকলের সুখ হওয়া সম্ভব কি করে ? সীতা বলেছিলেন রামকে, 'তুমি সকলের দুঃখকষ্ট দূর করে দাও না কেন ? রাজ্যে যত প্রজা লোকজন আছে সকলকে সুখে রাখ। তুমি তো ইচ্ছা করলেই পার।' রাম বললেন, 'সকলের সুখ একসঙ্গে কি হয় ?'

'না, তুমি ইচ্ছা করলেই হয়, যার যা অভাব হয় রাজভাণ্ডার হতে দিয়ে দাও।'

'আচ্ছা, তোমার কথামতই হবে।'

"তখন লক্ষ্মণকে ডাকিয়া বলিলেন, 'যাও, রাজ্যমধ্যে সকলকে জানাও, যার যা অভাব থাকে চাইলেই রাজকোষ হতে পাবে।' সকলে সংবাদ পেয়ে এসে দুঃখ জানালে।

রাজকোষ অবারিত। বেশ সকলে সুখে দিন কাটাতে লাগল। রামের এমনি মায়া যে শীঘ্র যে দালানে রাম-সীতা থাকতেন তার ছাদ ফেটে জল পড়তে আরম্ভ হলো। মেরামতির চেষ্টায় লোকজন ডাকতে পাঠালেন। কোথায় লোকজন ? কুলি-মজুর কি আর আছে ? রাজ্যমধ্যে কুলি-মজুরের অভাবে প্রজাদের ঘরদরজা, কাজকর্ম সব নষ্ট হতে চলেছে—প্রজারা জানালে। তখন নিরুপায় হয়ে সীতা রামকে বললেন, 'আর ভিজে ভিজে কষ্ট সহ্য হয় না ; যেমনটি ছিল তুমি তেমনটি করে দাও, তাহলে কুলি-মজুর সব মিলবে। সকলের একসঙ্গে সুখ হওয়া সম্ভব নয়।' রাম বললেন, 'তথাস্তু'। তখন দেখতে দেখতে সব পূর্বের মতো হলো। কুলি-মজুর মিস্ত্রী সব মিলল। সীতা বললেন, 'ঠাকুর, এ সৃষ্টি তোমারই অদ্ভুত খেলা !'

"চিরদিন কেউ সুখী থাকবে না, সব জন্ম কারও দুঃখে যাবে না। যেমন কর্ম তেমন ফল, তেমন যোগাযোগ হয়।"

আমি—সবই কর্ম থেকে হয় ?

মা—কর্ম না তো কি ? দেখছ না, এই যে মেথর বিষ্ঠার ভার বইছে !

আমি—এ ভালমন্দ কর্মপ্রবৃত্তি প্রথম কোথা থেকে আসে ? এ জন্মে বলবে তার পূর্বজন্ম থেকে, সে জন্মে আবার তার পূর্বজন্ম থেকে ; আদি কোথা ?

মা—ঈশ্বরেচ্ছা ছাড়া কিছুই হবার সাধ্য নেই, তৃণটিও নড়ে না। যখন জীবের সুসময় আসে, তখন ধ্যানচিন্তা আসে ; কুসময়ে কুপ্রবৃত্তি কুযোগাযোগ হয়। তাঁর যেমন ইচ্ছা তেমনি কালে সব আসে, তিনিই তার ভেতর দিয়ে কার্য করেন। নরেনের কি সাধ্য ? তিনি তার ভেতর দিয়ে সব করলেন বলে তো নরেন সব করতে পেরেছিল ?

"ঠাকুর যেটি করবেন তাঁর তা ঠিক করা আছে। তবে ঠিক ঠিক যদি কেউ ওঁর উপব ভার দেয়, উনি তা ঠিক কবে দেবেন।"

"সব সয়ে যেতে হয। কারণ কর্মানুসারে সব যোগাযোগ হয়। আবার কর্মের দ্বারা কর্মের খণ্ডন হয়।"

আমি—কর্মের দ্বারা কর্মের খণ্ডন হয় ?

মা—তা হবে না ? তুমি একটি সৎকার্য করলে, তাতে তোমার পাপটুকু কেটে গেল। ধ্যান, জপ ঈশ্বরচিন্তায় পাপ কাটে।

মির্জাপুব স্ট্রীটে একটি ছেলের উপর নাকি মৃতাত্মাদের আবেশ হয়। 'উদ্বোধনের' কেহ কেহ পূর্বদিন উহা দেখিতে গিয়াছিলেন। সেই কথা উঠিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, প্রেতদেহে কতদিন থাকতে হয় ?"

মা—উন্নত পুরুষ ছাড়া আর সকলকে একবছর প্রেতযোনিতে থাকতে হয়। তারপর গয়ায় পিণ্ডদান, মহোৎসব—তাদের উদ্দেশ্যে এ সব করলে প্রেতযোনি মুক্ত হয়ে ভগবানের কাছে যায়। অথবা অন্যান্য লোকে গিয়ে সুখটুকু ভোগ করে। আবার কালে

বাসনা অনুসারে জন্ম হয়। কারও বা সেখান থেকেই মুক্তি হয়। তবে ইহজন্মের কিছু সুকৃতি থাকলে প্রেতদেহেও চৈতন্য একেবারে হারায় না।

মা বৃন্দাবনের সেই বৈষ্ণব ভূতের (গোবিন্দজীর পূজারীর) কথা বলিলেন।

আমি—গয়ায় পিণ্ড দিলেই কি ভগবানের কাছে যায়?

মা—হাঁ যায়।*

আমি—তবে আর ভজন-সাধনের কি দরকার?

মা—তাঁর কাছ থেকে যে আবার বাসনা কর্মানুসারে পৃথিবীতে এসে জন্মায়। এখান থেকে কেউ বা মুক্তিলাভ করে, কেউ বা নীচ যোনি সব ভোগ করে। চক্রের মতো সৃষ্টি চলছে। যে জন্মে মন বাসনাশূন্য হয়, সেইটি শেষ জন্ম।

আমি—এই যে ভগবানের কাছে যায় বললে, কেউ কি এসে নিযে যায়, না আপনিই যায়?

মা—না, আপনিই যায়, সূক্ষ্ম শরীর হাওয়ার শরীর কিনা?

আমি—যাদের গয়ায় পিণ্ডাদি না হয়, তাদের কি গতি হয়?

মা—যতদিন না বংশে কোন ভাগ্যবান জন্মে গয়ায় পিণ্ড দেয়, কি ঔর্ধ্বদেহিক ক্রিয়াদি করে, ততকাল প্রেতদেহে থাকতে হয়।

আমি—এই যে ভূত প্রেত, এসব কি শিবের চেলা ভূত? না যারা মরে গেছে তারা।

মা—না, মৃত যারা তারা; শিবের চেলা ভূত, সে সব আছে আলাদা।

"ভারী সাবধানে চলতে হয়। প্রত্যেক কর্মের ফল ফলে। কাউকে কষ্ট দেওয়া, কটু বলা ভাল নয়।"

আমি—মা, নিমগাছেও আম ফলে না, আর আম গাছেও নিম ফলে না। যার যেমনটি হবার, তার তেমনটি হয়।

মা—ঠিক বলেছ, বাবা, কালে ঈশ্বর-টীশ্বর কিছু থাকে না। জ্ঞান হলে মানুষ দেখে ঠাকুর-ঠুকুর সবই মায়া—কালে আসছে, যাচ্ছে।

* এই প্রসঙ্গে আমার একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। ১৯১২ সালে মা যখন কাশীতে যান ফিরিবার সময় আমি গয়ায় পিতৃপুরুষদের পিণ্ড দিবার জন্য তাঁহার দুই-এক দিন পূর্বে রওনা হই। যাত্রা করিবার সময় মাকে বলিয়াছিলাম, "দেখো যেন তাদের সদগতি হয়।" আমি যেদিন গয়ায় পিণ্ড দিই, সেদিন রাত্রে ভূদেব (মায়ের ভাইপো, সঙ্গে কাশী গিয়াছিল) স্বপ্ন দেখে যে মা পঞ্চপাত্র লইয়া জপ করিতে বসিয়াছেন আর অনেক লোক আসিয়া বলিতেছে, "আমাকে উদ্ধার করুন, আমাকে উদ্ধার করুন।" মা তাহাদের গায়ে শান্তিজল (পঞ্চপাত্র হইতে) ছিটাইয়া দিতেছেন আর বলিতেছেন, "যা উদ্ধার হয়ে যা।" তাহারা সকলে আনন্দে চলিয়া যাইতেছে। শেষে একটা লোক আসিয়াছে। মা বলিলেন, "আমি আর পারব না।" অনেক মিনতি করাতে তাহাকেও কৃপা করিলেন। পরদিন ভূদেব মায়ের কাছে এই স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিয়াছিল। মা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "এই বা—গয়ায় পিণ্ড দিতে গেছে, তাই এত লোক উদ্ধার হয়েছে।" বাস্তবিকই, গয়ায় পিতৃপুরুষদের পিণ্ড দিবার পর মনের আবেগে যাঁহার নাম মনে পড়িয়াছে, তাঁহারই নামে পিণ্ড দিয়াছিলাম—সকলেই উদ্ধার হউক

উদ্বোধন—ঠাকুর ঘর

সকালবেলা মায়ের সঙ্গে কথা হইতেছে।

মা—যখন ঠাকুর চলে গেলেন, একা একা বসে ভাবতুম—তখন কামারপুকুরে রয়েছি—ছেলে নেই, কিছু নেই, কি হবে ? একদিন ঠাকুর দেখা দিয়ে বললেন, "ভাবছ কেন ? তুমি একটি ছেলে চাচ্ছ—আমি তোমাকে এই সব রত্ন ছেলে দিয়ে গেলুম। কালে কত লোকে তোমাকে 'মা, মা' বলে ডাকবে।"

"বৃন্দাবন যখন যাই, পথে রেলে যেতে যেতে দেখি কি ঠাকুর জানলা (রেলগাড়ির) দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলছেন, 'কবচটি যে সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে, দেখো যেন না হারায়'।"

"তাঁর ইষ্টকবচটি আমার হাতে ছিল। আমি পূজা করতুম। তারপর উটি মঠে দিলুম। এখন মঠে পূজা হয়।"

আমি—ও কবচটি এবার ঠাকুরের তিথিপূজার দিন হারিয়েছিল। ফুল বেলপাতার সঙ্গে গঙ্গায় ফেলে দেয়। কারও খেয়াল ছিল না। ভাটায় গঙ্গার জল কমে গেলে রামবাবুর ছেলে ঋষি ওখানে খেলতে খেলতে গিয়ে ওটি পেয়ে কুড়িয়ে নিয়ে আসে।

মা—তাঁর ইষ্টকবচ, সাবধানে রাখতে হয়।

বেলুড় মঠের কথা উঠিল।

মা—আমি কিন্তু বরাবরই দেখতুম, ঠাকুর যেন গঙ্গার ওপার ঐ জায়গাটিতে—যেখানে এখন মঠ, কলাবাগান-টাগান—তার মধ্যে ঘর, সেখানে বাস করছেন। (তখন মঠ হয় নাই।) মঠের নতুন জমি কেনা হলে পর নরেন একদিন আমাকে নিয়ে জমির চতুঃসীমা ঘুরে ঘুরে দেখালে, বললে, 'মা, তুমি আপনার জায়গায় আপন মনে হাঁপ ছেড়ে বেড়াও।'

"বোধগয়ায় মঠ, তাদের অত সব জিনিসপত্র, কোন অর্থের অভাব নেই, কষ্ট নেই—দেখে কাঁদতুম, আর ঠাকুরকে বলতুম, 'ঠাকুর, আমার ছেলেরা থাকতে পায় না, খেতে পায় না, দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের যদি অমন একটি থাকবার জায়গা হতো!' তা ঠাকুরের ইচ্ছায় মঠটি হলো।"

"একদিন নরেন এসে বললে, 'মা, এই ১০৮ বিল্বপত্র ঠাকুরকে আহুতি দিয়ে এলুম, যাতে মঠের জমি হয়। তা কর্ম কখনো বিফলে যাবে না। ও হবেই একদিন'।"

রাত্রে খাইবার পর উপরে পান আনিতে গিয়া শুনি, মা বলিতেছেন, "নরেন বলছিল, 'মা, আমার আজকাল সব উড়ে যাচ্ছে। সব দেখছি উড়ে যায়।' আমি বললুম (হাসিয়া বলিতেছেন), 'দেখো দেখো, আমাকে কিন্তু উড়িয়ে দিও না!' নরেন বললে, 'মা, তোমাকে উড়িয়ে দিলে থাকি কোথায়? যে জ্ঞানে গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দেয় সে তো অজ্ঞান। গুরুপাদপদ্ম উড়িয়ে দিলে জ্ঞান দাঁড়ায় কোথায়' ?"

ইহা বলিয়াই আবার বলিতেছেন, "জ্ঞান হলে ঈশ্বর-টীশ্বর সব উড়ে যায়। 'মা, মা' শেষে দেখে, মা আমার জগৎ জুড়ে! সব এক হয়ে দাঁড়ায়। এই তো সোজা কথাটা!"

উদ্বোধন, ঠাকুরঘর

মা পূজার জন্য ফুল বেলপাতা বাছিতেছিলেন। তাঁর একখানি ফটো নতুন ছাপা হইয়া আসিয়াছে, তাহাই মাকে দেখাইতেছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা এ ফটো কি ঠিক?"

মা—হাঁ, এটি ঠিক। তবে পূর্বে আরও মোটা ছিলুম। যখন ছবি উঠায় তখন যোগীনের (যোগানন্দ স্বামীর) খুব অসুখ। তার জন্য ভেবে ভেবে শরীর শুকিয়ে গিছল। মন ভাল নয়, যোগীনের অসুখ বাড়ছে তো, কাঁদছি, আবার যোগীন ভাল থাকছে তো ভাল থাকছি। সারা মেম (Sara Bull) এসে এইটি উঠালে। আমি কিছুতেই দেব না। সে অনেক করে বললে, 'মা, আমি আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে পূজা করব।' তাই শেষে এই ছবি উঠায়।

আমি—মা, তোমার কাছে এই যে ঠাকুরের ফটো রয়েছে এখানি বেশ। দেখলে বুঝা যায়। আচ্ছা, এখানি কি ঠিক?

মা—এটি খুব ঠিক ঠিক। ওখানি এক ব্রাহ্মণের ছিল। প্রথম কখানি যেমন উঠানো হয়। একখানি সে ব্রাহ্মণটি নিয়েছিল। আগে এখানি খুব কাল (deep) ছিল—ঠিক যেন কালীমূর্তিটি, তাই ঐ ব্রাহ্মণকে দিয়েছিল। সে ব্রাহ্মণ দক্ষিণেশ্বর থেকে কোথায় যাবার সময় ওখানি আমার কাছে রেখে যায়। আমি ওখানি অন্যান্য ঠাকুর-দেবতার ছবির সঙ্গে রেখে দিয়েছিলুম—পূজা করতুম। নহবতের নিচের ঘরে থাকতুম। একদিন ঠাকুর গিয়েছেন। ছবি দেখে বলছেন, 'ওগো, তোমাদের আবার এসব কি?' আমরা (বোধ হয় মা ও লক্ষ্মী দিদি) ও পাশে সিঁড়ির নিচে রাঁধছি। তারপর দেখলুম, বিল্বপত্র আর কি কি যা পূজার জন্য ছিল, একবার না দুবার ঐ ছবিতে দিলেন—পূজা করলেন। সেই ছবিই এই। সে ব্রাহ্মণ আর ফিরে এল না। এখানি আমারই রইল।

আমি—মা, ঠাকুরের সমাধি-অবস্থায় ঠাকুরের মুখ কখনো ম্লান দেখেছ কি?

মা—কই, আমি তো কখনো দেখিনি। সমাধির অবস্থায় মুখে হাসিই দেখেছি।

আমি—ভাবসমাধিতে মুখে হাসি থাকতে পারে। কিন্তু বসা ছবির সম্বন্ধে ঠাকুরও বলেছেন, 'এ অতি উচ্চ অবস্থার ছবি'। এতেও কি হাসি থাকে?

মা—আমি তো সব সমাধির অবস্থায়ই হাসিমুখ দেখেছি।

আমি—রং কি রকম ছিল?

মা—তাঁর গায়ের রং যেন হরিতালের মতো ছিল—সোনার ইষ্ট-কবচের সঙ্গে গায়ের রং মিশে যেত। যখন তেল মাখিয়ে দিতুম, দেখতুম সব গা থেকে যেন জ্যোতিঃ বেরুচ্ছে। কালীবাড়িতে দক্ষিণেশ্বরের একজনদের জামাই এসেছিল—খুব গৌরবর্ণ। ঠাকুর আমায়

বলছেন, 'আমরা দুজনে পাশাপাশি পঞ্চবটীতে বেড়াব, তুমি দেখবে কার রং ফরসা।' তাঁরা বেড়াতে লাগলেন, দেখলুম ঠাকুরের চেয়ে তার রং একটু ফরসা—উনিশ-বিশ হবে।

"যখনই কালীবাড়িতে বার হতেন, সব লোক দাঁড়িয়ে দেখত, বলত 'ঐ তিনি যাচ্ছেন।' বেশ মোটাসোটা ছিলেন। মথুরবাবু একখানা বড় পিঁড়ে দিয়েছিলেন, বেশ বড় পিঁড়ে। যখন খেতে বসতেন তখন তাতেও বসতে কুলাত না। ছোট তেলধুতিটি পরে যখন থস থস করে গঙ্গায় নাইতে যেতেন, লোকে অবাক হয়ে দেখত।

"কামারপুকুরে যখন যেতেন, ঘরের বার হলেই মেয়েমদ্দ হাঁ করে চেয়ে থাকত। একদিন ভূতির খালের দিকে বেরিয়েছেন, চারদিকে মেয়েগুলো—যারা জল আনতে গেছে—হাঁ করে দেখছে আর বলছে, 'ঐ ঠাকুর যাচ্ছেন'।

"ঠাকুর হৃদয়কে বলছেন, 'ও হৃদু আমায় ঘোমটা দিয়ে দে, আমায় ঘোমটা দিয়ে দে—দে, দে, নইলে আমি এখুনি ন্যাংটা হব।' হৃদয় বললে, 'না, মামা, এখানে ন্যাংটা হয়ো না, লোকে কি বলবে?' ন্যাংটা হলে মেয়েগুলো পালাবে কিনা। হৃদয় তাড়াতাড়ি গায়ের চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে দিলে।

"তাঁকে কখনো নিরানন্দ দেখিনি। পাঁচ বছরের ছেলের সঙ্গেই বা কি, আর বুড়োর সঙ্গেই বা কি, সকলের সঙ্গে মিশেই আনন্দে আছেন। কখনো বাপু নিরানন্দ দেখিনি। আহা! কামারপুকুরে সকালে উঠেই বলতেন, 'আজ এই শাক খাব, এইটি রেঁধো।' শুনতে পেয়ে আমরা (মা ও লক্ষ্মীদিদির মা) সব যোগাড় করে রাঁধতুম। কয়েক দিন পরে বলছেন, 'আঃ, আমার একি হলো? সকাল থেকে উঠেই কি খাব, কি খাব! রাম রাম!' আমাকে বলছেন, 'আর আমার কিছু খাবার সাধ নেই, তোমরা যা রাঁধ, যা দেবে, তাই খাব।' শরীর সারতে দেশে যেতেন। দক্ষিণেশ্বরে থাকতে খুব পেটের অসুখে ভুগতেন কিনা। বলতেন, 'রাম রাম! পেটটা কেবল মলেই ভর্তি, কেবল মলই বেরুচ্ছে।' এই সবে তারপর শরীরে ঘেন্না ধরে গেল, আর শরীরের যত্ন করতেন না।

"একদিন ভূতির খালের দিক থেকে আসছেন, বৃষ্টি হয়ে গেছে; একটা মাগুর মাছ পুকুর থেকে রাস্তায় উঠেছে, ঠাকুরের পায়ে ঠেকেছে। ঠাকুর সেটাকে পায়ে করে ঠেলে ঠেলে এনে পুকুরে ছেড়ে দিলেন বললেন, 'পালা, পালা, হৃদে দেখতে পেলে এখুনি তোকে মেরে ফেলবে।' এসে হৃদয়কে বলছেন, 'হৃদু এই এত বড় একটা মাগুর মাছ, হলদে রং, রাস্তায় উঠেছিল, পুকুরে ছেড়ে দিলুম।' হৃদয় বললে, 'ও মামা, তুমি করলে কি গো, ও মামা, তুমি করলে কি গো! আঃ, এত বড় মাছটা ছেড়ে দিলে! আনলে বেশ ঝোল হতো।'

"এখন তো কত ভক্ত, চারিদিকে হই হই। তাঁর অসুখের সময় একজন ভেগে গেল বিশ টাকার জন্য—চাঁদা ধরেছিল। এখন তো আর ঠাকুরের সেবা কঠিন নয়, ঠাকুরকে

ভোগ দিয়ে নিজেরাই খায়। ঠাকুরকে বসিয়ে রাখ, বসেই আছেন ; শুইয়ে রাখ, শুয়েই আছেন—ছবি তো !

"বলরামবাবুকে দেখেছিলেন, মা কালীর পাশে হাতজোড় করে রয়েছেন, মাথায় পাগড়ি। বলরাম সেই বরাবরই হাতজোড় করে ছিল, কখনো পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করত না। ঠাকুর তার মনের ভাব বুঝতে পেরে বললেন, 'ও বলরাম, এই পা-টা চুলকাচ্ছে, একটু হাত বুলিয়ে দাও না।' বলরাম অমনি নরেন, কি রাখাল-টাখাল যে কেউ কাছে থাকত তাকেই টেনে এনে বলত, 'এই ঠাকুরের পা-টায় একটু হাত বুলিয়ে দাও তো, চুলকাচ্ছে'।"

আমি—মহারাজকে আমি ঠাকুরের রং-এর কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেন, 'এই আমাদের গায়ের রং-এর মতই ছিল।'

মা—সে তারা যখন দেখেছে। তখন তাঁর সে শরীরও ছিল না, সে রংও ছিল না। এই আমারই দেখ না, এখন কেমন রং হয়েছে—কেমন শরীর হয়েছে। আগে আমার কি এইরকম ছিল ? আগে খুব সুন্দর ছিলুম। আমি প্রথমে বেশি মোটা ছিলুম না। শেষে (ঠাকুরের শরীর ত্যাগের পর) মোটা হয়েছিলুম। দক্ষিণেশ্বরে যখন ছিলুম তখন তো বার হতুম না। খাজাঞ্চী বলতেন, 'তিনি আছেন শুনেছি, কিন্তু কখনো দেখতে পাইনি।'

"কখনো কখনো দুমাসেও হয়তো একদিন ঠাকুরের দেখা পেতুম না। মনকে বোঝাতুম, 'মন, তুই এমন কি ভাগ্য করেছিস যে রোজ রোজ ওঁর দর্শন পাবি !' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে (দরমার বেড়ার ফাঁক দিয়ে) কীর্তনের আখর শুনতুম—পায়ে বাত ধরে গেল। তিনি বলতেন, 'বুনো পাখি খাঁচায় রাতদিন রাখলে বেতে যায় ; মাঝে মাঝে পাড়ায় বেড়াতে যাবে।' রাত চারটেয় নাইতুম। দিনের বেলায় বৈকালে সিঁড়িতে একটু রোদ পড়ত, তাইতে চুল শুকাতুম। তখন মাথায় অনেক চুল ছিল। (নহবতের) নিচের একটুখানি ঘর, তা আবার জিনিসপত্রে ভরা। উপরে সব শিকে ঝুলছে। রাত্রে শুয়েছি, মাথার উপর হাঁড়ি কলকল করছে—ঠাকুরের জন্য শিঙ্গি মাছের ঝোল হতো কিনা ! তবু আর কোন কষ্ট জানিনি, কেবল যা শৌচে যাবার কষ্ট। দিনের বেলায় দরকার হলে রাত্রে যেতে পারতুম— গঙ্গার ধারে, অন্ধকারে। কেবল বলতুম, 'হরি হরি, একবার শৌচে যেতে পারতুম !' (মা একটু পেটরোগা ছিলেন)।

"তখন কত কীর্তন, কত ভাব ! এই যে গৌরদাসী, এরই বা কত ভাব হতো ! কেবল 'নিত্যগোপাল, নিত্যগোপাল' করত ! 'নিত্য কোথায় ? নিত্য কোথায় ?' আমি বলতুম, 'কে জানে তোর নিত্য কোথায় ? দেখগে গঙ্গার ধারে টারে ভাব হয়ে রয়েছে'।..."

পূজার সময় হইয়াছে, মা পূজা করিতে বসিবেন। আমি নিচে আসিলাম। পূজা হইয়া যাইবার পর উপরে প্রসাদ আনিতে গিয়াছি। মা ঠাকুরঘরে দক্ষিণমুখে পা ছড়াইয়া বসিয়া শালপাতায় প্রসাদ ভাগ করিয়া রাখিতেছেন। দক্ষিণধারের বারান্দায় বসিয়া আমি দেখাইয়া দেখাইয়া বলিতেছি, "আমাকে এটা দাও, ঐটা দাও।" তারপর আর একটা জিনিস

চাহিয়াছি। সেটি মায়ের হাতের কাছে ছিল না। পায়ের বাতের জন্য তাঁহার উঠিয়া আসিতে কষ্ট হইবে ভাবিয়া আমি নিজেই উহা হাত বাড়াইয়া লইতে গেলাম। সেই সময় মায়ের পায়ে আমার হাতের কনুইয়ের উপরের অংশটা ঠেকিয়া গেল। মা অমনি 'আহা' বলিয়া হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিলেন। আমি বলিলাম, "সে কি, কি আর হয়েছে।" মা শুধু নমস্কারে তৃপ্ত না হইয়া বলিলেন, "এস, এস, একটা চুমু খাই।" অগত্যা আমি মুখ বাড়াইয়া দিলাম। তিনি হস্ত দ্বারা চিবুক স্পর্শ করিয়া চুমু খাইলেন, তবে তাঁহার মন শান্ত হইল।

এমনই ভাবে তিনি ভক্তগণকে ভক্ত-ভগবান-জ্ঞানে নমস্কার, আবার আপন সন্তানজ্ঞানে স্নেহ করিতেন।

২৯-১০-১০, উদ্বোধন, ঠাকুরঘর

সকালে মায়ের তক্তপোশের দক্ষিণপাশে বসিয়া কথা হইতেছে। ঠাকুরের কথা উঠিয়াছে। মা বলিতেছেন, "পুরীতে প্রথম দিন গিয়েই সকালবেলা একটা ঘিয়ের টিনে ঠেসান দিয়ে ঠাকুরের ছবি রেখে পূজা করে তাড়াতাড়ি জগন্নাথ দেখতে গিয়েছিলাম। ঘর দোর সব বন্ধ। এসে দেখি ঠাকুরের ছবি টিনের নিচে। সব্বাই এসে দেখলে। সকলে মনে করলে চোর ঢুকেছে। কিন্তু ঘরের কোথাও জিনিসপত্রের একটুও নড়চড় হয়নি; শেষে দেখি বড় লাল পিঁপড়ে ধরেছে টিনে—ঘিয়ের টিন কি না—সেই পিঁপড়ে ঠাকুরের ছবিতে ধরেছিল, তাই ঠাকুর নেমে বসেছেন।"

আমি—ছবিতে কি ঠাকুর আছেন?

মা—আছেন না? ছায়া কায়া সমান।* ছবি তো তাঁর ছায়া।

আমি—সব ছবিতেই তিনি আছেন?

মা—হাঁ, ডাকতে ডাকতে ছবিতে তাঁর আবির্ভাব হয়। স্থানটি একটি পীঠ হয়। যেমন এই জায়গায় (উদ্বোধনের উত্তরদিকে মাঠ দেখাইয়া) কেউ তাঁর পূজা দিলে। ঐটি তাঁর একটি স্থান হলো।

আমি—তা, ও সব স্থানের সঙ্গে ঐ সব ভাল স্মৃতি জড়িত আছে বলে অমন মনে হয়।

মা—তা নয়, ও স্থানটিতে তাঁর দৃষ্টি থাকে।

আমি—আচ্ছা, ঠাকুরকে যে-সব ভোগ দাও তা কি ঠাকুর খান?

মা—হাঁ, খান।

আমি—কই, কোন চিহ্ন দেখি না কেন?

---

* এইজন্যই বোধ হয় বলে, গুরুজনদের ছায়া ডিঙাইতে নাই। জয়রামবাটীতে একদিন স্নান করিয়া আসিতেছি। মাও বাঁড়ুযো পুকুর হইতে স্নান করিয়া আসিতেছেন। রৌদ্রে মায়ের ছায়া যে পাশে পড়িয়াছে, আমি সেই পাশ দিয়া মায়ের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছি দেখিয়া মা থামিয়া আমাকে বলিতেছেন "ওপাশ দিয়ে এগিয়ে যাও।" আমি প্রথমটা বুঝিতে পারি নাই। মাকে বার দুই থামিতে দেখিয়া তখন খেয়াল হইল।

মা—তাঁর চোখ থেকে একটি জ্যোতিঃ বার হয়ে সব জিনিস চুষে দেখে। তাঁর অমৃত-স্পর্শে সেটি আবার পরিপূর্ণ হয়, তাই কমে না।

"ভগবান বৈকুণ্ঠ থেকে নেমে আসেন যেথায় ভক্ত ডাকে। কোজাগর পূর্ণিমার দিন লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠ থেকে পৃথিবীতে আসেন। যেখানে যেখানে তাঁর দৃষ্টি থাকে, যান, পূজা গ্রহণ করেন। আমার শাশুড়ী কামারপুকুরে দেখেছিলেন, চৌদ্দ-পনর বছরের মেয়ে, গৌরবর্ণ, কানে শঙ্খের কুণ্ডল, হাতে হীরের বালা (ডায়মনকাটা বালা)। বকুলতলায় (ঠাকুরের বাড়ির সামনে) দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথা কয়েছিলেন। শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁগা, কে তুমি?' লক্ষ্মী বললেন, 'এই আমি এইখানেই আসছি।' শাশুড়ী বললেন, 'আমার ছেলেকে (শ্রীযুত রামকুমারকে) দেখেছ? পূজো করতে গেছে, রাত হয়েছে, এখনো এল না।' লক্ষ্মী বললেন, 'হাঁ গো, সে আসছে, চালকলা বেঁধেছে, এই যে আমিও সেইখান থেকেই তোমাদের বাড়ি আসছি।' আমার শাশুড়ি বললেন, 'না মা, বাড়িতে কেউ নেই, এখন এস না।' এইরূপে বারবার প্রত্যাখ্যান করায় 'আচ্ছা, আমার অমনিই দৃষ্টি থাকবে' বলে দেবী অন্তর্ধান হলেন। দেখছ না ওদের অবস্থা কখনো তেমন ভাল হলো না, মোটা ভাত-কাপড় চলে যাচ্ছে।

"আমার শাশুড়ী দেখেছিলেন, লক্ষ্মী লাহাদের বাড়ির দিক থেকে তাদের ধানের মরাইগুলির ওখান ঘুরে এসেছিলেন। আমার ভাসুর এসে সব শুনে বললেন, 'মা তুমি বুঝতে পারনি, স্বয়ং লক্ষ্মী এসেছিলেন কোজাগর পূর্ণিমা কি না আজ।' তিনি গণনা জানতেন, খড়ি পেতে দেখেছিলেন।

"তাঁর খাবার কি দরকার? তিনি ভক্তের সন্তোষের জন্য আসেন, খান। প্রসাদ খেলে চিত্তশুদ্ধি হয়। এমনি অন্ন খেলে চিত্ত মলিন হয়।"*

আমি—সত্যই কি ঠাকুর খান!

মা—হাঁ, আমি কি দেখি না যে ঠাকুর খেলেন কি না? ঠাকুর খেতে বসেন, খান।

আমি—তুমি দেখ?

মা—হাঁ, কারুরটা দেখি তিনি খেলেন, কারুরটা হয়তো দৃষ্টিমাত্র করলেন। তা তোমারও কি সব জিনিস সব সময় খেতে ভাল লাগে, না সকলের জিনিস খেতে পার? অমনি। যার যেমন ভাব ভক্তি। ভক্তিটিই প্রধান।

* জনৈক ভক্ত মায়ের নিকট হইতে গৈরিক বস্ত্র লইয়াছিল। সে কয়েক বৎসর অসুখে ভোগে। ঐ সময় পরিবর্তনের জন্য নানাস্থানে ছিল। পরে ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের আশ্রমের পরিবর্তে বাড়িতে গিয়া থাকে এবং একদিন জয়রামবাটী গিয়া মাকে গৈরিক বস্ত্র ফিরাইয়া দেয়। এই উপলক্ষে মা বলিয়াছিলেন, "আহা! এর বিষয়ীর অন্ন খেয়ে বুদ্ধি মলিন হয়ে গেছে

আমি—ভক্তি কি করে হবে? আপন ছেলেও যদি অন্যে পালন করে তো মাকে মা বলে জানে না।

মা—হাঁ, তাইতো তাঁর কৃপা চাই। কৃপার পাত্র হওয়া চাই।

আমি—কৃপার আবার পাত্রাপাত্র কি? কৃপা সকলের উপর সমান।

মা—নদীর কূলে বসে ডাকতে হয়, সময়ে তিনি পার করবেন।

আমি—সময়ে তো সবই হয়; তাতে তাঁর কৃপা কি?

মা—তা মাছটি ধরতে হলে ছিপটি ফেলে বসতে হয় না?

আমি—তিনি আপনার জন হলে আবার বসে থাকা কেন?

মা—তা বটে। তা অসময়েও হয়। আজকাল লোকে অসময়েও আম কাঁটাল ফলাচ্ছে। ভাদ্র মাসেও কত আম হচ্ছে।

আমি—আমাদের কি দৌড় ঐ পর্যন্ত, যে যা চায়, তাকে তাই দিয়ে তিনি বিদায় করে দিলেন? না এ ছাড়া আপনার মতো করে তাঁকে পাওয়া যায়? তিনি আমার আপনার কি না?

মা—হাঁ, তিনি আপনার। চিরসম্বন্ধ। তিনি সকলের আপনার, যেমন ভাব তেমনি লাভ।

আমি—ভাব তো স্বপ্নবৎ, যেমন ভাবতে ভাবতে শেষে তাই স্বপ্ন দেখছে।

মা—স্বপ্ন বইকি! জগৎই স্বপ্নবৎ। এটাও (এই জাগ্রত অবস্থা) একটা স্বপ্ন।

আমি—না, এতটা স্বপ্ন নয়। তাহলে পলকে ভাঙত। এ যে অনেক জন্ম ধরে রয়েছে।

মা—তা হোক। স্বপ্ন বই আর কিছু নয়। এই যে রাত্রে স্বপ্ন দেখেছ, এখন তা নেই। (বাস্তবিকই গত রাত্রে আমি একটা আশ্চর্য স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম।) চাষা স্বপ্ন দেখেছিল—রাজা হয়েছে, আট ছেলের বাপ হয়েছে। স্বপ্ন ভেঙে গেলে বলেছিল, 'সেই আট ছেলের জন্য কাঁদব, না এই এক ছেলের জন্য কাঁদব?'

এইরূপ তর্কের পর শেষে বলিলাম, "মা, ওসব যা বলি, ওর জন্য আমি মাথা ঘামাই না। আমি জানতে চাই আমার কেউ আপনার আছে কি না?"

মা—আছে বৈকি, নিশ্চয় আছে।

আমি—ঠিক?

মা—হাঁ।

আমি—আপনার জন হলে তার দেখা পেতে ডাকতে হবে কেন? আপনার জন যে, সে না ডাকলেও দেখা দেয়। বাপ মা যেমন করেন, তিনি কি তেমন করছেন?

মা—করছেন বইকি, বাছা, তিনিই বাপ-মা হয়েছেন। তিনিই বাপ-মা রূপে পালন করছেন। তিনিই দেখছেন। নইলে কোথা ছিলে, কোথা এলে! তারা প্রতিপালন করলে, শেষে দেখলে এ আমাদের নয়। যেমন কাকের বাসায় কোকিল পালে না?

আমি—ঠিক ঠিক আপনার জন পাব কি না ?

মা—পাবে, পাবে, তুমি সব পাবে। যা ভাব সব পাবে। স্বামীজী পেয়েছিলেন না ? স্বামীজী যেমন পেয়েছিলেন তেমন পাবে।

আমি—মা, যাতে আমার ভয়-সঙ্কোচ না থাকে (মায়ের প্রতি)।

মা—না, সঙ্কোচ কি ! আমি তো রুই গেঁথেছি।

আমি—বেশ তো, আমরা খাব।

মা—হাঁ, তাইতো। একজনে ছাঁচ করলে তা থেকে অনেক গড়ন হয়।

আমি—তুমি করলেই আমাদের হবে। তুমি আর ছাড়িয়ে যেতে পারছ না।

মা—হাঁ, বাবা, আমি করলেই তোমাদের হবে।

২৬-১১-১০, উদ্বোধন, সকাল ৭টা

পূর্বদিনে মা গুপ্ত-মহারাজের অসুখ দেখিতে গিয়াছিলেন বশী ও টাবু গুপ্ত-মহারাজের খুব সেবা করিতেছে। মা সেই কথার উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে প্রশংসা করিতেছেন—"ওরাই সাধু, ওরাই ধন্য ! আর সাধু কি ?"

"যোগীন চাটুজ্যেকেও (নিত্যানন্দ স্বামীকে) তার ছেলেবা (শিষ্যেরা) খুব সেবা কবছে। পূর্ববঙ্গের তারা সব। কাশীপুরে ঠাকুরের সেবা ছেলেরা সব করত। তিনি তাদের নানা কথায় আনন্দে রাখতেন। বলতেন, 'একটু আনন্দ না পেলে ওরা কেমন কবে পারবে।' তিনি সব্বায়ের মন বুঝে চলতেন। সেবার তেমন দরকার হতো না। হয়তো দশ-বার দিন অন্তর একটু বাহ্যে হতো। তবে রাত জাগতে হতো। খাওয়া তো বড় ছিল না—একটু সুজি, তাও ছেঁকে দিতে হতো। মাংসেব যুষ হতো। দুটো মরা কুকুর তার ছিবড়ে খেয়ে এই মোটা হলো। একদিন—তখন অকাল—আমলকী খেতে চাইলেন। দুর্গাচরণ (নাগ মহাশয়) তিনদিন পরে গোটা দুই-তিন আমলকী নিয়ে উপস্থিত হলো। বেশ বড় আমলকী। তিন দিন তার খাওয়া-দাওযা নেই। ঠাকুবের আমলকী হাতে করে কান্না। বললেন, 'আমি ভেবেছিলুম তুমি বুঝি ঢাকা-টাকা চলে গেছ।' আমাকে বললেন, 'ঝাল দিয়ে একটা চচ্চড়ি রেঁধে দাও। ওরা পূর্ববঙ্গের লোক, ঝাল বেশি খায়।' আর আর সব রাঁধা ছিল। বললেন, 'একখানা থালায় সব বেড়ে দাও। ও প্রসাদ না হলে খাবে না।' ঠাকুর তা প্রসাদ করে দিতে বসলেন। সে সব দিয়ে ভাত প্রায এত কটা খেলেন। তবে দুর্গাচরণ প্রসাদ পেল। তখন বাগানে খুব খরচ হয়। তিনটা রান্না—ঠাকুরের একটা, নরেনদের একটা, অপর সবার একটা। চাঁদা করলে টাকার জন্য। তাই চাঁদার ভয়ে একজন আবার ভেগে গেল।

"পাপগ্রহণ করে তাঁর শরীরে ব্যাধি। বলতেন, 'গিরিশের পাপ। ও কষ্ট ভোগ করতে পারবে না।' তাঁর ইচ্ছামৃত্যু ছিল। সমাধিতে অনায়াসে দেহ ছাড়তে পারতেন। বলতেন,

'আহা, ওদের (ছেলেদের) একটা ঐক্য করে বেঁধে দিতে পারতুম!' এতদিন তো এ বলছে, 'নরেনবাবু কেমন আছেন?' ও বলছে, 'রাখালবাবু কেমন আছেন?'—এই রকম ছিল। তাই অত কষ্টেও দেহ ছাড়েননি।"

১৪-৪-১১, উদ্বোধন, ঠাকুরঘর, সকালবেলা

রোজ ঠাকুরপূজার জন্য যে ফুল আসে তাহা লইয়া উপরে গিয়াছি। বেলা অধিক হইয়াছে, তাই মা বলিলেন, "ফুলটি যখন আসে দিয়ে যাবে।" মা নিজেই পূজার সব যোগাড় করিতেন এবং পূজা করিতেন। হাত ইসারা করিয়া আমাকে কাছে ডাকিলেন। মা তক্তপোশের উপর বসিয়া আছেন। জনৈক ভক্তের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

মা—ও নিচে আছে?

আমি—হাঁ।

মা—কি করে? পড়ে টড়ে?

আমি—মধ্যে মধ্যে হয়তো পড়ে।

মা—মঠে বুঝি যাবে না?

আমি—না, তার যেতে ইচ্ছা নেই।

মা—তোমরা বুঝিয়ে বলবে।

আমি—আমি ঢের বলেছি, তুমি বল যাতে গিয়ে অন্ততঃ দু-চার দিন থাকেন।

মা—বাবা, আমিও ঢের বলেছি, আমি বললেও শুনবে না। মঠে গেলে পাঁচজনে হাসিঠাট্টা করবে, তাই সে কিছুতেই যেতে চায় না। শরৎ কত করে আমাকে বললে, 'মহারাজের কথা, আমাদের কথা কি মোটেই শুনতে নেই? মঠে গিযে অন্ততঃ দুদিন থেকে মহারাজের কথাটা মান্য করে আসুক।' তাই তো, রাখালের সঙ্গে গিযে কিছুদিন পুরীতে থাকুক না। একা একা কোথায় যাবে? কোথায় খাওয়াটি জুটবে?

আমি—খাওয়ার জন্য কিছু নয়, ভিক্ষা করে খাবে। তবে মহারাজ এবং অন্যান্য গুরুজন বলছেন, এঁদের কথা মান্য করবার জন্যও তো একবার যাওয়া উচিত।

মা—হাঁ, তাই তো, গুরুজনের কথা। ওর কাজ করতেই ইচ্ছে নেই। কাজ না করলে কি মন ভাল থাকে? চব্বিশ ঘণ্টা কি ধ্যান চিন্তা করা যায়? তাই কাজ নিয়ে থাকতে হয়, ওতে মন ভাল থাকে। তোমাদের এখানে কাজকর্ম কেমন চলছে?

আমি—তা একরকম চলে যাচ্ছে।

মা—তুমি রামেশ্বর যাবার কথা লিখেছিলে। তা যাওনি, বাবা, বেশ করেছ, পথে যা ওঠা-নামা!

আমি—শরৎ মহারাজ চেষ্টা করেছিলেন। তা অত টাকা কোথায় জুটবে? গেলে শশী মহারাজের উপরই খরচ পড়ত।

মা—হাঁ, হাজার টাকা খরচ হয়েছে শশীর।

পরদিন মা ঠাকুরঘরের দক্ষিণপাশের ঘরে পান সাজিতেছিলেন। বেলা এগারটা হইবে। উপরে গিয়াছি। মা পূর্বোক্ত ভক্তটির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও চলে গেল ?"

আমি—হাঁ, কাঞ্জিলালের বাড়িতে আজ থাকবে, হয়তো কালও থাকতে পারে। শরৎ মহারাজ বলিলেন, 'যদি অভিমান অহঙ্কার করে গিয়ে থাকে তো দিন দিন আরও খারাপ হবে। আর যদি লজ্জায় কি করে মুখ দেখাবে এই ভাব থেকে গিয়ে থাকে তবে ঠাকুরের ইচ্ছায় হয়তো মোড় ফিরে ভালও হতে পারে।'

মা—কিই বা হয়েছে ? বেটাছেলে, মেয়ে তো নয় ?...ভাঙতে সব্বাই পারে, গড়তে পারে কজনে ? নিন্দা ঠাট্টা করতে পারে সব্বাই, কিন্তু তাকে ভাল করতে পারে কজনে ? দুর্বলতা তো মানুষের আছেই।...

আমি—শরৎ মহারাজ বললেন, "একা থাকা উন্নত মন হলে সম্ভব, নতুবা যার দোষী মন, তার আরও অধোগতি হয় ওতে।"

মা—কি ভয় ? ঠাকুর রক্ষা করবেন। কত সাধু একা থাকে না ?

আমি—হৃদয় মুখুজ্যেও শেষটায় ঠাকুরের সঙ্গছাড়া হয়েছিল।

মা—তা ভাল জিনিসটি কি কেউ চিরদিন ভোগ কবতে পায় ?

আমি—তিনি ঠাকুরকে অনেক কষ্টও নাকি দিতেন, গাল-মন্দ করতেন।

মা—যে অত সেবা করে পালন করেছে, সে একটু মন্দ বলবে না ? যে যত্ন করে সে অমন বলে থাকে।

আমি—ইনিও তোমার এত সেবা করলেন, শেষে এই হলো !

মা—তা শাসন না থাকলে চলবে কেন ? ভাল হবে কি করে।

জয়রামবাটী

একবার আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার সপ্তমীর দিন দুইটি যুবক ভক্ত শ্রীশ্রীমায়ের নিকট জয়রামবাটীতে উপস্থিত হইল। অষ্টমীর দিন তাহারা পদ্মফুল সংগ্রহ করিয়া মায়ের পায়ে অঞ্জলি দিল। তারপর একজন বলিল, "মা, আমায় সন্ন্যাস দাও।" অপরটিও তাহাতে যোগ দিল। মা একটু হাসিয়া বলিলেন (দৃষ্টি একটু অস্বাভাবিক), "সব হবে, বাবা, চিন্তা কি ?" ভক্তটি জেদ করিয়া আবার বলিল, "তা সন্ন্যাস দিতেই হবে মা ; আমাদের গেরুয়া দাও।" এবার মা একটু গম্ভীরভাবেই বলিলেন, "গেরুয়ায় কি হবে, বাবা ? গেরুয়াতে কি আছে ? তোমরা তো বে করনি, সন্ন্যাসী তো আছই। আর যা যা দরকার সব ক্রমে হবে।" ভক্তটি আবার বলিল, "মা, আমার ইচ্ছা হয় পৈতা-কাপড়-চোপড় ফেলে দিয়ে তৈলঙ্গ স্বামীর মতো সর্বদা ভগবৎ-চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকি।" মা হাসিয়া বলিলেন, 'হবে বাবা, হবে।"

এবার ভক্তটি একটু অস্থিরভাবেই বলিতে লাগিল, "মা, দিই ফেলে, পৈতে-কাপড় ফেলে দিই।" কেবল কথায় নহে, কাজেও তাহাই করিতে যাইতেছে। মা তাহাতে একটু ব্যস্ত হইয়াই বলিলেন, "থাক না, থাক না—সময় হলে আপনি খসে যাবে।"

তথাপি তাহার আবদার ফুরায় না। বলিতেছে, "মা, ঠাকুরের পাগলামির একটু ছিটেফোঁটা আমায় দাও, আমায় পাগল করে দাও।" আবার বলিল, "মা, ভক্তি-টক্তি কিছুই দিচ্ছ না, ঠাকুরকে দেখাবে না?" মা বলিলেন, "হবে, বাবা, সব হবে।" উভয়ে প্রণাম করিয়া বাহিরে গেল।

মধ্যাহ্নে সকলে প্রসাদ পাইতেছেন। পায়েস খাইয়া ভক্তটি বলিয়া উঠিল, "মা, এ কি পায়েস রেঁধেছ? একটুও ভাল হয়নি।" মা হাসিয়া বলিলেন, "কি করব, বাবা, এখানে দুধ তেমন পাওয়া যায় না।" কেদারের মা নিকটে ছিলেন। তিনি বলিলেন, "বেশ তো বাবা, তোমরা সব ছেলে আছ, খুব করে জিনিসপত্র এনে দিও, মা ভাল করে খাওয়াবেন।" একথা তাহার কানেও গেল না; বলিল, "মা, এবার কিন্তু খেয়ে পেট ভরল না। আবার এসে পেট ভরে খেয়ে যাব, আর 'উদ্বোধনে' আমায় আর একবার দেখা দিও।" মা এ কথায় সম্মতি জানাইলেন।

পূর্বাহ্নে শিলং হইতে একটি ভক্ত আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীমাযের অবতাবত্বে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য ইনি পণ করেন, সাতবাব মাকে স্বপ্নে দর্শন না পাইলে দর্শনে যাইবেন না। মাযেব কৃপায সাতবাব পূর্ণ হইযাছে। তাই এবার আসিয়াছেন। তিনি অপরাহ্ণে বিদায লইবেন। মাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা, আসি তবে। আর কি কোন দরকার আছে?"

মা—হাঁ, বাবা, আছে বইকি। দীক্ষাটা নিয়েই যেও।

ভক্ত—তা বাগবাজারেই হবে।

মা—না, বাবা, ওটা হয়েই যাক, আজই না হয় হবে।

ভক্ত—প্রসাদ পেলুম যে?

মা—ওতে দোষ হবে না।

তারপব দীক্ষাগ্রহণ করিয়া তিনি বিদায় লইলেন।

জয়রামবাটী হইতে বাড়ি আসিয়া পূর্বোক্ত ক্ষেপা ভক্তটির মনোভাবে ক্রমশঃ খুব পরিবর্তন হইতে চলিয়াছে। ঠাকুরের দর্শনেব জন্য সে অস্থির। শ্রীশ্রীমা ইচ্ছা করিলেই ঠাকুরকে দর্শন কবাইতে পারেন, অথচ দেখাইতেছেন না—এই বিশ্বাসে তাহার মনে বড় অভিমান হইয়াছে। অত্যন্ত বিরক্তিভাবেই সে পুনরায় জয়রামবাটী গিয়া মাকে বলিল, "মা, ঠাকুরকে দেখাবে না?" মা স্নেহমাখা স্বরে বলিলেন, "হবে, বাবা, কেন ব্যস্ত হচ্ছ?"

তাহার আর সহ্য হইল না। ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, 'কেবল ফাঁকি দিচ্ছ? এই নাও তোমার জপের মালা, আমি আর কিছু চাই নে' এবং জপের মালা মায়ের দিকে ছুঁড়িয়া দিল। মা

বলিলেন, "আচ্ছা, থাক, ঠাকুরের ছেলে হয়ে থাক।" সে কিন্তু আর অপেক্ষা করিল না, চলিয়া গেল। কোয়ালপাড়া মঠে তাহার মালা গচ্ছিত রহিল।

ইহার পর ভক্তটি রীতিমত পাগল হয়। সব মহারাজাদিগকে গালাগালি দিয়া পত্রাদি লিখিত। শ্রীশ্রীমাকেও কটূক্তিপূর্ণ পত্র লিখিত। তাহার নানা উৎপাতের জন্য সে মারও খাইয়াছিল।

এই ভক্তটির সম্বন্ধেই আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মা, সে কি মন্ত্রও ফেরত দিয়েছিল? মালা তো ছুঁড়ে মারল। মন্ত্র কি কখনো ফেরত দিতে পারে?"

মা—তা কি কখনো হয়? এ সজীব মন্ত্র। ও কি ফেরত হয়? যে মন্ত্র একবার পেয়েছে—মহামন্ত্র। যাঁর (যে গুরুর) উপর একবার ভালবাসা হয়েছে, তা কি কখনো যায়? ও একদিন না একদিন, যখন প্রকৃতিস্থ হবে তখন এদের সবার পায়ে ধরবে।

আমি—মা, কেন এমন হয়?

মা—তা হয়ে থাকে। এক গুরুই কতজনকে মন্ত্র দেন, সবাই কি সমান হয়? যে যেমন আধাব তাতে তেমনি বিকাশ হয়। ও জয়রামবাটীতে বললে, 'মা, আমায় পাগল করে দাও।' আমি বললুম, 'পাগল, হবে কেন? অনেক পাপ না হলে কি পাগল হয়?' বলে, 'আমার ছোট ভাই ঠাকুরকে দর্শন করেছে, আমায়ও দেখিয়ে দাও।' আমি বললুম, 'সাদা চোখে কে কবে দেখেছে? তবে চোখ বুজে দেখতে পারে। চোখ বুজলেও ছবি মনে পড়ে না? ছেলেমানুষ, হয়তো তাই দেখে ভাবছে ঠাকুর দেখছি। বললুম, 'তা তুমিও সাধনভজন কর, তাঁকে প্রার্থনা কর, তোমারও দর্শন হবে।' মানুষ আপন মনে জানতে পারে সে কতদূর এগিয়েছে, কতদূর জ্ঞানচৈতন্য হয়েছে। অন্তবে অন্তরে বুঝতে পারে যে কতদূব তাব ঈশ্বরলাভ হয়েছে। নতুবা সাদা চোখে কে দেখছে?

'উদ্বোধনে' ধমক খাইয়া ভক্তটি বাগবাজারে গঙ্গার ধারে পড়িয়া থাকিত। কখনো বা উদ্বোধনের রোয়াকে বসিয়া থাকিত। আসিলে দুপুরে রোয়াকে বসিয়াই দুটি খাইয়া যাইত। এইভাবে কিছুদিন গত হইলে একদিন তাহাকে নানাপ্রকারে বুঝাইয়া রাজি করাইয়া শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতিক্রমে (উদ্বোধনে) তাঁহার নিকট লইয়া যাওয়া হইল। মা তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন, "ঠাকুর বলতেন, 'যারা আমাকে ডাকবে তাদের জন্য আমাকে অন্তিমে দাঁড়াতে হবে।' এটি তাঁর নিজ মুখের কথা। তুমি আমার ছেলে, তোমার ভয় কি? তুমি কেন অমন পাগল হয়ে চলবে? এতে যে তাঁর দুর্নাম হবে! লোকে বলবে, 'তাঁর ভক্ত পাগল হয়েছে।' তোমার কি এমন করা উচিত, যাতে তাঁর দুর্নাম হয়? যাও, বাড়ি যাও, দশজনে যেমন আছে, বেশ খাও-দাও, থাক। যখন তোমার দেহ যাবে তখন তিনি দেখা দিয়ে নিয়ে যাবেন। কে তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখছে বল না? এক নরেন দেখেছিল। সেও যখন তার খুব ব্যাকুলতা—ঐ সব দেশে (আমেরিকায়)। তখন তিনি (ঠাকুর) তার হাত ধরে রয়েছেন, বোধ করত। তাও কিছুদিনের জন্য। বেশ, যাও, বাড়ি গিয়ে থাক। সংসারীদের

কত কষ্ট! এই সেদিন রামের ছেলে মারা গেল। তোমরা ঘুমিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচ।" তারপর বলিলেন, "সেদিন আমি পূজা করছিলুম। পূজা করতে করতে দেখি এর মুখটি—ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল, গোপালটির মতো। সেইদিনেই খানিক পরে এসে উপস্থিত।"

মায়ের এই সকল উপদেশ ও সান্ত্বনায় ভক্তটিকে অনেকটা শান্ত দেখা গেল। সেদিন দুপুরে প্রসাদ পাইয়া সে দেশে চলিয়া গেল। বাড়ি গিয়া ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল।

১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮, জয়রামবাটী

শ্রীশ্রীমা রামেশ্বরদর্শনের পর কলিকাতায় কয়েকদিন অবস্থান করিয়া ৫ জ্যৈষ্ঠ জয়রামবাটী পৌঁছিয়াছেন। পুরাতন বাড়িতে মায়ের ঘরের বারান্দায় সন্ধ্যার সময় কথা হইতেছে। মা জনৈক ভক্তের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

মা—সে কি বললে?

আমি—তাঁর প্রাণটা তোমার জন্য কেমন ব্যাকুল হয়েছে তিন-চার মাস ধরে।

মা—সে কি? সাধু সব মায়া কাটাবে। সোনার শিকলও বন্ধন, লোহার শিকলও বন্ধন। সাধুর মায়ায় জড়াতে নেই কি কেবল 'মাতৃস্নেহ' 'মাতৃস্নেহ' করে মায়ের ভালবাসা পেলুম না। ওসব কি? বেটাছেলে সর্বক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে ফেরা—আমি ওসব ভালবাসি না। মানুষের আকৃতিটা তো? ভগবান তো পরের কথা। আমাকে কুলের ঝি বউ নিয়ে থাকতে হয়। আশু উপরে আনাগোনা করত, চন্দন ঘষা, এটি সেটি। আমি ধমকে দিলুম।

আমি—বেদান্তবাদী সাধু যারা, তারা সব কি নির্বাণে যাবে?

মা—তা বইকি। মায়া কাটিয়ে কাটিয়ে নির্বাণ হবে—ভগবানে মিশে যাবে। বাসনা হতেই তো দেহ। একটু বাসনা না থাকলে দেহ থাকে না। একেবারে নির্বাসনা হলো, তো সব ফুরাল।

"কোন ছেলে এল, খেলে দেলে, চলে গেল। মায়া কি? হাজরা ঠাকুরকে বলেছিল, 'আপনি নরেন-টরেন ওদের জন্য অত ভাবেন কেন? তারা আপনার মনে খাচ্ছে দাচ্ছে, আছে। আপনি ভগবানের চিন্তায় মন স্থির করুন। আপনার আবার মায়া কেন?' ঠাকুর তার কথামত সব মায়া কাটিয়ে ভগবানে মন লীন করলেন। দাড়ির চুল, মাথার চুল এমনি (দেখাইয়া) সোজা হয়ে কাঁটা দিলে, কদমফুলের মতো। একবার ভাব দেখি, সে লোকটি কি ছিলেন। ঠাকুর তখন বাহ্যে গিয়েছিলেন। রামলাল আর শৌচ করাতে পারলে না। কাকে শৌচ করাবে? সব শরীর জড়, কাঠ—শক্ত! তখন রামলাল বলতে লাগল, 'যেমনটি ছিলে তেমনটি হও, যেমনটি ছিলে তেমনটি হও।' বলতে বলতে শেষে দেহে মন এল। দয়ায় মনকে নামিয়ে রাখতেন।

"যোগীন যখন দেহ রাখলে, নির্বাণ চাইলে। গিরিশবাবু বললেন, 'দ্যাখ যোগীন, নির্বাণ নিসনি নিসনি। ঠাকুর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে, চন্দ্র সূর্য তাঁর চক্ষু—এত বড় ভাবিসনি। যেমন ঠাকুরটি ছিলেন, তেমনটি ভেবে ভেবে তাঁর কাছে চলে যা।'

"দেবতা বল, যা বল—সব এসে পৃথিবীতে জন্মাচ্ছে। সূক্ষ্মদেহে তো আর খাওয়া-পরা কথাবার্তা কিছু নেই, তাই বেশি দিন থাকতে পারে না।"

আমি—খাওয়া-পরা কথাবার্তা নেই, তবে কি নিয়ে সময় কাটায়?

মা—কাঠের পুতুলটির মতো যুগ যুগান্তর ধরে যেখানে আছে সেখানেই থাকে। রামেশ্বরে যেমন দেখলুম, রাজাদের সব পাথরের মূর্তি পোশাক পরা রয়েছে। আবার ভগবানের দরকার হয় তো তিনি নিয়ে আসেন সেখান থেকে। বিভিন্ন দেবলোক সব আছে কিনা—জনলোক, সত্যলোক, ধ্রুবলোক। স্বামীজীকে সপ্তর্ষি থেকে এনেছিলেন, ঠাকুর বলেছেন। তাঁর কথা বেদবাক্য তো, মিথ্যা হবার জো নেই।

আমি—তবে আমাদেরও কি কাঠ-মাটির পুতুলের মতো হয়ে থাকতে হবে?

মা—না, তোমরা তাঁর সেবা করবে। দুটি থাক আছে। একটি এখানকার মতো ভগবানেব সেবাদি নিয়ে থাকে। অপরটি ঐ রকম পুতুলের মতো যুগ যুগান্তর ধরে ধ্যানমগ্ন।

আমি—মা, ঠাকুর বলতেন যে ঈশ্বরকোটী নির্বাণের (নির্বিকল্প সমাধির) পরও ফেরে, আর কেউ পারে না, এর মানে কি?

মা—ঈশ্বরকোটী নির্বাণের পরও মনটি গুছিয়ে আনতে পারে।

আমি—যে মন লীন হয়ে গেল, সে মন কি করে ফিরে আসে? একঘটি জল পুকুরে ফেলে দিলে কি করে সেই জলটুকুই বেছে আনবে?

মা—সব্বাই পারে না। যাঁরা পরমহংস তাঁরা পারেন। হাঁস, জল দুধ একত্র করে দাও, দুধটুকু বেছে খাবে।

আমি—সবাই কি নির্বাসনা হতে পারে?

মা—তা পারলে তো সৃষ্টি ফুরিয়ে যেত। পারে না বলেই তো সৃষ্টি চলছে—পুনঃপুনঃ জন্মাচ্ছে।

আমি—যদি গঙ্গায় দেহত্যাগ হয়?

মা—বাসনা ফুরুলেই হয়, নইলে কিছুতেই কিছু নয়। বাসনা না ফুরুলে শেষ জন্ম হলেই বা কি হবে?

আমি—মা, এই অনন্ত সৃষ্টিতে কোথায় কি হচ্ছে কে জানে? এই যে অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র, ওতে কোন জীবের বাস আছে কি না কে বলবে?

মা—মায়ার রাজ্যে সর্বজ্ঞ হওয়া একমাত্র ঈশ্বরেই সম্ভবে। ওসব গ্রহ-নক্ষত্রে কোন জীবের বাস নেই।

এই বৎসর বর্ষাকালে একদিন পূজনীয় শরৎ মহারাজ, যোগেন-মা ও কয়েকজন ভক্ত জয়রামবাটী হইতে কামারপুকুর গিয়াছেন। সেখানে আছাড় খাওয়ায় যোগেন-মার শরীরের কয়েক স্থান হইতে রক্ত পড়িয়াছে। আমি পূর্বেই ফিরিয়া মাকে যোগেন-মার কথা বলাতে মা দুঃখ করিয়া বলিলেন, "গোলাপ বলেছিল, 'যোগেন যে যায়, দেখি কটা আছাড় খায়।' তার এই কথাটির মানরক্ষার জন্য যোগেন এই আছাড়টি খেলে। সাধুবাক্য তো? জপ তপ করে কি না, না ফলে যায় না। তাই সাধুদের কাউকে কিছু বলতে নেই।"

১৬-১-১২ (২ মাঘ, ১৩১৮)
উদ্বোধন মায়ের ঘর, সকালবেলা

আমি বলিলাম, "মা, চৈতন্যদেব নারায়ণীকে আশীর্বাদ করলেন, 'নারায়ণি, তোমার কৃষ্ণে ভক্তি হোক'। তিন-চার বছরের মেয়ে অমনি 'হা কৃষ্ণ' বলে ধুলোয় গড়াগড়ি দিতে লাগল। একটি গল্প আছে যে নারদের সিদ্ধিলাভের পর একটা পিঁপড়ে দেখে হঠাৎ কি রকম দয়া এল। ভাবলেন, 'আমার কত জন্ম তপস্যার পর তবে সিদ্ধিলাভ হলো, আর এর মানুষ হতেই তো কত দেরি!' দয়ায় পিঁপড়েটাকে আশীর্বাদ করলেন, 'মুক্ত হয়ে যাও, মুক্ত হয়ে যাও।' অমনি পিঁপড়েটা পক্ষী, পশু ইত্যাদি ইতর জীব-দেহ ধারণ করে ক্রমে মানুষ হলো। মানুষদেহে অনেক জন্ম ভোগ করে করে ক্রমে তপস্যায় মন এল এবং ভগবানকে আরাধনা করে মুক্ত হলো। এ সব অসংখ্য জন্মের খেলা নারদের চোখের সামনে যেন মুহূর্ত মধ্যে হয়ে গেল। তা মহাপুরুষের কৃপা হলে তো যখন তখন হয়।"

মা—তা হয়।

আমি—তবে শুনেছি, অপরের পাপের বোঝা নিয়ে শরীর থাকে না। যে শরীর দ্বারা অনেকের উদ্ধার হতো, সেই শরীর হয়তো একজনের জন্যই ক্ষয় হয়।

মা—হাঁ, তাঁর শক্তিও কমে যায়। যে সাধন-তপস্যার শক্তির দ্বারা অনেকের উদ্ধার হতো তা একজনের জন্যই ক্ষয় হয়ে যায়। ঠাকুর বলতেন, 'গিরিশের পাপ নিয়ে আমার শরীরে এই ব্যাধি।' তা গিরিশও এখন ভুগছে।

আমি—মা, আমি একদিন স্বপ্ন দেখি যে একটা লোক, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, এসে তোমাকে খুব ধরে বসেছে, তুমি যাতে তাকে সদ্য সদ্যই কিছু করে দাও। সে তোমার কাছ থেকে পূর্বে মন্ত্র নিয়েছে। কিন্তু নিজে কোন সাধনভজন করবে না। তুমি বলছ, 'একে যদি আমি এখনি কিছু করে দিই, তাহলে আর আমি বাঁচব না, আমার দেহ থাকবে না।' আমি দুহাতে তোমাকে নিষেধ করছি আর বলছি, 'ওকে কেন করে দেওয়া? ও নিজে করতে পারবে, সাধন করুক।' সে ঐরকম বারবার বলাতে তুমি যেন ত্যক্ত হয়ে তার বুক ও ঘাড় স্পর্শ করে কি করে দিচ্ছ এবং খানিক করতেই কেবল ঐ বলছ, 'একে যদি আমি

এখনি কিছু করে দি, তাহলে আমি আর বাঁচব না, আমার দেহ থাকবে না।' তখন স্বপ্ন ভেঙে গেল। আচ্ছা, দেহধারণ করলে কি শক্তি সীমাবদ্ধ হয়?

মা—হাঁ, তা হয়। এক একটা লোকের জ্বালায় ত্যক্ত হয়ে অনেক সময় মনে হয়, আর এ দেহ তো যাবেই, তা যাক না এক্ষণি, দিয়ে দিই। এই যে রাধী রাধী করি, এ তো একটা মোহ নিয়ে আছি। আমার পাগলা-টাগলাকে ভয় করে। আবার সেইটে আসে, না কি করে। তুমি (মঠে) চলে যাচ্ছ, ভয় হয়।

আমি—মা, ভগবান-দর্শন মানে কি জ্ঞানচৈতন্যলাভ? না আর কিছু?

মা—জ্ঞানচৈতন্যলাভ না তো আর কি? নতুবা কি দুটো শিং বেরোয়?

আমি—এদের (এখানকার অনেক ভক্তদের) ভগবান-দর্শন মানে অন্য রকম—তাঁকে চোখে দেখা, কথা বলা।

মা—'বাবাকে দেখিয়ে দাও, বাবাকে দেখিয়ে দাও' বলছে। তিনি এত কারুর বাবা নন। 'গুরু, কর্তা, বাবা'—এই তিনে তাঁর গায়ে কাঁটা বিঁধত। কত মুনি ঋষি যুগ-যুগান্তর তপস্যা করে পেলে না; তা সাধন নেই, তপস্যা নেই, এখনই দেখিয়ে দাও! আমি এত পারব না। তিনি কাকে দেখিয়ে দিয়েছেন বল না?

আমি—আচ্ছা, মা, কেউ চাচ্ছে কিন্তু পাচ্ছে না; আবার কেউ চাচ্ছে না, তাকে দিচ্ছেন—এ কথার মানে কি?

মা—ঈশ্বর বালকস্বভাব কি না! কেউ চাচ্ছে, তাকে দিচ্ছেন না; আবার কেউ চায় না, তাকে সেধে দিচ্ছেন। হয়তো তার পূর্বজন্মে অনেক এগুনো ছিল। তাই তার উপর কৃপা হয়ে গেল।

আমি—তাহলে কৃপাতেও বিচার আছে?

মা—তা আছে বইকি। যার যেমন কর্ম করা থাকে। কর্ম শেষ হলেই ভগবান-দর্শন হয়। সেটি শেষ জন্ম।

আমি—মা, জ্ঞানচৈতন্যলাভ করতে হলে সাধন, কর্ম-ক্ষয়, সময়, এসব দরকার মানলুম। কিন্তু তিনি যদি আপন জন হন, তবে কি তিনি ইচ্ছা করলেই দেখা দিতে পারেন না?

মা—ঠিক কথা, তবে এ সূক্ষ্মটি তুমি যেমন ধরে বসেছ তেমনটি আর কে ধরে বসেছে? সব্বাই ওটা একটা করতে হয় তাই করে যাচ্ছে; ঈশ্বরকে চায় কজনে?

আমি—আমি তোমাকে আগে একদিন বলেছিলুম যে আপন মায়েরও যদি যত্ন স্নেহ না পায় তবে ছেলে মাকেও মা বলে জানে না।

মা—তা তো ঠিক কথাই। দেখা না পেলে কোথা থেকে ভালবাসা হয়? এই তোমার সঙ্গে দেখাটি হয়েছে—আমি তোমার মা, তুমি আমার ছেলে।

১-২-১২, উদ্বোধন

আজ রাত প্রায় সাড়ে নয়টার সময় মায়ের নিকট গিয়াছি। সমস্ত দিন যাই নাই দেখিয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আজ কোথায় ছিলে?"

আমি—নিচে হিসাব নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম।

মা—প্রকাশ তাই বলছিল। যে ত্যাগ করেছে তার কি আর ওসব ভাল লাগে? ঠাকুরের মাইনে নিয়ে হিসাবে কি গোল ছিল, কম দিয়েছিল। আমি খাজাঞ্চীকে বলতে বলায় বললেন, 'ছি ছি! হিসাব করব?'

"ঠাকুর এইটি আমাকে বলেছিলেন, 'যে তাঁর নাম নেয়, তার কোন দুঃখ থাকে না; তা আবার তোমার (শ্রীশ্রীমায়ের) কথা?' এটি তাঁর নিজ মুখের কথা। তাঁর ত্যাগই ছিল ভূষণ।"

৮-২-১২, উদ্বোধন

ঠাকুরঘরেব পাশের ঘরটির উত্তরধাবে মাদুব কিংবা কম্বল পাতিয়া দেওয়া হইত। মা সকালবেলা ঐখানটিতে অনেক সময় বসিতেন। কখনও একটু জপ করিতেন—পূর্ব মুখ হইয়া বসিয়া। আমরা যখন এই ঘবে মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতাম, তখন প্রায়ই এইখানে বসিতাম। আজও মা এই স্থানে বসিয়া আছেন।

আমি—মা, তুমি দক্ষিণেশ্বরে কত দিন ছিলে?

মা—তা অনেকদিন ছিলাম। ষোল বছরের সময় এসেছি। তদবধি বরাবর ছিলুম। মধ্যে মধ্যে বাড়ি যেতুম। রামলালের বিয়ের সময় গিছলুম। দু-তিন বছর অন্তর যেতুম।

আমি—একা থাকতে?

মা—কখন কখনও একা ছিলুম। আমার শাশুড়ী থাকতেন। মধ্যে মধ্যে গোলাপ, গৌরদাসী এরা সব থাকত। ঐটুকু ঘর, ওরই মধ্যে রান্না, থাকা, খাওয়া সব। ঠাকুরের রান্না হতো—প্রায়ই পেটের অসুখ ছিল কিনা, কালীর ভোগ সহ্য হতো না। অপর সব ভক্তদের রান্না হতো। লাটু ছিল; রামদত্তের সঙ্গে রাগারাগি করে এল। ঠাকুর বললেন, 'এ ছেলেটি বেশ, ও তোমার ময়দা ঠেসে দেবে।' দিনরাত রান্নাই হচ্ছে। এই হয়তো রামদত্ত এল। গাড়ি থেকে নেমেই বলছে, 'আজ ছোলার ডাল আর রুটি খাব।' আমি শুনতে পেয়েই এখানে রান্না চাপিয়ে দিতুম। তিন-চার সের ময়দার রুটি হতো। রাখাল থাকত; তার জন্য প্রায়ই খিচুড়ি হতো। সুরেন মিত্তির মাসে মাসে ভক্তসেবায় দশ টাকা করে দিত। বুড়ো গোপাল বাজার করত। নাচ, গান, কীর্তন, ভাব, সমাধি দিনরাতই চলছে। সামনে বাঁশের চেটাইয়ের বেড়া দেওয়া ছিল। তাই ফুটোফুটো কবে দাঁড়িয়ে দেখতুম। তাই তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে বাত ধরে গেল।

"যদুর মা বলে একটি ঝি কিছুদিন ছিল। এক বুড়ি আসত, পূর্বে অসৎ ছিল। এখন বুড়ো হয়েছে, হরিনাম করে। একাটি একাটি ; তবু ও আসছে, ওর সঙ্গে কথা কইতুম। একদিন ঠাকুর দেখে বললেন, 'ওটাকে এখানে কেন ?' আমি বললুম, 'ও এখন ভাল কথাই তো কয়, হরিকথা কয়, তাতে দোষ কি ?' মানুষের তো আর মনে সব সময় পূর্বভাব থাকে না। তিনি বললেন, 'ছি ছি! বেশ্যা—ওর সঙ্গে কি কথা ? শত হোক, রাম রাম!' পাছে কুবুদ্ধি শিখায় এই ভয়ে তিনি ওসব লোকেদের সঙ্গে কথাটি পর্যন্ত কইতে নিষেধ করতেন। এত করে আমাকে রক্ষা করতেন।

"কামারপুকুরে একজন তাঁকে দেখতে এসেছিল। লোকটা ভাল নয়। সে চলে যাবার পর ঠাকুব বললেন, 'ওরে, দে, দে, ওখানটার এক ঝোড়া মাটি ফেলে দে।' কেউ ফেলতে না যাওয়ায় নিজেই কোদালটা নিয়ে ঠনঠন করে খানিকটা মাটি ফেলে দিয়ে তবে ছাড়লেন। বললেন, 'ওরা, যেখানে বসে, মাটিসুদ্ধ অশুদ্ধ হয়।'

"বাঙাল-দেশীয় দুর্গাচরণ আসত। তার কি গুরুভক্তিই ছিল! ঠাকুরের অসুখের সময তাঁর জন্য তিন দিন খুঁজে খুঁজে আমলকী এনে দিলে। তিন দিন আহার-নিদ্রা নেই। একবার শালপাতে প্রসাদ দিলুম (বাগবাজারের গঙ্গার ধারের গুদামওয়ালা বাড়িতে)। পাতাসুদ্ধ খেযে ফেললে! কাল, শুকনো চেহারা—কেবল চোখ দুটি বড় আর উজ্জ্বল ছিল। প্রেমের চক্ষু, সর্বক্ষণ প্রেমাশ্রুতে ভেজা থাকত।

"তখনকার কত সব কেমন ভক্ত ছিল। এখন যারা আসছে, কেবল বলছে, 'ঠাকুর দেখিয়ে দাও।' সাধন নেই, ভজন নেই, জপ-তপ নেই, কত জন্মে কত কি করেছে—কত গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, ভ্রূণহত্যা করেছে! সে সব ক্রমে ক্রমে কাটবে, তবে তো ? আকাশে চাঁদটি মেঘে ঢেকেছে। ক্রমে ক্রমে হাওয়ায মেঘটি সরে যাবে, তবে তো চাঁদটি দেখতে পাবে। ফস করে কি যায় ? এও তো তেমনি।

"ধীরে ধীরে কর্মক্ষয় হয। ভগবান লাভ হলে ভেতরে ভেতরে তিনি জ্ঞানচৈতন্য দেন—নিজে জানতে পারে।"

৯-২-১২, উদ্বোধন

গতরাত্রে গিরিশবাবু দেহত্যাগ করিয়াছেন, সেই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, যারা মৃত্যুর পূর্বে অজ্ঞান হয়ে দেহত্যাগ করে, তাদের কি করে সদগতি হয় ?"

মা—অজ্ঞান হবার পূর্বে যে চিন্তাটি ছিল, যে চিন্তাটি নিয়ে অজ্ঞান হয়েছে, সেই চিন্তাটি অনুসারে গতি হয়।

আমি—হাঁ, গিরিশবাবুও সন্ধ্যা ছটার একটু পরে যে 'জয় রামকৃষ্ণ, চল' বলে শুলেন, তারপর আর তেমন চৈতন্য হয় নাই। এর খানিকক্ষণ আগে কেবল 'চল চল' করছিলেন।

'একটু ধর না রে, বাপ'—এই সব।* আমি বললুম, "কি আপনি কেবল 'চল চল' কচ্ছেন? আপনি এখন ঠাকুরের নাম করুন, যাতে ভাল হবেন।" বার দুই আমি এই কথা বলাতে তিনি বললেন, 'তা কি আর আমি জানি না?' আমি ভাবলুম, বাবা, বুঝি ভেতরে ভেতরে হুঁশ রয়েছে।

মা—যে চিন্তাটি নিয়ে অজ্ঞান হলো, যেন ঐ চিন্তাটিতে ডুবে রইল। সব তাঁর কাছ থেকে এসেছে, তাঁর কাছে চলে যাবে। কেউ তাঁর বাহু হতে, কেউ পা হতে, কেউ লোম হতে হয়েছে—সব তাঁর অঙ্গ, অংশ।

গৌব-মা উপস্থিত ছিলেন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "ঠাকুর আর দুবার আসবেন বলেছেন। একবার বাউল সেজে।"

মা—হাঁ, ঠাকুর বলেছিলেন, 'তোমার হুঁকোকলকে হাতে থাকবে।' ভাঙা একটু পাথরের বাসন ঠাকুরের হাতে থাকবে, হয়তো ভাঙা কড়ায রান্না হবে। যাচ্ছেন তো যাচ্ছেন—কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

"লক্ষ্মী বলেছিল, 'আমাকে তামাককাটা করলেও আর আসছি না।' তিনি হেসে বললেন, 'আমি যদি আসি তো থাকবে কোথা? প্রাণ টিকবে না। কলমীব দল, এক জায়গায় বসে টানলেই সব আসবে।'

"বৃন্দাবনে রেল থেকে নামছি। ছেলেরা আগে নেমেছে। গোলাপ গাড়ি থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে দিচ্ছে। লাটুর হুঁকোকলকেগুলো পড়ে ছিল, আমার হাতে দিয়েছে। লক্ষ্মী বলছে, 'এই তোমার হুঁকোকলকে ধরা হয়ে গেল।' আমিও 'ঠাকুর, ঠাকুব, এই আমার হুঁকোকলকে ধরা হযে গেল' বলে ধুপ করে মাটিতে ফেলে দিয়েছি।"

২১-২-১২, উদ্বোধন, মায়ের ঘর

মা চৌকিব পার্শ্বে নিচে বসিয়া—সকাল সাতটা। স্বামী নির্ভযানন্দ দ্বাবকাধাম গিয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীমাকে পত্র লিখিয়াছেন এবং গীর্ণারেব দত্তাত্রেয়ের চাউল-প্রসাদ উহার মধ্যে পাঠাইয়াছেন। মাকে দিলে মা বলিতেছেন, 'দত্তাত্রেয কে?'

আমি—জড়ভরত, দত্তাত্রেয—সেই ব্রহ্মর্ষি, ঈশ্বরকোটী।

মা—যেমন ঠাকুবেব ছেলেরা? এরা সব ঈশ্বরকোটী না? যোগীনকে অর্জুন বলতেন। স্বামীজীকে সপ্তর্ষি থেকে এনেছিলেন। বাবুরামকে নৈকষ্যকুলীন বলতেন। নিরঞ্জন, পূর্ণ, রাখাল।

আমি—বেলঘরিয়ার তারকবাবু?

* গিবিশবাবুব গঙ্গায যাইবাব খুব ইচ্ছা হইযাছিল। তাই ঐরূপ কবিতেছিলেন। তাঁহাব ভ্রাতা অতুলবাবু বলিযাছিলেন, "আমাব ভাইকে আবাব গঙ্গাযাত্রা।" আমি গিবিশবাবুব ইচ্ছা তখন বুঝিতে পাবি নাই

মা—হাঁ, ভবনাথ। ভবনাথকে নরেন্দ্রের প্রকৃতি বলতেন। শরৎকে কিছু বলতেন?

আমি—জানি নে। বল না আর কে কি?

মা—কি জানি, আর জানি নে। শরৎকে ঈশ্বরকোটী বলেননি।

আমি—তুমি তো বলেছিলে, 'শরৎ আর যোগীন (যোগানন্দ স্বামী) এ দুটি আমার অন্তরঙ্গ।' আচ্ছা, ঈশ্বরকোটী কেউ কেউ সংসারে এমন হয়ে রয়েছে কেন? স্ত্রী-পুত্র নিয়ে?

মা—হাঁ, পচে মরছে; পূর্ণকে জোর করে বিয়ে দিলে। বললে, ঠাকুরের ওখানে গেলে ইট পাটকেল মেরে তাঁর গাড়ি ভেঙে দেব যখন কলকাতায় আসবেন।

আমি—বিয়েই নয় করলে। নাগ মহাশয় তো বিয়ে করেছিলেন। এঁদের সব ছেলেপুলে, সংসার।

মা—হয়তো বাসনা ছিল। কি জান? এ সৃষ্টির মধ্যে কত গোলমেলে (ব্যাপার)—ঠাকুর এটাকে দিয়ে সেটা করেন, হাড়ীর মাকে নিয়ে তাড়ীর মা, এটাকে দিয়ে সেটা কত কি!

পরে বলিতেছেন, "তা সংসার করলেও ঈশ্বরকোটী হতে পারে, তাতে দোষ কি?"

রাধুর অসুখ করিয়াছে—জ্বর ও বেদনা। মা সেজন্য বড় চিন্তিত। বলিতেছেন, "আমি থাকতেই এর ভাল হলো না, তা এর পর কে আর ওকে দেখবে? তাহলে ও আর বাঁচবে কি?"

আমি—আর, যে ভক্তের ভিড় সমস্ত দিন! তোমার আর একটুও বিশ্রাম নেই।

মা—আমি তো ঠাকুরকে দিনরাতই বলি, 'ঠাকুর, এ সব কমিয়ে দাও, একটু বিশ্রাম পেতে দাও।' তা হয় কই? যে কদিন আছি এমনি হবে। এখন সব চারদিকে প্রচার হয়ে পড়েছে কি না, তাই এত লোক! ব্যাঙ্গালোরে—বাপরে কত লোক! পথে রেল থেকে নামতে সব পুষ্প-বৃষ্টি হতে লাগল। এত উঁচু হয়ে গেল রাস্তা। ঠাকুরেরও শেষটায় কত লোক। আমি তো এত বলি, 'কুলগুরুর কাছে মন্ত্র নাও, তারা প্রত্যাশা করে। আমার তো কিছু প্রত্যাশা নেই।' তা ছাড়ে না, কাঁদে। দেখে দয়া হয়। আর আমারও শেষ হয়ে এল। এখন যে কদিন আছি, এমনি হবেই।

আমি—না, না, তুমি এমন কথা কেন বলছ? তোমার শরীর ভাল আছে। বিশেষ কোন কষ্ট তো নেই। তবে কেন যেতে চাও? ও কথা বলো না।

এই সময়ে মায়ের মন কিছুদিন যাবৎ বড়ই উদাস ও বিষণ্ণ ছিল।

নিচে গোলাপ-মা কাহারও সহিত তর্ক করিতেছিলেন।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওখানে কি তর্ক হচ্ছে আবার?"

আমি—গোলাপ-মা কি বকছেন।

মা—কথায় মত্ত হওয়া ভাল নয়। মন্দটাই ভেবে ভেবে দুঃখ পেতে হয়। গোলাপের

সত্য কথা বলতে বলতে চক্ষুলজ্জা ভেঙে গেছে। আমি তো চক্ষুলজ্জা কিছুতেই ছাড়তে পারি না। "অপ্রিয় বচন সত্য কদাপি না কয়।"

আর একদিনও গোলাপ-মা এইরূপ একজনকে অপ্রিয় সত্য বলিয়াছিলেন। তাহাতে মা বলিলেন, "ও কি গোলাপ, এ তোমার কি রকম স্বভাব হচ্ছে?"

দুপুরে একটা মাথা-পাগলা লোক মায়ের কাছে আসিয়া ভারী গোলমাল করিয়াছিল। সেই কথায় মা বলিতেছেন, "তিনি (ঠাকুর) কাউকে জানতেও দেননি—কত সাবধানে রেখেছিলেন। এখন আবার তেমনি বাজারে ঢাক পিটিয়ে দিয়েছে। মাস্টারই এরূপ করলে, যত কথা 'কথামৃতে' ছাপিয়ে দিয়ে মাথা বিগড়ে দিয়েছে। গিরিশবাবু ঠাকুরের উপর ঐরকম জোর, গালমন্দ করেছে কিনা, তাই ওরাও অমন করতে চাচ্ছে।

"আর, কি কেবল এখানেই মন্ত্র নেওয়া! মঠে সব ছেলেবা আছে। তাদের কাছে মন্ত্র নিতে পারে না? তাদের কি শক্তি নেই? সব্বাই আমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্চে। আমি এমন কথা পর্যন্ত বলেছি যে কুলগুরুত্যাগে মহাপাপ হয়। তবু ফিরবে না।"

আমি—তুমি যে মন্ত্র দাও, সে তো ইচ্ছা করেই দাও।

মা—দয়ায় মন্ত্র দিই। ছাড়ে না, কাঁদে, দেখে দয়া হয়। কৃপায় মন্ত্র দিই। নতুবা আমার কি লাভ? মন্ত্র দিলে তার পাপগ্রহণ করতে হয়। ভাবি, শরীরটা তো যাবেই, তবু এদের হোক।

২৪-৪-১২, উদ্বোধন, মায়ের ঘর

দেড়টা বাজিয়াছে। দুপুরে খাওয়ার পর উপরে পান আনিতে গিয়াছি। শুনিলাম কাহারও সম্বন্ধে মা বলিতেছেন—

"স্বভাব ছাড়িতে নারে জীবের দায়, দায়।
স্বভাব ছাড়িয়ে ভজে, ভজি তার পায়।।"

আমি—মা, এর মানে কি?

মা—মানুষ স্বভাব ছাড়তে পারে না। চৈতন্যদেব বলেছিলেন, (পূর্ব) স্বভাব ছেড়ে যে আমার ভজনা করে, তাকে আমি ভজনা করি।

আমি—তুমি জয়রামবাটীতে সেই যে বলেছিলে, 'স্বভাব বদলালে তো হয়।' আব একদিন বললে, 'কারু কারু প্রকৃতিটি এমন যে দেখলে ভালবাসতে ইচ্ছা করে, আবার কাউকে দেখলে কি রকম মনে হয়।'

মা—ঠিক বলেছ, বাবা, তাই তো, স্বভাবই তো সব। আর কি আছে?

আমি—শরৎ মহারাজ গোলাপ-মার কথায় বলেছিলেন, 'একটা ডাব দেবে তো বাড়িসুদ্ধ চেঁচিয়ে বলবে।'

মা—হাঁ, এদের কি স্বভাব হয়েছে এখন। একটুতেই চেঁচিয়ে মেচিয়ে অস্থির করে। যোগেন আগে এমন ছিল, ধীর স্থির। এখন তা নেই। বাবা সহ্যগুণ বড় গুণ—এর চেয়ে আর গুণ নেই।

আমার বড় মাথা ধরিয়াছে। বৈকালে চারিটার সময় উপরে গিয়াছি। মাকে বলিলাম, "মা, বড় মাথা ধরেছে।" মা সব শুনিয়া বলিলেন, "বোধ হয় গরমে হয়েছে।" এই বলিয়া নিজে তাড়াতাড়ি গিয়া একটা পাতায় করিয়া খানিকটা ঘি ও কর্পূর জলে মিশাইয়া হাত দিয়া মাড়িতে মাড়িতে আনিয়া আমার সমস্ত কপালে মালিশ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "এ ওষুধ ঠাকুর লাগাতেন—তাঁর যখন মাথা ধরত।" কয়েক মিনিট মালিশ করিবার পর আমারও একটু ভাল বোধ হইল। আমি নিচে আসিলাম। খানিক পরেই মাথাধরা ছাড়িয়া গেল। মাকে গিয়া বলিলাম, "মা, মাথাধরা থেমেছে।"

পোল্যাণ্ডের একটি মেম বেদান্তশিক্ষার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। কলিকাতায় শ্রীশ্রীমায়ের সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। মেমটি মায়ের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা কহিলেন। তিনি 'বাহাই'-সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, উহাও শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার অনুরূপ—সর্বধর্ম-সমন্বয়। কথায় মনে হইল মেমটি ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত।

মেমটি চলিয়া গেছে মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই যে মেম এসেছিল, কেমন দেখলে?"

মা—বেশ সব।

আমি—এরা কতদূর থেকে এসেছে। পোল্যাণ্ড রুশের রাজ্য। রুশ-জাপানে যুদ্ধ হয়েছিল না? সেই রুশের দেশ।

মা—রুশিয়াদেশের লোক? ভয়ানক যোদ্ধার জাত! ধর্মশিক্ষার জন্য এদেশে এসেছে। লঙ্কায় তিন-চার মাস ছিল।

আমি—এখন সব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কোথায় পোল্যাণ্ড, আর কোথায় 'উদ্বোধন' অফিস! তোমার তো মা ধারণাও নেই।

মা—ঠাকুর ভাবাবস্থায় বলেছিলেন, 'এর পর ঘরে ঘরে আমার পূজা হবে। আমার যে কত লোক তার কুলকিনারা নেই।' নিবেদিতা বলেছিল, 'মা, আমরাও বাঙালী। কর্মবিপাকে ওদেশে জন্মেছি। তা দেখবে আমরাও এমন বাঙালী হয়ে যাব যে ঠিক ঠিক।' ওদের (নিবেদিতা প্রভৃতির) এই শেষ জন্ম।

১৯ বৈশাখ, ১৩১৯, উদ্বোধন, ঠাকুরঘর, সকাল সাতটা

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র চক্রবর্তী কয়েকদিন পূর্বে সস্ত্রীক শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। পরে একদিন তিনি একা আসিয়াছেন। মাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেদিন ওটিকে (স্ত্রীকে) কেমন দেখলেন?" মা বলিলেন, 'বেশ ভাল।'

সুরেনবাবু—আমার কিন্তু ভাল লাগে না।

মা—তোমাদের এখন ঐ এক ভাব হয়েছে।

সুরেনবাবু—মা, আমরাই কেবল ঠাকুরের দর্শন পেলুম না।

মা—পাবে বইকি। তোমাদের এই শেষ জন্ম। নিবেদিতা বলেছিল, 'মা, আমরাও বাঙালী, কর্মের ফেরে খ্রীস্টান হয়ে জন্মেছি।' ওদেরও এই শেষ জন্ম।

মা এইরূপ মাঝে মাঝে অনেকের শেষ জন্ম বলিতেন। তাই মনে করিয়া আজ তাঁহাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, 'শেষ জন্ম' কথাটার মানে কি? ঠাকুর অনেকের শেষ জন্ম বলেছেন, তুমিও বলছ।"

মা—শেষ জন্ম মানে—তার আর যাতায়াত হবে না, এই জন্মেই শেষ হয়ে গেল।

আমি—এদের তো অনেকের বাসনা আছে দেখা যায়—সংসার, ছেলেপুলে, পরিবার। বাসনা না গেলে কি করে যাতায়াত ফুরুবে?

মা—তা তিনি (ঠাকুর) যাকে যা বলেছেন সব সত্য তো। মিথ্যা তো হবার জো নেই। এখন বাসনা থাকুক, আর যাই করুক, তিনি দেখেছেন শেষে তা থাকবে না। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন।

আমি—তাহলে শেষ জন্ম মানে কি নির্বাণ?

মা—তা বইকি। হয়তো দেহ যাবার সময় মন নির্বাসনা হবে।

আমি—মা, ঠাকুর অনেককে আপনার জন বলেছেন, এর মানে কি?

মা—ঠাকুর বলতেন, 'তারা কেউ শরীর থেকে, কেউ লোমকূপ থেকে, কেউ হাত-পা থেকে বেরিয়েছে। তারা সব সঙ্গের সঙ্গী।' যেমন যখন রাজা কোথাও যায়, সব সঙ্গের লোকজন তথায় যায়। আমি যদি জয়রামবাটী যাই, আমার সঙ্গের যারা তারা সব যাবে না? তেমনি যারা আপনার, তারা সব যুগে যুগে সঙ্গী। ঠাকুর বলতেন, 'যারা অন্তরঙ্গ তারা ব্যথার ব্যথী।' এই সব ছেলেদের দেখিয়ে বলতেন, 'এরা আমার সুখে সুখী, দুঃখে দুখী, ব্যথার ব্যথী।' তিনি যখন আসেন, তখন সব হাজির। নরেনকে সপ্তর্ষি থেকে এনেছিলেন—তাও সবটা আসেনি। শম্ভু মল্লিককে মা কালীর পেছনে দেখেছিলেন—দক্ষিণেশ্বরে কালীঘরে ধ্যান করার সময়। বলরামবাবুকে যেমন চেহারা অমনি দেখেছিলেন। প্রথম দেখাতেই বলেছিলেন, 'ঠিক অমনি দেখেছি, মাথায় পাগড়ি, গৌরবর্ণ।' আর সুরেন মিত্তির। বলতেন, 'এই তিনজন রসদদার।' একদিন ঠাকুর বললেন,

'ওরা মা কালীকে ভোগ নিবেদন না করে ছবিকে (ঠাকুরেব ছবিকে) কেন দিলে ?'* আমরা অকল্যাণ হবে বলে মনে মনে ভয় পেলুম। ঠাকুর বললেন, 'ওগো, তোমরা কিছু ভেবো না—এর পর ঘরে ঘরে আমার পূজা হবে। মাইরি বলছি—বাপান্ত দিব্যি।'

"এত করে বলা আবার কার জন্য ? না আমার আর লক্ষ্মীর জন্য। আমাদের তখন অল্প বয়স। অত কি বুঝি ?

"এখনকার লোক সব সেয়ানা—ছবিটি তুলে নিয়েছে। এই যে মাস্টার মশায়—এরা কি কম লোক গা ? যত কথা সব লিখে নিয়েছে। কোন্ অবতারের ছবি আছে, বা কথাবার্তা এই রকম করে লেখা আছে ?"

আমি—'কথামৃত' সম্বন্ধে মাস্টারমশাই বলেছিলেন যে দশ-বার খণ্ড বেরুলে তবে সব কথা বের হতে পারে। তা এত কথা আর কবে বের হবে ?

মা—হাঁ, বয়েস হয়েছে, হয়তো পূর্বেই বা সরে পড়লে।

আমি—মা, তুমি যে আমাকে জয়রামবাটীতে বলেছিলে, ঠাকুর শ্বেতকায় ভক্তদের ভেতর আসবেন। না কি ?

মা—না, তাঁর অনেক শ্বেতকায় ভক্ত আসবে, তাই বলেছি। যেমন এখন সব খ্রীস্টানরা আসছে না ? ঠাকুর বলেছিলেন যে একশ বছর পরে আবার আসবেন। এই একশ বছর ভক্তহৃদয়ে থাকবেন। গোল বারান্দা হতে বালি, উত্তরপাড়ার দিকে দেখিয়ে বলেছিলেন। আমি বললুম, 'আমি আর আসতে পারব না।' লক্ষ্মী বলেছিল, 'আমাকে তামাককাটা করলেও আর আসব না।' ঠাকুর হেসে বললেন, 'যাবে কোথা ? কলমীর দল, এক জায়গায় বসে টানলেই সব এসে পড়বে।'

"আর এত কথারই বা দরকার কি ? ঠাকুব বলতেন, 'আম খেতে এসেছ, আম খেয়ে যাও। অত পাতা ডাল গুণে কি হবে।' "

আমি—কিন্তু মা, কিছু প্রত্যক্ষ না দেখলে কি করে কি হবে ? একবার এক মুসলমান ফকিরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'পুকুরে কি নদীতেই লোকে মাছের আশায় ছিপ ফেলে বসে, গোষ্পদের জলে তো মাছ ধববার জন্য ছিপ ফেলে বসে না! কিছু টের পেয়েছেন কি, যার আশায় ফকির হয়েছেন ?

মা—সে কি বললে ?

আমি—কি আর বলবে ?

এই কথা শুনিয়া মা ঐ বিষয়ে একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "ঠিক কথা, তাই তো। কিছু উপলব্ধি না হলে কি করে কি হবে ? তবে বিশ্বাস করে যেতে হয়।"

* একবাব কতকগুলি ভক্ত মিষ্টান্নাদি লইযা দক্ষিণেশ্বরে যায। গিযা দেখে ঠাকুব সেখানে নাই। তখন তিনি চিকিৎসার্থ কাশীপুবে আছেন। ভক্তেরা সেই সব দ্রব্য ঠাকুরেব ছবিব সামনেই ভোগ দিযা প্রসাদ গ্রহণ কবে।

আমি—শরৎ মহারাজ সেদিন বললেন এবং স্বামীজীও বলেছিলেন, 'মনে কর, পাশের ঘরে একতাল সোনা রয়েছে। একটা চোর এ পাশের ঘর থেকে তা জানতে পেরেছে। মাঝে দেয়াল, তাই নিতে পারছে না। সে লোকটার কি আর ঘুম আসবে? সব সময় ঐ ভাববে—কি করে সোনার তালটা নিতে পারবে। তেমনি এহেন ঈশ্বর বলে কেউ আছেন, এ যদি মানুষ ঠিক ঠিক বুঝতে পারত, তাহলে কি আর এই সব সংসার-ফংসার করতে পারত?'

মা—সে তো ঠিক কথাই।

আমি—যাই বল মা, ত্যাগ-বৈরাগ্যই প্রধান। আমাদের কি হবে না?

মা—হবে বই কি। ঠাকুরের শরণাগত হলে সব হয়। তাঁর ত্যাগই ছিল ঐশ্বর্য। তিনি ত্যাগ করেছিলেন বলে এখন আমরা সব তাঁর নামে খাচ্ছি-দাচ্ছি। লোকে ভাবে, তিনি এত বড় ত্যাগী ছিলেন, তাঁর ভক্ত এঁরা না জানি কত বড় হবে।

"আহা, একদিন খেয়ে নবতের ঘরে গেছেন। বেটুয়ায় মসলা ছিল না। দুটি যোয়ান মৌরি খেতে দিলুম, আর দুটি কাগজে মুড়ে হাতে দিলুম, বললুম, 'নিয়ে যাও।' তিনি নবতের ঘর থেকে ঘরে যাচ্ছেন। কিন্তু ঘরে না গিয়ে সোজা দক্ষিণদিকের নবতের কাছের গঙ্গার ধারের পোস্তায় চলে গেছেন—পথ দেখতে পাননি, হুঁশও নেই। বলছেন, 'মা, ডুবি? মা, ডুবি?' আমি এদিকে ছটফট করছি—ভরতি গঙ্গা। বউ মানুষ, বেরুই না, কোথাও কাউকে দেখিও না। কাকে পাঠাই? শেষে মা কালীর একটি বামুন এদিকে এল। তাকে দিয়ে হৃদয়কে ডাকালুম। হৃদয় খেতে বসেছিল, তাড়াতাড়ি এঁটো হাতেই দৌড়ে একেবারে ধরে তুলে নিয়ে এল। আর একটু হলেই গঙ্গায় পড়ে যেতেন!"

আমি—দক্ষিণমুখো কেন গেলেন?

মা—হাতে দুটি যোয়ান দিয়েছিলুম কিনা। সাধুর সঞ্চয় করতে নেই, তাই পথ দেখতে পাননি। তাঁর যে ষোল আনা ত্যাগ।

"পঞ্চবটীতে এক বৈষ্ণব সাধু এসেছিল। প্রথমটায় তার বেশ ত্যাগ ছিল। আহা, শেষে ইঁদুরের মতো টেনে হিঁচড়ে ক্রমে ঘটিটি, বাটিটি, হাঁড়ি, কলসী, চাল, ডাল, এসব গোছাতে লাগল। ঠাকুর একদিন তাই দেখে বললেন, 'যাঃ রে, এবার মারা পড়বে।'—কিনা মায়ায় বদ্ধ হতে চলল। ঠাকুর তাকে খুব ত্যাগের উপদেশ দিলেন, আর সে স্থান ছেড়ে যেতে বললেন। তবে সে পালাল।"

জনৈক ভক্ত প্রণাম করিতে আসিয়াছিলেন। প্রণাম করিয়া যাইবার পর মা বলিতেছেন, "আমি একবার ঠকেছি কি না সেই হরিশকে আদর করে। তাই এখন আর যত্ন স্নেহ কাউকে দেখাই না।"

১-৫-১২, বৈশাখী পূর্ণিমা, উদ্বোধন

সকালবেলা মায়ের চিঠি পড়িয়া শুনাইতে গিয়াছি। মা তাঁহার ঘরের দক্ষিণপাশের ঘরে উত্তরদিকে দরজার নিকট বসিয়া। আমি ঠাকুরঘর হইতে পড়িয়া মাকে কি একটা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। মা বলিলেন, "এদিকে এসে বসে কথা বল।" আমি গিয়া বসিলাম।

আমি—এক ভক্তের মেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে চিঠি লিখেছে আসবে বলে। প্রণাম জানিয়েছে। সে যে চিঠি লিখেছে এ কথা যেন তার শ্বশুরবাড়িতে না জানে।

মা—থাক, তবে আর জবাব দিয়ে কাজ নেই। আবার বাড়িতে জানবে না! আমি অত লুকোচুবি জানি নে। জয়রামবাটীতে যোগেন্দ্র (পিয়ন) চিঠির জবাব লিখে দিত। অনেকে বলত, 'পিয়ন চিঠি পড়ে?'—কিনা যাকে তাকে দিয়ে চিঠি পড়ানো। কেন? আমার কাছে কোন কপট কিছু তো নেই? আমার চিঠি যে ইচ্ছা সে দেখবে।

এক ভক্ত লিখিয়াছে, মা কবে জয়রামবাটী যাইবেন। আমি মাকে বলিলাম, "লিখে দিই, অগ্রহায়ণ মাসে যাবেন—জগদ্ধাত্রী পূজার সময়।"

মা—না, না, ওসব কি ঠিক বলা যায়? কখন কোথায় থাকি; সব তাঁর হাত। মানুষ এই আছে, এই নাই।

আমি—না, তুমি অমন কেন বলছ? তুমি আছ বলে এত লোক আসছে, শান্তি পাচ্ছে।

মা—তাই তো।

আমি—তুমি আমাদেব জন্য থাক।

মা করুণস্বরে ভক্তদেব জন্য কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিতেছেন, চক্ষে জল, "আহা, এরা আমাকে যত ভালবাসে আমিও এদের তত ভালবাসি।" আমি হাওযা কবিতেছিলাম। করুণকণ্ঠে বলিলেন, "আশীর্বাদ করি বাবা, বেঁচে থাক, ভক্তি হোক, শান্তিতে থাক—শান্তিই প্রধান, শান্তিই চাই।"

আমি—মা, এইটিই কেবল আমার মনে জাগে—ঠাকুরের কেন দেখা পাই না? তিনি যখন আপনাব জন, আব ইচ্ছা কবলেই দেখা দিতে পারেন, তখন কেন তিনি দেখা দেন না?

মা—তাই তো, এত দুঃখকষ্টেও যে কেন তিনি দেখা দেন না, কে জানে? রামের মার (বলরামবাবুর স্ত্রী) অসুখ হয়েছিল। ঠাকুর আমায় বললেন, 'যাও, দেখে এসগে।' আমি বললুম, 'যাব কিসে? গাড়ি টাড়ি নেই।' ঠাকুর বললেন, 'আমার বলরামের সংসার ভেসে যাচ্ছে আর তুমি যাবে না? হেঁটে যাবে। হেঁটে যাও।' শেষে পালকি পাওয়া গেল। দক্ষিণেশ্বর থেকে আসলুম। দুবার এসেছিলুম। আর একবার—তখন আমি শ্যামপুকুরে—বাত্রে হেঁটে রামের মার অসুখ দেখতে আসলুম। দেখ, সেই বলরামের পৌত্র কি সময়ে (নিতাইবাবুর মার শ্রাদ্ধদিনে) মারা গেল। একদিনও কি আগ পাছ হতে নেই? তিনি যদি এ বিপদে না দেখবেন, না দেখা দেবেন, তবে মানুষ যাবে কোথা?

আমি—দুঃখকষ্ট শরীরধারণ করলে আছেই। তাঁকে দুঃখ দূর করতেও বলি না। কিন্তু তিনি কি দুঃখকষ্টে দেখা দিয়ে প্রবোধ দিতেও পারেন না।

মা—আহা, তাই তো। এই রামের মা, রামের বউ, এরা আসল। ভাবলে যাই, মায়ের কাছে যাই। এখানে এসে তবু খানিকটা শান্তি পেলে।* তাই তো ঠাকুরকে বলতুম। তিনি বলতেন, 'আমার লাখ লাখ আছে। আমার তা (জিনিস) আমি পেছন দিকে কাটব, ন্যাজে কাটব, মারব।'

আমি—আমরা যে কষ্ট পাই তা তিনি দেখবেন না?

মা—তা তোমার মতো কত আছে তাঁর। তিনি বলতেন, 'চিদানন্দসিন্ধু'—এমন কত উঠছে, কত ডুবছে, কূলকিনারা নেই।

আমি—মা, যারা এমনিভাবে এই ডালগোলার লোকগুলির মতো আছে (তখন 'উদ্বোধনের' সামনে ডালগোলা ছিল) তারা বেশ আছে। কিন্তু মা, যাদের খানিক হুশ হয়েছে, যারা তাঁকে চায়, তারা যদি দেখা না পায় তাদের যে কি কষ্ট, তারাই জানে।

মা—হাঁ, তাই তো। ওরা বেশ আছে। খাচ্চে দাচ্চে, আছে। ভক্তদের যত কষ্ট।

আমি—তোমার কি এদের (ভক্তদের) দুঃখকষ্ট দেখে কষ্ট হয় না?

মা—আমার কি কষ্ট? যার জগৎ তিনিই দেখছেন।

আমি—ভক্তদের জন্য তোমার আসতে ইচ্ছা হয় না?

মা—দেহধারণে যা কষ্ট! আর না, আর না—আর যেন আসতে না হয়। ঠাকুরের অসুখের সময় দুর্গাচরণ, তিন দিন খাওয়া নেই দাওয়া নেই খুঁজে খুঁজে আমলকী আনলে। ঠাকুর খেতে চেয়েছিলেন। ঠাকুর তাকে প্রসাদ করে দিতে গিয়ে ভাত বেশ এত কটা খেলেন। বললুম, 'এই তো বেশ খাচ্চ, তবে আর সুজি খাওয়া কেন? ভাত দুটি দুটি খাবে।' ঠাকুর বললেন, 'না, না, শেষ অবস্থায় এই আহারই ভাল।' এক একদিন নাক দিয়ে, গলা দিয়ে সুজি বেরিয়ে পড়ত—অসহ্য কষ্ট হতো। আহা, তারকেশ্বরে বাবার কাছে হত্যা দিতে গেলুম, তাতেও কিছু হলো না। একদিন যায়, দুদিন যায়, পড়েই আছি। রাতে একটা শব্দ পেয়ে চমকে উঠলুম—যেমন অনেকগুলো হাঁড়ি সাজান থাকলে তার উপর ঘা মেরে কেউ একটা হাঁড়ি ভেঙে দেয়, সেই রকম শব্দ। জেগেই হঠাৎ আমার মনে এমন ভাব এল, 'এ জগতে কে কার স্বামী? এ সংসারে কে কার? কার জন্য আমি এখানে প্রাণহত্যা করতে বসেছি?'—একরারে সব মায়া কাটিয়ে এমনি বৈরাগ্য এনে দিলে। আমি উঠে গিয়ে অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে মন্দিরের পিছনে কুণ্ড থেকে স্নানজল নিয়ে চোখে মুখে দিলুম, খানিকটা খেলুম—পিপাসায় গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, না খেয়ে পড়েছিলুম

* রামবাবুর এই একমাত্র পুত্র মারা যাইবার পর তাহারা সান্ত্বনা পাইয়া চলিয়া গেলে মা আমাকে বলিলেন 'পেটের ছেলে, রক্তমাংসের শরীর থেকে বেরোয়, তাই এত মায়া। মাগুলোর যত কষ্ট। মায়া কি করে যাবে?'

কিনা। তবে প্রাণ একটু সুস্থ হলো। তার পরদিনই চলে আসি। আসতেই ঠাকুর বললেন, 'কিগো, কিছু হলো?—কিছুই না।' ঠাকুরও স্বপ্নে দেখেন ওষুধ আনতে হাতি গেল। হাতি মাটি খুঁড়ছে ওষুধের জন্য। এমন সময় গোপাল এসে স্বপ্ন ভেঙে দিলে। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি স্বপ্নটপ্ন দেখ?'

"দেখলুম, মা কালী ঘাড় কাত করে রয়েছেন। বললুম, 'মা, তুমি কেন এমন করে আছ?' মা কালী বললেন, 'ওর ঐটের জন্য (ঠাকুরের গলার ঘা দেখিয়ে), আমারও হয়েছে।' ঠাকুর বললেন, 'যা ভোগ আমার উপর দিয়েই হয়ে গেল। তোমাদের আর কারুকে কষ্ট ভোগ করতে হবে না। জগতের সকলের জন্য আমি ভোগ করে গেলুম।' গিরিশের পাপ নিয়ে এই ব্যাধি। তা গিরিশও শেষটায় ভুগলে।

"যত ভোগ, সব এখানেই তো (পৃথিবীতে) হচ্চে। আর কোথায় কি? ভুগে ভুগে, ঢাক, ঢোল সব বাজিয়ে শেষে ধনুরীর হাতে পড়ে তবে তুঁহু তুঁহু ডাক ছাড়ে।"

আমি—তা এর পর কি আর তোমার আমাদের মনে থাকবে?

মা—সেখানের আনন্দ পেলে হয়তো এ মনে থাকবে না। বাবা, কালই প্রধান। কালবশে কি হবে কে জানে?

আমি—কালবশেও হচ্চে, আবার কালজয়ীও তো আছে?

মা—হাঁ, তাও আছে।

আমি—মা, তুমি সুস্থ থাক, তবেই তো হয়।

আটটা বাজিয়াছে। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আটটা কি বেজেছে? বোধ হয় বেজেছে। যাই, বাবা, পূজো করতে যাই।"

এই বলিয়া উঠিতেছেন ও বলিতেছেন, "আর বাবা আশীর্বাদ কর, যাতে সুস্থ থাকি।"

পূজা হইয়া গেলে মায়ের চিঠি পড়িয়া শুনাইতে গিয়াছি। তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত জনৈক ভক্তের কাশীলাভ হইয়াছে। শুনিয়া মা বলিলেন, মরতে তো হবেই একদিন। কোথায় কোন পুকুরপাড়ে ডোবায় মরত—তা না হয়ে কাশীলাভ হলো।"

মামাদের পত্রে অর্থের আকাঙ্ক্ষা ও ঝগড়া-বিরোধের কথা আছে। আমি বলিলাম, "তাদের খুব করে টাকা দাও। ঠাকুরকে বল। বেশ ভোগ করুক, যাতে নিবৃত্তি হয়।"

মা—ওদের কি আর নিবৃত্তি আছে? ওদের কিছুতেই নিবৃত্তি হবে না। শত দিলেও না। সংসারী লোকদের কি আর নিবৃত্তি হয়?

"ওদের ওখানে কেবল দুঃখের কাহিনী। কেলেটাই কেবল টাকা টাকা করে। আবার ওর দেখাদেখি প্রসন্নও এখন করছে। বরদা কখনো চায় না, বলে—দিদি কোথায় টাকা পাবে?

আমি—পাগলীও না।

মা—তাকে দিলেও নেয় না।

আমি—ওঁদের ওখানে কেন জন্ম নিলে ?

মা—কেন ? আমার বাপ মা বড় ভাল ছিলেন। বাবা বড় রামভক্ত ছিলেন। নৈষ্ঠিক, অন্য বর্ণের গ্রহণ করতেন না। মায়ের কত দয়া ছিল। লোকদের কত খাওয়াতেন, যত্ন করতেন, কত সরল। বাবা তামাক খেতে খুব ভালবাসতেন। তা এমন সরল অমায়িক ছিলেন যে, যে কেউ বাড়ির কাছ দিয়ে যেত, ডেকে বসাতেন, আর বলতেন, 'বস ভাই, তামাক খাও।' এই বলে নিজেই ছিলিম ছিলিম তামাক সেজে খাওয়াতেন। বাপ মায়ের তপস্যা না থাকলে কি (ভগবান) জন্ম নেয় ?

২৫-৬-১২, উদ্বোধন

ঠাকুরঘরের পাশের ঘরে মায়ের তক্তপোশের নিকটেই বসিয়া সকালবেলা কথা হইতেছে।

আমি—মা, এই যে কেউ কেউ বলেন, মঠের সেবাশ্রম, হাসপাতাল, বইবেচা, হিসাব-নিকাশ প্রভৃতি সাধুরা যে করছে, এ ভাল নয়। ঠাকুর কি এসব কিছু করেছিলেন। নতুন নতুন যারা ব্যাকুলতা নিয়ে মঠে ঢুকছে, তাদের ঘাড়ে এই সব কর্ম চাপিয়ে দিচ্ছে। কর্ম করতে হয়তো পূজা, জপ, ধ্যান, কীর্তন—এই সব করবে। অন্য সব কর্ম বাসনা জড়িয়ে ঈশ্বর থেকে বিমুখ করে।

মা—তোমরা ওদের কথা শুনো না। কাজ করবে না তো দিনরাত কি নিয়ে থাকবে ? চব্বিশ ঘণ্টা কি ধ্যানজপ করা যায় ? ঠাকুরের কথা বলছে—তাঁর আলাদা। আর তাঁর মাছের ঝোল, ঘিয়ের বাটি মথুর যোগাত। এখানে একটি কাজ নিয়ে আছ বলে খাওয়াটি জুটছে। নইলে দুয়ারে দুয়ারে কোথায় একমুঠোর জন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে ? শরীরে অসুখ হয়ে পড়বে। আর কেই বা এখন সাধুদের এত ভিক্ষা দিচ্ছে ? তোমরা ওসব কথা কিছু শুনো না। ঠাকুর যেমন চালাচ্ছেন তেমনি চলবে। মঠ এমনিভাবেই চলবে। এতে যারা পারবে না তারা চলে যাবে।

"মণি মল্লিক সাধু দেখে এসে ঠাকুরকে বললে। ঠাকুর বললেন, 'কি গো, কেমন সব সাধু দেখলে ?' সে বললে, 'হাঁ, দেখলুম তো, তবে—।' ঠাকুর বললেন, 'তবে কি ?' মণি মল্লিক বললে, 'সব্বাই পয়সা চায়।' ঠাকুর বললেন, 'কি আর পয়সা চায় ? হয়তো একটা পয়সা, গাঁজা কি তামাক খাবে—এই পর্যন্ত। তোমার ঘিয়ের বাটি, দুধের বাটি, গদি—এ সব চাই। আর তার একটা আধটা পয়সা মাত্র—হয়তো একটু তামাক কি গাঁজা খাবে। এও চাই নে ? সব ভোগ তোমরাই করবে ? আর তারা এক পয়সার তামাকও খাবে না' ?"

আমি—বাসনা থেকেই ভোগ। চৌতলা বাড়িতে বাস করলেও যার বাসনা নেই তার কিছুই না। আর গাছতলায় বাস করেও বাসনা থাকলে ঐ থেকেই সব ভোগ এসে পড়ে।

ঠাকুর বলতেন, 'মহামায়ার এমনি খেলা যে, যার তিন কুলে কেউ নেই তাকে দিয়েও একটা বেরাল পুষিয়ে সংসার করাবে।'

মা—তাই তো; বাসনা থেকেই সব। বাসনা না থাকলে কিসের কি? এই যে আমি এসব নিয়ে আছি, কই, আমার তো কোন বাসনা হয় না—কিছুই না।

আমি—তা তোমার আবার বাসনা কি? মা, আমাদের ভেতরে কত কি তুচ্ছ বাসনা উঠছে, এসব কি করে যাবে?

মা—তোমাদের ওসব কোন বাসনা নয়। ও কিছু নয়। মনের খেয়ালে অমনি উঠছে, যাচ্ছে। ওসব যত বেরিয়ে যায় তত ভাল।"*

আমি—কাল বসে বসে ভাবছিলুম যে ঈশ্বর যদি রক্ষা না করেন তো কাঁহাতক মনের সঙ্গে লড়াই করা যায়? এক বাসনা যাচ্ছে তো অন্য বাসনা উঠছে।

মা—যতক্ষণ 'আমি' রয়েছে ততক্ষণ বাসনা তো থাকবেই। ওসব বাসনায় তোমাদের কিছু হবে না। তিনিই রক্ষা করবেন। যে তাঁর শরণাগত, যে সব ছেড়ে তাঁর আশ্রয় নিয়েছে, যে ভাল হতে চায়, তাকে তিনি যদি রক্ষা না করেন, সে তো তাঁরই মহাপাপ। তাঁর উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। তিনি ভাল করতে হয় করুন, ডোবাতে হয় ডোবান। তবে ভাল কাজটি করে যেতে হয় আর তাও তিনি যেমন শক্তি দেন।

আমি—আমার কি সেই নির্ভর আছে? হয়তো খানিকটা নির্ভর আসে, আবার তা চলে যায়। তিনি যদি নিজে রক্ষা না করেন তো উপায় কি? মনে ভাবি, এখন মা, তুমি আছ, আপদ হোক, বিপদ হোক, এসে তোমার কাছে বলি, তোমার মুখ চেয়ে শান্তি পাই। এর পর কে রক্ষা করবে? তুমি যদি ফিরে চাও, তবে তো হয়?

মা—ভয় কি বাবা? তোমাব কোন ভয় নেই। তোমাদের সংসার, পরিবার, ছেলেপুলে—এসব তো কিছু হবে না, তোমাদের ভয় কি? আর এর মধ্যে, আমি থাকতেই তোমরা তৈরি হয়ে যাবে।

আমি—ভাবি, ঈশ্বর যদি ফিরে না চান তো জপতপেই বা কি হবে? তিনি যদি রক্ষা করেন, তবেই রক্ষা।

মা—না, তোমার কোন ভয় নেই। তিনি রক্ষা করবেন। তুমি কিছু ভেবো না।

* জনৈক ত্যাগী ভক্ত একবার মাকে জিজ্ঞাসা কবিয়াছিল, "মা, সাধন-ভজন তো করা যাচ্ছে, চেষ্টাও কম করছি না, কিন্তু মনের আবর্জনা যেন কমছে না।" মা বললেন, "নাটাইতে সুতো যেভাবে গুটিযেছ—লাল সুতো, কালো, সাদা—খোলবাব সময তেমনি কবে কবে খুলবে তো?"

৭-৭-১২, উদ্বোধন

আমি—মা, তুমি রথযাত্রার সময় জগন্নাথ যাবে, কথা ছিল না?

মা—এখন এত লোকের ভিড়ের মধ্যে যেতে আছে? কলেরা টলেরা হবে। লক্ষ্মীকান্ত (পাণ্ডা) বললে, এখনই ঘর সব ভাড়া হয়ে গেছে, স্থান নেই। ছোট ছোট ঘরগুলি পর্যন্ত দশ টাকা। শীতকালে যাবেন।'

আমি—জগন্নাথ কি মূর্তি?

মা—আমি কিন্তু স্বপনে দেখেছিলুম শিবমূর্তি।

আমি—তখন তুমি সেখানে এই জগন্নাথ-মূর্তি দেখনি?

মা—না, শুধু শিবমূর্তি—শিবলিঙ্গ। লক্ষ শালগ্রামের বেদী, তার উপর জগন্নাথ শিব। একটা কিছু না থাকলে কি আর এত লোক হয়? বিমলা দেবী আছেন। তাঁর বলি হয় মহাষ্টমীর রাত্রে। বিমলা দুর্গা তো? কাজেই শিব থাকবেন না?

আমি— কেউ কেউ বলে বৌদ্ধমন্দির, বুদ্ধমূর্তি। তারপর শঙ্করাচার্য যখন বৌদ্ধদের তাড়ালেন, তখন ঐ মূর্তিকেই আবার শিবমূর্তি করে তুললে। পরে আবার বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের সঙ্গে শিবকে জগন্নাথ-বিষ্ণু করে দিলে।

মা—কি জানি, আমি কিন্তু শিব দেখেছিলুম।

আমি—মুসলমানেরা কত মন্দির, কত দেবদেবী ভেঙেছে, কারও নাক কেটেছে, কারও কান কেটেছে।

মা – মুসলমানের ভয়ে বৃন্দাবনের গোবিন্দজী জয়পুরে পালালেন। পাণ্ডারা ধন্না দিলে। শেষে দৈববাণী হলো, মূর্তি গিয়েছে, আমি যাইনি। তোমরা আবার মূর্তি কর, সেই মূর্তিতেই আমি থাকব।'

আমি– গুজরাটে সোমনাথের মন্দির, গঙ্গোত্রীর জলে রোজ স্নান হতো। মানুষের মাথায় মাথায় রোজ নতুন জল আসত। সুলতান মামুদ ভেঙে চুরমার করে দিলে। মন্দিরের চন্দনকাঠের দরজা নিয়ে গেল। এমন কেন হয়?

মা —দুষ্টলোকের ভয়ে তিনি পালান। তাই বা কেন? তিনি ইচ্ছা করলে তো সবই পারেন। তবে এ ও তাঁর এক লীলা।

আমি —মা, কর্মের ফল কি খণ্ডন হয়? শাস্ত্রে বলে জ্ঞান হলে খণ্ডন হয়। তাও প্রারব্ধ ভোগ করতে হয়।

মা—কর্ম হতেই সুখ দুঃখ সব। তাঁকেও কর্মফল ভোগ করতে হয়েছিল। ঠাকুরের বড় ভাই বিকারের সময় জল খাচ্ছিলেন। একটুখানি খেতেই ঠাকুর হাত থেকে গ্লাসটি টেনে নিলেন। তিনি তাতে অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'তুই আমাকে জল খেতে দিলিনি, তুইও এমনি কষ্ট পাবি, তোরও গলায় এমনি যাতনা হবে।' ঠাকুর বললেন, 'দাদা, আমি তো তোমার মন্দ করিনি। তোমার অসুখ, জল খেলে অনিষ্ট হবে, তাই দিইনি। তবে কেন তুমি আমায়

এমন শাপ দিলে?' তিনি কেঁদে বললেন, 'কি জানি, ভাই, আমার মুখ থেকে ওকথা বেরিয়ে পড়ল। এ তো অন্যথা হবে না।' ঠাকুরের অসুখের সময় আমাকে বললেন, 'এই তার শাপে গলায় ঘা। তা তোমাদের আর কারু কিছু হবে না, যা ভোগ আমারই হলো।' আমি বললুম, 'এমন হলে মানুষ কি করে থাকবে, যখন তোমারই একপ হলো?' তিনি বললেন, 'তার সে সিদ্ধ-বাক্য ছিল, ভাল লোক। এমনি যে-সে বললে কি হয়?'

"কর্মফল ভুগতে হবেই। তবে ঈশ্বরের নাম করলে যেখানে ফাল সেঁধুত, সেখানে ছুঁচ ফুটবে। জপ তপ করলে কর্ম অনেকটা খণ্ডন হয়। যেমন সুরথ রাজা লক্ষ বলি দিয়ে দেবীর আরাধনা করেছিল বলে লক্ষ পাঁঠায় মিলে তাঁকে এক কোপে কাটলে। তার আর পৃথক লক্ষ বার জন্ম নিতে হলো না। দেবীর আরাধনা করেছিল কিনা। ভগবানের নামে কমে যায়।"

আমি—তাহলে কর্মের প্রাধান্যই তো জগৎ চলছে। তবে আর ভগবান মানা কেন? বৌদ্ধেরাও কর্ম মানে, ঈশ্বর মানে না।

মা—তবে কি কালী, কৃষ্ণ, দুর্গা, এসব নেই বলতে চাও?

আমি—জপতপের দ্বারা খণ্ডন হয়?

মা—তা হবে না? ভাল কাজটি করা ভাল। ভালটি করলে ভাল থাকে, মন্দটি করলে কষ্ট পেতে হয়।

আমি—আচ্ছা মা তুমি জয়রামবাটীতে বলেছিলে, সব এক সময়ে সৃষ্টি হয়েছে। যা হয়েছে সব এক কালে হয়েছে একটি একটি করে হয়নি।

মা—তিনি কি আর একটি একটি করে সৃষ্টি করেছেন? এ যেন তাঁর একটা কল চলছে এই যেমন ময়দার কল। কলওয়ালা দেখছে, কলটি যাতে নষ্ট না হয়। সে কি কোথায় একটি একটি করে গম গুঁড়ো হচ্ছে দেখছে? তেমনি তাঁর কলটি তিনি ঠিক রাখছেন। কোথায় কে কি খুঁটিনাটি করছে তা কি তিনি অত দেখছেন? তাঁর অনন্ত সৃষ্টি, তাকে সবক্ষণ দেখতে হচ্ছে। অত খুঁটিনাটি দেখলে কি চলে?

উদ্বোধন—সকালবেলা

আমি—মা, তোমাকে কখনো কখনো রামায়ণ পড়তে দেখি। পড়তে কবে শিখলে?

মা—ছেলেবেলায় প্রসন্ন, রামনাথ ওরা সব পাঠশালায় যেত। ওদের সঙ্গে কখনো কখনো যেতুম। তাতেই একটু শিখেছিলুম। পরে কামারপুকুরে লক্ষ্মী আর আমি 'বর্ণ-পরিচয় একটু একটু পড়তুম। ভাগনে (হৃদয়) বই কেড়ে নিলে। বললে, 'মেয়েমানুষের লেখা-পড়া শিখতে নেই, শেষে কি নাটক নভেল পড়বে?' লক্ষ্মী তার বই ছাড়লে না। ঝিয়ারী মানুষ কিনা, জোর করে রাখলে। আমি আবার গোপনে আর একখানি

এক আনা দিয়ে কিনে আনালুম। লক্ষ্মী গিয়ে পাঠশালায় পড়ে আসত। সে এসে আবার আমায় পড়াত। ভাল করে শেখা হয় দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর তখন চিকিৎসার জন্য শ্যামপুকুরে। একাটি একাটি আছি। ভব মুখুজ্জ্যেদের একটি মেয়ে আসত নাইতে। সে মধ্যে মধ্যে অনেকক্ষণ আমার কাছে থাকত। সে রোজ নাইবার সময় পাঠ দিত ও নিত। আমি তাকে শাকপাতা, বাগান হতে যা আমার এখানে দিত, তাই খুব করে দিতুম।

আমি—মা, ঠাকুর জয়রামবাটী কি অনেকবার গিয়েছিলেন, না এক আধ বার।

মা—অনেক বার গেছেন। এক একবার গিয়ে দশ বার দিন থাকতেন। যখন দেশে যেতেন, তখন জয়রামবাটী, শিওড়, এসব হয়ে আসতেন। শিওড়ে রাখাল বালকদের খাওয়ালেন।

আমি—এ কোন সময়? সাধনার সময় না তারপর?

মা—সাধনার পর। সাধনার সময় তো উন্মাদ। তখন শ্বশুরবাড়ি গেলে তো লোকে পাগল বলবে। শিব শ্বশুরবাড়ি গেলেন। সব্বাই বলতে লাগল, 'ওমা উমা, তোর এই ছিল কপালে! শেষে ভাঙ্গড়ের হাতে গেলে!' সেই তখন (বিবাহের পর) ঠাকুরকে কত কি সবাই বলত—'পাগলা জামাই, কি হবে গো?'

আমি—কাল যে মণীন্দ্র গুপ্ত এসেছিলেন, এঁকে তো আর কখনো দেখিনি।

মা—এ আর একবার এসেছিল। ঠাকুরের কাছে যেত, তখন খুব ছোটটি।

আমি—ছোট নরেনকে এখানে একবারও দেখিনি।

মা—সে আসে না। ঠাকুরের কাছে যেত। কালো ছিপছিপে, মুখে বসন্তের দাগ। ঠাকুর তাকে খুব ভালবাসতেন। তার জন্য ভাবতেন; "এই ছোট নরেনকে মনে পড়েছে, এই ছোট নরেন এল"—ভাবে দেখতেন।

আমি—পলটুবাবু একদিন মাত্র এখানে এসেছিলেন। তারকবাবু (বেলঘরিয়া) মধ্যে মধ্যে আসেন।

মা—পতুও মাঝে মাঝে আসে। আমাকে মাস মাস একটি করে টাকা দেয়। বড় গরিব। আমি যখন জয়রামবাটীতে থাকি তখন সেখানে পাঠায়। পতু আর মণীন্দ্র এরা দুটিতে যখন ঠাকুরের কাছে যেত তখন ছেলেমানুষ, দশ-এগার বছরের। দোলের দিন সব বাইরে চলে গেছে, আবীর দিচ্ছে, কাশীপুর বাগানে। এরা দুটি গেল না। ঠাকুরকে হাওয়া করতে লাগল—এই এ হাতে, এই সে হাতে। ছেলেমানুষ কি না, হাতে পায় না। এই পা টিপছে। ঠাকুরের তখন কাশি ছিল, তাই মাথায় জ্বালা করত। হাওয়া দরকার হতো। ঠাকুর বলছেন, 'যা যা, তোরা নিচে যা, আবীর খেলগে না, সব্বাই গেছে।' পতু বলছে, 'না, মশাই, আমরা যাব না। আমরা এইখানে আছি। আপনি রয়েছেন, আমরা কি ফেলে যেতে পারি?'

"ওরা কিছুতেই গেল না। ঠাকুর কেঁদে বললেন, 'আরে, এরাই আমার সেই রামলালা, আমাকে সেবা করতে এসেছে। ছেলেমানুষ, তবু আমাকে ফেলে আমোদের দিকে ফিরে চাইলে না', বলতে বলতে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ল দেখলুম।"

আমি—ঠাকুরের কাছে কত ভক্ত যেত, তারা সব এখন কোথায়? কেউ তো আসে না।

মা—তারা সব আপন মনে আনন্দে আছে।

আমি—যে আনন্দে আছে!

মা—তা তো বটেই। সংসারে মাগ ছেলে নিয়ে কি আর সুখ আছে? কামিনী আর কাঞ্চন, ওতেই ভুলে রয়েছে। সংসারে সবই ভোগের।

আমি—তাতে আবার বহির্মুখ মন।

মা—জগদম্বা কালী। তিনিই সকলের মা, তাঁ থেকেই ভালমন্দ সব হয়েছে। তিনি সব প্রসব ক'রেছেন। স্বতঃসিদ্ধ, সাধনসিদ্ধ, কৃপাসিদ্ধ, হঠাৎসিদ্ধ—এই রকম সব আছে না?

আমি—হঠাৎসিদ্ধ কি?

মা—যেমন পরের ধন পেয়ে হঠাৎ বড়মানুষ হয়ে গেল।

এই সময় নলিনী স্নান করিয়া আসিল। উপরের পায়খানা একটু অপরিষ্কার ছিল, তাহাতে দুই-এক ঘটি জল ঢালিয়া দিয়া ধুইয়াছিল। সেইজন্য গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়াছে। মা দেখিয়া বলিলেন, "নলিনী, গঙ্গা নেয়ে এলি নাকি?" নলিনী কারণ বলিল।

আমি—কলে নাইলেই তো হতো।

মা—তাই তো, কলে নেয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করলেই তো হতো। (নলিনীর শরীর ভাল ছিল না।)

নলিনী—তা কি হয়, পায়খানা।

মা—তাতে কি! বিষ্ঠা তো আর ছুঁসনি। আর ছুঁলেই বা কি? পেটের মধ্যেও তো রয়েছে। ঠাকুর বলতেন, 'একটা গামলায় ডাল, ভাত, তরকারি, ছানা, মাখন রেখে দাও, দুদিন পরে পচে দুর্গন্ধ হবে। বিষ্ঠাও তো তাই।' তিনি দক্ষিণেশ্বরে নিজেব মল মুখে দিলেন। ন্যাংটা (তোতাপুরী) বললে, 'ও তো আপনার মল।' তখন ঠাকুর কোথা গিয়ে চাখলেন।

"আমিও তো দেশে কত শুকনো বিষ্ঠা মাড়িয়ে চলেছি। দুবার 'গোবিন্দ গোবিন্দ' বললুম, বস্ শুদ্ধ হয়ে গেল। মনেতেই সব, মনেই শুদ্ধ, মনেই অশুদ্ধ। মানুষ নিজের মনটি আগে দোষী করে নিয়ে তবে পরের দোষ দেখে। পরের দোষ দেখলে তাদের কি হয়?—নিজেরই ক্ষতি। আমার এইটি ছেলেবেলা থেকেই স্বভাব যে আমি কারও দোষ দেখতে পারতুম না। আমার জন্য যে এতটুকু করে আমি তাকে তাই দিয়ে মনে রাখতে চেষ্টা করি। তা আবার মানুষের দোষ দেখা? মানুষের কি দোষ দেখতে আছে! ওটি শিখিনি। ক্ষমারূপ তপস্যা।"

আমি—স্বামীজী বলতেন, 'ঘরে চোর ঢুকে কিছু নিয়ে গেল, তোমার মনে উঠবে—চোর, চোর। কিন্তু শিশুর মনে চোর-বুদ্ধি নেই; সে চোর বলে কিছুই দেখলে না।'

মা—তা তো বটেই। যার শুদ্ধ মন, সে সব শুদ্ধ দেখে। এই গোলাপের (তখন গোলাপ—মা কিজন্য আসিয়াছেন) মনটি শুদ্ধ। বৃন্দাবনে মাধবজীর মন্দিরে কাদের ছেলেমেয়ে বাহ্যে করে গেছে। সব্বাই বলছে, 'বিষ্ঠা, বিষ্ঠা', কিন্তু কেউ ফেলবার চেষ্টা করছে না। গোলাপ তাই দেখে অমনি নিজের ধুতি—নতুন মলমলের ধুতি—ছিঁড়ে পুঁছে ফেলে দিলে। স্ত্রীলোকগুলো দেখে বলছে, 'এ যখন ফেলেছে, তখন এরই ছেলে বাহ্যে করেছে!' আমি মনে মনে বলছি, 'দেখ মাধব, কি বলছে।' কেউ বা বলছে, এরা সাধুলোক (যোগীন স্বামী প্রভৃতি ছিলেন), এঁদের আবার ছেলেপিলে কি? এঁরা ফেলছেন সকলের দর্শনের অসুবিধা হচ্ছে, মন্দিরে বিষ্ঠা রয়েছে, এ জন্য।'

"এই গঙ্গার ঘাটে যদি কোন ময়লা থাকে তো গোলাপ হেথা সেথা থেকে ন্যাকড়া কুড়িয়ে এনে পরিষ্কাব করে ঘটি ঘটি জল ঢেলে ধুযে দিলে। এতে দশজনের সুবিধা হলো। তারা যে শান্তি পেলে, ওতে গোলাপের মঙ্গল হবে, তাদেব শান্তিতে এরও শান্তি হবে।

"অনেক সাধন তপস্যা কবলে, পূর্বজন্মের অনেক তপস্যা থাকলে, তবে এ জন্মে মনটি শুদ্ধ হয।"

কিছু পবে আমি বলিলাম, "মা, আমার তো জপ করতে মন লাগে না।"

মা হাসিয়া বলিলেন, "কেন, মোটেই না?"

আমি—ঐ একটু আধটু, কোনমতে বেগারশোধ। একটু করেই ভাবি, বিড়বিড করে কি হবে? ঈশ্বব যদি থাকেন তো আছেনই। ববং ধ্যান কবতে চেষ্টা কবি।

মা—ধ্যান হয?

আমি—না, হয কই? সব তো বুঝি, তবে শক্তি কোথা? দক্ষিণেশ্বরে কোন বাস্তায় যেতে হবে, তা তো জান, কিন্তু হেঁটে যেতে পাব কি?

মা—ও জপ বিড়বিড় করা মেয়েদের কর্ম, তোমাদেব জ্ঞান আছে।

বৈকালে ললিতবাবু প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত কথা হইতেছিল। আমিও মাঝে মাঝে বলিতেছিলাম।

মা বলিতেছিলেন, "ঠাকুব বলতেন, 'ক্ষুবের ধারের ন্যায় পথ বড কঠিন বাস্তা'।" বলিয়াই একটু পবে আবার বলিতেছেন, "তা তিনিই কোলে করে রয়েছেন, তিনিই দেখছেন।"

আমি—কই, কিছু জানতে দিচ্ছেন না যে!

মা—সেই তো দুঃখ (তোমাদের)।

আমি—হাঁ।

ললিতবাবু—মরলে পব ঠাকুর কোলে করে নেবেন, সে আর বেশি কি? যদি এই দেহেই নিতেন।

মা—এই দেহেই কোলে করে রয়েছেন। মাথার উপরে তিনি আছেন, ঠিক ধরে রয়েছেন।

আমি—ঠিক আমাদের ধরে রয়েছেন?

মা—হাঁ, ঠিক ধরে রয়েছেন।

আমি—সত্যি বলছ?

মা—হাঁ, সত্যি বলছি, ঠিক ধরে রয়েছেন।

আমি—ঠিক?

মা—(দৃঢ়তার সহিত) হাঁ, ঠিক।

সকালের পূজা শেষ করিয়া মা শালপাতায় করিয়া ভক্তগণকে প্রসাদবিতরণ করিলেন। তারপর ঘরঝাঁট দিয়া ওঁচলাগুলি হাতে তুলিযা লইবার সময় হঠাৎ একটা আলপিন তাঁহার অঙ্গুষ্ঠে ফুটিয়া গেল। উহাতে রক্ত বাহির হইল এবং খুব যাতনা হইতে লাগিল। আমি নিচে সংবাদ পাইয়াই ছুটিয়া আসিয়া দেখি, খুব যাতনা হইতেছে। আসিবার সময় কে যেন বলিলেন, "চুন গরম করে দাও।" আমি তাড়াতাড়ি চুন গরম কবিয়া উপরে লইয়া গেলাম এবং আঙুলে লাগাইয়া দিলাম। দিতেই যাতনার অনেকটা উপশম হইল। মা বলিলেন, "বাবা, তোমরাই আমার আপনার লোক, তোমরাই আমার আপনার।"

১৬-৮-১২ (৩১ শ্রাবণ), বৈকাল ৫টা

মা—তের বছরের সময় কামারপুকুরে যাত্রার দিন হয়, কামারপুকুর যাই। তখন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে। আমি কামাবপুকুরে মাস খানেক থেকে জয়রামবাটী আসি। আবার পাঁচ ছয় মাস পরে গিয়ে কামারপুকুবে প্রায দেড় মাস থাকি—তখনও ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে। কামারপুকুরে আমার ভাসুর, জা, এঁরা সব ছিলেন। ঠাকুর তারপর যখন ব্রাহ্মণীকে নিয়ে দেশে এলেন (ইং ১৮৬৭), তখন আমাকে খবর দিলেন, ব্রাহ্মণী এসেছেন, তুমি এস।' আমি খবর পেয়ে কামারপুকুর গেলুম। সেবার প্রায় মাস তিনেক ছিলুম। বামুন ঠাকরুন জয়রামবাটী, শিওড়, এসব ঘুরে দেখলেন। একদিন চিনু শাঁখারীর এঁটো নেয়া নিয়ে হৃদয়ের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয়।

আমি—চিনু তখন বেঁচে আছেন?

মা—হাঁ, বেঁচে আছে, বুড়ো অথর্ব।

আমি—কেউ কেউ বইয়ে ঠাকুরের ছেলেবেলাতেই যেন চিনু মাবা গেছেন, এই ভাব দিয়েছেন। *

মা—সে তার অনেক পরে মারা গেছে। ওখানে তার সমাজ আছে, শীতল দেয়।

"বামুন ঠাকরুন বললেন, 'চিনু ভক্ত লোক, তার এঁটো নেব তাতে কি?' হৃদয় বললে,

* রামকৃষ্ণপুঁথি—পৃষ্ঠা ২৪

'তুমি শাঁখারীর এঁটো নেবে, থাকবে কোথা? কোথা শোবে?' বামুন ঠাকরুন বললেন, 'কেন? শীতলার ঘরে মনসা শোবে।'

"হৃদয় বললে, 'দেখি কেমন শীতলার ঘরে মনসা শোয়।' ঐসব নিয়ে হৃদয়ের সঙ্গে ঝগড়া মারামারি হয়। হৃদয় তাঁকে কি একটা ছুঁড়ে মারলে, তাঁর কানে লেগে রক্ত পড়তে লাগল। বামুন ঠাকরুন কাঁদতে লাগলেন। ঠাকুর বললেন, 'ওরে হৃদু, তুই কেন এমন করলি? এ সৎলোক, ভক্তিমতী। ওরে, এমন হলে যে সব লোক জড় হবে, কেলেঙ্কারি হবে।'

"তারপর একদিন ঠাকুর তাঁকে (ব্রাহ্মণীকে) কি রকম ভয় দেখিয়ে দিলেন। কি রকম ভাবাবস্থা দেখে ভয় পেলেন যেন হরিণীর মতো। ভয়ে সর্বক্ষণ এইরকম (উপরের দিকে চাহিয়া) করতে লাগলেন। বললেন, 'ওরে প্রসন্ন (লাহাদের প্রসন্নময়ী), কোথা যাব? ওরে কি করব? জগন্নাথ যাব, না বৃন্দাবন যাব?' তারপর একদিন কোথায় যে কখন চলে গেলেন কেউ টের পেলে না। তদবধি আর আসেননি। পাছে হৃদয়ের সঙ্গে আবার ঝগড়া হয়—লাহাদের বাড়ি কাছে—এই সব জন্য ঠাকুর তাঁকে ঐ রকম ভয় দেখিয়েছিলেন।

"একদিন আবার বামুন ঠাকরুন ঠাকুরকে মালাটালা দিয়ে গৌরাঙ্গের মতো সাজালেন। তখন ঠাকুরের কি রকম ভাব হয়েছে। বামুন ঠাকরুন আমাকে ডেকে নিলেন। যেতেই ঠাকুর বললেন, 'কেমন হয়েছে?' আমি 'বেশ হয়েছে' বলে, কোনমতে যা হয় একটা বলে প্রণাম করেই চলে এলুম। ভাবাবেশ দেখে আমার ভয় হয়েছিল।

"এর পব আবার জয়বামবাটী এলুম। নানা লোকের কাছে শুনতুম তিনি পাগল, উন্মাদ হয়েছেন, উলঙ্গ হয়ে বেড়ান। কেউ তো আর তখন তাঁর ভাব বুঝত না। আমি মনে ভাবলুম সব্বাই এমন বলছে, আমি গিয়ে একবার দেখে আসি কি রকম আছেন। তখন কি যোগ উপলক্ষে আমাদের দেশ থেকে মেয়েরা গঙ্গাস্নানে আসছিল। ফাল্গুন-চৈত্র মাস (১২৭৮ সন) আমি একজনকে বললুম, 'আমি দক্ষিণেশ্বরে তাঁকে দেখতে যাব কেমন আছেন।' সে বাবাকে সব বলে দিলে। আমি তো আর বাবাকে কিছু বলতে পারিনি লজ্জায়, ভয়ে।

"বাবা বললেন, 'যাবে, বেশ তো।' তিনি আমাদের সঙ্গে এলেন। পথে জ্বর হলো। খুব জ্বর, কোন জ্ঞান নেই। রাতে স্বপ্নে দেখি কি একটি কালো কুচকুচে মেয়ে আমার বিছানার পাশে বসে আমার মাথায় হাত বুলুচ্ছে। বললে, 'দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি।' আমি বললুম, 'আমিও তাঁর ওখানে যাব। তুমি আমাদের কে হও? সে বললে, 'আমি তোমার বোন। ভয় কি? সেরে যাবে।'

"পরদিন জ্বর ছেড়ে গেল। বাবা শেষে পালকি করলেন। রাত প্রায় নটার সময় দক্ষিণেশ্বরে পৌছুলুম। আমি একেবারেই ঠাকুরের ঘরে গিয়ে উপস্থিত। এঁরা সব নহবতের ঘরেটরে গিয়েছেন (যেখানে ঠাকুরের মা আছেন)। ঠাকুর দেখে বললেন, 'তুমি এসেছ?

বেশ করেছ।' বললেন, 'মাদুর পেতে দে রে।' ঘরেই মাদুর পেতে দিলে। ঠাকুর বললেন, 'এখন কি আর আমার সেজবাবু আছেন ? আমার ডান হাত ভেঙে গেছে।' তখন কয়েক মাস হয় মথুরবাবু মারা গেছেন। অক্ষয় (ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র) তারও কয়েকমাস আগে মারা গেছে।"

আমি—মথুরবাবু তখন নেই ?

মা—না, কয়েক মাস, সাত-আট মাস আগে মারা গেছেন। মথুরাবাবু থাকলে কি আর আমাকে ঐ কুঁড়েঘরে (নবতে) বাস করতে হয় ? শৌচের যা কষ্ট! তিনি অট্টালিকায় রাখতেন। আমরা নবতের ঘরে যেতে চাইলুম। ঠাকুর বললেন, 'না না, ওখানে ডাক্তার দেখাতে অসুবিধা হবে। এ ঘরেই থাক।' আমরা তাঁর ঘরেই শুলুম। একটি সঙ্গী মেয়ে আমার কাছে শুল। হৃদয় দু-ধামা না তিন ধামা মুড়ি আনলে। তখন সকলের খাওয়া হয়ে গেছে কিনা।

"পরদিন ডাক্তার দেখালেন। কয়েকদিন পরে জ্বর সারতে নবতের ঘরে গেলুম। তখন আমার শাশুড়ী কুঠিঘর ছেড়ে নবতের ঘরে এসে রয়েছেন। কুঠিঘরের একটি কোঠা তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। অক্ষয় তাঁর ঐ কুঠিতেই মারা যায়। সে মারা যেতে মা ঠাকরুন কুঠিঘর ছেড়ে এলেন। বললেন, 'আর আমি ওখানে থাকব না। আমি এই নবতের ঘরেই থাকব, গঙ্গাপানে মুখ করে রইব, কুঠিতে আর আমার দরকার নেই।'

"দক্ষিণেশ্বরে মাস দেড়েক থাকবার পরেই ষোড়শীপূজা করলেন (১২৭৯, জ্যৈষ্ঠ)। আমি তখন ষোল বছরে পড়েছি। * (সম্ভবতঃ ফলহারিণী কালীপূজার) রাত্রে প্রায় নটায় আমাকে তাঁর ঘরে আনালেন। পূজার সব যোগাড়। ভাগনে সব যোগাড় করে দিয়েছে। আমাকে বসতে বললেন। আমি তাঁর চৌকির উত্তর পাশে (গঙ্গাজলের) জালার পানে মুখ করে (পশ্চিম মুখে) বসলুম। ঠাকুর পূর্বমুখ হয়ে পশ্চিমদিকের দরজার কাছে বসেছেন। দরজা সব বন্ধ। আমার ডান পাশে সব পূজার জিনিস।"

আমি—পূজার সময় কি করলেন ?

মা—আমি একটু পরেই বেহুঁশ হয়ে গেলুম। পূজার মধ্যে কি হয়েছে জানতে পারিনি। †

আমি—হুঁশ হতে তুমি কি করলে ?

* শ্রীশ্রীমায়ের জন্ম ৮ পৌষ, ১২৬০ সাল। কোষ্ঠীর হিসাবে ১৯ বছরে পড়িলেও মার কিন্তু ধারণা ছিল তিনি তখন ষোল বছরে পড়িয়াছেন। অন্যত্রও ষোল বছর বলিয়াছেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'তেও এই ভুল আছে।

† লক্ষ্মী দিদির মুখে শুনিয়াছি মা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "পূজার প্রথমে পায়ে আলতা পরিয়ে দিলেন, সিঁদুর দিলেন, কাপড় পরিয়ে দিলেন। পান, মিষ্টি খাওয়ালেন।" লক্ষ্মী দিদি হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তো অত লজ্জা কর—কাপড় কি করে পরালেন গো ?" মা বলিলেন, "আমি তখন কি রকম যেন (অর্ধবাহ্যদশা ?) হয়ে গিছলুম।"

মা—আমি মনে মনে প্রণাম করলুম। পরে চলে এলুম।

আমি—কালীপূজার রাত, এত লোক, কেউ এ পূজা টের পায়নি?

মা—দরজা যে বন্ধ! কালীবাড়িতে গানবাজনা, হৈ রৈ। সবাই তা নিয়ে ব্যস্ত। আর তাঁর সঙ্গে তাঁদের অন্য সম্পর্কই বা কি?—একমাত্র দর্শন-স্পর্শন, আর তো কিছু না।

আমি—পূজার সময় আর কেউ ছিল?

মা—দীনু বলে একটি ছেলে, আমার ভাসুরপো হয়, মুকুন্দপুরের জ্ঞাতির ছেলে, ঠাকুরের কাছে থাকত। তিনি খুব ভালবাসতেন। সে সব ফুল বেলপাতা যোগাড় করে এনে দিতে লাগল। হৃদয় সব ঠিকঠাক করে দিলে। পূজার সময় আর কেউ ছিল না, একা তিনি ছিলেন। পূজার শেষাশেষি হৃদয় এসেছিল।

"রামবাবু বইয়ে লিখেছেন জয়রামবাটীতে ষোড়শী পূজা হয়েছে। আমাদের দেশে এমনিই রক্ষা নেই। এতেই 'কাকে মেয়ে দিলে— উন্মাদ, পাগল!' বলত, তা আবার মেয়েমানুষকে পূজা করা! তা হলে তো হয়েছে!

"এরপর দক্ষিণেশ্বরে প্রায় এক বছর ছিলাম। শেষটায় অসুখ হতে দেশে যাই। * শম্ভুবাবু ডাক্তার প্রসাদবাবুকে দিয়ে চিকিৎসা করিয়েছিলেন (দক্ষিণেশ্বরে)।"

আমি—ঠাকুরের মায়ের শরীর যাবার সময় (১২৮২, ১৬ ফাল্গুন) দক্ষিণেশ্বরে ছিলে কি?

মা—না, জয়রামবাটীতে ছিলাম। তখন আমার অসুখ। দক্ষিণেশ্বরে এক বছর ভুগে দেশে গেছি। বদনগঞ্জে বাজারের শিবমন্দিরে পীলের দাগ নিলুম। †

"দু-তিনবার আসবার পর একবার কাপ্তেন (বিশ্বনাথ উপাধ্যায়) বাহাদুরী কাঠ দিলেন। এখন যেখানে রামলালের বাড়ি ওর পাশে আমার জন্য ঘর হলো। শম্ভুবাবু করালেন। একখানা গুঁড়িকাঠ জোয়ারে ভেসে গেল। হৃদয় এসে 'তোমার ভাগ্য মন্দ'—এই সব

মা জ্ঞানানন্দকেও এই ঘটনা বলিয়াছিলেন। সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল 'মা, ঠাকুর যখন আপনার পায়ে ফুল দিতে গিয়ে হাত দিলেন, মিষ্টি খাওয়ালেন, তখন আপনার সঙ্কোচ বোধ হলো না?' মা বলিলেন, "না, আমি তখন সব দেখছি বটে, কিন্তু কিছু বলতে কইতে ইচ্ছা ছিল না।"

* রামলাল দাদা বলিতেন, তাঁহার পিতার (ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ শ্রীযুত রামেশ্বরের) মৃত্যুকালে (১২৮০, ২৭ অগ্রহায়ণ) শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটীতে ছিলেন।

† বদনগঞ্জ জয়রামবাটী হতে প্রায় ৮ মাইল। এই দাগ দেওয়া সেকালের এক অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার। স্নানের পর রোগীকে শোয়াইয়া তিন চারি জন লোক তাহার হাত পা চাপিয়া ধরিত, যাহাতে সে যন্ত্রণায় উঠিয়া না পালায়। তারপর এক ব্যক্তি একটা জ্বলন্ত কুলকাঠ দিয়া পেটের উপরকার কতকটা স্থান ঘষিত। সে সময় চামড়া পুড়িয়া যাওয়ায় রোগী চিৎকার করিত। শ্রীশ্রীমা স্নান করিয়া আসিবার পর যখন দাগ দিবার জন্য সকলে তাঁহাকে ধরিবার উপক্রম করিতেছিল, তখন তিনি বলিলেন, "না, কাউকে ধরতে হবে না, নিজেই চুপ করে শুয়ে পড়ে থাকব।" বাস্তবিকই তিনি ঐ অসহ্য যন্ত্রণা স্থিরভাবে সহ্য করিলেন। ওদেশের লোকদের বিশ্বাস ছিল যে উহাতে ম্যালেরিয়া জ্বর সারে। শ্রীশ্রীঠাকুরও উহা লইয়াছিলেন।

বলে আমাকে বকলে। কাপ্তেন শুনে বললেন, 'যা কাঠ লাগে আমি দেব।' ঘরে কিছুদিন রইলুম। একদিন বর্ষাকালে ঠাকুর গেছেন। শেষে এমন বৃষ্টি যে ঠাকুর আর সে রাত্রে ফিরে আসতে পারলেন না। সেখানেই খেয়ে দেয়ে শুয়ে রইলেন। আমাকে ঠাট্টা করে বললেন, 'কালীর বামুনরা রাত্রে বাড়ি যায় না? এ যেন আমি তাই এসেছি।'

"পরে কাশীর একটি প্রাচীন মেয়ে আমাকে বলে ওবাড়ি থেকে নহবতের ঘরে আনালে। তখন ঠাকুরের অসুখ, সেবার কষ্ট হচ্ছে। বাহ্যে গিয়ে গিয়ে মলদ্বার হেজে গেছে। আমি এসে সেবা করতে লাগলুম।

"কাশীতে গিয়ে এই মেয়েটির অনেক খোঁজ করেছিলুম, দেখা পাইনি। * তার পরের বার (চতুর্থ বার) তো আমি, মা, লক্ষ্মী, আরও কে কে দক্ষিণেশ্বরে আসি। তারকেশ্বরে গত অসুখের মানসিক নখ চুল দিয়ে এলুম। প্রসন্ন সঙ্গে থাকায় প্রথমে কলকাতায় তার বাসায় (গিরিশ বিদ্যারত্নের বাসায়) উঠি। ফাল্গুন-চৈত্র মাস হবে (১২৮৭)। পরদিন সকলে দক্ষিণেশ্বরে যাই। যেতেই হৃদয় কি ভেবে বলতে থাকে, 'কেন এসেছে? কি জন্য এসেছে? এখানে কি?' --এই সব বলে তাঁদের অশ্রদ্ধা করে। আমার মা সে কথায় কোন জবাব দেয়নি। হৃদয় শিওড়ের লোক আমার মাও শিওড়ের মেয়ে। কাজেই হৃদয় মাকে আদৌ মান্য করলে না। মা বললেন, 'চল, ফিরে দেশে যাই, এখানে কার কাছে মেয়ে রেখে যাব?' ঠাকুর হৃদয়ের ভয়ে আগাগোড়া 'হাঁ, না' কিছুই বলেননি। আমরা সকলে সেই দিনই চলে গেলুম। রামলাল পারের নৌকা এনে দিলে। আমি মনে মনে মা-কালীকে বললুম, 'মা, যদি কোন দিন আনাও তো আসব।' তারপর হৃদয় ওখান হতে চলে গেল, ত্রৈলোক্যবাবুর মেয়ের পায়ে ফুল দিয়ে (১২৮৮, জ্যৈষ্ঠ)। রামলাল কালীঘরের (স্থায়ী) পূজারী হলো। পূজারী হয়ে ভাবলে, আর কি, এবার মা-কালীর পূজারী হয়েছি।' সে ঠাকুরের অত খোঁজ খবর নিত না। উনি ভাব-টাব হয়ে হয়তো পড়ে থাকতেন। এদিকে মা কালীর প্রসাদ শুকনা হয়ে থাকত। ঠাকুরের খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হতে লাগল। তখন অন্য কেউ নেই। ঠাকুর পুনঃপুনঃ আমাকে আসবার জন্য খবর দিতে লাগলেন। ওদেশের যে আসত তাকে দিয়েই বলে পাঠাতেন আসবার জন্য। কামারপুকুরের লক্ষ্মণ পানকে দিয়ে বলে পাঠালেন, 'এখানে আমার কষ্ট হচ্ছে, রামলাল মা-কালীর পূজারী হয়ে বামুনের দলে মিশেছে, এখন আমাকে আর অত খোঁজ করে না। তুমি অবশ্য আসবে, ডুলি করে হোক, পালকি করে হোক, দশ টাকা লাগুক, বিশ টাকা লাগুক, আমি দেব।'

* যোগেন মার নিকট শুনিয়াছি মা পূর্বে ঠাকুরকে খুব সঙ্কোচ করিতেন, মুখের ঘোমটা খুলিতেন না। ঐ কাশীর মেয়েটিই এই সঙ্কোচ ভাঙিয়া দেয়। একদিন রাত্রে সে মাকে লইয়া ঠাকুরের ঘরে গেল এবং মায়ের ঘোমটা সরাইয়া দিল। ঠাকুরও মাকে কত ভগবৎ কথা শুনাইতে লাগিলেন। মা এবং ঐ মেয়েটি যেন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া কথা শুনিতে লাগিলেন। এত তন্ময় হইয়াছেন যে ঐদিকে যে সূর্যোদয় হইয়াছে সে বিষয়ে কাহারও আর হুঁশ নাই।

ঠাকুরের এই সব সংবাদ পেয়ে আমি শেষে আসলুম (১২৮৮, মাঘ বা ফাল্গুন)। এক বছর আসিনি"।*

আমি—রাসমণি যখন দেহত্যাগ করেন তখন ঠাকুর কোথায়?

মা—তখন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে। তাঁর মুখে ও আরও লোকজনের মুখে শুনেছিলুম, রাসমণির দেহত্যাগের সময় কালীঘাটের মা-কালীর মন্দিরের সব আলো একটা দমকা হাওয়া এসে নিবে যায়। তখন মা রাসমণিকে দেখা দেন। ওদের সকলেই কালীঘাটে মারা যায়। কেবল মথুরবাবু জানবাজারে মারা যান।

১৬-১০-১২, বুধবার, বেলুড় মঠ

মঠে দুর্গাপূজা। আজ দেবীর বোধন। শ্রীশ্রীমা আজ বৈকালে মঠে আসিবেন। সন্ধ্যা সমাগত। মায়ের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ ছুটাছুটি করিতেছেন। মঠের প্রবেশদ্বারে মঙ্গলঘট ও কলাগাছ-স্থাপন হয় নাই দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এসব এখনও হয়নি, মা আসবেন কি?" দেবীর বোধন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীশ্রীমায়ের গাড়ি মঠে পৌঁছিল। গোলাপ-মা মাকে হাত ধরিয়া গাড়ি হইতে নামাইতেছেন। নামিবার পরই সমস্ত দেখিয়া মা বলিতেছেন, "সব ফিটফাট, আমরা যেন সেজেগুজে মা-দুর্গাঠাকরুন এলুম।"

অষ্টমীর দিন অনেক লোক শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিল, তিন শতের উপর হইবে। উত্তর পাশের বাড়িতে মা ও স্ত্রী-ভক্তদের থাকিবার স্থান হইয়াছিল। দক্ষিণ দিকের ঘরটিতে মা থাকিতেন। তক্তপোশের উপর পশ্চিমমুখে পা ঝুলাইয়া বসিয়া সব ভক্তদের প্রণাম গ্রহণ করিলেন। তিন-চারি জন মন্ত্রও লইলেন।

বৈকালে ন-দিদির (গিরিশবাবুর ভগিনীর) মৃত্যুপ্রসঙ্গ হইতেছিল। বোধনের দিন রাত্রে হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হইয়াছে। মা বলিলেন, "আর মানুষ, এই আছে, এই নাই। কিছুই সঙ্গে যাবে না। একমাত্র ধর্মাধর্মই সঙ্গে যাবে। পাপপুণ্য মৃত্যুর পরও সঙ্গে যায়।"

একটি ছেলে স্বপ্নে মন্ত্র পাইয়াছিল। ঠাকুর তাহাকে কোলে করিয়া মন্ত্র দিয়াছেন। সে মায়ের নিকট হইতে সব জানিয়া লইল। মা সেই কথায় বলিলেন, "এই তো সেই বামুনের ছেলেটিকে ঠাকুর মন্ত্র দিয়েছেন, কোলে করে।"

* ইহার পরের বার মা দেশে গিয়া ৭।৮ মাস পরেই (১২৯০ সনের মাঘ মাসে) দক্ষিণেশ্বরে আসেন। আসিয়া ঠাকুরের ঘরে কাপড়ের পুঁটুলিটি রাখিয়া প্রণাম করিতেই ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে রওনা হয়েছ?" তখন শ্রীশ্রীমায়ের উত্তরে ঠাকুর জানিলেন যে তিনি বৃহস্পতিবারের বারবেলায় রওয়ানা হইয়াছেন। অমনি বলিলেন, "এই তুমি বৃহস্পতিবার বারবেলায় রওনা হয়ে এসেছ বলে আমার হাত ভেঙেছে। যাও, যাও, যাত্রা বদলে এসগে।" শ্রীশ্রীমা সেইদিনই ফিরিয়া যাইতেছিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "আজ থাক কাল যেও।" পরদিন শ্রীশ্রীমা যাত্রা বদলাইতে দেশে ফিরিয়া যান।

আমি—তুমি তাকে ফের মন্ত্র দিলে ?

মা—না ; আমি বললুম, 'তুমি কৃপাসিদ্ধ। তুমি এই মন্ত্র জপ করেই সিদ্ধ হবে।' আমি তার মন্ত্র কেন শুনতে যাব ? আমি তাকে জপ দেখিয়ে দিলুম।

বিজয়ার দিন ডাক্তার কাঞ্জিলাল যে নৌকাতে প্রতিমা গঙ্গায় ভাসান হইতেছিল উহাতে দেবীর সামনে নানাপ্রকার মুখভঙ্গি রঙ্গব্যঙ্গ করিতেছিলেন এবং অনেকেই সেই সব দেখিয়া হাসিয়া অধীর হইতেছিল। একজন ব্রহ্মচারী কিছু মার্জিতরুচি ছিল। সে উহাতে খুবই চটিতেছিল। মঠের উত্তর পাশের বাগানে থাকিয়া মাও নৌকার এই সব ব্যাপার দেখিতেছিলেন এবং আনন্দিত হইতেছিলেন। আমি মাকে বলিলাম, "মা, দেবীর সামনে ওরূপ করার জন্য কাঞ্জিলাল ডাক্তারকে গাল দিচ্ছে।" মা বলিলেন, "না, না, এসব ঠিক। গানবাজনা, রঙ্গব্যঙ্গ, এ সব দিয়ে সকল রকমে দেবীকে আনন্দ দিতে হয়।"

পূজার কয়দিন থাকিয়া বিজয়ার পরদিন মা কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন এবং কয়েকদিন মাত্র তথায় থাকিয়া কাশীধামে গমন করেন।

কাশীধাম, ২০ কার্তিক, ১৩১৯
(৫ নভেম্বর, ১৯১২), মঙ্গলবার, একাদশী

বেলা প্রায় একটার সময় শ্রীশ্রীমা কাশী অদ্বৈতাশ্রমে শুভাগমন করেন। তথায় কিছুক্ষণ থাকিয়া পরে কিরণবাবুদের নূতন বাড়িতে (লক্ষ্মীনিবাস) গমন করেন। বাড়িটি একেবারে নূতন, আশ্রমের নিকটেই। বেশ প্রশস্ত বারান্দা, দেখিয়া মা প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "ভাগ্যবান না হলে এমন হয় না। ক্ষুদ্র জায়গায় থাকলে মনও ক্ষুদ্র হয়, খোলা জায়গায় দিলও খোলা হয়।"

মা এই বাড়িতে দোতলায় উঠিয়াই প্রথম ঘরটিতে ছিলেন। গোলাপ-মা, মাস্টার মহাশয়ের স্ত্রী ও আরও অনেক স্ত্রী-ভক্তেরা সঙ্গে ছিলেন। নিচে প্রজ্ঞানন্দ স্বামী ও আমরা থাকিতাম।

পরদিনই সকালবেলা পালকি করিয়া মা বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শন করিতে যান। ২৪ কার্তিক, শ্যামাপূজার পরদিন সকালে মা পুনরায় অদ্বৈতাশ্রমে আসেন এবং সেবাশ্রম দর্শন করেন। পূজ্যপাদ মহারাজ, হরি মহারাজ, চারুবাবু, ডাক্তার কাঞ্জিলাল প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। কেদার বাবা শ্রীশ্রীমায়ের পালকির সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া সমস্ত ওয়ার্ড দেখাইলেন ও প্রত্যেকটির পরিচয় দিলেন। অন্যান্য সমস্ত দেখিয়া মা দক্ষিণের বারান্দায় চেয়ারে আসন গ্রহণ করিলেন এবং কেদার বাবার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে সেবাশ্রমের বাড়ি, বাগান ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে অতিশয় প্রীতি প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, "এখানে ঠাকুর নিজে বিরাজ করছেন, আর মা লক্ষ্মী পূর্ণ হয়ে আছেন। আচ্ছা, এটি প্রথমে কি করে আরম্ভ

হলো? এ ভাবটি কার মাথায় প্রথমে ঢুকেছিল?" কেদার বাবা চারুবাবু প্রভৃতির যত্ন ও অধ্যবসায়ের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "বাড়ি-তৈরির সময় বুড়ো বাবা দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করিয়েছিলেন।" মহারাজ কেদার বাবার যত্ন, উদ্যম ও পরিশ্রমের কথা বলিলেন। মা আনন্দিত হইয়া বলিতেছেন, "স্থানটি এত সুন্দর যে আমার ইচ্ছা হচ্ছে কাশীতে থেকে যাই।" মা বাসায় ফিরিবার কিয়ৎক্ষণ পরেই একজন ভক্ত আসিয়া অধ্যক্ষকে বলিলেন, "শ্রীশ্রীমায়ের সেবাশ্রমে দান এই দশটাকা জমা করে নেবেন।"

২৮ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, শ্রীশ্রীমা পালকিতে প্রথমে কালভৈরব, বেণীমাধব, ত্রৈলঙ্গস্বামী, নাগপুরবাজার মন্দির, গোয়ালিয়রবাজার মন্দির, সঙ্কটা, বীরেশ্বর ও মণিকর্ণিকা প্রভৃতি দর্শন করিয়া সন্ধ্যায় বাসস্থানে ফিরিয়া আসেন। গোলাপ মা ও মায়ের স্ত্রী-ভক্তেরা গাড়িতে এবং খগেন মহারাজ পালকির সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া গিয়াছিলেন। অন্য আর একদিন বৈদ্যনাথ ও তিলভাণ্ডেশ্বর দর্শন করিয়া মা বলিলেন, 'এ স্বয়ম্ভুলিঙ্গ।' পরে একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে কেদারনাথ দর্শন করিতে গেলেন। কিছুক্ষণ গঙ্গাদর্শন করিয়া সন্ধ্যারতি দর্শন করিলেন। বলিলেন,' এ কেদার ও সেই কেদার (হিমালয়ের) এক—যোগ আছে। একে দর্শন করলেই তাকে দর্শন করা হয়, বড় জাগ্রত।"

একদিন মা সারনাথ দেখিতে যান। কয়েকজন সাহেবও দেখিতে গিয়াছিলেন। তাহারা সকলে অবাক হইয়া সারনাথের পুরাতন কীর্তি দেখিতেছেন। মা বলিলেন, "যারা করেছিল তারাই আবার এসেছে। আর দেখে অবাক হয়ে বলছে, কি আশ্চর্য সব করে গেছে।" সারনাথ হইতে ফিরিবার সময় মহারাজ নিজের গাড়িতে মাকে পাঠাইলেন। প্রথমে মা কিছুতেই রাজি হন না, বলেন, "না, না, ও গাড়িতে রাখাল এসেছে, রাখাল ওরা যাবে। আমার এ গাড়িতে কষ্ট হবে না।" মায়ের গাড়ি রওয়ানা হইয়া দৃষ্টির বাহিরে যাইতেই মহারাজ যে গাড়িতে উঠিয়াছিলেন উহার ঘোড়া ক্ষেপিয়া গিয়া গাড়িসমেত রাস্তার পাশে খানায় পড়িল। মহারাজের শরীর বহু স্থানে ছড়িয়া গিয়া রক্তারক্তি হইয়াছিল।

মা এই ঘটনায় বলিয়াছিলেন, 'এ বিপদ আমারই অদৃষ্টে ছিল। রাখাল জোর করে নিজের ঘাড়ে টেনে নিলে। না হলে ছেলেপিলে (রাধু, ভূদেব প্রভৃতি) গাড়িতে, কি যে হতো।

মা একবার কাশীতে দুইজন সাধুকে দর্শন করেন। গঙ্গাতীরে এক নানকপন্থী সাধু এবং চামেলী পুরী। চামেলী পুরীকে যখন দর্শন করেন, গোলাপ মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে খেতে দেয়। বৃদ্ধ তদুত্তরে খুব তেজ ও বিশ্বাসের সহিত বলিয়াছিলেন, "এক দুর্গা মাঈ দেতা হ্যায়, ঔর কোন দেতা?" উত্তরটি শুনিয়া মা খুব খুশি হইয়াছিলেন। বাড়িতে ফিরিয়া সন্ধ্যার পর আমাদিগকে বলিতেছিলেন, "আহা, বুড়োর মুখটি মনে পড়ছে। যেন ছেলেমানুষটির মতো।" পরদিন তাঁহার জন্য কমলালেবু, সন্দেশ ও একখানি কম্বল পাঠাইয়া দেন। পরে একদিন আমি অন্যান্য সাধু দেখিবার কথা বলাতে মা বলিলেন, 'আবার সাধু কি দেখব? ঐ তো সাধু দেখেছি, আবার সাধু কোথা?"

একদিন কাশীর স্ত্রীলোক শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে আসিয়া দেখেন, মা রাধু, ভূদেব প্রভৃতি ছেলেমেয়েদের লইয়া খুব ব্যস্ত, আবার নিজের পরিধেয় বস্ত্রখানি ছিঁড়িয়া যাওয়ায় একটু সেলাই করিয়া দিতে গোলাপ-মাকে বলিতেছেন। ঐ সকল দেখিয়া তাহাদের একজন বলিয়া উঠিলেন, "মা, আপনি দেখছি মায়ায় ঘোর বদ্ধ।" অস্ফুট-স্বরে মা বলিলেন, 'কি করব মা নিজেই মায়া।"

আর একদিন বৈকালে তিন চারিটার সময় কয়েকটি স্ত্রীলোক শ্রীশ্রীমায়ের নাম শুনিয়া দর্শন করিতে আসিলেন। মা বারান্দায় বসিয়া আছেন। গোলাপ-মা প্রভৃতি এক পাশে বসিয়া। একটি স্ত্রীলোক গোলাপ-মাকে প্রাচীনা এবং ভব্য আকৃতি-বিশিষ্টা দেখিয়া তাহাকেই মাতাঠাকুরানী মনে করিয়া প্রণাম করিয়া কথা বলিতে যাওয়ায় গোলাপ-মা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "ঐ উনিই মা ঠাকরুন।" মায়ের সাদাসিধা চেহারা দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, মাতাঠাকুরানী বুঝি রহস্য করিতেছেন। গোলাপ মা আবার বলায় তিনি যেমন মাকে প্রণাম করিতে গেলেন অমনি মাও হাসিয়া বলিলেন 'না, না, ঐ উনিই মা ঠাকরুন।" তখন স্ত্রীলোকটি মহা সমস্যায় পড়িলেন। গোলাপ মা এবং মা বারবার পরস্পরকে দেখাইয়া বলিতেছেন, "ঐ উনিই মা ঠাকরুন।" আমরা দেখিয়া হাসিতেছি। শেষে যখন তিনি গোলাপ মাকেই মাতাঠাকুরানী সাব্যস্ত করিয়া তাহার দিকে ফিরিতে গেলেন, তখন গোলাপ মা তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, 'তোমার কি বুদ্ধি বিবেচনা নেই? দেখছ না, মানুষের মুখ, কি দেবতার মুখ? মানুষের চেহারা কি অমন হয়?"

বাস্তবিকই মায়ের সরল, প্রসন্ন দৃষ্টিতে এমন একটি বিশেষত্ব ছিল যাহাতে স্বতই তাঁহাকে একটু অসাধারণ বলিয়া ধারণা হইত।

কিরণবাবুর বাড়ি, কাশীধাম, প্রাতঃকাল

আমি— বিশ্বনাথকে রোজ সব লোকে ছোঁয়, সেজন্য সন্ধ্যার পর অভিষেক হয়ে তবে আরতি ও ভোগ হয়।*

মা—পাণ্ডাগুলো টাকার জন্য ওরূপ ছুঁতে দেয়। কেন ছুঁতে দেওয়া? দূর থেকে দর্শন করলেই তো হয়। যত লোকের পাপ এসে লাগে। কত অসচ্চরিত্র নানারকমের লোক সব ছোঁয়।

"এক একটা লোক এমন আছে যে ছুঁলে সব শরীর গরম হয়, জ্বালা করে। তাই হাত পা ধুয়ে ফেলতে হয়। এখানে তবু লোকের ভিড় কলকাতার চেয়ে কম।"

আমি—এখানে যে মহারাজদের অনুমতি নিয়ে এলে তবে দর্শন হয়—ভিড় কমাবার জন্য এই ব্যবস্থা করেছেন।

* তখন দিনের বেলায় ভোগ হইত না।

মা—হাঁ, কে এত সাত জায়গায় দরবার দিয়ে আসতে চায় ?

পাগলী মামী এখানেও মাকে জ্বালাতন করিতেছেন। সেই কথার উল্লেখ করিয়া মা বলিলেন, "হয়তো কাঁটাসুদ্ধ বেলপাতা শিবের মাথায় দিয়েছি, তাই আমার এই কণ্টক হয়েছে।"

আমি—সে কি ? না জেনে দিলে দোষ কি ?

মা—না, না ; শিবপূজা বড় কঠিন। ওতেও বড় দোষ হয়। কি জান, যাদের শেষ জন্ম তাদের কর্মগুলো সেই জন্মেই ভোগ হয়ে যায়।†

"আমি তো জন্মাবধি কোন পাপ করেছি বলে মনে পড়ে না। পাঁচ বছরের সময় তাঁকে ছুঁয়েছি। আমি না হয় তখন না বুঝি, তিনিও তো ছুঁয়েছেন। আমার কেন এত জ্বালা ? তাঁকে ছুঁয়ে অন্য সকলে মায়ামুক্ত হচ্ছে, আর আমারই কি এত মায়া ? আমার যে মন রাত দিন উঁচুতে উঠে থাকতে চায়, জোর করে তা আমি নিচে নামিয়ে রাখি—দয়ায়, এদের জন্য, আর আমার এত জ্বালাতন ?"

আমি—মা, যতই করুক না কেন, সহ্য করে যাবে। মানুষ হুঁশে থাকলে রাগে না।

মা—ঠিক কথা, বাবা ! সহ্যের চেয়ে কিছুই নাই। তবে কি জান। রক্তমাংসের শরীর, হয়তো বেগেমেগে কিছু বলে ফেললুম।

আপন মনে বলিতেছেন, "যে সময়ে বলে সে বান্ধব। অসময়ে 'আহা' করলে কি হয় ?"

১১ ডিসেম্বর, ১৯১২

মায়ের ওখানে 'কাশীখণ্ড'-পাঠ হইত। সন্ধ্যায় পাঠের পর কথাবার্তা হইতেছে।

আমি—কাশীতে মলে কি সবারই মুক্তি হয় ?

মা—শাস্ত্রে বলছে 'হয়'।

আমি—তুমি কি দেখলে ? ঠাকুর তো দেখেছিলেন শিব তারকব্রহ্ম-মন্ত্র দেন।

মা—কি জানি বাপু, আমি তো কিছু দেখিনি।

আমি—তোমার মুখে না শুনলে বিশ্বাস করি নে।

মা—ঠাকুরকে বলব, 'ঠাকুর, এ বিশ্বাস করতে চায় না, আমাকে কিছু দেখিয়ে দাও।'

ইহার পর আমি মুসলমান-রাজত্বে ভারতের নানাস্থানে মন্দির ধ্বংসের উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই যে এত অত্যাচার, তার তিনি কি করলেন ?"

মা—তাঁর অনন্ত ধৈর্য। এই যে তাঁর মাথায় ঘটি ঘটি জল ঢালছে দিনরাত, তাতেই বা

† জনৈক ত্যাগী ভক্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মা, আমাদের এত রোগ-ভোগ কেন হয় ?" মা তদুত্তরে বলেন, "তোমাদের এই শেষ জন্ম, তাই বাকি সব জন্মের কর্মফল এ জন্মে ভোগ হয়ে যাচ্ছে।"

তাঁর কি ? আর শুকনো কাপড় দিয়ে ঢেকে পূজা কর, তাতেই বা তাঁর কি ? তাঁর অসীম ধৈর্য।

পরদিন সকালে খগেন মহারাজ মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীশ্রীঠাকুর কাশীতে এত সব দর্শন করেছিলেন, আপনি কি দেখলেন ?" উত্তরে মা বলিলেন, "রাত্রে বিছানায় শুয়ে জেগে আছি, হঠাৎ দেখি যে বৃন্দাবনের শেঠের বাড়ির নারায়ণমূর্তি পাশে দাঁড়িয়ে। মূর্তির গলার ফুলের মালা পা পর্যন্ত ঝুলছে। ঠাকুর ঐ মূর্তির সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে। আমি মনে ভাবছি, 'ঠাকুর এখানে কি করে এলেন ?' বললুম, 'ও বিশ্বাস করতে চায় না।' ঠাকুর বললেন, 'বিশ্বাস করবে বইকি, সব সত্য।' (অর্থাৎ কাশীতে মরিলে মুক্তি হয়)।

"সেই নারায়ণ মূর্তি আমাকে দুটি কথা বললেন। তার একটি এই—'ঈশ্বরতত্ত্ব না করলে কি তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় ?' অপরটি মনে করতে পারছি না।"

খগেন মহারাজ—ঠাকুর নারায়ণমূর্তির সামনে হাতজোড় করে কেন ?

মা—ও তাঁর ওরকম ভাব ছিল—সকলের সামনে দীনতা।

সকালে পূজার পর যখন প্রসাদ আনিতে গিয়াছি, পূর্বদিনের কথা মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "বল, কাশীতে মলে মুক্তি হয় কি না, কি দেখলে ?"

মা—শাস্ত্রাদিতে আছে, আর এত লোক আসছে—মুক্তি হয়। তাঁর শরণাগত যে তার মুক্তি হবে না তো হবে কি ?

আমি—শরণাগত যে তার তো মুক্তি হবেই। যে শরণাগত নয়, ভক্ত নয়, বিধর্মী—এদের মুক্তি হবে কি না ?

মা—তাদেরও হবে। কাশী চৈতন্যময় স্থান। এখানে সব জীব চৈতন্যময়—পোকাটা মাকড়টা পর্যন্ত। ভক্তাভক্ত, বিধর্মী, যে এখানে মরবে—কীটপতঙ্গ পর্যন্ত—তারই মুক্তি হবে।

আমি—সত্য বলছ ?

মা—হাঁ, সত্য বইকি ! নইলে আর স্থানমাহাত্ম্য কি ?

প্রসাদী মিষ্টির গন্ধে আমার হাতে একটা মাছি বসিয়াছিল ; সেটিকে দেখাইয়া বলিলাম, 'এই মাছিটারও ?'

মা—হাঁ, মাছিটারও হবে। এখানের সব চৈতন্যময় জীব। ভূদেব দুটো পায়রা নিতে চেয়েছিল, উপরে সিঁড়ির কোথায় বাচ্চা হয়েছিল। আমি বললুম, 'ওরে, না, না ; এরা কাশীবাসী, এদের নিতে নেই।'

"*বাঙালদেশের মেয়েছেলে সব, দেখগে বাঙালীটোলায়। এদের কি ঘরবাড়ি,* আত্মীয়স্বজনের মায়া নেই ? এরা সব কাশীলাভের জন্য এখানে এসেছে। বেশ জ্ঞান, মায়া নেই।"

আমি—দেখলে বাঙালদের কেমন জ্ঞান ?

মা—হাঁ, ও দেশের (মায়ের দেশের) লোকগুলোর জ্ঞান নেই। এই তাজপুরের (রাধুর শ্বশুরবাড়ির) ওরা—ওদের তো এখানে বাড়ি রয়েছে। তবু কাশীবাসের নামে ভয় পায়। মনে করে, বাড়িতে থাকলে যেন মরবে না। মরণ তো সঙ্গে সঙ্গেই আছে।

আমি—সত্য বলছ এখানে মলে মুক্তি হয়?

মা—(বিরক্ত হইয়া) আমি তোমার কাছে তেসত্য করতে পারব না। এক সত্যেই রক্ষে নেই, তা আবার তেসত্য, কাশীতে!

আমি—(হাসিয়া) দেখো, আমার যেন কাশীতে মৃত্যু না হয়। তাহলে আমিই বা কোথায়, আর তুমিই বা কোথায় থাকবে—দেখাই হবে না।

মা—(সহাস্যে) কি বলে--'আমার কাশী চাইনি'।

আমি—মা, একটা কিছু প্রত্যক্ষ হলে তবে তো সত্য বিশ্বাস হয়?

মা—তা মানুষ মহাজনদের কথা নেবে না তো কি কববে? মুনি ঋষিরা যা বলে গেছেন, মহাজনেরা যে পথে গেছেন, তা ছাড়া আর পথ কি?

আমি—প্রত্যক্ষ যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের কথা শুনব না তো কি করব? তাইতো তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। তুমি বললে তবে তোমাকে ছাড়ব।

মা—তুমি বিশ্বাস করলে আর না করলে তাতে তাঁর কি? শুকদেব তো ডেয়ো পিঁপড়ে! অনন্ত তিনি, তাঁর কি বুঝবে? ঠাকুর ছিলেন—তিনি একটি দেখা (প্রত্যক্ষদর্শী) লোক, তিনি সব দেখেছেন, তিনি সব জানেন, তাঁর কথা বেদবাক্য। তাঁর কথা যদি বিশ্বাস না করবে তো কি করবে?

আমি—শাস্ত্রে তো কত কথা বলে। এ বলছে এই, ও বলছে ঐ, কার কথা নেব? তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করি।

মা—তা তো বটে। পাঁজিতে বিশ আড়া জল লিখেছে, নেংড়ালে এক ফোঁটাও বেরোয় না। আর শাস্ত্রে অনেক বাজে কথাও ভবেছে! শাস্ত্রবিধি অত আর পারা যায় না। তিনি বলতেন, 'বৈধী-ভক্তি ভক্তিই নয়।'

"কামারপুকুরে যখন ছিলুম, বৃন্দাবন থেকে আসবার পর তখন সব লোকের ভয়ে—'এ ও বলছে ও তা বলছে'—হাতের বালা খুলে ফেললুম। আর ভাবতুম গঙ্গাহীন স্থানে কি করে থাকব, গঙ্গাস্নানে যাব মনে করলুম। আমার বরাবরই একটা গঙ্গাবাই ছিল। একদিন দেখি কি সামনের রাস্তা দিয়ে ঠাকুর আসছেন আগে আগে (ভূতির খালের দিক থেকে), পিছনে নরেন, বাবুরাম, রাখাল, সব যত ভক্তেরা—কত লোক! দেখি কি ঠাকুরের পা থেকে জলের ফোয়ারা ঢেউ খেলে খেলে আগে আগে আসছে—এই জলের স্রোত! আমি ভাবলুম, দেখছি ইনিই তো সব, এঁর পাদপদ্ম থেকেই তো গঙ্গা! আমি তাড়াতাড়ি রঘুবীরের ঘরের পাশের জবাফুল গাছ থেকে মুঠো মুঠো ফুল ছিঁড়ে এনে গঙ্গায় দিতে লাগলুম। তারপর ঠাকুর আমাকে বললেন, 'তুমি হাতেব বালা ফেলো না। বৈষ্ণব-তন্ত্র

জান তো?' আমি বললুম. 'বৈষ্ণব-তন্ত্র কি? আমি তো কিছু জানি নে।' তিনি বললেন, 'আজ বৈকালে গৌরমণি আসবে, তার কাছে শুনবে।' সেইদিনই বৈকালে গৌরদাসী এল। তার কাছে শুনলুম, 'চিন্ময় স্বামী'।*

"এ কলিতে শুধু সত্যের আঁট থাকলেই ভগবানলাভ হয়। ঠাকুর বলতেন, 'যে সত্যকথাটি ধরে আছে সে ভগবানের কোলে শুয়ে আছে।' দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের অসুখের সময় তাঁকে রোজ যে দুধ দিতুম তা জ্বাল দিয়ে বেশ ঘন করে দিতুম আর এক সের দুধ হলে বলতুম আধ সের—কম করে বলতুম। ঠাকুর একদিন টের পেয়ে বললেন. সেকি! সত্য ধরে থাকবে। এই আমার বেশি দুধ খেয়ে পেটের অসুখ হয়েছে।' যাই মনে করা, অমনি সেদিন পেটের অসুখ হলো।

"তাঁর সব সুযোগ ছিল। আমাদের সে সব কই?"

শেষে আমি বলিলাম, "মা, আমি এসব যা জিজ্ঞাসা করি, ও অমনি বলি, আমি ওসবের জন্য অত ভাবি না। আমার মনের ভাব অন্য রকম। আমি নিজে জানতে চাই, তোমাকে যে মা বলে ডাকি, তুমি আপন মা কি না।"

মা—আপনাব মা নয় তো কি? আপনারই মা।

আমি—তুমি তো বললে, আমি যে ভাল বুঝতে পারছি না। গর্ভধারিণী মাকে যেমন আপনা হতেই মা বলে জানি, এমন তোমাকে মনে হয় কই?

মা—আহা, তাই তো।

পরক্ষণেই বলিতেছেন, "তিনিই মা-বাপ, বাছা, তিনিই মা-বাপ হয়েছেন।" (অর্থাৎ যে মা-বাপের দৃষ্টান্ত দিলাম তাঁহারাও তিনিই)।

১ পৌষ, সন্ধ্যা ৭টা

মা তাঁহার ঘরে শুইয়া শুইয়াই কথা বলিতেছেন। 'কাশীখণ্ডে' আছে. কাশীতে মাছ খাওয়া উচিত নয়। সেই প্রসঙ্গ হইতেছিল।

আমি—তা মাছ খেলে প্রাণীহত্যা হয় তো।

মা—ওসব মানুষের খাদ্য, মানুষ খাবে না তো কি করবে?

আমি—খাদ্যের নাম করে প্রাণীকে ব্যথা দেবে?

* যোগেন-মা কামাবপুকুর যাইলে মা তাঁহাকে এই ঘটনা বর্ণনা কবিয়া বলিয়াছিলেন, "ঐ অশ্বত্থগাছের গোড়ায় ঠাকুর তখন দাঁড়িয়েছিলেন। শে᠁ষ দেখলুম, ঠাকুর নরেনের দেহে মিলিয়ে গেলেন।' তারপর যোগেন-মাকে বলিলেন, "এইখানকার ধূলি খাও. প্রণাম কব।" এই কথা স্বামীজীর কানে পৌছিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "একথা (অর্থাৎ ঠাকুরের স্বামীজীব দেহে প্রবেশ করার কথা) আমাকে বলা ভাল হয়নি"

মা—(অন্য কথার পর)তা বিচার করতে গেলে ওতেও হিংসা হয় বইকি—প্রাণী তো? কাশীপুরে ঠাকুরের জন্য শামুকের ঝোল ব্যবস্থা হলো। ঠাকুর আমাকে করতে বললেন। আমি বললুম, 'এগুলো জীয়ন্ত প্রাণী, ঘাটে দেখি চলে বেড়ায়। আমি এদের মাথা ইট দিয়ে ছেঁচতে পারব না।' শুনে ঠাকুর বললেন, 'সেকি! আমি খাব, আমার জন্য করবে।' তখন রোখ করে করতে লাগলুম।

"সব সময় মনের এক অবস্থা থাকে না। (আমার প্রতি) তুমি সব খাবে। তোমার ওসব বিচার করবার দরকার নেই।"*

আমি দর্শনাদির কথা উত্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, লোকে এই যে দর্শনাদি করে, এসব কি ভাবে, না সাদা চোখে?"

মা—সবই ভাবে। আমি কিন্তু সাদা চোখে দেখেছিলুম—কামারপুকুরে—গৈরিকপরা, রাধুর মতো অতটুকু মেয়ে (১১/১২ বছরের), মাথায় রুখো রুখো চুল, রুদ্রাক্ষের মালা গলায়, যেখানে যাই সেখানেই সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে—এই সামনে, এই পিছনে।

"তারপর বেলুড়ে—তখন নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে—পঞ্চতপা করলুম। যোগেনও করলে। সেই সাধন-টাধনের পর মিশে গেল—আর দেখিনি।"

আমি—তপস্যার কি দরকার?

মা—তপস্যা দরকার। এই যোগেন এখনও কত উপবাস করে। খুব তপস্বী। গোলাপ জপে সিদ্ধ।

"নরেনের মা আমাকে দেখতে এসেছিল। নরেন তাকে বললে, 'এই তুমি হয়তো তপস্যা করেছিলে বলে বিবেকানন্দকে পুত্র পেলে। আবার তপস্যা কর, আবার হয়তো একটা পাবে'।"

ঠাকুরের পঞ্চবটীতে তপস্যার কথা মা বলিলেন। তাহাতে আমি বলিলাম, "তাঁর ব্যাকুলতায় হুঁশ থাকত না, গঙ্গার জোয়ার মাথা বয়ে যেত। তুমি তাঁর কথা কেন বলছ? পঞ্চতপা-টপা এসব করে শরীরকে কেন কষ্ট দেওয়া?"

মা—পার্বতীও শিবের জন্য করেছিলেন।

আমি—শিবও তো করেছেন—ধ্যানস্থ।

* কাশীতে আমি মাছ খাইতাম। কিন্তু মার জীবহিংসা সম্বন্ধীয় পূর্বোক্ত কথাটি আমার মনে লাগায় কলিকাতায় গিয়া প্রায় এক বৎসর মাছ খাই নাই। মা তাহা জানিতেন না। পরে তাঁহার সহিত যখন জয়রামবাটী যাই, সেখানে আমি মাছ খাইতেছি না দেখিয়া মা উহা খাইবার জন্য আমাকে বলেন; কিন্তু আমি খাইলাম না। আবার একদিন বিশেষ করিয়া বলেন; সেদিনও আমি খাই নাই। তৃতীয়বার পুনরায় খুব বলেন। "তোমরা মাছ খাবে ওতে দোষ কি? তোমরা তো বিধবা নও। বিধবাদের খেতে নেই"—ইত্যাদি অনেক বলায় শেষে আমি খাই। ভাবিলাম, উনি অত করিয়া বলিতেছেন। আর ওদেশে মাছ ছাড়া খাইতেই বা কি দিবেন?

মা—হাঁ, তবে এসব করা লোকের জন্য। নইলে লোকে বলবে, 'কই সাধারণের মতো খায় দায় আছে।' আর পঞ্চতপা-টপা, এসব মেয়েলী—যেমন ব্রত সব করে না ?

আমি—হাঁ বুঝেছি। যেমন ব্রত করে, এসবও তেমনি ব্রত।

মা—ঠাকুর সব সাধনা করেছেন। বলতেন, 'আমি ছাঁচ করে গেলুম, তোরা সব ছাঁচে ঢেলে তুলে নে।'

আমি—'ছাঁচে ঢালা' মানে কি ?

ভূদেব—মানে ঠাকুরকে চিন্তা করা।

মা—ও বুঝেছে। 'ছাঁচে ঢালা' মানে ঠাকুরকে ধ্যান চিন্তা করা। ঠাকুরকে ভাবলেই সব ভাব আসবে। তিনি যে-সব করেছেন তা চিন্তা করা। ঠাকুর বলতেন, 'আমাকে যে স্মরণ করে তার কখনও খাওয়ার কষ্ট থাকে না।'

মাকু—তিনি নিজে বলেছেন ?

মা—হাঁ, তাঁর নিজ মুখের কথা। তাঁকে স্মরণ করলে কোন দুঃখ থাকে না। দেখছ না, তাঁর ভক্তেরা সকলেই ভাল আছে। তাঁর ভক্তের মতো এমনটি কোথাও দেখা যায় না। এই তো কাশীতে এত সাধু দেখেছি, তাঁর ভক্তগুলির মতো কোন্‌টি ?

আমি—তার কারণ আছে, মা। যেন এইমাত্র একটা বাজার ভেঙেছে। সব চিহ্ন, লোকজন এখনো রয়েছে—ঠাকুরের সব অন্তরঙ্গ ভক্ত-টক্ত রয়েছেন কি না ? মনে হয়, এই যেন কাছে, বেশি দূর যাননি—ডাকলেই তাঁর সাড়া পাওয়া যাবে।

মা—আর কত লোক পাচ্ছে যে !

আমি—কৃষ্ণ, রাম এঁরা যেন কত কালের। যেন পাওয়ার মতো কাছে নাই।

মা—হাঁ, ঠিক কথা।

আমি কাশীপুর বাগানের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলাম, "এমন স্থানে এখন কে এক সাহেব বাস করছে।"

মা—কাশীপুর বাগান তাঁর অন্ত্যলীলার স্থান। কত তপস্যা, ধ্যান, সমাধি! তাঁর মহাসমাধির স্থান—সিদ্ধস্থান। ওখানে ধ্যান করলে সিদ্ধ হয়।

"ঠাকুর যদি তাদের (মালিকদের) স্বপ্ন দিয়ে স্থানটি করে নেন তবে হতে পারে।

"ঐ কাশীপুরে একদিন নিরঞ্জন-টিরঞ্জন ওরা কাঁচা রস খাবে বলে রস চুরি করতে যাচ্ছে। আমি দেখি কি ঠাকুরও তাদের পিছে-পিছে যাচ্ছেন। পরদিন তাঁকে একথা বলায় তিনি বললেন, 'ও রেঁধে তোমার মাথা গরম !'*

* *এই ঘটনার একটু বিস্তৃত বিবরণ নীরদ মহারাজের মাতা শ্রীশ্রীমায়ের নিকট এইরূপ শুনিয়াছিলেন : ঠাকুর* তখন কাশীপুরের বাগানে অত্যন্ত পীড়িত। এত দুর্বল যে একেবারে শয্যাশায়ী। স্বামীজী প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ সর্বদা তাঁহাব সেবা করিতেছেন। এ৮ ।দন তাঁহারা স্থির করিলেন, বাগানে এক পাশের একটি খেজুর গাছ হইতে সন্ধ্যার সময় জিবেনের রস খাইবেন। ঠাকুরকে কিন্তু সে সম্বন্ধে কিছুই জানাইলেন না। সন্ধ্যার সময় তাঁহারা সকলে সেই

"ঢাকায় বিজয় গোঁসাইও দেখেছিল (ঠাকুরকে)—গা টিপে।

"তাঁর যাবার পর নরেন এরা বললে, 'বাড়িটা তিন দিনও থাক, আমরা ভিক্ষে করে খাওয়াব মাকে—সদ্য সদ্য মায়ের মনে কষ্ট।' রামদত্ত-টত্ত এরা বললে, 'তোদের আর ভিক্ষে করে খাওয়াতে হবে না।' বাড়ি চুকিয়ে দিলে।

"এই যে গিরিশবাবু, এখন সব বড় ভক্ত হয়েছে! বলরামবাবু! তবে গৃহীদের মধ্যে বলরামবাবু সব চেয়ে বড়। সব ভক্ত হিসাবে ভক্ত। কে এলেন? না ভক্ত এলেন! এলে গেলে, প্রণাম করলে!*

"শরৎ যে কদিন আছে, সে কদিন আমার ওখানে থাকা চলবে। তারপর আমার বোঝা নিতে পারে এমন কে আছে দেখি না। যোগীন ছিল। কৃষ্ণলালও আছে, ধীর, স্থির—যোগীনের চেলা। ...শরৎটি সর্বপ্রকারে পারে। শরৎ হচ্ছে আমার ভারী। রাখাল, শরৎ-টরৎ, এরা সব আপনার শরীর থেকে বেরিয়েছে।"

আমি—মহারাজ পারেন না?

মা—না; রাখালের সে ভাব নয়। ঝঞ্ঝাট পারে না। মনে মনে পারে, কি কারুকে দিয়ে করাতে পারে। রাখালের ভাবই আলাদা।

আমি—বাবুরাম মহারাজ?

মা—না, সেও পারে না।

আমি—মঠ চালাচ্ছেন যে।

মা—তা হোক। মেয়েমানুষের ঝঞ্ঝাট! দূর থেকে খবর নিতে পারে।

গাছটির দিকে চলিলেন। শ্রীশ্রীমা তখন সেই বাড়িতেই থাকিতেন। তিনি হঠাৎ দেখিলেন, ঠাকুর তীরবেগে নিচে চলিয়া গেলেন। দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, ইহা কি সম্ভব। যাঁহাকে পাশ ফিরাইয়া দিতে হয়, তিনি ইহা কিরূপে করিবেন। অথচ চাক্ষুষ দেখিলেন। তখন ঠাকুরের ঘরে যাইয়া দেখিলেন, ঠাকুর বিছানায় নাই, ঘর শূন্য। মা ভয়বিহ্বল হইয়া চারিদিক খুঁজিয়াও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না এবং নিজ স্থানে ফিরিয়া গিয়া উৎকট চিন্তায় অভিভূত হইলেন—এ কি ঘটনা হইল! কিছুক্ষণ পরে দেখিলেন, ঠাকুর পূর্বের ন্যায় তীরবেগে আপন ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। মা পরে তাঁহার নিকট গিয়া ঐ সম্বন্ধে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিলেন, "তুমি দেখেছ নাকি?" তারপর বলিলেন, "ছেলেরা সব এখানে এসেছে সকলেই ছেলেমানুষ। তারা আনন্দ করে এই বাগানের একপাশে একটা খেজুর গাছ আছে, তারই রস খেতে যাচ্ছিল। আমি দেখলাম, ঐ গাছতলায় একটা কালসাপ রয়েছে। সে এত রাগী যে সকলকেই কামড়াত। ছেলেরা তা জানত না। তাই আমি অন্য পথে সেখানে গিয়ে সাপটাকে বাগান থেকে তাড়িয়ে দিয়ে এলাম। বলে এলাম, 'আর কখনও ঢুকিস নে'।" মা ইহা শুনিয়া অবাক হইলেন। ঠাকুর তাঁহাকে উহা তখন প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

* প্রথমবার বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া মা বর্ধমানের রাস্তায় কামারপুকুর যান। টাকার অভাবে বর্ধমান হইতে উচালন পর্যন্ত তাঁহাকে হাঁটিয়া যাইতে হয়। উহাতে মা খুব ক্লান্ত হইয়া পড়েন। সঙ্গে গোলাপ-মা, যোগানন্দ স্বামী প্রভৃতি ছিলেন। উচালনে গোলাপ-মা কোনপ্রকারে দুটি খিচুড়ি সিদ্ধ করেন। মা ক্ষুধায় তাহাই খাইয়া বার বার বলিয়াছিলেন, "ও গোলাপ, তুমি কি অমৃতই রেঁধেছ!"

"এই রাধুর বিয়ের কথা—এটি মায়ের বোঝা। ...আপনার মায়ের বোঝা কে মনে করছে? আপনার জন কযটি আর? দু-চারটি। ঠাকুর বলেছিলেন, 'কটিই বা অন্তরঙ্গ।'

আমি—কোন্ কোন ভক্ত কে. বল না; কিছুই চিনতে পারলুম না।

মা—কি জানি। তবে যারা সব (পূর্বে) এসেছিল তারাই এসেছে।

একটি ভক্তের কথায় বলিলেন, "হাঁ, তাই হবে। ওব ভিতরের স্বভাবটি আনন্দময়। বাহিরে এ রকম।"

আমি—চতুর্ভুজ প্রভৃতি দর্শনের সাধ আমার হয় না, আমার যা আছে তাই।

মা—আমারও তাই। ওসব দেখে কি হবে? আমাদের এই ঠাকুর আছেন—উনিই সব।

২ মাঘ বুধবার, মা কাশী হইতে কলিকাতা রওনা হন।

১১-২-১৯১৩, উদ্বোধন

আমি—মা, এই যে স্বামীজী কত লোককে মন্ত্র দিয়েছেন, তুমিও কত লোককে দিচ্ছ, এ যেন কেউ এলে দুটো টাকা দিয়ে বিদায় করে দেওয়া হলো, আর মনে রইল না।

মা—এত লোক আসছে, কটিকে মনে রাখা যায়? আগুন জ্বাললে বাদুলে পোকা আসে না? সেই রকম।

আমি—এই যে মন্ত্র নেয়, কি পায়? এমনি তো বাহ্য দৃষ্টিতে দেখি, লোকটি যেমন ছিল তেমনি আছে।

মা—মন্ত্রের মধ্য দিয়ে শক্তি যায়। গুরুর শক্তি শিষ্যে যায়, শিষ্যের গুরুতে আসে। তাই তো মন্ত্র দিলে পাপ নিয়ে শরীরে এত ব্যাধি হয়। গুরু হওয়া বড় কঠিন—শিষ্যের পাপ নিতে হয়। শিষ্য পাপ করলে গুরুরও লাগে। ভাল শিষ্য হলে গুরুরও উপকার হয়। কারও বা হঠাৎ উন্নতি হয়, কারও বা ক্রমে হয়। তা যার যেমন সংস্কার।

"রাখাল তাই মন্ত্র দিতে চায় না। বলে, 'মা, মন্ত্র দিলে অমনি শরীর অসুস্থ হয়।' মন্তরের নামে আমার গায়ে জ্বর আসে!"

জনৈক মহারাজ একটি ছেলেকে মন্ত্র লইবার জন্য মায়ের কাছে পাঠাইয়াছে। মা তাহার সমস্ত পরিচয় শুনিয়া বলিলেন, "তোমাদের সব গোঁসাই গোবিন্দ আছেন। তাঁদের কাছ থেকে মন্ত্র নেবে।" যে কোন কারণে হউক মা তাহাকে দীক্ষা দিলেন না।

প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন, "কুলধর্মানুযায়ী চলা উচিত। জাতিবিচার সংসারে থাকলে মেনে চলতে হয়।"

রাত্রে খাইবার পর পান আনিতে গিয়াছি। মা পাশের ঘরে ছেলেমেয়েদের মশারি খাটাইয়া দিতেছিলেন। শুনিলাম মা পাগলী মামীকে বলিতেছেন, "তুই আমাকে সামান্য লোক মনে করিসনি। ...তুই যে আমাকে অত বাপান্ত মা-অন্ত করে গাল দিচ্ছিস, আমি

তোর অপরাধ নিই না। ভাবি দুটো শব্দ বই তো নয়। আমি যদি তোর অপরাধ নিই তাহলে কি তোর রক্ষা আছে? আমি যে কদিন বেঁচে আছি, তোরই ভাল। তোর মেয়ে তোরই হবে। যে কদিন না মানুষ হয়, সে কদিনই আমি। নতুবা আমার কি মায়া? এক্ষুণি কেটে দিতে পারি। কর্পূরের মতো কবে একদিন উড়ে যাব, টেরও পাবিনি।

পাগলী—আমি তোমাকে বাপান্ত করে কবে গাল দিয়েছি? আমি বাপান্ত করিনি—অমনি বলেছি। তুমি যাকে দাও, সব যে দিয়ে ফেল।

তাঁহার মনের ভাব মা যেন টাকা-পয়সা সব রাধুর জন্য রাখিয়া দেন।

মা—আমার বালকস্বভাব। আমার কি অত আগ-পাছ হিসাব থাকে? যে চাইলে দিলুম।

কাশী হইতে ফিরিয়া মা অল্প কয়েকদিন কলিকাতায় থাকিয়া জয়রামবাটী রওয়ানা হইলেন। ১৩ ফাল্গুন কোয়ালপাড়া মঠে পৌঁছিলেন। ঠাকুরঘরের পাশের ঘরে মাকে থাকিতে দেওয়া হইয়াছে। একটি বটফলের বীজ বাহির করিয়া মাকে বলিতেছিলাম, "মা, দেখছ, লাল শাকের বীজের চেয়েও ছোট। এ থেকে অত প্রকাণ্ড গাছ! কি আশ্চর্য!" মা বলিলেন, "তা হবে না? এই দেখ না, ভগবানের নামের বীজ কতটুকু? তা থেকেই কালে ভাব, ভক্তি, প্রেম, এসব কত কি হয়।"

জয়রামবাটীতে আসিয়া রাত্রে আমরা খাইতে বসিয়াছি। আমাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "মা, দেখলেন, এঁদের (মামাদের) কি আক্কেল? আপনি এলেন, তা একটি লোকও নদীর ধারে পাঠালে না।" এই কথার উল্লেখ করিয়া মা বড় মামাকে বলিলেন, "এই যে আমি এলুম, তুই নদীর ধারে লোক পাঠালি না কেন? আমার এই ছেলেগুলি এল। তুই একটি লোকও পাঠালি নে, নিজেও গেলি নে।"

প্রসন্ন মামা—দিদি আমি কালীর ভয়ে পাঠাইনি। পাছে কালী বলে 'দিদিকে হাত করে নিতে যাচ্ছে।' আমি কি বুঝি না, তুমি কি বস্তু, আর এঁরা (ভক্তেরা) কি বস্তু? সব জানি, কিন্তু কিছু করবার সাধ্য নেই। ভগবান এবার আমাকে সে ক্ষমতা দেয়নি। এই আশীর্বাদ কর, যেন তোমাকে এবার যে ভাবে পেয়েছি, এই ভাবে জন্মে জন্মে পাই, অন্য আর কিছুই চাই নে।

মা—তোদের ঘরে আর? এই যা হয়ে গেল। রাম বলেছিল, 'মরে যেন আর না জন্মাই কৌশল্যার উদরে।' আরও তোদের মধ্যে? বাবা পরম রামভক্ত ছিলেন, পরোপকারী, মায়ের কত দয়া ছিল; তাই এ ঘরে জন্মেছি।

একদিন প্রসন্ন মামা আসিয়া মাকে বলিলেন, "দিদি, শুনলুম তুমি নাকি কাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছ, তাকে মন্ত্র দিয়েছ, আবার এও বলে দিয়েছ যে তার মুক্তি হবে। আর আমাদের তুমি কোলে করে মানুষ করেছ—আমরা কি চিরদিনই এমনি থাকব।" মা উত্তরে

তাঁহাকে বলিলেন, "ঠাকুর যা করবেন, তাই হবে। আর দেখ, শ্রীকৃষ্ণ রাখাল-বালকদের সঙ্গে কত খেলেছেন, হেসেছেন, বেড়িয়েছেন, তাদের এঁটো খেয়েছেন, কিন্তু তারা কি জানতে পেরেছিল কৃষ্ণ কে?"

একদিন আমরা কয়েকটি ভক্ত আহারান্তে উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিতে যাইতেছি; মা তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন, "না, না, ওসব রেখে দাও—তোমরা দেবের দুর্লভ জিনিস।" ভক্তেরা আপত্তি করায় বলিলেন, "ও ফেলবার লোক আছে, ঝি আছে।"

১৪-৩-১৩ (ফাল্গুন-সংক্রান্তি, ১৩১৯) জয়রামবাটী

শ্যামবাজারের ললিত ডাক্তার ও প্রবোধবাবু আসিয়াছেন। বৈকালে প্রায় চারটার সময় তাঁহারা শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিতে গিয়া কথাবার্তা বলিতেছেন।

ললিতবাবু—মা, খাওয়া-দাওয়ার কি রকম নিয়ম পালন করা উচিত।

মা—আদ্যশ্রাদ্ধের অন্ন খেতে নেই, ভক্তির বড় হানি হয়। বরং অন্য শ্রাদ্ধের অন্ন খাবে, তবু আদ্যশ্রাদ্ধের নয়. ঠাকুর নিষেধ করতেন। আর যা কিছু খাবে, ভগবানকে দিয়ে খাবে, অপ্রসাদী অন্ন খেতে নেই। যেমন অন্ন খাবে তেমন রক্ত হবে। শুদ্ধ অন্ন খেলে শুদ্ধ রক্ত হয়, শুদ্ধ মন হয়, বল হয়। শুদ্ধ মনে শুদ্ধা ভক্তি হয়, প্রেম হয়।

ললিতবাবু—মা, আমরা তো গৃহী, আত্মীয় স্বজনের শ্রাদ্ধে কি করব?

মা—শ্রাদ্ধে গিয়ে কাজকর্ম দেখবে, খাটবে, যেন তারা কিছু মনে না করতে পারে। কিন্তু সে দিনটা কোন রকম করে খাওয়াটা এড়াতে চেষ্টা করবে। নেহাৎ না পারলে শ্রাদ্ধে বিষ্ণু বা দেবতাদিগকে যা নিবেদন হয়, তাই গ্রহণ করবে। প্রসাদী হলে আদ্যশ্রাদ্ধের অন্নও ভক্তেরা খেতে পারে।

ললিতবাবু—অনেক সময় শ্রাদ্ধের জন্য আনা জিনিস-পত্র বাড়তি থাকে, তা খাওয়া চলে?

মা—তা চলতে পারে, তাতে দোষ নেই, বাবা। গৃহী আর কি করবে।

প্রবোধবাবু—মা, তিনি যে ত্যাগ ভালবাসতেন। আমাদের ত্যাগ কোথায়?

মা—হবে ক্রমে ক্রমে। এ জন্মে খানিকটা হলো, পরজন্মে আবার হবে। খোলটাই তো বদলায়, আত্মা তো একই থাকে।

"কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগ। তিনি বলতেন, 'আমি ইচ্ছা করলে কামারপুকুরটাকে সোনার করে দিতে পারি, সেজবাবুকে বলে। কিন্তু ওতে কি হবে? ওগুলো তো অনিত্য।' কারও কারও তিনি বলতেন শেষ জন্ম। বলতেন, 'আরে, এর কিছুতেই আকাঙ্ক্ষা নাই রে। এর শেষ জন্ম'।"

তাঁহারা প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

সন্ধ্যার সময় মায়ের বারান্দায় বসিয়া কথাবার্তা হইতেছিল। কায়স্থের উপবীতের কথা উঠিল।

আমি—কেউ কেউ স্বামীজীকে বলেছিল, 'শূদ্রের সন্ন্যাসে অধিকার কি?' তুমি যখন কাশী গিয়েছিলে তখন কাশীর 'ত্রিশূল' পত্র মহারাজকে গাল দিয়েছিল। স্বামীজী কিন্তু উত্তর দিয়েছিলেন, 'কায়স্থ ক্ষত্রিয়, সুতরাং সন্ন্যাসে অধিকার আছে।'

মা—(অন্য কথার পর) আর কিছু বুঝি না, সপ্তর্ষির মধ্য থেকে একটি ঋষি এসেছিলেন—এইটি জানি। আর ঠাকুরের ভক্তেরা জ্ঞানী সন্ন্যাসী। জ্ঞানীর সন্ন্যাস হতে পারে। এই যে গৌরদাসী; মেয়েদের তো সন্ন্যাস নেই। গৌরদাসী কি মেয়ে? ও তো পুরুষ। ওর মতো কটা পুরুষ আছে? এই স্কুল, গাড়ি, ঘোড়া সব করে ফেললে। ঠাকুর বলতেন, 'মেয়ে যদি সন্ন্যাসী হয়, সে কখনো মেয়ে নয়—সে তো পুরুষ।' গৌরদাসীকে বলতেন, 'আমি জল ঢালছি, তুই কাদা মাখ।'

১৫ চৈত্র, ১৩১৯, জয়রামবাটী

সকালে বাড়ির মধ্যে গিয়া দেখি মা কলমি শাক কুটিতেছেন। আমি বলিলাম, "কলমি শাকের সঙ্গে এ কি কুটছ? এ যে ঘাস!" মা বলিলেন, "এ ঘাসফুলের শাক (ও দেশে খায় বোধ হয়), কৃষ্ণের গায়ের এই ঘাসফুলের রং ছিল।"

মধ্যাহ্নে খাইতে বসিয়াছি। পাগলী মামী তাঁহার ঘরের বারান্দায় একটি ছেলেকে (বোধ হয় আত্মীয়) পাতা ও জলের গ্লাস দিয়াছেন। বিড়ালে সে জলে মুখ দেওয়ায় পুনরায় জল আনিয়া দিয়াছেন। আবার মুখ দেওয়ায় সে জলও বদলাইয়া দিলেন। এবারেও একটা বিড়াল সে জল খাইতেছে। পাগলী বিড়ালটাকে তাড়া করিয়া বলিতেছেন, "পোড়ারমুখো বেড়াল মেরে ফেলব।" তখন চৈত্র মাস। মা কাছেই ছিলেন, বলিলেন, "না, না, পিপাসার সময় বাধা দিতে নেই। আর ও জলে তো মুখ দিয়ে ফেলেছে।"

পাগলী মামী চিৎকার করিয়া বলিতেছেন, "তোমায় আর বেড়ালকে অত দয়া দেখাতে হবে না। মানুষকেই বড় দয়া করছেন! মানুষকে দয়া কর না।"

মা গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "আমার দয়া যার উপর নেই সে নেহাত হতভাগ্য। আমার দয়া যে কার উপর নেই তা বুঝি না—প্রাণীটা পর্যন্ত।"

রাত্রে খাইতে বসিয়াছি। মা নিজে ঝিঙ্গে, আলু প্রভৃতি দিয়া একটি ব্যঞ্জন রাঁধিয়াছিলেন। তাই আনিয়া দিয়া বলিলেন, "খেয়ে দেখ কেমন হয়েছে।" আমি একটু খাইয়া বলিলাম, "এ যেন রোগীর পথ্য, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। কে রেঁধেছে?"

মা—আমি।

আমি— তুমি নিজে ?

মা—হাঁ।

আমি—কই, তেমন হয়নি। আমাদের দেশের পছন্দ মতো হয়নি।

মা—তুমি শুধু ঝোল মুখে দিয়ে দেখ।

নলিনী—ও পিসিমা, তুমি যে রান্নায় মোটেই ঝাল দাও না ; ও কি খাওয়া যায়।

মা (নলিনীকে)—তুই ওর কথা শুনিসনি। খেয়ে দেখবি ভাল হয়েছে।

আমি--আমি কদিন তোমার রান্না কোন্‌টা এদের জিজ্ঞাসা করে একটু একটু চেখে দেখেছি। সব ঐ রকম।

মা—বেশ তো, একদিন তোমাদের দেশের মতো রাঁধব, দেখিয়ে দেবে। লঙ্কা বেশি দিতে হয়, না ?

আমি—তত বেশি নয়। আর ঝাল কম হলেও রান্না কি খারাপ হয় ?

মা (নলিনীকে)—কাল ছোলার ডাল আনিস, রাঁধব। আমি আগে বেশ রাঁধতে পারতাম। এখন অভ্যাস নেই তো। কামারপুকুরে লক্ষ্মীর মা আর আমি রাঁধতুম। একদিন খেতে বসেছেন—ঠাকুর আর হৃদয়। লক্ষ্মীর মা ভাল রাঁধতে পারত। সে যেটা রেঁধেছে, খেয়ে বললেন, 'ও হৃদু, এ যে রেঁধেছে, এ রামদাস বদ্যি।' আমি যেটা রেঁধেছি, খেয়ে বললেন, 'আর এই ছিনাথ সেন।' শ্রীনাথ সেন হাতুড়ে। লক্ষ্মীর মা হলো রামদাস বদ্যি, আর আমি হলুম ছিনাথ সেন—হাতুড়ে। শুনে হৃদয় বলছে, 'তা বটে, তবে তোমার এ হাতুড়ে বদ্যি তুমি সব সময় পাবে---গা টিপতে, পা টিপতে পর্যন্ত। ডাকলেই হলো। রামদাস বদ্যি—তার অনেক টাকা ভিজিট, তাকে তো আর সব সময় পাবে না। আর লোকে আগে হাতুড়েকে ডাকে—সে তোমার সব সময় বান্ধব।' ঠাকুর বললেন, 'তা বটে, তা বটে। এ সব সময় আছে।'

"নরেনের জন্য দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর একদিন বললেন, 'বেশ করে রাঁধো।' আমি মুগের ডাল, রুটি করলুম। খাবার পর নরেনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওরে কেমন খেলি ?' নরেন বললে, 'বেশ খেলুম, যেন রোগীর পথ্য।' ঠাকুর শুনে বললেন, 'ওকে ওসব কি রেঁধে দিয়েছ ? ওর জন্য ছোলার ডাল আর মোটা মোটা রুটি করে দেবে।' আমি শেষে তাই করলুম। তবে নরেন খেয়ে তুষ্ট হলো।"

২৫ বৈশাখ, ১৩২০, জয়রামবাটী

রাধুর কি অসুখ করায় পাগলী মামী তাকে তিরস্কার করিতেছেন। "তুমিই ওষুধ খাইয়ে খাইয়ে আমার মেয়েকে মেরে ফেললে" ইত্যাদি বলিয়া আরম্ভ করিয়া শেষে যা তা বলিতে লাগিলেন। বরদা মামাকে ডাকায় তিনি পাগলীকে তাড়া করিলেন। মাও অত্যন্ত অসহ্য হওয়ায় ধমকাইয়া বলিলেন, "তোকে আজই মেরে ফেলব। আমি যদি তোকে মারি, দুনিয়ায় এমন কেউ নেই যে তোকে রক্ষা করতে পারে। আর এতে আমার পাপও নেই, পুণ্যও নেই।"

কিছুক্ষণ পরে আমাদিগকে বলিতেছেন, "আমি এমন স্বামীর কাছে পড়েছিলুম যে তিনি কখনো আমাকে 'তুই' পর্যন্ত বলেননি। দক্ষিণেশ্বরে একদিন ঠাকুরের ঘরে খাবার দিতে গেছি।* রেখে চলে আসছি; তিনি লক্ষ্মী খাবার দিয়ে গেল মনে করে বলছেন, 'দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাস।' আমি বললুম, 'হাঁ, দরজা ভেজিয়ে রাখলুম।' তিনি আমার গলার স্বর টেব পেয়ে সঙ্কুচিত হয়ে বললেন, 'আহা, তুমি! আমি ভেবেছিলুম লক্ষ্মী—কিছু মনে করো না।' 'দিয়ে যাস' বলেছিলেন, তার জন্যই এত সঙ্কোচ। পরদিন পর্যন্ত নবতের সামনে গিয়ে বলছেন, 'দেখ গো, সাবারাত আমার ঘুম হয়নি, ভেবে ভেবে—কেন এমন রূঢ়বাক্য বলে ফেললুম।' আর এটা (রাধুর মা) কি না আমাকে দিনরাত গাল দিচ্ছে! কি পাপে যে আমার এমন হচ্ছে জানি না। হয়তো শিবের মাথায় কাঁটাসুদ্ধ বেলপাতা দিয়েছি। সেই কণ্টকে আমার এই কণ্টক।"

২৯ বৈশাখ, ১৩২০, জয়রামবাটী

বাধুর সেই জ্বর ও বেদনা। মা বলিতেছেন—"এই রাধীর উপর আমার আর একটুও মন নেই। রোগ ঘেঁটে ঘেঁটে বিতৃষ্ণা হয়েছে। জোর করে মন টেনে রাখি। বলি, 'ঠাকুর বাধীর উপর একটু মন দাও, নইলে ওকে কে দেখবে? এমন রোগও আর দেখিনি। জন্মান্তবীণ রোগ নিয়ে মরেছিল, প্রায়শ্চিত্ত করেনি। আমার এই দুইটি করাবার ইচ্ছা আছে ঃ একটি চণ্ড দেখানো—কেন এমন হচ্ছে, আর এই চান্দ্রায়ণ করা।

"ঠাকুরের যখন মহাভাব হতো বুকের ভেতর যেন সাতটা আগুনের তাওয়া জ্বলছে। বইয়েতে সব পড়েছ তো? তখন আমার ভাসুর তাঁকে দেশে নিয়ে এলেন। পাণ্ডবা থেকে একজন চণ্ড আনালেন। দেবতাব ভর হতে সেই চণ্ড বললে, তার ছেলেবেলার নাম করে,

* সরুচাকলি ও সুজিব পায়েস প্রস্তুত কবিযা, অন্য কেহ ঠাকুবেব ওখানে নাই জানিযা, সন্ধ্যাব পব নিজেই লইযা গিযাছিলেন

'ও অমুক (গদাই), তোমার এ মহাভাব ঈশ্বরের মহাকৃপায় হয়। এ রোগ নয়। তুমি অত সুপারি খেও না।' সুপারি বেশি খেলে পুরুষের ইন্দ্রিয়দোষ হয়।

"মানুষ যে রোগ নিয়ে মরে, যদি প্রায়শ্চিত্ত না করে মরে, তবে পরজন্মেও সেই রোগ হয়। সাধুদের পক্ষে এসব কিছু নয়।"

কেদারের মা—তারা ভগবানের নাম করে মরে, ভগবানকে পায়।

মা—হাঁ, তাই তো। এই যে ছেলেটি* কোয়ালপাড়ায় মারা গেল, এর কি আর পুনর্জন্ম হবে ? এর আর জন্ম হবে না।

"কাশীপুরে তাঁর অসুখের সময় তিনি বললেন, 'এই অসুখ, খাজাঞ্চী-টাজাঞ্চী লোকে কেউ কিছু বলবে—প্রায়শ্চিত্ত করলে না। ও রামলাল, তুই দশটা টাকা নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে যা, মা কালীকে নিবেদন করে বামুন-টামুনদের বিলিয়ে দে।'

"সাধুর তো কর্ম নেই, তাই টাকা ইষ্টকে নিবেদন করে দিয়ে বিতরণ করতে বললেন। মুনি-ঋষিরা বনে থাকতেন। তাঁরা কি চান্দ্রায়ণ করতে পারতেন ? তাঁরা ফলমূল নিজ ইষ্টকে নিবেদন করে সব্বাইকে বিতরণ করতেন। তাঁদের ওতেই হয়।"

পাগলী মামী—এই আমার মাসি রোগ নিয়ে মরেছে। তাহলে তারও কি সে রোগ হয়েছে ?

মা—তোর মাসি মরে জন্ম নেয়নি ? সে মরে জন্মও নিয়েছে, সেই রোগও তার সঙ্গে এসেছে।

"অনেক সময় কর্মের ফলে বংশের লোক সেই বংশেই পুনঃপুনঃ জন্মায় আর মরে। গয়ায় পিণ্ড দিলে তবে উদ্ধার হয়ে যায়।"

রাত্রে আহারের পর মায়ের ঘরে পান আনিতে গিয়াছি। রাঁচিতে একটি ভক্ত ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছেন, সেই কথা মাকে বলিলাম— একটি লোক সাধুদর্শন করবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে কখনো কখনো যেতেন। তিনি পাতলা ও বেঁটে ছিলেন। ঠাকুর তাঁকে 'ঝুনো সরষে' বলে ডাকতেন। ঠাকুরের দেহ যাবার অনেক বছর পরে যখন তিনি শিলং-এ চাকরি করেন, সেই সময় ঠাকুরের বিশেষ ভক্ত হন। তাঁদের আফিস শিলং থেকে

* দ্বারিক মজুমদার। ছেলেটি বি-এ পরীক্ষা দিয়াই জয়রামবাটী গিয়াছিল। গরিব বাপ-মা তাহাকে কষ্ট করিয়া পড়াইয়াছেন এবং একমাত্র পুত্র বলিয়া তাহার বিবাহ দেওয়া স্থির করিয়াছেন। ছেলেটি পিতামাতার অনুরোধে উহাতে সম্মত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমাকে সমস্ত ঘটনা বলায় তিনি আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "ভয় কি, ঠাকুরের গৃহস্থ ভক্ত সব ছিল, বলরামবাবু এঁরা ছিলেন" এবং তাহাকে অভয় দেন। ফিরিবার পথে ছেলেটি কোয়ালপাড়া আসিয়া হঠাৎ ভীষণ আমাশয়ে আক্রান্ত হয় এবং ছয়-সাত দিনের মধ্যেই দেহত্যাগ করে। অন্তিম সময়ে সজ্ঞানে ঠাকুরের নাম করিতে থাকে এবং 'রামকৃষ্ণ প্রেমানন্দে হরি হরি বোল' বলিয়া তাহার শেষ নিঃশ্বাস বহির্গত হয়। মায়ের কাছে সংবাদ যাইলে তিনি খুব দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "এখানে এসে এমন কারু হয়নি।" (অর্থাৎ তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়া কেহ মারা যায় নাই)।

ঢাকায় আসে এবং পরে রাঁচি যায়। রাঁচিতে রাত্রে তিনি শুয়ে আছেন, হঠাৎ কার ডাকে তাঁর ঘুম ভেঙে যেতে শোনেন যে, কে ডাকছে—'ও ঝুনো সরষে!' অবাক হয়ে ভাবছেন, আমার এ নাম তো কেউ জানে না—ঠাকুর ডাকতেন। দরজা খুলে দেখলেন ঠাকুর রাস্তায় দাঁড়িয়ে—গেরুয়া পরা, খড়ম পায়ে, চিমটে হাতে! জ্যোৎস্না রাত। বলছেন, 'এখানকার কিছু কথা হতো। তা ঢাকায় নয় দরকার না ছিল; এখানে ওটি বন্ধ কেন করলে? উটি করো না'—বলে অন্তর্ধান হলেন।

শিলং-এ ইঁহাদের একটি সমিতির মতো ছিল। তাহাতে 'কথামৃত' প্রভৃতি পাঠ হইত। ঢাকায় পূর্ব হইতেই একটি সমিতি থাকায় শিলং হইতে আসিয়া ভক্তেরা উহাতেই যোগ দেন। নিজেদের সমিতির আর পৃথক অস্তিত্ব রহিল না। কিন্তু ইঁহারা যখন রাঁচিতে আসিলেন, তখন আর নূতন করিয়া শিলং-এর মতো 'কথামৃত' পাঠ আরম্ভ না হওয়ায় তাহা বন্ধই হইয়া গিয়াছিল।

মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, খড়ম পায়ে, চিমটে হাতে কেন দেখলে?"

মা—সন্ন্যাসীর বেশ। তিনি যে বাউলবেশে আসবেন বলেছেন। বাউলবেশ—গায়ে আলখাল্লা, মাথায় ঝুটি, এতখানা দাড়ি। বললেন, 'বর্ধমানের রাস্তায় দেশে যাব, পথে কাদের ছেলে বাহ্যে করবে, ভাঙা পাথরের বাসন হাতে, ঝুলি বগলে।' যাচ্ছেন তো যাচ্ছেন, খাচ্ছেন তো খাচ্ছেন—কোন দিক-বিদিক খেয়ালই নেই।

আমি—বর্ধমানের রাস্তা কেন?

মা—এইদিকে দেশ (জন্মস্থান)।

আমি—তবে কি বাঙালী?

মা—হাঁ, বাঙালী। আমি শুনে বললুম, 'ও কিগো, তোমার একি সাধ?' তিনি হেসে বললেন, 'হাঁ, তোমার হাতে হুকো-কলকে থাকবে।'

ইহা বলিয়া মা বৃন্দাবনের সেই হুকো-কলকে ধরার ঘটনাটি বলিলেন (পৃঃ ২০৮)।

আমি বলিলাম, "আমাদের দেশে কেউ এল না। তুমি আমাদের দেশে যাবে (জন্ম নেবে)।"

এইবার যাইতে বলিতেছি ভাবিয়া মা বলিতেছেন, "তোমাদের দেশে কি করে যেতে হয়? রেল, জাহাজ, স্টিমার? তোমাদের ও দেশে একবার গেলে হয়। তাঁর যদি ইচ্ছা হয় তো হবে। ওদিকে যাওয়া হয়নি। তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'আমার যে-সব স্থানে যাওয়া হয়নি, তুমি সে-সব জায়গায় যাবে।' তাই তাঁর আশীর্বাদে রামেশ্বর এসব যাওয়া হলো।"

আমি—মা, শাস্ত্রে তো দশ অবতারের কথা আছে। চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, এসব অবতারের তো কথা নেই।

মা—তাঁর কি জান, সব খেলা, সব খেয়াল!

আমি—কোন্ গ্রামে জন্ম নেবেন?

মা—"কি জানি, জানি নে" বলিয়া এ প্রসঙ্গ চাপা দিলেন।

১৩২০ সাল, ২৫ জ্যৈষ্ঠ, জয়রামবাটী
মায়ের পুরাতন বাড়ি

শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ভৌমিক ও ডাক্তার দুর্গাপদ ঘোষ আসিয়াছেন। আজ অপরাহ্নে তাঁহারা রওয়ানা হইবেন। পূর্বাহ্ণে স্নানান্তে তাঁহারা শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিতে গেলেন। মা তাহাদিগকে মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং বসিতে বলিলেন। দুই-এক কথার পর সুরেনবাবু মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা, ঠাকুরকে পূজা করতে গিয়ে একটা খটকা বাধে। যেমন, একজনের হয়তো ইষ্টদেবী ও ঠাকুরকে এক বলে সাধারণ বিশ্বাস আছে। কিন্তু ঠাকুরের মূর্তিতে ইষ্টদেবীর পূজা করে জপ বিসর্জনের সময় 'ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরী' বলতে তার কেমন একটা খটকা বাধে।

মা—(সহাস্যে) তা বাবা, তিনিই মহেশ্বর, তিনিই মহেশ্বরী। তিনিই সর্বদেবময় তিনিই সর্ববীজময়। তাঁতে সব দেবদেবীর পূজা হয়। ও মহেশ্বর বললেও হবে, মহেশ্বরী বললেও হবে।

সুরেনবাবু—মা, ধ্যান ট্যান তো কিছুই হয় না।

মা—তা নাই বা হলো। ঠাকুরের ছবি দেখলেই হবে। ঠাকুরের তখন অসুখ, কাশীপুরে। ছেলেরা পালা করে থাকত। তখন গোপাল রয়েছে। ঠাকুরকে ফেলে সে গিয়ে ধ্যান করতে বসেছে। অনেকক্ষণ ধ্যান করছে। গিরিশবাবু এসে শুনে বললেন, 'চোখ বুজে যার ধ্যান করছে তিনি এখানে রোগশয্যায় পড়ে কষ্ট পাচ্ছেন, আর ও কি না ধ্যান করতে গেল।' গোপালকে ডেকে পাঠালেন। ঠাকুর তাকে পা টিপে দিতে বললেন। বললেন, পায়ে ব্যথা হয়েছে বলে টিপতে বলছি কি? তা নয় তোর অনেক করা ছিল (জন্মান্তরে), তাই।'

'ওকে দেখবে, তাহলেই হবে।'

সুরেনবাবু—মা, যথানিয়মে তিন বেলা জপ করাও সব সময় হয়ে ওঠে না।

মা—তা নাই বা হলো, স্মরণ-মনন রাখবে। যখন পার জপ করবে। অন্ততঃ প্রণামটা তো করতে পারবে?

দুর্গাবাবু—মা, আহারাদির সম্বন্ধে কি রকম নিয়ম পালন করে চলতে হবে বুঝতে পারি নে।

মা—আহারাদি সম্বন্ধে ঠাকুর একটা নিয়ম বেশি মানতেন, প্রথম শ্রাদ্ধের অন্নটা খেতে সব ভক্তদের নিষেধ করতেন। বলতেন 'ওতে ভক্তির হানি হয়।' তা ছাড়া তাঁকে মনে করে খাবে দাবে।

দুর্গাবাবু—মা, হাসপাতালে কাজকর্ম করতে অনেক সময় হয়তো পিপাসায় সেইখানেই যার-তার জল খেতে হয়, খেয়েও থাকি। তার কি হবে, মা?

মা—তা কি করবে? কাজের জন্য করতে হয়। ঠাকুরকে স্মরণ করে খাবে। কাজের

জন্য, ওতে দোষ হবে না। যাদের কাজকর্ম করতে হয় তাদের অত মেনে চলা হয় কি ?*

সুরেনবাবু—এই তো, মা, সংসারে দশজন নিয়ে বাস। রান্না হতে হয়তো দুজন অগ্রভাগ খেয়ে গেছে। তারপর সেই অন্ন এল ! তা নিবেদন করতেও দ্বিধা লাগে।

মা—তা সংসারে ওরকম হবেই। আমাদেরও হয়।† ধর না, একজন হয়তো রোগা, তার জন্য আগে একটু উঠিয়ে রাখতে হলো। তা খাবার এলে, তিনিই খেতে দিলেন মনে করে তাঁকে স্মরণ করে খাবে। দোষ হবে না।

সুরেনবাবু—মা, মনের যা অবস্থা তার আর কি বলব। আপনি অন্তর্যামিনী, বুঝতেই পারছেন। আর যে ভোগ কবছর ভুগছি। আপনার আশীর্বাদ না থাকলে হয়তো এতদিনে মরে যেতুম।

মা—হাঁ, বাবা, সংসারে যা কষ্ট তা আর বলতে ! কষ্টের পার নেই। তোমাদের তো আছেই ; আমাকেই, বাবা, যেভাবে ঠাকুর রেখেছেন ! এই মেয়েটাকে (রাধুকে) নিয়ে কি কষ্টই পাচ্ছি !

সুরেনবাবু—হাঁ, মা, এখানকার এই ভাব দেখেই মনকে প্রবোধ দিই, আর ভরসা হয়। মা তো সংসারের যন্ত্রণা নিজে দেখছেন, কাজেই দয়া হবে।

মা—তা ভয় নেই, বাবা, ঠাকুর আছেন। তিনিই তোমাদের ইহকাল পরকাল সব রক্ষা করবেন।

সুরেনবাবু—মা, দূরে পড়ে থাকি ; স্বপ্ন কি সত্য ?

মা—হাঁ, সত্য বইকি ! তাঁর স্বপ্ন সত্য। তাঁর স্বপ্ন আবার তিনি তাঁর কাছেই বলতে নিষেধ করতেন।

---

* মা যে সব সময় সকলের ছোঁয়া জিনিস খাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন তাহা মনে হয় না। জয়রামবাটীতে একদিন এই প্রসঙ্গে ঠাকুরের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর বলতেন, ওরে আমি তো এখুনি মুচি মেথর সকলের খেয়ে আসতে পারি। তাহলে তোরা যে এখুনি সব একাকার করে দিবি।' মায়ের শেষ অসুখের সময় যখন তাঁহাকে পাঁউরুটি দিবার ব্যবস্থা হয়, মা আমাকে বলিলেন, "বাবা, আমার এই শেষকালটায় আর আমাকে মুসলমানের ছোঁয়াটোয়া খাইও না।" যদিও তাঁহাকে এই সময় যে পাঁউরুটি দেওয়া হইয়াছিল তাহা ব্রাহ্মণের তৈয়ারি। পরে কলের তৈয়ারি বলিয়া বুঝাইয়া Milk-roll পাঁউরুটি দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু অন্য সময়ে কখন কখনও ব্রাহ্মণেতর ত্যাগী ভক্তের রান্না খাইয়াছেন, ইহাও দেখা গিয়াছে।

† কিন্তু ইহাও দেখিয়াছি যে, জয়রামবাটিতে ভোগের পূর্বে বাড়ির ছেলে মেয়ে কেহ খাবার কথা বলায় ধমক দিয়া বলিলেন, "এখন কি খাওয়া ? ঠাকুর দেবতার ভোগ হলো না, কিছু না।" একবার কার্যোপলক্ষে মামাকে সকাল সকাল রওয়ানা হইতে হইবে। মা তাহার জন্য পৃথক রাঁধিয়া দিলেন, তথাপি যে রান্না হইতে ঠাকুরের ভোগ হইবে তাহা দিলেন না। একদিন 'উদ্বোধনে' ঠাকুরের জন্য ফল ছাড়াইতেছেন মাকুর শিশুপুত্র খাইতে চাওয়ায় তাহাকে যাহা দিবেন তাহা হাতে করিয়া ঠাকুরকে দেখাইয়া (নিবেদন করিয়া) দিলেন। শেষ অসুখের পূর্ববারের অসুখে একদিন অনেক বলিয়া কহিয়া মাকে ভোগের পূর্বে খাওয়ানো গেল। অবশ্য যাহা খাইলেন তাহা ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া লইলেন। পরদিনও ভোগের পূর্বে খাইতে দেওয়া হইল। কিন্তু যাই যাই বলিয়া কোনরকমে বিলম্ব করিয়া সকলের অনুরোধে যখন খাইতে বসিলেন, তখন ঠাকুরের ভোগ উঠিয়াছে। এদিকে ঠাকুরের ভোগও হইয়া গেল, মাও খাইতে আরম্ভ করিলেন। পরদিন ঠাকুরের ভোগ হইয়া গেলে তবে খাইতে বসিলেন।

সুরেনবাবু—মা, ঠাকুর কেমন জানিনি, দেখিনি। আমাদের ঠাকুর বলুন, যা বলুন সবই এখানে (আপনি)।

মা—ভয় নেই, ঠাকুর দেখবেন, বাবা। ইহকাল পরকাল সব দেখবেন, সব রক্ষা করবেন।

আহারাদির পর তাঁহারা রওয়ানা হইলেন। সঙ্গে বরদা মামা; তিনি কলিকাতা আসিবেন। তাঁহারা ক্রমে উত্তরদিকের মাঠে পড়িলেন। মা কিছুদূর পর্যন্ত আসিয়া যতক্ষণ দেখা গেল চাহিয়া রহিলেন।

এই সুরেনবাবু যখন বল্লারতনগঞ্জ স্কুলে হেডমাস্টার ছিলেন, সেই সময় তিনি তথাকার কসাইগণ জীবন্ত গরুর চামড়া খসাইয়া লয় জানিয়া বড়ই ব্যথিত হন। দুর্বৃত্তেরা একদিন স্কুলের সামনেই ঐরূপ করিল। হিন্দু ও মুসলমান ছাত্র ও শিক্ষকগণ এবং সুরেনবাবু ইহার খুব প্রতিবাদ করেন। কসাইগণ মারও খায়। ইহা লইয়া তথায় একটা গণ্ডগোল বাধে। কসাইগণ সুরেনবাবুর উপর অত্যাচার করিবে বলিযা তাঁহাকে ভয় দেখায়। এই সময় স্কুলের দুই-তিনটি ছাত্র শ্রীশ্রীমায়ের কৃপালাভের জন্য জয়রামবাটী যায়। সুরেনবাবু ঐসঙ্গে পত্র দেন; তাহারাও সব ঘটনা শ্রীশ্রীমাকে নিবেদন করে। মা শুনিয়া শিহরিতে লাগিলেন, এবং সুরেনবাবুকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, 'তোমরা যদি এমন কাজের প্রতিবাদ না কর, তবে কে করবে?' মায়ের কথামত সুরেনবাবুকে খুব অভয় দিয়া পত্র লেখা হইল এবং যাহাতে এরূপ নৃশংস ব্যাপার আর না ঘটে তাহারই বিশেষ চেষ্টা করিতে বলা হইল। সুরেনবাবুর দ্বিতীয় পত্রের উত্তরে মা লিখিতে বলিলেন, "ভগবান যদি সত্য হন, তবে নিশ্চয়ই এর প্রতিবিধান হবে।" এই ঘটনা উপলক্ষে মকদ্দমা হইয়াছিল। ইহার ফল আশানুরূপ না হইলেও ক্রমে প্রকাশ্যভাবে ঐ নৃশংস কর্মের অনুষ্ঠান একেবারে বন্ধ হইয়া গেল।

২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০, জয়রামবাটী

মধ্যাহ্নে মায়ের ঘরের বারান্দায় আমি ও আর একজন খাইতে বসিয়াছি।

মা—রাধু বললে, এবার নাকি আশ্বিন মাসে খুব মারামারি হবে, পাঁজিতে লিখেছে।

আমি—মারামারি নয়, মহামারী।

কথাপ্রসঙ্গে মা বলিলেন, "ঠাকুরের আবির্ভাব থেকে সত্যযুগ আরম্ভ হয়েছে। বিশেষ বিশেষ লোক তাঁর সঙ্গে এসেছেন। এই নরেন সপ্তঋষির মধ্যে প্রধান ঋষি। তিনি তো শত ঋষির মধ্যে বলতে পারতেন; তা না বলে সেই বড় সাতজনের মধ্যে একজন বললেন। অর্জুন যোগীন হয়ে এলেন। তেমন প্রধান প্রধান কটি থাকে? অনেক থাকে কি? টোকো আম অনেক পাওয়া যায়, ফজলি আম কি বেশি পাওয়া যায়? সাধারণ লোক কত

জন্মাচ্ছে, মরছে। এই সব সর্ব-প্রধান যাঁরা, তাঁরাই ভগবানের কার্যের জন্য সঙ্গে সঙ্গে আসেন।"

আমি—স্বামীজীও বলেছেন, ঠাকুরের আবির্ভাব থেকে সত্যযুগ আরম্ভ।

মা— তাই তো।

২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০, জয়রামবাটী

দ্বিপ্রহরে মায়ের বারান্দায় খাইতে বসিয়াছি, রাধুকেও মা একধারে বসিয়া খাওয়াইতেছেন। মা রাধুকে বলিতেছেন, "খা, খা, গাঁদাল-ঝোল, এ ঠাকুর খেতেন। তিনি ভালবাসতেন-- গাঁদাল, ডুমুর, কাঁচকলা। পেটের অসুখ ছিল কি না। এই দুধ খা।"

রাধু —না, আর খাব না।

মা খা, খা, একটু (আমাদিগকে) ঠাকুরের অসুখের সময় কুমারটুলির গঙ্গাপ্রসাদ সেনকে দেখালেন। কবিরাজ জল বন্ধ করে ওষুধ খাবার ব্যবস্থা করলেন। ঠাকুর এসে সব্বাইকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, 'হ্যাগা, জল না খেয়ে পারব ?' যাকে দেখেন তাকেই জিজ্ঞাসা করেন, পাঁচ বছরের ছেলেদের পর্যন্ত 'হ্যাগা, জল না খেয়ে কি থাকা যায় ?' তারা বললে, 'হাঁ, পারবেন বইকি, মশায়।' আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'পারব ' আমি বললুম, পারবে বইকি।' তিনি বললেন, 'বেদানা পর্যন্ত জল পুঁছে দিতে হবে, দেখ যদি তোমরা পার।' আমি বললুম, 'তা মা কালী যেমন করবেন, যথাসাধ্য তাঁর ইচ্ছায় হবে।' শেষে মন স্থির করে জল বন্ধ করে ওষুধ খেলেন। রোজ তিন চার সের, শেষে পাঁচ ছ সের পর্যন্ত দুধ দিতুম। গাই দুইয়ে যে লোকটি দুধ দিত সে আমাকে বেশি বেশি দুধ দিয়ে যেত। বলত ওখানে দিলে কালীর ভোগ বেটারা বাড়ি নিয়ে যাবে। কাকে না কাকে খাওয়াবে। আর এখানে দিলে উনি খাবেন। তাই পাঁচ ছয় সের পর্যন্ত দিয়ে যেত। বেশ ভাল ভক্তিমান লোকটি ছিল। আমি সন্দেশ, রসগোল্লা, এসব মিষ্টি-টিষ্টি যা থাকত—আর তখন অনেক আসত—সব দিতুম। দুধ জ্বাল দিয়ে দিয়ে কমিয়ে এক সের, দেড় সের করে দিতুম। জিজ্ঞাসা করতেন, 'কত দুধ ?' বলতাম, 'কত আর—এক সের, পাঁচপো হবে।' তিনি বলতেন, না, এই যে পুরু সর দেখা যাচ্ছে।'

' একদিন গোলাপ ছিল, তাঁকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'হ্যাগা, কত দুধ হবে ?' গোলাপ বলে দিয়েছে।

"'এ্যা এত দুধ। তাই তো আমার পেটের অসুখ হয়। ডাক, ডাক।' আমি গেলুম। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত দুধ ?' আমি বললাম, 'পাঁচপো হবে আর কি'।"

"তবে যে গোলাপ বলে এত ?"

"গোলাপ জানে না, এখানের মাপ গোলাপ জানে? ঘটিতে কত দুধ ধরে গোলাপ জানবে কি করে?

"আর একদিন গোলাপকে জিজ্ঞাসা করেছেন। গোলাপ বলে দিয়েছে, 'এখানের এক বাটি, আর কালীঘরের এক বাটি।' শুনে বললেন, 'এ্যা, এত দুধ? ডাক, ডাক, জিজ্ঞাসা করব।' যেতেই বলছেন, 'বাটিতে কত ধরে? ক ছটাক, ক পো?' আমি বললুম, 'ক ছটাক, ক পো, অত জানি নে। দুধ খাবে, তা ক ছটাকের ঘটি কত পো, অত কেন? অত হিসাব কে জানে?' তিনি বললেন, 'এত কি হজম হয়? তাই তো পেটের অসুখ হবে।' বাস্তবিকই সেদিন পেটের অসুখ করল। জিজ্ঞাসা করলুম, 'কি রকম দাস্ত হচ্ছে?' বললেন, 'পালো পালো, সাদা সাদা, একটু একটু পনর বার বাহ্যে গেলুম। তোমাদের এমন সেবা চাই না।' সেদিন আর বিকালে কিছু খেলেন না। ভাত টাত পড়ে রইল। একটু সাগু করে দিলুম। গোলাপ বললে, মা, বলে দিতে হয়। আমি কি জানি? তাইতো, খাওয়া নষ্ট হলো।' আমি বললুম, 'খাওয়ার জন্য মিথ্যা বললে দোষ নেই, আমি এই রকম করে ভুলিয়ে টুলিয়ে খাওয়াই।' (আমাদিগকে) এই এতখানি শরীর হয়েছিল। বেশ সেরে গিয়েছিলেন।"

আমি—এ তো দেখছি মনেই সব।

মা—তাই তো, মনেই। নতুবা না বললে এমনি বেশ খেতেন।

রাত্রে আমি ও বিভূতি খাইতে বসিয়াছি। আমি বিভূতিকে বলিলাম, 'রাধুর জন্য একটি হিষ্টিরিয়া রোগের কবচ ভাল লোকের কাছ থেকে এনে দিলে হয়।'

মা—হাঁ, বেলটের স্বরূপনারায়ণ ধর্মের পণ্ডিতরা ঔষধ দেয়। রাধুর জন্য তাই দেব মনে করেছি। এখন কিছুদিন দৈবী টৈবী দেখাবার ইচ্ছা। আমার মা ঐ স্বরূপনারায়ণের ফুল পেয়ে ভাল হয়েছিলেন। সেই হতে আমার এটিতে বিশ্বাস।

বিভূতি—ওঃ, ধর্মের পণ্ডিত (সেবাইত)? বৌদ্ধরা ঔষধপত্র দিত কি না। ধর্ম হচ্ছে বুদ্ধদেব।

মা—আমাদেরও আছে ধর্মঠাকুর (মন্দির), ঐ যে ওখানে।

আমি—ধর্ম তো সব জায়গায় জানি বুদ্ধমূর্তি।

মা—এখানে কচ্ছপমূর্তি, নারায়ণ বলে।

বিভূতি—আসনের মতো না? নিচে চারটি খুরো দেওয়া?

মা—হাঁ, মাঝখানটি একটু উঁচু।

বিভূতি—ও কচ্ছপ নয়, বুদ্ধাসন। বুদ্ধাবস্থা অস্তি-নাস্তির পারে কি না। তাঁর কোন মূর্তি হতে পারে না। তাই তাঁর শুধু আসন করেছে।

মা—তা হতে পারে আমাদের এই ধর্মকে ছেলেরা পূজো করছে। যা দেয়, কোন বিধি-নিষেধ নেই। হয়তো দুটো লাল ফুল, কি যা হলো তাই দিলে, কোন অপরাধ নেন না। যে যা দেয় তাতেই খুশি।

আমি—বেদনা প্রভৃতির লোকে দৈব ঔষধ পায়, এর অদৃষ্টে তা আর হলো না।

মা—না, কেউ ফিরে চাইলেন না। এই যে এত ডাকি, কিছুই না। আমার অসুখের সময়, তখন সব শরীর ফুলে গেছে, নাক কান দিয়ে রস ঝরছে। উমেশ (মায়ের ভাই) বললে, 'দিদি, এখানে সিংহবাহিনী আছেন, হত্যা দেবে?' সে-ই আমাকে রাজি করে ধরে ধরে নিয়ে গেল। পূর্ণিমার রাত আমার কাছে অমাবস্যা—চক্ষে দেখতে পাই না, জল পড়ে পড়ে চক্ষু গেছে। গিয়ে মায়ের মাড়োতে পড়ে রইলুম। আবার আমাশা; তিন-চারবার হাতড়ে হাতড়ে রাত্রেই শৌচে গেলুম। ভিক্ষে-মা ছিল; ঐখানেই তার ঘর। সে মাঝে মাঝে গলা খ্যাঁকার দিত, আমি ভয় না পাই। পড়ে রইলুম। কিছুক্ষণ পরেই আমার মাকে এসে বলছেন, কামারদের একটি মেয়ের বেশে, রাধুর মতো অত বড় (১২/১৩ বছরের) মেয়েটি, 'যাও, যাও, উঠিয়ে আনগে। অমন অসুখ, তাকে ফেলে রাখতে আছে? এক্ষুণি আনগে। এই ওষুধ দিও, এতেই ভাল হয়ে যাবে।' এদিকে আমাকে বললেন, 'লাউফুল নুন দিয়ে রগড়ে তার রস চোখে ফুট (ফোঁটা ফোঁটা করে) দিও, ভাল হয়ে যাবে।' তারপর মা যে ওষুধ পেলেন তাই নিলুম। আর লাউফুলের ফুট চোখে দিলুম। দিতেই যেমন জাল টেনে আনে, অমনি চোখের সব ময়লা টেনে বের করে দিলে। সেইদিনই চোখ ভাল হয়ে গেল। আব শবীরের সব ফুলো-টুলো কমে গেল। বেশ ঝরঝরে হলুম। সেরে গেলুম। যে জিজ্ঞাসা কবত, বলতুম, 'মা ওষুধ দিয়েছেন।' সেই হতেই মায়ের মাহাত্ম্য প্রচার হলো। আমিও ওষুধ পেলুম, জগৎও ধন্য হলো। আগে আগে মাকে অত কেউ জানত না। আমার খুড়ো মায়েব ওখানে হত্যা দিলেন। তাঁকে কিন্তু এমন ডেয়ো ছেড়ে দিলেন যে টিকতে দিলে না। মাকে এসে স্বপ্নে বলছেন, আমি যে শয়নে আছি, এখন কেন হত্যা দিয়েছে? ও বামুন মানুষ, এ সব জানে না? যাও, যাও, উঠিয়ে আনগে।' মা বললেন, 'এত কথা বললে, আর ওষুধটুকু বলে দিলেই তো হতো।'

"আমাব মা একবাব দেখেছিলেন। একবার গ্রামের কালীপূজার সময় নব মুখুজ্যে আডাআড়ি কবে আমাদেব চাল নিলে না। মা চাল-টাল তয়ের করে রেখেছিলেন—পূজার যোগান। আমাদেব ঘব থেকে আর নিলে না। মা সমস্ত রাত্তির কেবল কাঁদলেন, 'কালীর জন্যে চাল করেছি, আমাব চাল নিলে না? এ চাল আমার কে খাবে? এ কালীর চাল তো কেউ খেতে পাববে না।' তাবপব রাত্রে দেখেন কি জগদ্ধাত্রী, লাল রং, দুয়ারের ধারে পাযেব উপব পা দিয়ে বসেছেন। তখন ঐ একটি ঘর, বরদার ঘরটি। তিনি (ঠাকুর) আসলেও ঐ ঘরে থাকতেন। জগদ্ধাত্রী আমার মাকে গা চাপড়ে চাপড়ে ওঠালেন। উঠিয়ে বলছেন, 'তুমি কাঁদছ কেন? কালীর চাল আমি খাব। তোমার ভাবনা কি?' মা বললেন, 'কে তুমি?' জগদ্ধাত্রী বললেন, 'আমি জগদম্বা, জগদ্ধাত্রীরূপে তোমার পূজা গ্রহণ করব।' পবদিন মা আমাকে বলছেন, 'আরে সারদা, লাল রং, পায়ে পা ঠেসান দিয়ে ও কি ঠাকুর? আমি জগদ্ধাত্রী পূজা করব।' 'জগদ্ধাত্রী পূজা করব, জগদ্ধাত্রী পূজা করব'—তাঁর একটা

বাই হয়ে গেল! বিশ্বাসদের কাছ থেকে দু আড়া (প্রায় ১৩ মণ) ধান আনালেন। এমন বৃষ্টি তখন, একদিনও ফাঁক নেই। মা বললেন, 'মা, কি করে তোমার পূজা হবে, ধানই শুকাতে পারলুম না!' শেষটায় মা জগদ্ধাত্রী এমন রোদ দিলেন যে, চারিদিকে বৃষ্টি হচ্ছে, মায়ের চাটাইয়ে রোদ! কাঠ জ্বেলে সেঁকে সেঁকে মূর্তি শুকনো করে রং দেওয়া হলো। প্রসন্ন তাঁকে (ঠাকুরকে) দক্ষিণেশ্বরে খবর দিতে গেল। তিনি শুনে বললেন, 'মা আসবেন, মা আসবেন, বেশ, বেশ। তোদের বড় খারাপ অবস্থা ছিল যে রে।' প্রসন্ন বললে, 'আপনি যাবেন, আপনাকে নিতে এলুম।' তিনি বললেন, 'এই আমার যাওয়া হলো; যা, বেশ, পূজা করগে। বেশ, বেশ, তোদের ভাল হবে।' জগদ্ধাত্রী পূজা হলো। দেশাম (দেশসুদ্ধ নিমন্ত্রণ) হলো। ঐ চালেই সব খরচ-পত্র কুলিয়ে গেল। প্রতিমা বিসর্জনের সময় মা জগদ্ধাত্রী-মূর্তির কানে কানে আবার বলে দিলেন, 'মা জগাই, আবার আর বছর এসো। আমি তোমার জন্য সমস্ত বছর ধরে সব যোগাড় করে রাখব।' পরের বছর মা আমাকে বললেন, 'দেখ, তুমি কিছু দিও, আমার জগাইয়ের পূজা হবে।' আমি বললুম, 'অত ল্যাঠা আমি পারব না! হলো, একবার পূজা হলো, আবার ল্যাঠা কেন? দরকার নেই, ও পারব না।' রাত্রে স্বপ্নে দেখি কি তিনজনে এসে হাজির। ওরে বাপ! সেই মনে পড়ছে।"

আমি—তিনজন কে কে?

মা—জগদ্ধাত্রী ও জয়া বিজয়া সখী। বলছেন, 'আমরা তবে যাব?' আমি বললুম, 'কে তোমরা!' বললেন, 'আমি জগদ্ধাত্রী।' আমি বললুম, 'না, তোমরা কোথা যাবে? না, না, তোমরা কোথা যাবে? তোমরা থাক, তোমাদের যেতে বলিনি।'

"সেই থেকে বরাবর জগদ্ধাত্রীপূজার সময় এখানে আসি। বাসন-টাসন মাজতে হয় কি না। আর তখন তো আমাদের সংসারে লোকজন বেশি ছিল না। বাসন মাজতে আসতুম। তারপর যোগীন (মহারাজ) সব কাঠের বাসন করে দিলে। বললে, 'মা, তোমাকে আর বাসন মাজতে যেতে হবে না।' জগদ্ধাত্রীপূজার জমিও করে দিলে। আহা! আমার মা ছিলেন যেন লক্ষ্মী; সমস্ত বছর সব জিনিসটি-পত্রটি গুছিয়ে-টুছিয়ে ঠিকঠাক করে রাখতেন। বলতেন, 'আমার ভক্ত-ভগবানের সংসার, আমার সারদা (স্বামী ত্রিগুণাতীত) হয়তো কখনো আসবে, যোগীন (মহারাজ) আসবে। এসব দরকার।' ভাল চাল টাল যা পেতেন সব ঠিকঠাক করে রাখতেন। বলতেন, 'আমি যতক্ষণ আছি, ব্রহ্মা আছেন, বিষ্ণু আছেন, জগদম্বা আছেন, শিব আছেন, সব আছেন। আমিও যাব, এঁরাও সঙ্গে সঙ্গে যাবেন। তোরা কি যত্ন করতে পারবি! আমার ভক্ত-ভগবানের সংসার।'

"আমার একটু আমাশয়ের মতো হইয়াছিল। তাহা শুনিয়া মা বলিলেন, 'ওর আমাশার ধাত, কাশীতেও হলো।' আমি বলিলাম, 'কাশী যাবার আগে কলকাতায় হয়েছিল। আমাদের বংশেরই এই রোগ। বাবা এবং আরও অনেকে আমাশায় মারা গেছেন'।"

বিভূতি—ও সব কি? কবে বাপ কিসে মারা গেছেন, তাতে কি?

মা—হাঁ, ও কি ? দৃষ্টান্ত দেওয়া ভাল নয়। দৃষ্টান্ত দিলে ভুগতে হয়। কে কবে মরেছে। কেবা বাপ, কেবা মা ? ঈশ্বরই সব।

৩০ আষাঢ়, ১৩২০, জয়রামবাটী

মধ্যাহ্নে মায়ের ঘরের বারান্দায় আমি ও মুকুন্দ (সাহা) খাইতে বসিয়াছি। মা বড় মামার বারান্দার পূর্বপাশে বসিয়া আছেন, এমন সময় নলিনী ভিজা কাপড়ে আসিয়া বলিল, কাকে তাহার কাপড়ে প্রস্রাব করিয়াছে বলিয়া সে আবার স্নান করিয়া আসিয়াছে।

মা—বুড়ো হতে চললুম, কাকে প্রস্রাব করে, কখনো শুনিনি ! বহু পাপ, মহাপাপ না হলে কি মন অশুদ্ধ হয় ? কৃষ্ণ বোসের বোনের অমনি শুচিবাই ছিল। 'টিকিটা ডুবল কি ?'—গঙ্গায় নাইতে গিয়ে ডুব দিচ্ছে, আর লোকেদের জিজ্ঞাসা করছে। শুচিবাই, মন আর কিছুতেই শুদ্ধ হচ্ছে না। অশুদ্ধ মন অনায়াসে যায় না। আর শুচিবাই যত বাড়াবে তত বাড়বে। সবই যত বাড়াবে তত বাড়বে।

আমি—মহাপুরুষকে দেখেছি ভজা প্রভৃতি কুকুরগুলোকে ঘেঁটে তারপর হয়তো ঠাকুরপূজা করতে গেলেন। যাবার সময় কেউ হাতে জল (তখন গঙ্গাজলই সব কাজে ব্যবহার হতো) ঢেলে দিলে, আচমনের মতো একটু হাত ধুলেন মাত্র।

মা—তাদের কথা স্বতন্ত্র। তাদের মন কত শুদ্ধ—সাধুর মন ! গঙ্গাতীরে যারা বাস করে তারা সব দেবতা। দেবতা না হলে কি গঙ্গাতীরে বাস হয় ? আর গঙ্গাস্নানে রোজের পাপ রোজ ক্ষয় হয়।

নলিনী—গোলাপ দিদি একদিন 'উদ্বোধনে' (উপরের) পায়খানা সাফ করে এসে, আবার কাপড় ছেড়েই ঠাকুরের ফল ছাড়াতে গেল। আমি বললুম, 'ও কি, গোলাপ দিদি ! গঙ্গায় ডুব দিয়ে এস।' গোলাপ দিদি বললে, 'তোর ইচ্ছা হয় তুই যা না।'

মা—গোলাপের মন কত শুদ্ধ, কত উঁচু মন। তাই ওর অত শুচি-অশুচি-বিচার নেই—অত শুচি-বাই-টাই-এর ধার ধারে না। ওর এই শেষ জন্ম। তোদের অমন মন হতে আলাদা দেহ দরকার।

"আর চারক্রোশী গঙ্গাতীর, পবিত্র হাওয়া বয়। হাওয়ারূপী নারায়ণ। বহু তপস্যা করলে এই মন শুদ্ধ হয়। 'সাধন বিনা শুদ্ধ বস্তু কভু না মিলয়।'

"ভগবানলাভ হলে কি আর হয় ? দুটো কি শিং বেরোয় ? না, মন শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ মনে জ্ঞানচৈতন্যলাভ হয়।"

আমি—যারা ভগবানের উপর নির্ভর করে পড়ে থাকে তাদের (বিনা সাধনে) কি করে হয় ?

মা—ভগবানের উপর নির্ভর করে, বিশ্বাস করে যে পড়ে থাকে, এইটিই তাদের সাধন।

আহা, নরেন বলেছিল, 'লাখ জন্ম হলেই বা, তাতে ভয় কি ?' তাইতো জ্ঞানীর জন্ম নিতে ভয় কি ? তাদের তো আর পাপ হয় না। অজ্ঞানীরই যত ভয়। তারাই বদ্ধ হয়, পাপে লিপ্ত হয়। কত লাখ লাখ জন্ম ভুগে ভুগে, যাতনা পেয়ে পেয়ে শেষে ভগবানকে চায়।

আমি—ঘেঁটে ঘেঁটে তবে তো শিক্ষা হয়, জ্ঞান হয়।

মা—হাঁ, ঢাক, ঢোল, বীণা, সব যন্ত্র বাজিয়ে বাজিয়ে শেষে ধুনুরীর হাতে পড়ে তবে তুঁহু তুঁহু ডাক ছাড়ে।

শ্রীযুত রামলাল দাদার মেয়েটি বিধবা হইয়াছে শুনিয়া বলিলেন, "ঠাকুর বলেছিলেন, 'ওসব দেববংশের মেয়ে ওরা কখনও সংসারী হবে না।' তাই সব বিধবা। রামলালের কষ্ট আর কি। ছেলেটি মারা গেল। আজ থাকলে বার-তেরো বছরের হতো। ছেলেগুলো* 'দাদামশায়, দাদামশায়' করে নাচছে। আর ওদেরও এই শেষ জন্ম। তাই সব এসে জন্মেছে তো।"

২ আশ্বিন, জয়রামবাটী

মা একজনকে পত্রে জানাইতেছেন, "শরীরধারণে কিছুমাত্র সুখ নাই। দুঃখপূর্ণই জগৎ। সুখ কেবল একটি নাম মাত্র। ঠাকুরের কৃপা যাহার উপর হইয়াছে সেই কেবল তাঁহাকে ভগবান বলিয়া জানিতে পারিয়াছে এবং তাহার সেইটুকুই সুখ জানিবে।"

একটি ত্যাগী ভক্ত জয়রামবাটীতে মাকে দর্শন করিয়া হৃষীকেশ গিয়াছেন। কিছুদিন পরেই তিনি মাকে লিখিয়াছেন, "মা, তুমি বলেছিলে, 'সময়ে ঠাকুরের দর্শন পাবে।' কই তা হলো ?" ইত্যাদি। মা চিঠি শুনিয়া আমাকে বলিতেছেন, "দাও তো, দাও তো ওকে লিখে, 'তুমি হৃষীকেশ গিয়েছ বলে ঠাকুর তোমার জন্য সেখানে এগিয়ে থাকেননি।' সাধু হয়েছে, ভগবানকে ডাকবে না তো কি করবে ? তিনি যখন ইচ্ছা দেখা দেবেন।"

উদ্বোধন

একটি ছেলে মায়ের কৃপালাভের জন্য দুই-একবার আসিয়াছিল। ছেলেটি গরিব, অনেক কষ্টে আসিয়াছিল। কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্যবশতঃ মায়ের শরীর অসুস্থ থাকায় কৃপালাভ করিতে পারে নাই। এবারে সে আমাদিগকে অনুযোগ করিয়া লিখিয়াছে, "আপনারা আর দুয়ার বন্ধ রাখিবেন না, আমাকে বহু কষ্টে যাইতে হয়। আমি জানিতে চাই, এবার যাইলে হইবে কি না" ইত্যাদি। তাহার পত্র মাকে পড়িয়া শুনানো হইল। মা তদুত্তরে বলিলেন,

* শ্রীযুত রামলাল দাদা ও শিবু দাদার শিশুপুত্রগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি দর্শনে ঐরূপে আনন্দপ্রকাশ করিত

"আমার শরীর যখন খারাপ থাকে তখন যেই আসুক না কেন, ফিরে যাবে। শরীর ভাল থাকলেও কাকেও নিমন্ত্রণ করে আনতে পারব না। যার যেমন ভাগ্য, যার যেমন কর্ম, তার তেমনি সুযোগ-সুবিধা হয়ে থাকে। কেউ বা বহুবার এসেও দর্শনের সুবিধা পায় না, হয়তো আমার অসুখ, বা অন্য কোন ব্যাঘাত ঘটল। সে তার অদৃষ্ট; তার আমি কি করব? যাতায়াতে তাদের বহু অর্থব্যয় হয়ে থাকে, সকলের টাকা নাই, বলবে। তা গুরু যতবারই ফিরিয়ে দেন না কেন, যে কৃপা চায়, সে ভিক্ষা করেও আসে। কথা এই, যার ভবপারে যাবার সময় হবে সে দড়ি ছিঁড়ে আসবে, তাকে বেঁধেও কেউ রাখতে পারে না। অর্থাভাব, চিঠির অপেক্ষা, এসে ফিরে যাওয়ার ভয়—এসব কিছুই কিছু নয়।" পরিশেষে বলিলেন, "আজকাল শরীর একটু ভাল আছে, এখন আসতে পারে, লিখে দাও।"

একটি স্ত্রীলোক লিখিয়াছেন, "মা, আমার অল্প বয়স। শ্বশুর-শাশুড়ী আসতে দিচ্ছেন না। তাঁদের অমতে কি করে আসি। আপনার কৃপালাভ-ইচ্ছা" ইত্যাদি। মা তাঁহাকে লিখিতে বলিলেন, "মা, তোমার এখানে আসিবার আবশ্যকতা নাই। যে ভগবান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া রহিয়াছেন তুমি তাঁহাকেই ডাক। তিনিই তোমাকে কৃপা করিবেন।"

৩০-৯-১৮ উদ্বোধন, ঠাকুরঘর

সকালে মা পূজার জন্য ফল ছাড়াইতেছিলেন। জনৈক ভক্তের পত্র পড়িয়া শুনাইতেছিলাম। পত্রখানি ভগবানের উপর অভিমানের ভাবে লেখা। মা তদুত্তরে বলিলেন, "ঠাকুর বলতেন, শুক, ব্যাস তো ডেয়ো-পিঁপড়ে। তাঁর অনন্ত রয়েছে। তুমি যদি ঈশ্বরকে না ডাক—আর কত লোক তো তাঁকে মনেই করছে না—তাতে তাঁর কি? সে তোমারই দুর্ভাগ্য। ভগবানের এমনি মায়া যে তিনি এই রকম করে সব ভুলিয়ে রেখেছেন—'বেশ আছে ওরা, থাক্'।"

আমি—মা, এরা (পত্রলেখক) যে চায় না তা নয়। না চাইলে এমন প্রশ্ন এদের মনে উঠবে কেন? তবে যাঁকে আপনার বলে ধরতে যাচ্ছি, তিনি ধরাছোঁয়া দিচ্ছেন না, এটা বড় প্রাণে লাগে। বুদ্ধ, চৈতন্যদেব, যীশুখ্রীস্ট এঁরা ভক্তদের জন্য কত করতেন—কিসে তাদের কল্যাণ হবে।

মা—আমাদের ঠাকুরেরও তো ঐ ভাব ছিল। তবে আমার তো সব সময় মনে থাকে না (সকল ভক্তকে)। আমি ঠাকুরকে বলি, 'ঠাকুর, তুমি সকলের কল্যাণ কর, যে যেখানে আছে, আমার তো সকলকে মনে থাকে না।' আর দেখ, তিনিই সব করছেন, তা না হলে এত সব আসছে?

আমি—তাতো বটেই। মানুষ কালী, দুর্গা, এ সবকে বরং ঈশ্বর বলে বিশ্বাস করতে পারে, কিন্তু মানুষকে ঈশ্বর বলে বিশ্বাস করা—একি হতে চায়?

মা—এইটি তাঁর কৃপা।

পরে একদিন ভক্তটি আসিলে মাকে বলিলাম, "মা, এই সেই চিঠি লিখেছিল।" মা বলিলেন, "এ ? এ তো ভাল ছেলে।" ভক্তটিকে বলিয়াছিলেন, "এমন যে জল, যার স্বভাব নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচুদিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।"

বেলা প্রায় সাড়ে দশটা হইবে। একটি গৃহস্থ শিষ্য মাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। প্রণাম করিয়া মাকে বলিতেছেন, "মা, কেন ঠাকুরের দর্শন হচ্ছে না ?" ইত্যাদি। মা বলিলেন, "ডাকতে থাক ক্রমে হবে। কত মুনি ঋষি যুগযুগান্তর ধরে তপস্যা করে পেলে না, আর তোমাদের ফস্ করে হবে ? এজন্মে না হয়, পরজন্মে হবে পরজন্মে না হয়, তার পরজন্ম হবে। ভগবানলাভ কি এতই সোজা ? তবে এবার ঠাকুরের সোজা পথ, তাই।"

ভক্তটি বাহিরে গেলে মা বলিলেন—

"এই সংসার করে এলুম, এই কুড়িগণ্ডা ছেলের বাপ হয়ে এলুম ! বলে কি না, 'ঠাকুরের দেখা কেন পাই না ?'

"ঠাকুরের কাছে মেয়েমানুষগুলো যেত। বলত, 'কেন ঈশ্বরে মন হয় না ?' 'কেন মন স্থির হয় না ?'—এই সব। ঠাকুর তাদের বলতেন, 'আরে, গা থেকে এখনও আঁতুড়-গন্ধ যায়নি। আগে আঁতুড়-গন্ধ ছাড়ুক। এখন কিরে ? ক্রমে হবে। এজন্মে এই দেখা হলো, পরজন্মে আবার দেখাটেখা হবে, তখন হবে।'

"যখন দেহ থাকে তখন অনায়াসেই দর্শন মেলে। এই এখানে রয়েছি—এলেই দেখা হয়। এখন ঠাকুরকে চাক্ষুষ দেখা কজনের ভাগ্যে হয় ? বিজয় গোঁসাই ঢাকায় দেখেছিল—গা টিপে। ঠাকুর বললেন, 'আত্মাটা যে বেরিয়ে যায়, এ ভাল নয় ; দেহ বুঝি এবার বেশি দিন থাকবে না।'

"কার হয়েছে বল না ? নরেনের তিনি করে দিয়েছিলেন। শুক, ব্যাস, শিব তো ডেয়ো-পিঁপড়ে। স্বপ্নে-টপ্নে হয়তো দর্শন হয়। নতুবা তিনি দেহ ধরে দেখা দেবেন, সে বহু ভাগ্যের কথা।

(উত্তেজিতকণ্ঠে) "যদি শুদ্ধ মন হয়, কেন ধ্যানধারণা হবে না ? কেন দর্শন হবে না ? জপ করতে বসলুম তো আপনা হতেই ভিতর থেকে গর গর করে নাম উঠতে থাকবে, চেষ্টা করে নয়।

"জপধ্যান সব যথাসময়ে আলস্য ত্যাগ করে করতে হয়। দক্ষিণেশ্বরে একদিন শরীরটা খারাপ লাগায় একটু দেরিতে উঠেছি। তখন রাত তিনটায় উঠতুম। পরদিন আরও দেরিতে উঠলুম। ক্রমে দেখি সকালে উঠতেই ইচ্ছা যাচ্ছে না। তখন মনে হলো, ওরে এইতো আলস্যে পেয়েছে। তারপর জোর করে উঠতে লাগলুম, তখন সব পূর্বের মতো হতে লাগল। এসব বিষয়ে রোখ করে অভ্যাস রাখতে হয়।

"সাধন বল, ভজন বল, তীর্থদর্শন বল, অর্থোপার্জন বল—সব প্রথম বয়সে করে নিতে হয়। এই আমি তখন হেঁটে হেঁটে কাশী-বৃন্দাবনে কত দর্শন করেছি। এখন দুহাত যেতে হলে পালকি চাই—ধরে ধরে নিতে হয়। বৃদ্ধ বয়সে কফ-শ্লেষ্মায় ভরা, শরীরে সামর্থ্য নেই, মনে বল থাকে না—তখন কি কোন কাজ হয়? এই যে এখানকার ছোকরারা সব প্রথম বয়সেই ভগবানে মন দিচ্ছে, এ ঠিক দিচ্ছে, ঠিক সময়ে হচ্ছে। (আমাকে) বাবা, সাধন বল, ভজন বল, সব এখন, এই বয়সেই করে নেবে। শেষে কি আর হয়? যা করতে পার, এখন।"

আমি—এখন যারা তোমার কৃপা পাচ্ছে, তারা তো ভাগ্যবান। এর পর যারা আসবে তাদের কি করে হবে?

মা—সে কি? তা হবে না? ভগবান সর্বত্র সব সময়ে রয়েছেন। ঠাকুর রয়েছেন। তাঁর কৃপায় হবে। অন্য সব দেশে হচ্ছে না?

আমি—ভালবাসা পেলে তবে তো প্রাণ ব্যাকুল হয়। তুমি আমাদের ভালবাস কই?

মা—তোমাকে আবার ভালবাসি না? যে আমার জন্য এতটুকু করে, তাকে ভালবাসি, আর তুমি এত করছ! বাড়িতে যখনই যে জিনিসটি ধরি, তোমার কথা মনে পড়ে। ভাল খুবই বাসি। তবে শরীব নিয়ে তো আর মেশামেশি করতে পারি না। আর সেগুলো করা কি ভাল? তোমরা যে কয়টি এখানে রয়েছ তাদের প্রায়ই মনে পড়ে। তবে যারা দূরে আছে তাদের জন্য ঠাকুরকে জানাই—'ঠাকুর, তুমি ওদের দেখো, আমার তো আব মনে থাকে না।'

উদ্বোধন, ঠাকুরঘর

মা তাঁহার তক্তপোশের উপর বসিয়া আছেন, আমি ভক্তদের পত্র পড়িয়া শুনাইতেছিলাম। কৃষ্ণলাল মহারাজও ছিলেন। পত্র লিখিয়াছে, মন স্থির হয় না, ইত্যাদি। মা এই সকল কথায় বেশ একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "রোজ পনর-বিশ হাজার করে জপ করতে পারে, তাহলে হয়। আমি দেখেছি, কৃষ্ণলাল, বাস্তবিক হয়। আগে করুক; না হয়, তখন বলবে। তবে একটু মন দিয়ে করতে হয়। তা তো নয়, কেউ করবে না, কেবল বলে—কেন হয় না?"

একটি ভক্ত প্রণাম করিতে গিয়া ধ্যানজপের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। মা বলিলেন—

"জপ, সংখ্যা, করগণনা—এসব শুধু মন আনবার জন্য। মন এদিক ওদিক যেতে চায়, তবু ঐ সবের দ্বারা এদিকে আকৃষ্ট হয়। যখন জপ করতে করতে ভগবানের রূপ-দর্শন হয়, ধ্যান হয়, তখন জপও থাকে না। ধ্যান হলো তো সবই হলো।

"মন চঞ্চল, তাই প্রথম মন স্থিব কববাব জন্য একটু একটু নিঃশ্বাস বন্ধ কবে ধ্যানেব চেষ্টা কবতে হয। তাতে মন স্থিব হবাব সাহায্য কবে। কিন্তু ওভাবে বেশি কবতে নাই, মাথা গবম হয। ভগবানদর্শন বল, ধ্যান বল. সবই মন। মন স্থিব হলে সবই হয।

"মানুষ তো ভগবানকে ভুলেই আছে। তাই যখন যখন দবকাব. তিনি নিজে এক একবাব এসে সাধন কবে পথ দেখিযে দেন। এবাব দেখালেন ত্যাগ। তিনি শতবর্ষ ছেলেপুলে নিযে থাকবেন বলেছেন।"

—স্বামী অরূপানন্দ

(১)

১৩১৬ সালেব জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন সকালে শুনিলাম, সেইদিন বিকালে চাবিটাব সময শ্রীশ্রীমা পূজনীয শবৎ মহাবাজ যোগেন মা, গোলাপ মা প্রভৃতিব সহিত কলিকাতাব পথে কোযালপাড়া পৌঁছিবেন এবং আমাদেব শিক্ষব শ্রীযুক্ত কেদাবনাথ দত্তেব (স্বামী কেশবানন্দেব) বাটীব ঠাকুবঘবখানিতে শ্রীশ্রীমাযেব ও আমাদেব স্কুলে আব সকলেব বিশ্রামেব ব্যবস্থা হইযাছে। কিন্তু সন্ধ্যা হইযা গেলেও তাহাবা আসিযা পৌঁছিলেন না। পবে সংবাদ আসিল তাহাদেব গাড়ি নদীব নিকট দহে পড়িযাছে। তৎক্ষণাৎ ভক্তদেব কযেকজন সেইদিকে অগ্রসব হইলেন। ক্রমে বাত্রি দশটা আন্দাজ সকলে আসিযা পৌঁছিলেন।

মা গাড়ি হইতে নামিযা বেশ ঘোমটা দিযা একটু পা টানিতে টানিতে কেদাববাবুব মাযেব সহিত তাঁহাদেব ঠাকুবঘবে গেলেন। তিনি ঠাকুবকে প্রণাম কবিযা আসন গ্রহণ কবিলে সমবেত স্ত্রী ও পুরুষ ভক্তগণ তাঁহাকে প্রণাম কবিলেন। আমিও কবিলাম। কেদাববাবুব মা কানে একটু কম শুনিতেন বলিযা মা আমাব দ্বাবাই পুরুষ ভক্তগণেব সহিত কথাবার্তা কহিযাছিলেন। এদিকে বেশি বাত্রি হইতেছে বলিযা পূজনীয শবৎ মহাবাজ সংবাদ পাঠাইলে মা শশব্যস্তে থালা হইতে একটি সন্দেশেব কিছু ভাঙিযা গ্রহণ কবিলেন ও একটু জল খাইযা বওযানা হইবাব জন্য গাত্রোত্থান কবিলেন। সকলেব সঙ্গে আমিও তাড়াতাড়ি ভিড়েব মধ্যে তাঁহাকে প্রণাম কবিযা, বাবা যাহা প্রণামী দিতে দিযাছিলেন তাহা তাঁহাব হাতে দিলাম। মা সস্নেহে চিবুকে হাত দিযা চুমু খাইযা বলিলেন, "বাবা, যা কিছু দিতে হয সব পাযে দিতে হয।" তিনি ধীবে ধীবে গাড়িতে উঠিলেন।

সেই সামান্য কযেকটি কথাব ভিতব দিযা তাঁহাব যে স্নেহেব আস্বাদ পাইযাছিলাম তাহাব তুলনায পিতামাতাব ভালবাসাও সেই বযসে তুচ্ছ বোধ হইযাছিল।

একবাব জগদ্ধাত্রীপূজাব সময মা কলিকাতা হইতে জযবামবাটী আসিবাব পথে সকালে কোযালপাড়া আশ্রমে পৌঁছিলেন। অপবাহ্নে বওযানা হইবাব সময আশ্রমেব

উৎসাহী কর্মীগণকে বলিলেন, "এখানে এখন তোমরাই আপনার জন। দেশে এখন তোমাদের ভরসাই ভরসা। এখানে দেখছি ঠাকুর তাহলে বসছেন।" একে একে সকলকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "মধ্যে মধ্যে জয়রামবাটী যেও। বিশেষ করে জগদ্ধাত্রীপূজার সময় তোমাদের সব যেতে হবে।"

জগদ্ধাত্রীপূজার দিন আমরা তিনজন আমাদের ক্ষেতের কতকগুলি শাকশব্জি লইয়া জয়রামবাটী গেলাম। মা আমাদের দেখিয়া খুব আহ্লাদিত হইলেন ও বলিলেন, "এখানে তরকারিপাতি সব সময়ে মেলে না, মাঝে মাঝে বড় মুশ্কিলে পড়তে হয়। তা ঠাকুরই তোমাদের দিয়ে সব যোগাবেন দেখছি।" সেই সময় হইতে তিনি যখনই দেশে থাকিতেন, আমরা সপ্তাহে দুই-তিন দিন আশ্রমের দৈনন্দিন কার্য শেষ করিয়া কখনও বাগান হইতে, কখনও বা হাট হইতে কিনিয়া তাঁহার জন্য তরকারি লইয়া যাইতাম। কোন কোন দিন গিয়া দেখিতাম মা শুইয়া আছেন। আমরা তাঁহার নির্দেশমত জিনিসগুলি যথাস্থানে রাখিয়া প্রণাম করিলে তিনি মাথা একটু তুলিয়া "তোমাদের চৈতন্য হোক, ভক্তিবিশ্বাস হোক" বলিয়া আশীর্বাদ করিয়া কিছু মুড়ি লইতে বলিতেন। আমরাও উহা লইয়া খাইতে খাইতে কোন কোন দিন রাত্রি বারটায় আশ্রমে ফিরিতাম।

একদিন শীতকালে কতকগুলি তরকারি ও কিছু গাওয়া ঘি প্রভৃতি মাথায় লইয়া গলদঘর্ম-অবস্থায় সন্ধ্যার সময় আমরা জয়রামবাটী পৌঁছিলাম। মামীদের মধ্যে একজন আমাদের অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, "ভক্ত হইলেই কি যত কষ্ট! বোঝা বয়ে ছেলেদের মাথা গেল।" শ্রীশ্রীমা ঐকথা শুনিয়া বলিলেন, "ওদের মাথা কি আর আছে? যাঁর মাথা তাঁকে দিয়ে দিয়েছে।" তারপর অতি স্নেহে মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। পরে আশ্রমে আমাদের বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "একসঙ্গে অত জিনিস না পাঠিয়ে অল্প অল্প পাঠিও, নইলে শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যায়।" ইহার পর আমরা অল্প মোট লইয়া ঘন ঘন তাঁহার নিকট যাইতাম।

জগদ্ধাত্রীপূজার পর মা কলিকাতা যাইবেন। কোয়ালপাড়া আশ্রমে তখন খুব স্বদেশীচর্চা হয় এবং ধ্যান, জপ. পূজা, পাঠ প্রভৃতি অপেক্ষা তাঁত, চরকা প্রভৃতির উপরই সকলের বেশি ঝোঁক। মা চলিয়া যাইবেন শুনিয়া কেদারবাবু জয়রামবাটীতে তাঁহাকে দর্শন করিতে গেলেন। মা তাঁহাকে বলিলেন, "দেখ, বাবা, তোমরা যখন ঠাকুরের জন্য ঘর ও আমাদের পথের বিশ্রামের স্থান একটু করেছ, তখন এবার যাবার সময় ওখানে ঠাকুরকে বসিয়ে দিয়ে যাব। সব আয়োজন করে রেখো। পূজা, অন্নভোগ, আরতি সব নিয়মিত করবে। শুধু স্বদেশী করে কি হবে? আমাদের যা কিছু সবার মূল ঠাকুর। তিনিই আদর্শ। যা কিছু কর না কেন, তাঁকে ধরে থাকলে কোন বেচাল হবে না!" কেদারবাবু বলিলেন, "স্বামীজী তো দেশের কাজ করতে খুব বলেছেন। তিনি আজ বেঁচে থাকলে কত কাজই না দেশের হতো!" ইহা শুনিয়া মা তাড়াতাড়ি বলিতেছেন, "ও বাবা, নরেন আমার আজ

থাকলে কোম্পানি কি আর তাকে ছেড়ে দিত? জেলে পুরে রাখত। আমি তা দেখতে পারতুম না। নরেন যেন খাপখোলা তরোয়াল। বিলেত থেকে ফিরে এসে আমাকে বললে, 'মা, আপনার আশীর্বাদে এ যুগে লাফিয়ে না গিয়ে তাদের তৈরি জাহাজে চড়ে সে মুল্লুকে গিয়েছি। সেখানেও দেখলাম ঠাকুরের কি মহিমা! কত সজ্জন লোক আমার কাছে তাঁর কথা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনেছে এবং এই ভাব নিয়েছে'।" তারপর বলিলেন, "তারাও তো আমার ছেলে, কি বল?"

প্রসঙ্গক্রমে দু-একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। একবার পূজার সময় মামাদের ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু কাপড় কিনিবার ভার মা আমার উপর দেন। আমি সব দেশী কাপড় লইয়া যাই। মেয়েরা অধিকাংশই অপছন্দ করিলেন এবং তাঁহাদের নিজেদের পছন্দমত ফরমাস করিতে লাগিলেন। আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, "ওসব তো বিলিতী হবে, ও আবার কি আনব?" শ্রীশ্রীমা একপাশে বসিয়াছিলেন। তিনি একটু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বাবা, তারাও (বিলাতের লোক) তো আমার ছেলে। আমার সকলকে নিয়ে ঘর করতে হয়। আমার কি একরোখা হলে চলে? ওরা যেমন যেমন বলছে তাই এনে দাও।" পরে দেখিতাম কাহারও জন্য কোন বিলাতী দ্রব্য আনাইতে হইলে মা আমাকে না বলিয়া অপরকে দিয়া আনাইতেন। কাহারও ভাবে আঘাত দেওয়া তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল।

কিন্তু যেদিন সংবাদ আসিল কোন স্বদেশী মামলা সম্পর্কে যুথবিহার গ্রামের দেবেনবাবুর স্ত্রী ও ভগিনী সিন্ধুবালা দেবীদের (দুজনেরই নাম এক ছিল) গর্ভাবস্থায় বাঁকুড়ার পুলিশ-কর্তৃপক্ষ বন্দী করিয়া হাঁটাইয়া থানায় লইয়া গিয়াছেন, সেদিন মায়ের অগ্নিময়ী মূর্তি দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। মা প্রথমত 'বল কি'! বলিয়া যেন শিহরিয়া উঠিলেন। তারপর বলিলেন, "এটা কি কোম্পানির আদেশ, না পুলিশ সাহেবের কেরামতি? নিরপরাধ স্ত্রীলোকের উপর এত অত্যাচার মহারানী ভিক্টোরিয়ার সময় তো কই শুনিনি! এ যদি কোম্পানির আদেশ হয়, তবে আর বেশিদিন নয়। এমন কোন বেটাছেলে কি সেখানে ছিল না যে দু-চড় দিয়ে মেয়ে দুটিকে ছাড়িয়ে আনতে পারত?" কিয়ৎক্ষণ পরে যখন তাহাদের ছাড়িয়া দিয়াছে এই সংবাদ শুনিলেন তখন অনেকটা শান্ত হইয়া বলিলেন, "এ খবর যদি না পেতাম তবে আজ আর ঘুমোতে পারতাম না।"

আর একবার মা কোয়ালপাড়ায় আছেন, সেইসময় একদিন পূজনীয় শরৎ মহারাজ রাসবিহারী মহারাজকে কতকগুলি আম সঙ্গে দিয়া মায়ের কাছে পাঠাইয়াছেন। তিনি পৌঁছিবার একটু পরেই প্রবোধবাবু মাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। কুশলপ্রশ্নাদির পর মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাগো, যুদ্ধের কি খবর? কি লোকক্ষয়টাই না হলো—কি মানুষমারা কলই না বের করেছে! আজকাল কতরকম যন্ত্রপাতি—টেলিগ্রাফ ইত্যাদি। এই দেখ না, রাসবিহারী কাল কলকাতা থেকে রওয়ানা হয়ে আজ এখানে পৌঁছে গেল। আমরা তখন

কত হেঁটে, কত কষ্ট করে তবে দক্ষিণেশ্বরে গেছি।" প্রবোধবাবু একটু উৎসাহিত হইয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "ইংরেজ সরকার আমাদের দেশের অনেক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়েছে।" মা সব কথায় সায় দিতে দিতে শেষে বলিলেন, "কিন্তু বাবা, ঐ সব সুবিধা হলেও আমাদের দেশে অন্ন-বস্ত্রের অভাব বড় বেড়েছে। আগে এত অন্নকষ্ট ছিল না।"

কলিকাতা যাইবার পথে মা কোয়ালপাড়া আশ্রমে ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা করিলেন। নিজহাতে ঠাকুরের ও নিজের ফটো দুইখানি বসাইয়া বিশেষ পূজা করিলেন এবং কিশোর দাদাকে দিয়া হোম ও অন্যান্য ক্রিয়া করাইলেন। মধ্যাহ্নে মা হাঁটিয়া কেদারবাবুর মায়ের সঙ্গে তাঁহাদের বাড়িতে একটু বেড়াইতে গিয়াছেন। মা কেদারবাবুর বাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় মধ্য পথে প্র—মহারাজ তাঁহাকে পালকিতে উঠিতে বলায় তিনি একটু বিরক্ত হইয়াই উহাতে চড়িলেন। আশ্রমে আসিয়া মা তাঁহাকে খুব ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "এ আমাদের পাড়াগাঁ। কোয়ালপাড়া হলো আমার বৈঠকখানা। এইসব ছেলেরা আমার আপনার লোক। আমি এদেশে এসে একটু স্বাধীনভাবে চলব ফিরব। কলকাতা থেকে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। তোমরা তো সেখানে আমাকে খাঁচার ভিতর পুরে রাখ। আমাকে সর্বদা সঙ্কুচিত হয়ে থাকতে হয়। এখানেও যদি তোমাদের কথামত পা-টি বাড়াতে হয়, তা আমি পারব না। শরৎকে লিখে দাও।" তখন প্র—মহারাজ ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "শরৎ মহারাজ আমাকে পথে খুব সাবধানে আপনাকে নিয়ে যেতে আদেশ করেছেন। আমার মনে হয়েছিল, বোধ হয় আমারই ত্রুটিতে আপনি হেঁটে গিয়েছেন। তা মা, আপনার যে অভিপ্রায় সেইরূপই করবেন।"

প্র—মহারাজের কথামত ঠিক হইল সন্ধ্যা ছয়টার পূর্বে তাঁহাদের খাবার আমরা প্রস্তুত করিয়া সঙ্গে দিব। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও আমরা সময়মত সব শেষ করিতে পারিতেছি না দেখিয়া তিনি রাগ করিতে লাগিলেন। রাজেন দাদা বলিলেন, "বেশ, আপনার সময়মত এঁদের নিয়ে আপনি রওনা হোন। আমরা খাবার তৈরি করে যতদূর হোক মাথায় করে আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসব।" মা এই সকল শুনিতে পাইয়া প্র—মহারাজকে বলিলেন, "তুমি মাথা গরম করে এত রাগারাগি করছ কেন? এ আমাদের পাড়াগাঁ, কলকাতার মতো এখানে কি সব ঘড়ির কাঁটাটিতে হয়ে ওঠে? দেখছ সকাল থেকে ছেলেরা কি খাটাই খাটছে! তুমি যাই বল না কেন, এখান থেকে না খেয়ে যাওয়া হবে না।" শেষে রাত্রি আটটা আন্দাজ আহারাদি করিয়া আটখানি গরুর গাড়িতে সকলে বিষ্ণুপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মা রামেশ্বর তীর্থ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। আমরা তিনজন 'উদ্বোধনে'র বাড়িতে তাঁহাকে দর্শন করিতে উপরে গিয়াছি। আমরা প্রণাম করিয়া বসিলে কোয়ালপাড়া আশ্রমের ও জয়রামবাটীর সকলের কুশল জিজ্ঞাসার পর মা কেদারবাবুকে বলিলেন,

"তুমি আসবে শুনে তোমাদের আশ্রমের জন্যে দুখানি রামেশ্বরের ফটো রেখেছি। যাবার সময় নিয়ে যেও। সেখানে পূজো করবে।" কেদারবাবু বলিলেন, "আপনিই তো ঠাকুরকে বসিয়ে এসেছেন, আর তাঁকেই সকল দেবদেবীজ্ঞানে পূজা করতে বলেছেন। আবার এইসব ঠাকুর দিচ্ছেন। কত ঠাকুরের পূজো করব ? আমরা অন্য ঠাকুরের পূজো করতে পারব না।" তখন মা বলিলেন, "আচ্ছা, এইগুলো ভাল করে বাঁধিয়ে ঠাকুরঘরে টাঙিয়ে রেখো।" কেদারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামেশ্বর প্রভৃতি কেমন দেখলেন ?" মা বলিলেন, "বাবা, যেমনটি রেখে এসেছিলাম ঠিক তেমনটিই আছেন।" গোলাপ-মা তখন ঐ দিক দিয়া বারান্দায় যাইতেছিলেন। তিনি মায়ের ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন, "কি বললে, মা ?" মা একটু চমকিত হইয়া বলিলেন, "কই, কি বলব ? বলছি এই তোমাদের কাছে যেমনটি শুনেছিলাম ঠিক তেমনটিই দেখে বড আনন্দ হয়েছিল।" তখন গোলাপ-মা বলিলেন, "না, মা, আমি সব শুনেছি, এখন আর কথা ফেরালে কি হবে ? কেমন গো, কেদার ?" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন ও যোগেন-মা প্রভৃতিকে সব বলিতে লাগিলেন।

মা বলিলেন, "আহা, শশী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) আমাকে সোনার ১০৮টি বেলপাতা দিয়ে রামেশ্বরের পূজা করালে। রামনাদের রাজা, আমি এখানে এসেছি শুনে, তাঁর দেওয়ানকে হুকুম দিলেন, মন্দিরের রত্নাগার খুলে আমাকে দেখাতে ; আর যদি আমি কোন জিনিস পছন্দ করি, তখনই যেন তা আমাকে উপহার দেওয়া হয়। আমি আর কি বলব ? কিছু ঠিক করতে না পেরে বললাম, 'আমার আর কি প্রয়োজন ? আমাদের যা কিছু দরকার সব শশীই ব্যবস্থা করছে।' আবার তারা ক্ষুণ্ন হবে ভেবে বললাম, 'আচ্ছা, রাধুর যদি কিছু দরকার হয়, নেবে এখন।' রাধুকে বললাম, 'দেখ, তোর যদি কিছু দরকার হয়, নিতে পারিস।' তারপর যখন ইরা জহরতের জিনিস সব দেখছি তখন কেবলই আমার বুক দুরদুর করছে। ঠাকুরের কাছে আকুল হয়ে প্রার্থনা করছি, 'ঠাকুর, রাধুর যেন কোন বাসনা না জাগে।' তা রাধু বললে, 'এ আবার কি নেব ? ও সব আমার চাই না। আমার লেখবার পেন্সিলটা হারিয়ে ফেলেছি, একটা পেন্সিল কিনে দাও।' আমি এ কথা শুনে হাঁফ ছেড়ে বাইরে এসে রাস্তায় দোকান থেকে দু পয়সার একটা পেন্সিল কিনিয়ে দিলাম।"

এই সকল কথাবার্তার পর মা ঠাকুরকে ভোগ দিতে উঠিয়া গেলেন। আমরাও নিচে নামিয়া আসিলাম।

জন্মাষ্টমীর দুই-এক দিন পূর্বে আমি মায়ের নিকট ঐ দিন দীক্ষা লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় গোলাপ-মা শুনিতে পাইয়া তাঁহার স্বাভাবিক উচ্চ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "ঐটুকু ছেলে (আমার বয়স তখন তের বৎসর), দুদিন পরে মন্ত্র ভুলে যাবে, এখন থেকেই দীক্ষা ! কেদারের যেমন কাণ্ড ! মা তো তোমাদের দেশেরই। তিনি যখন সেখানে যাবেন তখন দেখে শুনে পরে দীক্ষা নিও।" ইহা বলিয়া গোলাপ-মা চলিয়া গেলেন। তখন মা

বলিতেছেন, "গোলাপের কথা দেখ না। বালককালে যা ভাল করে শেখে তা কি ভোলে কখনো? এখন থেকে যা পারে করুক না। পরে তো আমি আছিই।" জন্মাষ্টমীর দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা সারিয়া মা আমাকে দীক্ষা দিলেন এবং আমাকে যেমন বলিয়াছিলেন সেইরূপ জপ করিতে দেখিয়া বলিলেন, "এই তো; এইটি আর মনে থাকবে না? খুব থাকবে। পরে যেমন যেমন আবশ্যক সব সময়মত আবার দেখিয়ে দেব।" তারপর মাথায় ও বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে আশীর্বাদ করিলেন এবং আসন হইতে উঠিয়া বলিলেন, "আমার সঙ্গে এস।" আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সহিত পাশের ঘরে গেলে তিনি শিকা হইতে দুইটি পান্তুয়া লইয়া একটি হইতে সামান্য দাঁতে কাটিয়া খাইলেন এবং বাকি আমার হাতে দিয়া বলিলেন, 'খাও'। আমি উহা হাতে লইয়া তাঁহার সামনে খাইতে লজ্জা করিতেছি দেখিয়া বলিলেন, "লজ্জা করো না, দীক্ষার পর প্রসাদ খেতে হয়।" বলিয়া এক গ্লাস জল দিলেন।

কয়েক দিন পরেই আমরা কেদারবাবুর মাকে * (তিনি মায়ের সহিত রামেশ্বর প্রভৃতি তীর্থে গিয়াছিলেন) সঙ্গে লইয়া কোয়ালপাড়ায় চলিয়া আসিলাম। আসিবার সময় মা কেদারবাবুকে কয়েকটি টাকা দিয়া বলিলেন, "জগদ্ধাত্রীপূজার জন্যে ধান কিনে কিছু চাল করিয়ে রাখবে।"

ফাল্গুন মাসে মা দেশে আসিতেছেন। কোয়ালপাড়া হইতে ভোরে আমরা তিনজন অনেকদূর আগাইয়া তাঁহাকে আনিতে গেলাম। মায়ের গাড়িগুলি দৃষ্টিগোচর হইতেই আমাদের দুজন আশ্রমে খবর দিবার জন্য ফিরিয়া গেলেন। আমি গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে ফিরিব বলিয়া থাকিয়া গেলাম। দূর হইতে মা আমাকে দেখিয়া বলিতেছেন, "কে গো, ব—নয়?" আমি কাছে গিয়া প্রণাম করিতেই মা সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। গাড়ি চলিতেছে, আমিও হাঁটিয়া যাইতেছি। মা ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া "এটি কোন্ গ্রাম? ওটা কাদের পুকুর? কোয়ালপাড়া আর কতদূর?" ইত্যাদি নানা কথা বলিতে লাগিলেন। কোতলপুর ছাড়াইয়া আসিলে মা বলিলেন, "গাড়িতে উঠে এস না, আর কত হাঁটবে?" গাড়িতে মায়ের সহিত রাধুও ছিল। একটু পরে গাড়োয়ান গাড়ি হইতে নামিয়া বলিল, "আমি একটু হাঁটছি, আপনি এই সামনে বসুন।" আমি তখন গাড়িতে উঠিয়া গরু দুটিকে একটু তাড়া দিয়া জোরে চালাইতেই মা খুব হাসিয়া উঠিয়া বলিতেছেন, "তুমি তো বেশ গাড়ি হাঁকাতে জান। তা সব কাজই শিখে রাখা ভাল।" যথাসময়ে আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলাম। মায়ের বাতের শরীর; গরুর গাড়িতে বহুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া পা আড়ষ্ট হইয়া

* এই বৃদ্ধা মহিলা মায়ের অনেক সেবা করিয়াছিলেন। ষাট বৎসর বয়সে লেখাপড়া শিখিবার আগ্রহ হওয়ায় তিনি প্রথম ভাগ হইতে পড়িতে আরম্ভ করেন এবং শেষকালে রামায়ণ, মহাভারত পর্যন্ত পড়িতে ও বুঝিতে পারিতেন। রামেশ্বরেও তিনি প্রথম ভাগ ও স্লেট সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। মায়ের দেহত্যাগের ছয়-সাত বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

গিয়াছে। কেদারবাবুর মা হাত ধরিয়া তাঁহাকে গাড়ি হইতে নামাইয়া ধীরে ধীরে লইয়া গিয়া ঠাকুরঘরের বারান্দায় বসাইলেন। মা একটু বিশ্রাম করিয়া স্নান করিলেন। আমাকে বলিলেন, "বাবা, কেদারের মায়ের সঙ্গে আর বকতে পারি না (ইনি একটু কালা ছিলেন)। তুমি কাপড়খানা ছেড়ে গামছা পরে আমার পূজার যোগাড়টা করে দাও তো।"

আমি না জানিয়া মায়েরই ভিজা গামছাখানি পরিয়া সাজি লইয়া ফুল তুলিতে যাইতেছি। কেদারবাবুর মা তাহা দেখিয়া একেবারে অস্থির হইয়া বলিলেন, "ওরে মায়ের গামছা পরেছিস যে রে, ছাড় ছাড়।" তখন মা বলিতেছেন, "তাতে কি? ছেলেমানুষ—আমার গামছা পরেছে তো কি হয়েছে? যাও, যাও, ফুল নিয়ে এস।"

কেদারবাবু গল্প করিতে করিতে মাকে বলিলেন, "মা, আপনার সব ছেলেই বিদ্বান, আমরা এই কয়টি আপনার একেবারে মূর্খ সন্তান। শরৎ মহারাজ ঠাকুরের বই লিখে তাঁর কথা ও ভাব প্রচার করছেন। অন্যান্য ছেলেরা সব বক্তৃতা দিচ্ছেন—কত কাজ হচ্ছে।" মা শুনিয়া বলিতেছেন, "সে কি গো? ঠাকুর যে লেখাপড়া কিছুই জানতেন না। ভগবানে মতি হওযাই আসল। তোমার দ্বারা এদেশে অনেক কাজ হবে। ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে। মলয়েব হাওয়া খুব বইছে। যে একটু পাল তুলে দেবে, শরণাগত হবে, সেই ধন্য হযে যাবে। এবার বাঁশ ও ঘাস ছাড়া যার ভিতরে একটু সার আছে সেই চন্দন হবে। তোমাদের ভাবনা কি? তোমরা আমার আপনার লোক। তবে কি জান, বিদ্বান সাধু যেন হাতির দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।" এই কথা বলিয়া পূজা করিতে উঠিলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মা পালকিতে জয়রামবাটী রওয়ানা হইলেন।

জগদ্ধাত্রীপূজায় কোয়ালপাড়া হইতে যে লোকটিব ভাণ্ডারী হইয়া যাইবার কথা ছিল তাহার হঠাৎ অসুখ হওয়াতে আমিই ওই কাজের ভাব লইয়া পূজার পূর্বদিন জয়রামবাটী উপস্থিত হইলাম। মা আমাকে বলিলেন, "তা বেশ তুমিই পারবে। আজ সব দেখে শুনে বাখ। কাল খুব সকালে স্নান করে ভাঁড়ারে এস। একটু আলগোছ রেখে কাজগুলি করো তা হলেই হবে এখন।" ঐ অঞ্চলে সমাজেব বাঁধাবাঁধি খুব বেশি বলিয়া মা শেষের কথাগুলি বলিলেন। *

জগদ্ধাত্রীপূজার দিন সকাল হইতে মা ভাণ্ডারে আসিয়া একটি বস্তার উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া রহিলেন এবং কেহ কিছু চাহিতে আসিলে আমি তাঁহাকে দেখাইয়া উহা দিতে লাগিলাম। পূজা শেষ হইলে পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য মা স্নান করিয়া মামীদের লইয়া মণ্ডপে গেলেন। তিনবার দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া গলবস্ত্রে জোড়হাতে একধারে কিছুক্ষণ চুপ করিযা বসিয়া রহিলেন। পূজা নির্বিঘ্নে শেষ হইল। মধ্যাহ্নে গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ অনেকেই

* একবাব ভগিনী নিবেদিতা মাযের দেশে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ কবিলে মা তাঁহাকে বলিযাছিলেন, "না, মা, আমি বেঁচে থাকতে তোমবা সেখানে যেও না। তাহলে আমায তাবা ঠেকো (একঘবে) কববে।"

অন্নপ্রসাদ পাইলেন। দ্বিতীয় দিন (মা তিনদিন প্রতিমা রাখিতেন) আমার জ্বর হওয়ায় মা নিজেই ভাঁড়ারের সব কাজ করিলেন।

সন্ধ্যারতির পর সাধু-ভক্তেরা সকলে মিলিয়া ভজন গান আরম্ভ করিলেন। "মাকে দেখবে বলে ভাবনা কেউ করো না গো আর ; সে যে তোমার আমার মা শুধু নয়, জগতের মা সবাকার।"—এই গানটি বার বার গাহিতে লাগিলেন। মা পাশের ঘরে বসিয়া মেয়েদের সহিত একমনে শুনিতেছেন। রাত্রে আমাকে বলিলেন, "আহা, গানটি বেশ জমেছিল। ভক্তের আবার জাত কি? সব ছেলে এক। আমার ইচ্ছে হয় সবাইকে এক পাত্রে বসিয়ে খাওয়াই। তা এ পোড়া দেশে জাতের বড়াই আবার আছে। যাই হোক মুড়িতে তো আর দোষ নেই, কাল এক কাজ কর। খুব সকালে কামারপুকুরে সত্য ময়রার দোকান থেকে বড় বড় জিলিপি দু সের নিয়ে এস।" পর দিন বেলা নয়টা আন্দাজ আমি জিলিপি লইয়া ফিরিলাম। মা উহা শ্রীশ্রীঠাকুরকে একবার দেখাইয়া একখানি বড় থালাতে বিস্তর মুড়ি ও তাহার চারিপাশে জিলিপিগুলি সাজাইয়া ভক্তদের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। আমরা সকলে মহানন্দে উহা খাইতে লাগিলাম। পাশের ঘর হইতে মা দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন।

একবার বর্ষাকালে জয়রামবাটীতে খুব ম্যালেরিয়া ও আমাশয়ের প্রকোপ হয়। মাও কয়েকদিন রক্তামাশয়ে খুব ভুগিয়া ডাক্তার কাঞ্জিলালের চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করেন। জল-কাদার মধ্যে হাটাহাটির ফলে কোয়ালপাড়া আশ্রমে আমাদের সকলেরও অল্পবিস্তর জ্বর হয়। দশ-পনর দিন আমাদের কেহ জয়রামবাটী আসিতেছে না দেখিয়া মা আমাদের সংবাদ লইতে একটি ঝিকে পাঠাইলেন। তাহার পরের দিনই রাধুকে দিয়া আমাদিগকে এই মর্মে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন—"শ্রীমান কেদার, ওখানকার আশ্রমে আমি ঠাকুরকে বসিয়েছি। তিনি সিদ্ধ চালের ভাত খেতেন, মাছও খেতেন। অতএব আমি বলছি, ঠাকুরকে সিদ্ধ চালের ভোগ ও অন্ততঃ শনি-মঙ্গলবারে মাছভোগ দেবে। রবিবারে দিও না। আর যেমন করেই হোক, তিন তরকারি ছাড়া ভোগ দিতে পারবে না। অত কঠোরতা করলে দেশের ম্যালেরিয়ার সঙ্গে যুঝবে কি করে!"

মা ইহার কয়েকদিন পরে কেদারবাবুকে রাধুর সম্বন্ধে বলিতেছেন, "অত বড় মেয়ে হলো, কোন জ্ঞান হলো না। ঠাকুর ওকে দিয়ে কি বন্ধনেই রেখেছেন! তাঁর শরীর ত্যাগের পর দেশে এসে যখন উদাসভাবে এইখানটিতে বসে থাকতাম, তখন দেখতাম লাল কাপড় পরে ছোট মেয়েটির রূপ ধরে সামনে ঘুরতে।" কেদারবাবু একটু অন্যমনস্ক হইয়াছেন দেখিয়া মা বলিলেন, "ও কেদার, শুনছ? ও হলো যোগমায়া।" কেদারবাবু বলিলেন, "না, মা, আমি সব শুনিনি—আবার বলুন।" মা তখন বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুরের শরীর যাবার পর যখন সংসারে আর কিছুই ভাল লাগছে না, মন হু হু করছে, আর প্রার্থনা করছি, 'আর আমার এ সংসারে থেকে কি হবে!' সেই সময় হঠাৎ দেখলাম, লাল কাপড় পরা দশ-বার বছরের একটি মেয়ে সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠাকুর তাকে

দেখিয়ে বললেন, 'একে আশ্রয় করে থাক। তোমার কাছে কত সব ছেলেরা এখন আসবে।' পরক্ষণেই তিনি অন্তর্ধান হলেন, মেয়েটিকেও আর দেখতে পাইনি। তারপর একদিন ঠিক এই জায়গাটিতে বসে আছি, ছোট বউ (রাধুর মা) তখন বদ্ধ পাগল, কতকগুলো কাঁথা বগলে করে টানতে টানতে ঐ দিকে যাচ্ছে, আব রাধু হামা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তার পেছনে যাচ্ছে। তাই দেখে বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। ছুটে গিয়ে রাধুকে তুলে নিলাম। মনে হলো, তাই তো, একে আমি না দেখলে কে আর দেখবে? বাবা নেই, মা ঐ পাগল। এই মনে করে যাই ওকে কোলে তুলে নিয়েছি, অমনি ঠাকুরকে সামনে দেখলাম। তিনি বলছেন, 'এই সেই মেয়েটি, ওকে আশ্রয় করে থাক, এটি যোগমায়া।' কি জানি বাবা, আগে আগে ও বেশ ছিল। আজকাল নানা রোগ, আবার বিয়েও হলো। এখন ভয় হয় পাগলের মেয়ে শেষে পাগল না হয়! শেষটায় কি একটা পাগলকে মানুষ করলাম!"

কলিকাতা হইতে মা একবার কেদারবাবুকে পত্র লেখেন, "তোমরা যদি কোয়ালপাড়ায় আমাব জন্যে একখানা ঘব করে বাখতে পার, তাহলে দেশে গিয়ে মাঝে মাঝে তোমাদের ওখানে থাকি।" এই পত্র পাইয়া আমরা নিজেরা চেষ্টা করিয়া তাঁহার জন্য একটি বাড়ি প্রস্তুত করি। উহাই 'জগদম্বা আশ্রম'। মা তথায় প্রথম বার প্রায় একপক্ষ কাল বাস করিয়া জয়রামবাটী যান। শেষে একদিন বিকালে তাঁহার দ্বিতীয়বার আসিবাব দিন স্থির হইল। আমবা পালকি ঠিক করিয়া রাখিলাম। কিন্তু ঐ দিন সকাল হইতে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। নদীতে খুব জল বাড়িয়াছে, খবর আসিল। তথাপি কেদারবাবু বলিলেন, "তোমরা তাঁব আদেশ মতো পালকি নিয়ে যথাসময়ে উপস্থিত হও, তারপর মা যেমন বলেন তেমনি করো।" নদীতে আসিযা দেখিলাম সাঁতাব জল। রাজেন মহারাজ সাঁতার দিয়া ওপার হইতে ডোঙা লইয়া আসিলেন এবং পালকিসহ আমরা পার হইয়া বেলা তিনটা আন্দাজ জয়বামবাটী পৌঁছিলাম।

কালী মামা আমাদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "তোমরা এই বাদলে কি বলে দিদিকে নিতে এলে?" মা একটু একটু হাসিতেছেন। রাজেন দাদা বলিলেন, "আমাদের কি সাধ্য আছে যে মাকে নিয়ে যাই বা সেবা করি! আজ পালকি নিয়ে আসব বলে গেছি, তাই এসেছি।" মা তখন হাসিয়া বলিলেন, "তোমরা কথা রাখতে পার, আর আমি বুঝি পারি নে? আমি একাই পালকিতে যাচ্ছি। আমাকে নিয়ে চল। ওরা সব পরে যাবে।" তখন আমরা হার মানিয়া বলিলাম, "না, মা, তা কি হয়? এই বাদলে কেউ বাড়ির বার হতে পারছে না, আর আপনাকে ভিজিয়ে নিয়ে গিয়ে কি অসুখ করাব?" তখন কালী মামা ও মা খুব হাসিতে লাগিলেন। আমরা পালকি লইয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম।

কিন্তু মা তাহার পরেই অসুস্থ হইয়া পড়ায় কয়েক মাস পরে কোয়ালপাড়া আসেন। একদিন বেলা এগারটা আন্দাজ 'জগদম্বা আশ্রমে' গিয়া দেখি মেয়েরা সব চঞ্চল হইয়া

উঠিয়াছেন। কেদারবাবুর মা আস্তে আস্তে বলিতেছেন, "মায়ের ভাবসমাধি হয়েছে। 'ঠাকুর'—এই কথাটি বলেই অচৈতন্য হয়ে পড়েছেন।" মেয়েরা মাথায় ও চোখে জল দিতে লাগিলেন। কিছু পরে মা সুস্থ হইলে নলিনী দিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিসিমা, অমন হলে কেন?" মা বলিলেন, "কই কি হলো? ও কিছু না, তোদের ছুঁচে সুতো দিতে গিয়ে মাথাটা কেমন ঘুরে গেল।" মায়ের এই কথা শুনিয়া আর কেহ উচ্চবাচ্য করিলেন না।

পরে এই ভাবসমাধির ঘটনাটি মা উদ্বোধনে তাঁহার শেষ অসুখের সময় আমাকে খুলিয়া বলিয়াছিলেন। সেদিন বেলা দেড়টা-দুটার সময় জ্বর বাড়িতেছে; আমি নিত্যকার মতো তাঁহার বিছানার পাশে বসিয়া তাঁহাকে হাওয়া করিতেছি ও কপালে ভিজা হাত বুলাইয়া দিতেছি। মা আমার পিঠে ও বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে মুখের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন, "শরীরটা চলে গেলে তোমাদের খুব কষ্ট হবে, বুঝতে পাচ্ছি!" আমি বলিলাম, "মা, ও কি সব কথা বলছেন? ওষুধেও যখন তেমন ফল হচ্ছে না, আপনি ঠাকুরকে শরীরটার জন্য একটু জানান না। তাহলেই তো সব সেরে যায়।" মা সামান্য হাসিয়া বলিতেছেন, "কোয়ালপাড়াতে অত জ্বর হতো, বেহুঁশ হয়ে বিছানাতেই অসামাল হয়ে পড়তাম; কিন্তু হুঁশ হলে শরীরটার জন্যে যখনই তাঁকে স্মরণ করতাম তখনই তাঁর দর্শন পেতাম। দুর্বল শরীরে একদিন বারান্দায় বসে আছি; নলিনীরা কি সেলাই করছে; খুব রোদ, চারদিক খাঁ খাঁ করছে। দেখি যেন সদর দরজা দিয়ে ঠাকুর এসে ঠাণ্ডা বারান্দায় বসে শুয়ে পড়েছেন। আমি তাই দেখে তাড়াতাড়ি নিজের আঁচল পেতে দিতে গেছি। পেতে দিতে গিয়ে কেমন হয়ে গেলাম। কেদাবের মা-টা সব নানারকম গোলমাল করতে লাগল। তাই তাদের বলেছিলাম, 'ও কিছু না, ছুঁচে সুতো দিতে গিয়ে মাথাটা কেমন হয়ে গেল!' তোমাদের দিকে চেয়ে শরীরটাব জন্যে ঠাকুরকে কি মাঝে মাঝে না জানাচ্ছি? কিন্তু শরীরটার জন্যে যখন তাঁকে স্মরণ করি, কিছুতেই তাঁর দর্শন পাচ্ছি না। আমার মনে হচ্ছে, তাঁর ইচ্ছা নয় যে শরীরটা থাকে। শরৎ রইল।" পরে কোয়ালপাড়া ফিরিয়া আসিয়া কেদার মহারাজের মায়ের নিকটও ঠিক ঐরূপ শুনিলাম। মা তাঁহাকেও ঐরূপ বলিয়াছিলেন।

একদিন বেলা দুইটার সময় কোয়ালপাড়া পৌঁছিয়াছি। খুব গরম। মা একটু মিষ্টি ও জল আনাইয়া দিয়া বলিতেছেন, "বড় রোদ বাবা, একটু ঠাণ্ডা হও, বেলা পড়লে বেরিও। গোপেশ কেমন আছে? আজ কি খেলে? কি রান্না করলে? যাবার সময় কিছু ফল ও আনাজ নিয়ে যেও।" আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "গোপেশদার কথামত কাঁচাকলা আলু প্রভৃতি খোসাসুদ্ধ সব একসঙ্গে মিশিয়ে ঝোল ও আলুভাতে রেঁধেছিলাম। কিন্তু আন্দাজ করতে না পারায় আট-দশ জনের মতো তরকারি রাঁধা হয়েছিল।" শুনিয়া মা খুব হাসিতে লাগিলেন। এই সকল কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় আকাশে খুব মেঘ হইল। মা বলিতেছেন, "আঃ, একটু বৃষ্টি হলে ধরিত্রীটা ঠাণ্ডা হয়।" কিয়ৎক্ষণ পরেই ঝড় ও শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। মা আনন্দ করিতে করিতে দু-একটি শিল মুখে দিলেন। কিন্তু

উহাতেই ঠাণ্ডা লাগিয়া আবার জ্বর হয় এবং সেই জ্বর পরে খুব ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল।

রাসবিহারী মহারাজ ও আমি একদিন তাঁহার বিছানার দুইপাশে বসিয়া আছি। মা আমাদের বুকে পিঠে হাত রাখিয়া বলিতেছেন, "আঃ, এতগুলো মেয়ে, কারো গা ঠাণ্ডা নয়। এরা বেটা ছেলে, কেমন ঠাণ্ডা দেহ। আমার হাত জুড়াল!" অসুখের ঘোরে মা পুজনীয় শরৎ মহারাজকে খুব খুঁজিতেন। তিনি সংবাদ পাইয়া ডাক্তার কাঞ্জিলাল প্রভৃতিকে লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং একেবারে মায়ের শয্যাপার্শ্বে গেলেন। মা তখন গাত্রদাহের জন্য ছট্‌ফট্ করিয়া হাত বাড়াইতেছেন। তাহা দেখিয়া পূজনীয় শরৎ মহারাজ গায়ের জামা খুলিয়া তাঁহার বিছানাতে গিয়া বসিলেন। মা তাঁহার পিঠে হাত দিয়া বলিতেছেন, "আঃ, আমার সমস্ত দেহটা ঠাণ্ডা হলো। শরতের গাটি যেন পাথর।" শরৎ মহারাজ বলিলেন, "এই তো, মা, আমরা সব এসে পড়েছি, এখন সেরে উঠুন।" মা বলিলেন, "হাঁ, বাবা, কাঞ্জিলাল একটু ওষুধ দিলেই ভাল হয়ে যাব।" এই কথা শুনিয়া শরৎ মহারাজের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। কয়েক দিনের মধ্যেই জ্বর ছাড়িয়া গেল ও মা অন্নপথ্য করিলেন। শরৎ মহাবাজ একদিন মাকে বলিলেন, "মা, এবার আর আপনাকে ছেড়ে যাব না; আমি সঙ্গে করে কলকাতায় নিয়ে যাব।" মাও বিশেষ আপত্তি না করিয়া বলিলেন, "কিন্তু বাবা, একবার জয়রামবাটী গিয়ে যাত্রাটা বদলে আসতে হবে।" শরৎ মহারাজ তাহাতেই রাজি হইলেন ও জয়রামবাটী যাত্রাব দিন দেখিতে লাগিলেন।

মায়ের অসুখের সময়েই উদ্বোধনে স্বামী প্রজ্ঞানন্দের দেহত্যাগ হয়। পরে ঐ প্রসঙ্গে মা একদিন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে তাঁহার ভগিনী ও নিবেদিতা স্কুলের পরিচালিকা শ্রীমতী সুধীরা সে সময় স্থিরভাবে পাশেই বসিয়াছিলেন। শুনিযা মা বলিলেন, "আহা, একটু ডাক ছেড়ে কাঁদলে শোকটার কিছু লাঘব হতো। দেখ, ওর আবার কোন অসুখ-বিসুখ না হয়। একেই হার্টের দোষ আছে।"

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। আমি তখন মায়ের নিকট জয়রামবাটীতে আছি। একদিন কোয়ালপাড়া হইতে কতকগুলি জিনিস এক বৃদ্ধা মজুরনীর মাথায় দিয়া বেলা দশটা আন্দাজ জয়রামবাটী ফিরিয়াছি। বৃদ্ধা মোট নামাইয়া মাকে প্রণাম করিল। মা বলিতেছেন, "মাঝি বউ, কই অনেক দিন তুমি আর আসনি কেন?" তখন বৃদ্ধা করুণস্বরে বলিল, "মা, আজকাল বড় কষ্টে পড়েছি। নানা স্থানে অন্নের চেষ্টায় বেড়াই। এখানে মোট নিয়ে আসবার দরকার হলে বাবুরা সব সময়ে আমার দেখা পায় না। কিছুদিন হলো আমার জোয়ান রোজগারী ছেলেটি মারা গেছে।"

মা তাহা শুনিয়া বলিলেন, "বল কি মাঝি বউ!" বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিল। বৃদ্ধা মায়ের সহানুভূতি পাইয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। মাও তাহার কাছে বসিয়া পড়িয়া বারান্দার খুঁটিতে মাথা রাখিয়া তাহার সহিত ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে

লাগিলেন। তাঁহার কান্না শুনিয়া বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা সব ছুটিয়া আসিলেন এবং এই দৃশ্য দেখিয়া দূরে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটিল। পরে কান্নার বেগ কমিয়া আসিলে মা ধীরে ধীরে নবাসনের বউদিদিকে নারিকেল তেল আনিতে বলিলেন। তেল আনা হইলে তিনি উহা বৃদ্ধার মাথায় ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা একমাথা তেল মাখিলে পর মা তাহার কাপড়ে মুড়ি ও গুড় দিয়া বিদায় দিবার সময় ছলছল নেত্রে বলিলেন, "আবার এসো, মাঝি বউ।" মায়ের এই করুণ ব্যবহারে বৃদ্ধা কিরূপ সান্ত্বনা পাইয়া গেল তাহা তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

একটু বল পাইলে মা নির্দিষ্ট দিনে শরৎ মহারাজ প্রভৃতিকে লইয়া জয়রামবাটীতে পৌঁছিলেন। গ্রামের সব স্ত্রী-পুরুষ মাকে দেখিতে আসিলেন। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, "মা, আমরা যে আর আপনাকে দেখতে পাব, এ আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম।" মা বলিলেন, "হাঁ, খুব অসুখটায় ভুগলাম। শরৎ, কাঞ্জিলাল, সব এসে পড়ল; মা সিংহবাহিনীর কৃপায় এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেলাম। শরৎ বলছে কলকাতায় যেতে। তা তোমরা সকলে মত কর তো গিয়ে শরীরটা একটু সেরে আসি।" সকলে আনন্দের সহিত সম্মতি জানাইলেন। সাত-আট দিন পরে মা কলিকাতা রওয়ানা হইলেন।

কয়েক মাস পড়ে বেলুড় মঠে আসিয়া আছি। 'উদ্বোধনে' রাধুর অসুখ। কোন শব্দ সহ্য হয় না। সেইজন্য মা তাহাকে লইয়া নিবেদিতা স্কুলের বোর্ডিং বাড়িতে আছেন। প্রায়ই সেখানে গিয়া দেখা করিয়া আসি। তিনি খুবই চিন্তিত। বলেন, "তাই তো, একে নিয়ে কোথায় যাই? দেশে নির্জন হলেও ডাক্তার-কবিরাজের তো তেমন সুবিধা নেই।"

স্বামীজীর উৎসবের দিন দুপুরবেলা হঠাৎ শুনিলাম, মা কল্য সকালে দেশে চলিয়া যাইতেছেন। পূজনীয় শরৎ মহারাজের আদেশে তাড়াতাড়ি মায়ের সঙ্গে যাইবার জন্য সন্ধ্যার সময় 'উদ্বোধনে' আসিলাম। উপরে গিয়া দেখি মা কিছু নারিকেল-দড়ি গুছাইতেছেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "এই অগাধ দরিয়া নিয়ে দেশে যাচ্ছি। তোমার আমার সঙ্গে যাবার কি হবে? তোমরাই সেখানে আমার ভরসা।" আমি প্রণাম করিয়া বলিলাম, "আপনি যখন যা আদেশ করবেন তাই হবে। আপনার সঙ্গে যাব, তাতে আর আপত্তি কি?" মা বলিলেন, "তাই বল, বাবা, এই দড়ি টড়ি দেখে নিয়ে জিনিসপত্র সব গুছিয়ে বেঁধে ফেল, এখনো কিছুই গোছানো হয়নি। তোমার অপেক্ষায় বসে থেকে দড়ি গোছাচ্ছিলাম।" রাত্রি এগারটা পর্যন্ত মায়ের সহিত বিছানাপত্র সব বাঁধিলাম। পরদিন খুব সকালে তাঁহার সহিত রওয়ানা হইলাম।

বিষ্ণুপুরে তিন দিন বিশ্রাম করিয়া আমরা প্রত্যুষে ছয়খানি গরুর গাড়িতে রওয়ানা হইলাম। আট মাইল দূরে জয়পুর গ্রামে এক চটিতে রন্ধনের ব্যবস্থা হইল। উনুন হইতে নামাইবার সময় হাঁড়িটি হঠাৎ ভাঙিয়া যাওয়ায় ভাত ও ফেন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম। মা কিন্তু আদৌ বিচলিত না হইয়া একটি খড়ের

নুড়ো লইয়া ফেনগুলি সব সরাইয়া দিতে লাগিলেন। তারপর হাত ধুইয়া বাক্স হইতে ঠাকুরের ছবিখানি বাহির করিয়া একধারে বসাইলেন এবং একটি শালের কাঠির দ্বারা উহা হইতে কতকগুলি ভাত পৃথক করিয়া একখানি শালপাতায় ডাল, তরকারি সাজাইয়া ঠাকুরকে জোড়হাতে বলিতেছেন, "আজ এইরূপেই মেপেছ, শিগ্‌গির শিগ্‌গির গরম গরম দুটি খেয়ে নাও।" আমরা সকলে মায়ের কাণ্ড দেখিয়া হাসিতে লাগিলাম। তাহা দেখিয়া তিনি বলিলেন, "যখন যেমন তখন তেমন তো করতে হবে। নাও, তোমরা সব এখন বসে যাও দেখি।" তখন আমরা সকলে চারিধারে বসিয়া গেলাম। মা কাঠিতে করিয়া আমাদের পাতায় পাতায় পরিবেশন করিয়া নিজেও একধারে পা মেলিয়া বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন ও বলিলেন, "বেশ রান্না হয়েছে।" আহারাদি সারিয়াই গাড়ি ছাড়িয়া দিলাম। রাত্রি প্রায় এগারটায় আমরা কোয়ালপাড়া পৌঁছিলাম।

এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। একবার পূজনীয়া গৌরী-মা মাকে দর্শন করিতে জয়রামবাটী যাইতেছেন। কোয়ালপাড়া হইতে আমাকে সঙ্গে লইয়া বিকালে রওযানা হইলেন। জয়রামবাটীর কাছে নদীর ধারে পৌঁছিয়া কিছু বেলা আছে দেখিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার একটু পরে মায়ের সদর দরজায় পৌঁছিয়া আমাকে তথায় অপেক্ষা করিতে বলিয়া তিনি একটু ভিতরে ঢুকিলেন ও ভিখারিদের অনুকরণে বলিয়া উঠিলেন, "মা, দুটি ভিক্ষা পাই, মা।" তাহা শুনিয়া ছোট মামী বাহিরে আসিয়া বলিতেছেন, 'কে গো?' তখন গৌরী-মা আবার বলিয়া উঠিলেন, "দুটি ভিক্ষা পাই, মা।" ছোট মামী তখন খুব ভয় পাইয়া চিৎকার করিয়া একেবারে মায়ের কাছে ছুটিয়া গেলেন। মা চিৎকার শুনিয়া ধীরভাবে বাহির হইয়া আসিয়া দৃঢ়স্বরে বলিতেছেন, 'কে রে?' গৌরী-মা পূর্ব স্থানেই দাঁড়াইয়া বলিলেন, "দুটি ভিক্ষা পাই, মা, আমি রাতভিখারি।" অন্ধকারে মা গৌরী-মায়ের গলার আওয়াজ পাইয়া বলিলেন, "ও গৌরদাসী, এস এস, কখন এলে?" তারপর খুব রহস্য হইতে লাগিল।

কোয়ালপাড়ায় দুই-একদিন থাকিবার পর রাধুর ঐ স্থানটি বেশ নির্জন বলিয়া পছন্দ হওয়ায় মা ছয়মাস তাহাকে লইয়া থাকিয়া যান। জগদম্বা আশ্রম হইতে কিছু দূরে অপর একটি নির্জন বাড়িতে রাধুর থাকিবার ব্যবস্থা হয়। উহার তিনদিকে কাঁটাগাছের জঙ্গল ছিল। মা একদিন আমাকে বলিলেন, "আজকাল মনের কি যে হয়েছে, যা চিন্তা ওঠে তাই উপস্থিত হয়—তা ভালই হোক, আর মন্দই হোক। রাধুর তো এই জঙ্গলটাই পছন্দ, নির্জন কি না। আমার কদিন থেকে মনে হচ্ছে, সারাদিন কাজকর্মে বাইরে যাওয়া আসা কর, সন্ধ্যার সময় থেকে কিন্তু এইখানে এসে আমার কাছেই থেকো। বড় ভয় হয়, বাবা। রাজেনকেও বলেছি। সে রাত দশটা-এগারটার পর আসবে।" সেই দিন হইতে রাধুর বাড়ির বাহিরে একটি কতবেল-গাছের তলায় সন্ধ্যা হইতে রাত্রি এগারটা পর্যন্ত চৌকি পাতিয়া বসিয়া থাকিতাম। মাও বসিয়া থাকিতেন এবং খুব আস্তে আস্তে আমাদের সঙ্গে

কথাবার্তা কহিতেন। মা একদিন বলিতেছেন, "যে জঙ্গল! কোন্ দিন ভালুক না বেরিয়ে পড়ে।" আমি বলিলাম, "কই মা, এদিকে তো কখনো ভালুক দেখিনি।" কিন্তু সত্যই দুই-এক দিন পরে দুপুরবেলায় শোনা গেল, এক মাইল দূরে দেশড়ার মাঠে একটি প্রকাণ্ড ভালুক গোবর কুড়াইবার সময় একটি বৃদ্ধাকে মারিয়া ফেলিয়াছে এবং ভালুকটিকেও গুলি করিয়া মারিয়া ফেলা হইয়াছে। সন্ধ্যার সময় মা বলিলেন, "দেখলে আজ ভালুকের কাণ্ড! অম্বিকের (জয়রামবাটীর চৌকিদার) শাশুড়ীকে নাকি মেরে ফেলেছে। তুমি যে বলেছিলে এদেশে ভালুক নেই।"

সন্ধ্যার সময়ে মা একটু মিষ্টি খাইয়া জল খাইতেন। আমি ঐ গাছতলায় আসিলে আমাকেও খাইতে দিতেন। বলিতেন, "সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার সময় একটু কিছু খেয়ে জল খেলে শরীরটা বেশ স্নিগ্ধ হয়। তারপর জপতপে বা যে কোন কাজে মনটি বেশ স্থির হয়ে বসে।" একদিন বলিতেছেন, "ঠাকুরের সেবার জন্যে যখন নহবতখানায় ছিলাম তখন কি কষ্টেই না ছোট ঘরখানিতে থাকতে হতো! তারই ভিতর কত সব জিনিসপত্র। ঠাকুরের জন্যে হাঁড়িতে মাছ জীইয়ে রাখতাম। তাঁর সেবার জন্যে কোন কষ্টই গায়ে লাগত না। কোথায় দিয়ে আনন্দে দিন কেটে যেত। আর এখন পড়েছি রাধুর জন্যে এই কষ্টে। জঙ্গলে তোমাদের নিয়ে বসে আছি। ধর্মকর্ম জপতপ, সব গেল। এখন তাঁর কৃপায় ভালয় ভালয় উদ্ধার হলে হয় (রাধু তখন আসন্নপ্রসবা)।" একটু পরে নবাসনের বউদিদি আসিয়া বলিতেছেন, "ও দাদা, শুনেছেন? আজ দুপুরে এখানে মা ও আমি বসে আছি, বেশ নির্জন। মা বলছেন, 'সেই কাক দুটি কদিন এই সময়ে এসে এই গাছে বড় চিৎকার করত। রাধুও বড় বিরক্ত হতো। কিন্তু কই, আজ কদিন থেকে তাদের দেখতে পাচ্ছিনি। কোথায় গেল সে দুটি, বল তো?' মা এই কথা বলতে না বলতে কাক দুটি এসে গাছে ডেকে উঠল।" মাও হাসিয়া 'হাঁ, বাবা' বলিয়া ঐ কথার সমর্থন করিলেন।

আর একদিন আষাঢ়ের প্রথমভাগে মা ও আমরা কয়েকজন গাছতলায় বসিয়া আছি। রাত্রি দশটা হইবে। মা হঠাৎ বলিতেছেন, "দেখ, সেই পাগলটি কই অনেকদিন আসেনি। বদ্ধ পাগল। গান-টানগুলি কিন্তু বেশ গায়। তবে বড় ভয় করে, বাবা, পাছে এখানে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে ওঠে!" তখন নবাসনের বউদিদি বলিতেছেন, "আর তার নাম কেন, মা? যদি এখন এসে পড়ে এই রাত্রিবেলায়?" মা বলিতেছেন, "কে জানে, মা।" "হাঁ, তুমিও যেমন; এই বাদলে নদী পার হবে কি করে, যে আসবে?"—আমি এই কথা বলিতে না বলিতে পাগলটি একটি তালপাতার পেখে মাথায় দিয়া এক বোঝা সজিনাশাক বগলে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল ও মাকে বলিল, "তোমার জন্যে সজনেশাক নিয়ে এলাম।" নবাসনের বউদিদি ভয় পাইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। মা বলিলেন, "যা, যা, এত রাতে গোল করিসনি।" সে বলিল, "যাব কি করে? নদীতে বান যে।" আমি বলিলাম, "এলি কি করে?" সে বলিল, "সাঁতরে পার হয়ে এসেছি।" মা তাহাকে বলিলেন, "লক্ষ্মীটি, গোল

করিসনি।" সে তখন আর কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেল। মাস দুই মায়ের এই ভাবটি ছিল।

ঐ সময়ে একদিন রাধুর ঘরের বারান্দায় মায়ের নিকট বসিয়া বাজারের ফর্দ লিখিতেছি। পাশ দিয়া যাইবার সময় অসাবধানতাবশতঃ জনৈক স্ত্রীভক্তের কাপড়ের আঁচল আমার পিঠে একটু লাগিয়া যায়। মা তাহা লক্ষ্য করিয়া অত্যন্ত বিরক্তির সহিত স্ত্রীলোকটিকে বলিতেছেন, "কিগো, ছেলে, আমার সামনে বসে লিখছে, বেটা ছেলে, তোমার একটু হুঁশ নেই—ওর পিঠে আঁচল লাগিয়ে যাচ্ছ! ওরা ব্রহ্মচারী, তোমরা মেয়েমানুষ, ওদের সমীহ করে চলতে হয়, প্রণাম কর" ইত্যাদি। কথাগুলি মা এমন তেজের সহিত বলিলেন যে বাড়ির মেয়েরাও সন্ত্রস্ত হইলেন।

একটি নতুন ব্রহ্মচারী কোয়ালপাড়ায় মায়ের কাছে কিছুদিন থাকিতে চাহিলে মা বলিলেন, "তুমি থাকতে চাচ্ছ; কিন্তু তোমার এখানে থেকে কষ্ট হবে। আমার এখানে বড় কাজকর্ম। রাধুকে নিয়ে এই জঙ্গলে পড়ে আছি।" ছেলেটি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় মা বলিলেন, "আচ্ছা, কেদারকে বলে আশ্রমে দিনকতক থাক, তারপর দেখা যাবে।" ঐ সময়ে যে সেবকটি রাধুর পথ্য তৈয়ার করিত তাহাকে কয়েক দিনের জন্য কলিকাতায় যাইতে হইল। মা ঐ ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এটি পারবে, বাবা?" সে সম্মত হইলে বলিলেন, "ওদের কাছে সব দেখে শুনে নাও।" প্রথম দিনেই পথ্য প্রস্তুত করিয়া মায়ের নিকট লইয়া যাইবার সময় তাহার হাত হইতে সব পড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়। তখন কি করা উচিত ঠিক করিতে না পারিয়া সে খালি পাত্রগুলি মায়ের নিকট উপস্থিত করে। সেদিন আর রাধুর খাওয়া হইল না। মা বিরক্ত হইলেন। পরে বলিয়াছিলেন, "সাধু হিসাবে তো ছেলেটি বেশ ভালই। তবে আমার এখানে কাজকর্মে চৌকশ লোক চাই। 'গাছতলার সাধু' দিয়ে আমার কাজ হবে না। আবার হুজুগে পড়েও অনেকে অনেক বড় বড় কাজ করে ফেলে। কিন্তু মানুষের প্রত্যেক খুঁটিনাটি কাজটিতে শ্রদ্ধা দেখলে ঠিক ঠিক মানুষটি চেনা যায়।" দুই-এক দিন পরেই সেবকটি ফিরিয়া আসায় ছেলেটির ওখানে থাকা হইল না।

আর একদিন কোয়ালপাড়ায় একটি ছেলে পুলিশের নজরবন্দি হইতে মুক্তি পাইয়া মায়ের নিকট সন্ধ্যাকালে উপস্থিত হয় ও দীক্ষা লইবার অভিপ্রায় জানায়। তখন ওখানকার আশ্রমের উপর পুলিসের তীক্ষ্ণদৃষ্টি থাকায় আশ্রমাধ্যক্ষ তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিলেন। মা এই সংবাদ পাইয়া আমাকে বলিলেন, "আহা, ছেলেটি কত কষ্ট পেয়ে ব্যাকুল হয়ে এসেছে! তুমি যদি আজ রাত্রিটা গ্রামের কোন লোকের বাড়িতে তাকে রাখবার ব্যবস্থা করতে পার তবে কাল সকালে আমি ওকে দীক্ষা দিয়ে চলে যেতে বলব।" তাঁহার ইঙ্গিতমত আমি তাহাকে একস্থানে রাখিয়া দিলাম।

পরদিন খুব সকালে মায়ের সহিত রাধুর বাড়ি যাইতেছি। ছেলেটি স্নান করিয়া মাঠের

মাঝপথে মায়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। মা আমাকে নিকটবর্তী পুকুর হইতে একটু জল আনিতে বলিলেন। আমি একটা গ্লাসে জল আনিয়া দিলে মা যেন আসন খুঁজিতেছেন মনে হওয়ায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আসন এনে দেব কি?" মা বলিলেন, "থাক, আর যেতে হবে না, দুটো খড় দাও, আমরা দুজনে বসি।" আমি ঐরূপ করিলে তাঁহারা ঐ খড় পাতিয়া মাটিতে বসিলেন এবং আমাকে একটু তফাতে থাকিতে বলিয়া মা আচমন করিয়া ছেলেটিকে দীক্ষা দিলেন।

একদিন সন্ধ্যায় মা কথাপ্রসঙ্গে বলিতেছেন, "আমি আর কারও দোষ দেখতে শুনতে পারিনে, বাবা, প্রারব্ধ কর্ম যার যা আছে। যেখানে ফালটি যেত সেখানে ছুঁচটি তো যাবে? আমার কাছে—র দোষের কথা বললে। তখন এরা সব কোথায় ছিল? সে আমার কত সেবা করেছে। আমি তো তখন ভাইদের ঘরে ধান সিদ্ধ করি। বউরা সব ছোট। সে শীত বর্ষা গ্রাহ্য না করে সকাল থেকে গায়ে কালি মেখে আমার সঙ্গে বড় বড় ধানের হাঁড়ি নামাত। এখন তো অনেকে ভক্ত হয়ে আসে। তখন আমার কে ছিল! আমরা কি সেগুলো সব ভুলে যাব? তা লোকেরই বা দোষ কি? আমারও আগে লোকের কত দোষ চোখে ঠেকত। তারপর ঠাকুরের কাছে কেঁদে কেঁদে 'ঠাকুর, আর দোষ দেখতে পারি নে' বলে কত প্রার্থনা করে তবে দোষ-দেখাটা গেছে। মানুষের হাজার উপকার করে একটু দোষ কর, মুখটি তখনই বেঁকে যাবে। লোক কেবল দোষটি দেখে। গুণটি দেখা চাই।"

জয়রামবাটীতে একদিন মহাপুরুষদের সেবকগণের দুর্বুদ্ধি প্রসঙ্গে মা বলিলেন, "দেখ, সেবাপরাধ একটা আছে বটে। সেটা হচ্ছে—সেবা করতে করতে অধিকার পেয়ে অহংবুদ্ধি বেড়ে গেলে সে তখন পুতুলের মতো নাচাতে চায়। উঠতে, বসতে, খেতে, সব তাতেই কর্তা। সেবার ভাব আর থাকে না। যারা নিজের দেহসুখ ভুলে তাঁর সুখদুঃখ নিজের সুখদুঃখ জ্ঞান করে সেবা করে, তাদের ওরূপ হবে কেন? আর পতনের কথা বলছ? অনেক মহাপুরুষের চারিদিকে ঐশ্বর্যের ভাব থাকে। তাই দেখে অনেকে তাঁদের সেবা করতে এসে ওতেই মত্ত থাকে, আর পরে ওতেই ডুবে মরে। ঠিক ঠিক তাঁর সেবা করে কজন, বল?" তারপর মা একটি গল্প বলিলেন, "দেখ, কথায় আছে যে, পুকুরে চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়েছে, তাই দেখে ছোট ছোট মাছেরা আনন্দে সেইখানে খুব লাফালাফি করে খেলা করছে—ভাবছে আমাদেরই একজন। কিন্তু যখন চাঁদ অস্ত গেল তখন তাদের সেই পূর্ব অবস্থা। লাফালাফির পর অবসাদ এল—কিছুই বুঝতে পারলে না।" আমি বলিলাম, "কেদার মহারাজ বলেন যে, গুরুর কাছে বেশি দিন থাকতে নেই। গুরুর অলৌকিক আচরণ দেখে অনেক সময়ে শিষ্যের নাকি ভক্তিশ্রদ্ধা কমে যায়।" মা হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, "তোমরা বাবা, ওসব কথায় মন খারাপ করো না। তাহলে আমার কাজ চলে কি করে? অত ভগবানবুদ্ধি না করে মানুষবুদ্ধিতে আমি যা বলি দেখে শুনে, কাজগুলি যা করছ করে যাও। তোমাদের কোন ভয় নেই।"

একদিন ভক্তদের অনেকগুলি পত্র আসিয়াছে। সন্ধ্যার সময় মাকে পড়িয়া শুনাইলাম। পত্র শুনিয়া মা বলিতেছেন, "কতরকম ছেলেরা কত কি ইচ্ছা লিখেছে, দেখলে? কেউ বলছে, 'এত করে প্রার্থনা, জপধ্যান করছি, কিছুই হচ্ছে না'; কেউ বা সংসারে নানা অশান্তি, অনটন, রোগশোকের কথা লিখছে। আর এসব শুনতে পারি নে। ঠাকুরকে বলি, 'ঠাকুর, এদের ইহকাল পরকাল তুমিই রক্ষা করো।' আমি মা হয়ে আর কি বলব? কজন তাঁকে ঠিক ঠিক চায়? সে ব্যাকুলতা কোথায়? এত তো ভক্তি, আগ্রহ—এদিকে সামান্য একটু ভোগ্যবস্তু পেলেই সন্তুষ্ট! বলে, 'আহা, তাঁর কি দয়া!' বলে, 'রাধু কেমন আছে?' আমার মন ভেজাবার জন্যে রাধুর খোঁজ আগে। আমি চোখ বুঁজলে রাধুর দিকে কেউ ফিরেও চাইবে না।" নবাসনের বউদিদি বলিতেছেন, "মা, আপনার তো সব ছেলে সমান; যে বিয়ে করার মতামত চেয়েছে তাকে আপনি অনুমতি দিচ্ছেন, আর যে সংসার ত্যাগ করতে চায় তাকে সেইমত ত্যাগের প্রশংসা করে উপদেশ দিচ্ছেন। আপনার তো উচিত যেটি ভাল সেই পথেই সকলকে নিয়ে যাওয়া।" মা বলিতেছেন, "যার ভোগবাসনা প্রবল, আমি নিষেধ করলেই কি সে শুনবে? আর যে বহু সুকৃতিবলে এই সব মায়ার খেলা বুঝতে পেরে তাঁকেই একমাত্র সার ভেবেছে, তাকে একটু সাহায্য করব না! সংসারে দুঃখের কি অন্ত আছে?"

নলিনীদিদি প্রভৃতি কয়েকজন কিছুক্ষণ তর্কের পর মাকে বলিতেছেন, "পিসিমা, বল তো কোন্ অপবাদ ভাল?" মা বলিতেছেন, "অপবাদের আবার ভালমন্দ!" এইরূপ একটু কথাবাতার পর বলিতেছেন, "তবে ধনের অপবাদই ভাল। কোন লোককে যদি বলা যায়, 'তুমি বেশ ধনী', সে তা শুনে মুখে দীনতা বা অসন্তোষ যাই দেখাক না কেন, তার অন্তরটি বেশ খুশি হয়।" এই কথা বলিয়া মা বলিতেছেন, "এ তো হলো। আচ্ছা, তোরা বল দেখি কোন্ জিনিসটা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হয়?" নলিনীদিদি বলিতেছেন, "কেন, পিসিমা, জ্ঞান, ভক্তি, মানুষ যাতে সংসারে সুখে থাকে, এই সব প্রার্থনা করতে হয়।" মা বলিতেছেন, "এক কথায় বলতে গেলে, নির্বাসনা প্রার্থনা করতে হয়। কেন না বাসনাই সকল দুঃখের মূল, বার বার জন্ম-মৃত্যুর কারণ, আর মুক্তিপথের অন্তরায়।"

শ্রাবণ মাসে মা রাধুকে লইয়া কোয়ালপাড়া হইতে জয়রামবাটী আসিয়াছেন। তখন তাঁহার সংসারে আমরা পনর-কুড়ি জন লোক। সকলের খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি সব বিষয় মা নিজেই তত্ত্বাবধান করিতেছেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে মা আমাকে বলিতেছেন, "বাবা, সেদিন—আমাকে কি কথাটাই বললে। আমি জানতাম ওর খুব উদার মন। ওর মতো লোকের ও কথাটা বলা মোটেই ভাল হয়নি। আমি তার মনের ভাব বুঝে, আসবার সময় এক মরাই ধান আশ্রমের খরচের জন্য দিয়ে এলুম।* তা তখন আর নিতে চায়নি—নিজের

* পরে ঐ ধানগুলির চাউল করিয়া মাকেই পাঠানো হয়, এবং—অনুতপ্ত হইয়া মায়ের নিকট বিশেষভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

ভুল বুঝতে পেরে আমার কাছে ক্ষমা চাইতে এল।" এই বলিয়া মা সমস্ত ঘটনাটি বলিলেন, "সেদিন সকালে প্রণাম করতে এসে বলছে, 'মা, এরা সব আগে আমার খুব বাধ্য ছিল, এখন চোখ ফুটেছে, আমার কথা সব সময় মেনে থাকতে চায় না। আর শরৎ মহারাজ বা আপনাদের কাছে গেলে আপনারা আদরযত্ন করে কাছে রেখে দেন। ভাল খাবারও সুবিধা পায়। আপনারা যদি স্থান না দেন, একটু বুঝিয়ে পাঠিয়ে দেন, তবে আমার বাধ্য থাকবে।' আমি বললাম, 'সেকি গো? ও সব কি কথা বলছ? ভালবাসাই তো আমাদের আসল। ভালবাসাতেই তো তাঁর সংসার গড়ে উঠেছে। আর আমি মা, আমার কাছে তুমি ছেলেদের খাওয়া-পরার খোঁটা দিয়ে কি করে বললে?' আহা, এর জন্যে ঠাকুরের কাছে কত কেঁদেছি, প্রার্থনা করেছি। তবে তো আজ তাঁর কৃপায় মঠ-টঠ যা কিছু। ঠাকুরের শরীর যাবার পর ছেলেরা সংসার ত্যাগ করে কয়েকদিন একটা আশ্রয় করে সব একসঙ্গে জুটল। তারপর একে একে স্বাধীনভাবে বেরিয়ে পড়ে এখানে ওখানে ঘুরতে থাকে। আমার তখন মনে খুব দুঃখ হলো। ঠাকুরের কাছে এই বলে প্রার্থনা করতে লাগলুম, 'ঠাকুর, তুমি এলে, এই কজনকে নিয়ে লীলা করে আনন্দ করে চলে গেলে, আর অমনি সব শেষ হয়ে গেল? তাহলে আর এত কষ্ট করে আসার কি দরকার ছিল? কাশী বৃন্দাবনে দেখেছি, অনেক সাধু ভিক্ষা করে খায়, আর গাছতলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সে রকম সাধুর তো অভাব নেই। তোমার নাম করে সব ছেড়ে বেরিয়ে আমার ছেলেরা যে দুটি অন্নের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াবে তা আমি দেখতে পারব না। আমার প্রার্থনা, তোমার নামে যারা বেরুবে তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব যেন না হয়। ওরা সব তোমাকে, আর তোমার সব ভাব, উপদেশ নিয়ে একত্রে থাকবে। আর এই সংসারতাপদগ্ধ লোকেরা তাদের কাছে এসে তোমার কথা শুনে শান্তি পাবে। এইজন্যই তো তোমার আসা। ওদের ঘুরে ঘুরে বেড়ানো দেখে আমার প্রাণ আকুল হয়ে উঠে।' তারপর থেকে নরেন ধীরে ধীরে এই সব করলে।"

জয়রামবাটীতে দুর্গাপূজার সময় অষ্টমীর দিন একটি ভক্ত কতকগুলি পদ্মফুল একটি ঝুড়িতে লইয়া আসিতেছেন। দূর হইতে আমাকে দেখিয়া ফুলসমেত হাত তুলিয়া আমাকে নমস্কার করিলেন। মা দূর হইতে উহা দেখিয়াছিলেন। পরে আমাকে বলিলেন, "ঐ ফুল দিয়ে আর ঠাকুরের পূজো হবে না; ওগুলি ফেলে দিও।"

আমাদের দুজনের পরিধানে সাদাপাড় কাপড় দেখিয়া মা বলিলেন, "এ কি! সাদাপেড়ে কাপড় কেন পরেছ? তোমরা ছেলে মানুষ, পাড় দেওয়া কাপড় পরবে। নইলে মন বুড়ো হয়ে যাবে। মনে সর্বদা উৎসাহ রাখতে হয়।" এই বলিয়া বাক্স হইতে দুজনকে দুখানি কাপড় বাহির করিয়া দিলেন।

সেইদিন সন্ধ্যার একটু পরেই সন্ধিপূজা। মায়ের পায়ে পদ্মফুল দিয়া অনেকে পুষ্পাঞ্জলি দিলে মা বলিতেছেন, "আরও ফুল আন; রাখাল, তারক, শরৎ, খোকা, যোগেন, গোলাপ—

এদের সব নাম করে ফুল দাও। আমার জানা-অজানা সকল ছেলের হয়ে ফুল দাও।" আমি ঐরূপ করিলে মা জোড়হাতে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া বহুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া বলিতেছেন, "সকলের ইহকাল-পরকালের মঙ্গল হোক।"

কেদার মহারাজ একদিন সকালে জয়রামবাটীতে মায়ের নিকট বসিয়া বলিতেছেন, "মা, আমাদের দাতব্য চিকিৎসালয়ে যাদের অবস্থা ভাল তারাও সব ওষুধ নিতে আসে। আমরা তো গরিবদের জন্যেই করেছি। ঐ সমস্ত লোককে ওষুধ দেওয়া কি উচিত?"মা একটু থামিয়া বলিলেন, "বাবা, এদেশের সকলেই গরিব। তবে ওরা এইসব জেনেশুনেও যদি প্রার্থী হয়ে এসে দাঁড়ায়, সামর্থ্য থাকলে দেবে বইকি। যে প্রার্থী সেই গরিব।"

কেদার মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, এবার কি ঠাকুর একটা নতুন জিনিস দিয়ে যাবার জন্যেই এসেছিলেন যে সর্বধর্মসমন্বয় করে গেলেন?" মা বলিলেন, "দেখ, বাবা, তিনি যে সমন্বয়-ভাব প্রচার করবার মতলবে সব ধর্মমত সাধন করেছিলেন তা কিন্তু আমার মনে হয়নি। তিনি সর্বদা ভগবদভাবেই বিভোর থাকতেন। খ্রীস্টানরা, মুসলমানরা, বৈষ্ণবরা যে যে ভাবে তাঁকে ভজনা করে বস্তুলাভ করে, তিনি সেই সেইভাবে সাধনা করে নানা লীলা আস্বাদ করতেন ও দিনরাত কোথা দিয়ে কেটে যেত, কোন হুঁশ থাকত না। তবে কি জান, বাবা, এই যুগে তাঁর ত্যাগই হলো বিশেষত্ব। ও রকম স্বাভাবিক ত্যাগ কি আর কখনো কেউ দেখেছে? সর্বসমন্বয়-ভাবটি যা বললে, ওটিও ঠিক। অন্যান্য বারে একটা ভাবকেই বড় করায় অন্য সব ভাব চাপা পড়েছিল।"

সেদিন সন্ধ্যার পর নিত্যকার মতো রুটি ইত্যাদি করিয়া ভক্তদের চিঠি পড়িয়া শুনাইতে মায়ের ঘরে গিয়াছি। একটি স্ত্রী-ভক্ত প্রায়ই পত্র দেন—মায়ের নানারূপ স্তবস্তুতিতে ভরা. তাহার পত্রের মর্ম মাকে বলিলাম। মা সব শুনিয়া বলিতেছেন, "দেখ, অনেক সময় ভাবি যে আমি তো সেই রাম মুখুয্যের মেয়ে, আমার সমবয়সী আরও তো অনেক মেয়ে জয়রামবাটীতে আছে, তাদের সঙ্গে আমার তফাত কি? ভক্তেরা সব কোথা থেকে এসে প্রণাম করে। জিজ্ঞাসা করলে শুনি, কেউ হাকিম, কেউ উকিল। এরাই বা এমন আসে কেন?" মা ইহা বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। কিছু পরে আমি বলিলাম, "আচ্ছা, আপনাদের কি সব সময়ে নিজের স্বরূপ মনে থাকে না?" মা বলিতেছেন, "তা কি সব সময়ে থাকে? তাহলে কি এইসব কাজকর্ম করা চলে? তবে কাজকর্মের ভেতর যখন ইচ্ছা হয়, সামান্য চিন্তাতে দপ্‌ করে উদ্দীপনা হয়ে মহামায়ার খেলা সব বুঝতে পারা যায়।" একজন বলিলেন, "কই মা, আমরা তো এত চেষ্টাতেও কিছুই বুঝতে পারছি না।" মা বলিতেছেন, "হবে গো হবে, তোমাদের ভাবনা কি? কালে সব হবে।" সেদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত কথাবার্তা হইতেছিল। আমি বলিলাম, "মা কেদার মহারাজ বলেন, এইসব কাজে কর্মে খুব খাট, তাহলেই যা হবার আপনিই হবে।" মা বলিলেন, "কাজকর্ম করবে বইকি, কাজে মন ভাল থাকে। তবে জপধ্যান, প্রার্থনাও বিশেষ দরকার। অন্ততঃ সকাল-সন্ধ্যায়

একবার বসতেই হয়। ওটি হলো যেন নৌকার হাল। সন্ধ্যাকালে একটু বসলে সমস্ত দিন ভালমন্দ কি করলাম না করলাম তার বিচার আসে। তারপর গতকালের মনের অবস্থার সঙ্গে আজকের অবস্থার তুলনা করতে হয়। পরে জপ করতে করতে ইষ্টমূর্তির ধ্যান করতে হয়। ধ্যানের প্রথমে মুখটি আসে বটে, কিন্তু পা থেকে সমস্ত অঙ্গটি সাক্ষাৎ ধ্যান করতে হয়। কাজের সঙ্গে সকাল-সন্ধ্যা জপ-ধ্যান না করলে কি করছ না করছ বুঝবে কি করে?" আমি বলিলাম, "কেউ কেউ আবার বলেন, কাজকর্মে কিছু হবে না, সর্বদা জপধ্যান করতে পারলেই হবে।" মা বলিলেন, "তারা কি করে বুঝলে, কি করলে হবে, আর কি করলে হবে না? কয়েকদিন একটু জপধ্যান করলেই কি সব হয়ে গেল? মহামায়া পথ ছেড়ে না দিলে কিছুতেই কিছু হবার নয়। সেদিন দেখলে তো, একজন জোর করে জপধ্যান বেশি করে করতে গিয়ে মাথাটি বিগড়ে এলেন। মাথাটি যদি বিগড়াল তো আর রইল কি? ইস্ক্রুপের প্যাঁচের একটু এধার আর ওধার। এক প্যাঁচ আলগা হলেই হয় পাগল হলো, না হয় মহামায়ার ফাঁদে পড়ে নিজেকে বুদ্ধিমান ভেবে মনে করে, আমি বেশ আছি। আর উলটো দিকে এক প্যাঁচ কষা হলেই ঠিক পথে চলে শান্তি ও আনন্দ পায়। সর্বদা তাঁর স্মরণ মনন করে প্রার্থনা করতে হয়, 'প্রভু সদ্বুদ্ধি দাও।' সব সময়ে জপধ্যান করতে পারে কজন? প্রথমটা একটু করে। শেষে ন—র মতো বসে থেকে থেকে নিচের গরম মাথায় ওঠে (অহঙ্কারী হয়)। গাছ পাথর ভেবে নানা অশান্তি। মনটাকে বসিয়ে আলগা না দিয়ে কাজ করা ঢের ভাল। মন আলগা পেলেই যত গোল বাধায়। নরেন আমার এইসব দেখেই তো নিষ্কাম কর্মের পত্তন করলে।" মা ন—কে লক্ষ্য করিয়া আবার বলিলেন, "দেখ না, বসে থেকে থেকে কি অশুদ্ধ মনই না হয়ে গেছে! কেবল শুচিবাই বাড়ছে। আর বলে, অশান্তি। অত অশান্তি কেন? এত দেখেশুনেও চৈতন্য হলো না?"

পরদিন বেলা দশটা-এগারটার সময় মা সদর দরজার রোয়াকে বসিয়া আছেন। আমরা বৈঠকখানায় আছি। কালী মামা ও বরদা মামার মধ্যে রাস্তা লইয়া বচসা হইতে হইতে ক্রমে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইয়াছে। মা আর স্থির থাকিতে না পারিয়া উঁহাদের নিকট গেলেন। কখনও একজনকে বলিতেছেন, 'তোর অন্যায়', কখনও অপরকে ধরিয়া টানিতেছেন। খুব মাতিয়া গিয়াছেন। ঐ সময় আমরাও গিয়া পড়ায় ঝগড়া একটু কমিল, এবং বকিতে বকিতে যে যার বাড়ি চলিয়া গেলেন। মাও সক্রোধে বাড়ির মধ্যে আসিয়া বসিলেন। বসিয়াই হাসিতেছেন ও বলিতেছেন, "মহামায়ার কি মায়া গো! অনন্ত পৃথিবীটা পড়ে আছে, এও পড়ে থাকবে! জীব এইটুকু আর বুঝতে পারে না।" এই পর্যন্ত বলিয়া মা হাসিয়া অস্থির—হাসি আর থামে না।

ছয়মাস হইল রাধুর সন্তান হইয়াছে, কিন্তু দুর্বলতাবশতঃ সে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারে না। বসিয়া বসিয়াই চলাফেরা করে। আবার খুব আফিম খাওয়া অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছে। ইদানীং মায়েরও শরীর ভাল নয়, মাঝে মাঝে জ্বর হইতেছে। তিনি রাধুর

আফিম খাওয়াটা একটু কমাইতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহা লইয়া রাধু সব সময়ে খুব জিদ করে। সেদিন সকালে মা তরকারি কুটিতেছেন। রাধু আফিমের জন্য আসিয়া বসিয়াছে। মা বুঝিতে পারিয়া বলিতেছেন, "রাধি, আর কেন, উঠে দাঁড়া না। তোকে নিয়ে আর পারি নে। তোর জন্য আমার ধর্মকর্ম সব গেল। এত খরচপত্র কোথা থেকে জোগাই বল্ তো ?" এই সকল মৃদু রোষবাক্য বলাতে রাধু রাগিয়া গিয়া সামনের চুবড়ি হইতে একটা বড় বেগুন লইয়া মায়ের পিঠে জোরে ছুঁড়িয়া মারিল। গুম্ করিয়া শব্দ হইতেই দেখি, মা পিঠটা বাঁকাইয়া উঠিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানটি ফুলিয়া উঠিল। মা ঠাকুরের দিকে চাহিয়া জোড়হাতে বলিতেছেন, "ঠাকুর ওর অপরাধ নিও না, ও অবোধ!" নিজের পায়ের ধুলা লইয়া রাধুর মাথায় দিতেছেন ও বলিতেছেন, "রাধি, এই শরীরকে ঠাকুর কোনদিন একটি শাসনবাক্য বলেননি, আর তুই এত কষ্ট দিচ্ছিস! তুই কি বুঝবি আমার স্থান কোথায় ? তোদের নিয়ে পড়ে আছি বলে তোরা কি মনে করিস বল্ দেখি ?" রাধু তখন কাঁদিয়া ফেলিল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন ছোট মামী (রাধুর পাগলী মা) মনের খেয়ালে জামাই মন্মথকে নানা স্থানে—এমনকি পুকুরে নামিয়া—খুঁজিয়া না পাইয়া স্থির করিলেন যে, সে জলে ডুবিয়া গিয়াছে। পরে ভাবিলেন, এ সব ঠাকুরঝির কাজ। তখন ছুটিয়া আসিয়া ভিজা কাপড়ে মায়ের পায়ে পড়িয়া আকুলভাবে কাঁদিয়া বলিলেন, "ওগো, ঠাকুরঝি গো, আমার জামাই বাড়ুয্যে পুকুরে ডুবে গেছে গো। কি হবে গো!" মা হঠাৎ ইহা শুনিয়া আমাদের ডাকিয়া বলিলেন, "শিগ্গির এস, পাগলী কি বলছে শোন," এবং ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আমরা ছুটিয়া আসিলাম। হরি বলিল, "মন্মথ বেনেদের দোকানে তাস খেলছে, দেখে এলাম।" মা বলিলেন, "শিগ্গির ছুটে খবর দিয়ে তাকে নিয়ে এস।" আমরা তৎক্ষণাৎ মন্মথকে লইয়া আসিলাম। তাহাকে দেখিয়া ছোটমামী অপ্রস্তুত হইয়া ক্রোধভরে বকিতে বকিতে চলিয়া গেলেন।

বিকালে মা বাঞের কুটনো লইয়া বসিয়াছেন। হঠাৎ ছোটমামী তাঁহার কাছে বসিয়া বলিতেছেন, "তুমিই তো রাধুকে আফিম খাইয়ে পঙ্গু করে বশ করে রেখেছ। আমার নাতিকে, আমার মেয়েকে আমার কাছে পর্যন্ত যেতে দাও না।" মা বলিতেছেন, "নিয়ে যা না তোর মেয়েকে, ঐ তো পড়ে আছে। আমি লুকিয়ে রেখেছি নাকি ?" এইরূপ দুই-এক কথা হইতেই মামীর পাগলামী চরম সীমায় উঠিয়াছে। মাকে মারিবার জন্য তিনি একখানি জ্বালানি কাঠ আনিতে ছুটিয়াছেন। মা তখন চিৎকার করিয়া বলিতেছেন, "ওগো কে আছ, পাগলী আমায় মেরে ফেললে!" আমি দৌড়িয়া গিয়া দেখি, কাঠখানি প্রায় মায়ের মাথায় ফেলেন আর কি! তাড়াতাড়ি উহা দূরে ফেলিয়া দিয়া মামীকে সদর দরজা পার করিয়া দিলাম। রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া পুনরায় সে বাড়িতে আসিতে নিষেধ করিলাম। মাও তখন উত্তেজিত হইয়া বলিয়া ফেলিলেন, "পাগলী, কি করতে

বসেছিলি ? ঐ হাত তোর খসে পড়বে।" ইহা বলিয়াই জিব কাটিয়া মা শিহরিয়া উঠিলেন। ঠাকুরের দিকে চাহিয়া জোড়হাতে বলিতেছেন, "ঠাকুর, একি করলাম ! এখন উপায় কি হবে? আমার মুখ দিয়ে কোনদিন তো কারও ওপর অভিসম্পাত-বাক্য বেরোয়নি, শেষটায় তাও হলো ? আর কেন ?" মায়ের অপার করুণার ভাব দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

কয়েক মাস পূর্বে ব্যাঙ্গালোরের শ্রীযুত ন—কিছুদিনের ছুটি লইয়া কোয়ালপাড়ায় মায়ের নিকট ছিলেন, এবং রাধুর জন্য মায়ের খুব খরচ হইতেছে দেখিয়া তাঁহাকে প্রতিমাসে প্রচুর অর্থসাহায্য করিতেন। যাইবার সময় মাকে তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন, "মা, খরচপত্রে যখনই অনটন পড়বে, কোনরূপ দ্বিধা না করে আমাকে যেন একটু জানান।" আজকাল জয়রামবাটীতে খরচ খুব বাড়িয়াছে। পূজনীয় শরৎ মহারাজ লিখিয়াছেন, যোগাড়যন্ত্র করিয়া সময়মত টাকা পাঠাইতে দেরি হইয়া যাইতেছে। এই পত্র শুনিয়া মা বলিতেছেন, "তাহলে শরতের হাতে আর বেশি টাকা নেই ; নইলে সে অমন কথা লিখবে কেন ? ন—সেদিন ঐ কথা বলে গেল। হাঁ গা, আমি তার কাছে কি বলে টাকা চাইব ? ঠাকুর, তোমার শেষ আদেশটি কি রক্ষা করতে পারব না ? রাধি, তোর জন্যে আমি সব খোয়াতে বসেছি। ঠাকুর বলেছিলেন, 'দেখ, কারও কাছে একটি পয়সার জন্যেও চিৎহাত করো না, তোমার মোটা ভাত কাপড়ের অভাব হবে না। একটি পয়সার জন্যে যদি কারও কাছে হাত পাত, তবে তার কাছে মাথাটি কেনা হয়ে থাকবে। বরং পরভাতা ভাল, পরঘোরো ভাল নয়। তোমাকে ভক্তেরা যে যেখানেই নিজেদের বাড়িতে আদর করে রাখুক না কেন, কামারপুকুরের নিজের ঘরখানি কখনও নষ্ট করো না।"

মনসা নামে একটি ছেলে মায়ের কাছে আসিয়াছে। দীক্ষা ও গৈরিক লওয়ার খুব ইচ্ছা। মাও তাহাকে আনন্দের সহিত উহা দিলেন। সে খুব আহ্লাদিত হইয়া সন্ধ্যার সময় কালী মামার বৈঠকখানায় বসিয়া, "আর কিছু নাই সংসারের মাঝে, কেবল শ্যামা সার রে" এবং "মনছাঁচে তোমারে ফেলে, শ্যামা"—এই দুইটি গান গাহিল। মায়ের খুব ভাল লাগিয়াছে। তাঁহার কাছে বসিয়া রাধু, মাকু, নলিনী, মামীরা দু-একজন এবং আরও অনেকে শুনিতে-ছিলেন। মামীদের মধ্যে একজন বলিলেন, "ঠাকুরঝি ঐ ছেলেটিকে সাধু করে দিলেন।" মাকু তাহাতে সায় দিয়া বলিল, "তাই বটে, পিসিমার যেমন কাজ ! অমন ভাল ভাল ছেলেদের সাধু করে দিচ্ছেন। বাপ মা কত কষ্ট করে মানুষ করে মুখ চেয়ে আছে। তাদের কত আশা ! সে সব চুরমার হয়ে গেল। এখন উনি হয় হৃষীকেশে গিয়ে ভিক্ষে করে খাবেন, না হয় রোগীর সেবায় মলমূত্র ঘাঁটবেন ! বে থা করা—সেও তো একটা সংসারধর্ম। তুমি যদি এ রকম সাধু করে দাও, মহামায়া তোমার উপর চটে যাবেন। সাধু হয়, নিজেরা হোকগে। তোমার নিমিত্ত হতে যাওয়া কেন, পিসিমা ?" মা তখন বলিতে লাগিলেন, "মাকু, ওরা সব দেবশিশু। সংসারে ফুলের মতো পবিত্র হয়ে থাকবে। এর চেয়ে সুখের

কি আছে বল দেখি ? সংসারে যে কি সুখ তা তো দেখছিস। স্বামী-সুখও দেখলি। এখন লজ্জা হয় না, আবার স্বামীর কাছে যাস ? এতদিন আমার কাছে থেকে কি দেখলি ? এত আকর্ষণ, পশুভাব কেন ? কি সুখ পাচ্ছিস ? ফের যদি স্বামীর কাছে যাবি, দূর করে দেব। পবিত্র ভাবটা কি স্বপ্নেও তোদের ধারণা হয় না ? এখনও কি ভাই-বোনের মতো থাকতে পারিস নে ? খালি শূয়োরের মতো থাকতে চাস ? তোদের সংসারের জ্বালায় আমার হাড় জ্বলে গেল।"* সকলে লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন।

মা আবার বলিতেছেন, "ভগবানকে ডাকুক আর না ডাকুক, যে বে না করে সে তো অর্ধমুক্ত। যে সময়ে ভগবানে একটু মন হবে, সে সময়ে হু হু করে এগুতে থাকবে। আর যাদের মহাপাপ তারাই বিয়ে করে সংসার করে। ভগবানে মন হলেও কিছুতেই আর উঠতে পারে না। হাত-পা সব বাঁধা।"

আজকাল প্রায় প্রত্যহ মায়ের সামান্য সামান্য জ্বর হইতেছে। শরীর খুব দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। পূজনীয় শরৎ মহারাজ মাকে শীঘ্র কলিকাতায় লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তিনি বিশেষ কার্য উপলক্ষে কাশী গিয়াছেন। সেই সময় মাকে কলিকাতা যাইবার কথা বলাতে মা বলিতেছেন, "শরৎ কলকাতায় না থাকলে আমার সেখানে যাবার কথা উঠতেই পারে না। কার কাছে যাব ? আমি সেখানে আছি আর শরৎ যদি বলে, 'মা, কয়েকদিন অন্যত্র যাচ্ছি', তাহলে আমি বলব, 'একটু থাম বাবা, আমি আগে এখান থেকে পা বাড়াই, তারপর তুমি যাবে।' শরৎ ছাড়া আমার ঝক্কি কে পোয়াবে ?"

তখন শীতকাল, মায়ের শরীরও এত খারাপ ; তথাপি পূর্ব অভ্যাস মতো ভোর তিনটায় উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া বিছানায় লেপমুড়ি দিয়া কিয়ৎক্ষণ বসিয়া পুনরায় শুইয়া পড়িতেন। সেই সময়ে আমরা তাঁহার ঘরে গিয়া অন্ধকারে দরজা বন্ধ করিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকিতাম। মা হয়তো বলিতেছেন, "এই সময় এই দেবতার মন্ত্রটি এইভাবে জপ কর দেখি," ইত্যাদি। কিছু পরে কথা উঠিয়াছে, আমাদের সাধুরা অসুস্থ হইয়া গৃহস্থের বাড়িতে থাকে। মা বলিতেছেন, "অসুস্থ হয়েছে বলে গৃহস্থ-বাড়িতে সন্ন্যাসী কেন থাকবে ? মঠ রয়েছে, আশ্রম রয়েছে। সন্ন্যাসী ত্যাগের আদর্শ। কাঠের স্ত্রী-মূর্তি পুতুল যদি রাস্তায় উপুড় হয়ে পড়ে থাকে, সন্ন্যাসী কখনো পায়ে করেও উলটে দর্শন করবে না। আর সন্ন্যাসীর অর্থ থাকা একান্ত খারাপ। চাকি (টাকা) না করতে পারে এমন জিনিস নেই— প্রাণসংশয় পর্যন্ত। পুরীতে একটি সাধু থাকত, সমুদ্রের ধারে। তার কিছু টাকা ছিল। তাই টের পেয়ে দুজন চেলা লোভ সামলাতে না পেরে সাধুটিকে খুন করে টাকা নিয়ে চলে গেল।"

* ইহার অল্পদিন পূর্বে মাকুর একটি শিশুপুত্র মারা গিয়াছে এবং সম্প্রতি একটি পুত্রসন্তান হইয়াছে। বাধু তখনও অসুস্থ।

একদিন মা বেলা নয়টা-দশটার সময় বসিয়া তেল মাখিতেছেন। ঐ সময় একজন ঝাঁট দিয়া ঝাঁটাটি ছুঁড়িয়া একদিকে ফেলিয়া রাখিলেন। মা তাহা দেখিয়া বলিতেছেন, "ও কি গো, কাজটি হয়ে গেল, আর অমনি ওটি অশ্রদ্ধা করে ছুঁড়ে দিলে? ছুঁড়ে রাখতেও যতক্ষণ, আস্তে ধীর হয়ে রাখতেও ততক্ষণ। ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে? যাকে রাখ সেই রাখে। আবার তো ওটি দরকার হবে? তা ছাড়া, এ সংসারে ওটিও তো একটি অঙ্গ। সেদিক দিয়েও তো ওর একটা সম্মান আছে। যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাঁটাটিকেও মান্য করে রাখতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়।"

একদিন রাধুর সর্বাপেক্ষা প্রিয় মিনি বিড়ালটি উঠানের ধারে শুইয়া আছে। জনৈকা মহিলা দাঁড়াইয়া পা দিয়া তাহাকে আদর করিতেছেন। ক্রমে তাহার মাথায়ও পা দিয়াছেন। মা তাহা দেখিয়া বলিতেছেন, "ও মা, ও কি করছ? মাথা যে গুরুর স্থান, মাথায় কি পা দিতে আছে? নমস্কার কর।" উক্ত মহিলা বলিলেন, "তা তো কোন দিন জানিনি, মা। আজ জানলাম।"

সকালে কলিকাতা হইতে কয়েকটি ভক্ত আসিয়াছেন, বেশ ফিট্‌ফাট। কাপড়-জামার খুব প্রাচুর্য। মায়ের জন্য ফল প্রভৃতি অনেক জিনিস আনিয়াছেন। মা বিকালে আপন মনে বলিতেছেন, "সব জ্বালিয়ে খেলে! আর পারিনে। এক একটি ছেলে আসে, আমার সংসারটি যেন শান্তিপূর্ণ হয়ে যায়। কোথা থেকে সব তরিতরকারি জিনিসপত্রের যোগাযোগ হয়ে যায়। আমাকে কোন ভাবনা চিন্তা করতে হয় না। যা হলো, মুখটি বুজে খেয়ে পাতাটি গুটিয়ে নিয়ে উঠে গেল। আহা, তাদের মুখের কথাটিতেও যেন প্রাণটি শীতল হয়! আর এই দেখ না, সকাল থেকে যেন উদ্বাস্ত হয়ে উঠেছি। একগাদা ফল নিয়ে এল। তার অর্ধেক পচে গোবর হয়ে গেছে। সেগুলি ফেলি কোথায় তা খুঁজে পাইনে। এদিকে অমন ফরসা কাপড়-চোপড়, বলে, 'গামছা আনতে ভুলে গেছি।' আমি গামছা পাই কোত্থেকে? তখন তো একটা দেখেশুনে দিলাম। এখন ভাবনা, রাত্রে কি যে তরকারি করি! আবার শুনছি, মশারির দড়ি নেই; হরি দড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছে। ঠাকুর, তোমার সংসার তুমি দেখ গিয়ে। আমি তো আর পেরে উঠছি না। এদিকে রাঁধি, আর ওদিকে এইসব।"

ভক্তদের কেহ কেহ মাকে কত উত্যক্ত করিত তদ্বিষয়ে দুই-একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে।

মা তখন জয়রামবাটীতে। সন্ধ্যার একটু পূর্বে শ্যামবাজার হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, বারান্দায় একখানা মাদুর পাতিয়া মা শুইয়া আছেন। আমি যাইতেই মা বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, "তোমরা সব থাক, কিন্তু কাজকর্মে বাইরেও যেতে হয়। আজ—র সঙ্গে একটা লোক এসেছিল; বুড়ো গোছের। তাকে দূর থেকে দেখে আমি ঘরের ভিতর চৌকিতে বসে রইলাম। সে বাইরে থেকে প্রণাম করল বটে, কিন্তু পায়ের ধুলো নিতে ব্যস্ত। আমি যত সঙ্কোচ করি, 'না, না, করি, সে কিছুতেই ছাড়ল না; শেষে একরকম জোর করেই পায়ের ধুলো নিলে। সেই থেকে অসহ্য পায়ের জ্বালা আর পেটের ব্যথায় মরছি।

তিনবাব চারবার পা ধুলুম, তবুও সে জ্বালা যাচ্ছে না। তোমরা কাছে থাকলে আমার ইসারা বুঝে তাকে নিষেধ করতে পারতে। কলকাতায় ওরা ভক্তদের সম্বন্ধে যে কড়াক্কড় করে সেটি না করলেও চলে না। কত বকমের লোক যে আসে! তোমরা ছেলেমানুষ বুঝতে পার না।"

বাহিরের কাজকর্ম সারিয়া আমি সন্ধ্যাকালে মায়ের কাছে আসিয়াছি। মা বলিলেন, "আজ বিকালে বি—একজন পুলিসের বড় কর্মচারীকে (তাহার নাম করিয়া) আমার কাছে আনিয়াছিল। লোকটি কি রকম প্রকৃতির—গোঁফ পাকাতে পাকাতে এসে প্রণাম করে আমার পাযেব ধুলো নিতে চায়! আমি সঙ্কুচিত হযে কিছুতেই পায়ের ধুলো দিতে পারলাম না। কি রকম চনমনে স্বভাব! অথচ বি—আমার সামনে তাকে শুনিয়ে শুনিযে তার কত প্রশংসা করছে! এদিকে আমি তো ব্যতিব্যস্ত, ভাবছি কি ভাবে তার অভ্যর্থনা করতে হবে, না হবে। শেষে কিছু হালুয়া করে সদরে পাঠিয়ে দিলুম।"

একদিন 'উদ্বোধনের' বাটীতে মা পূজা সারিয়া উঠিয়াছেন এমন সময় একটি ভক্ত কতকগুলি ফুল লইয়া মাকে দর্শন করিতে যান। মা তো অপরিচিত ভক্তটিকে দেখিয়া সর্বাঙ্গ চাদর মুড়ি দিযা বউ-মানুষটির মতো তক্তপোশে পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন। ভক্তটি মাযের পাযে ফুলগুলি দিয়া প্রণাম করিয়া সামনে আসন করিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া ন্যাস ও দীর্ঘ প্রাণায়াম আবম্ভ কবিলেন। বাড়ির সকলে কাজে ব্যস্ত, মাযের কাছে কেহই নাই। বসিয়া থাকিতে থাকিতে মায়ের সমস্ত শরীর ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিল।

ভক্তটি মাকে পূজা করিতেছে দেখিয়া গোলাপ-মা কার্যোপলক্ষে অন্যত্র গিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ পবে ফিরিযা আসিয়াও সেই ব্যক্তিকে তদ্রূপ বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পাবিলেন এবং তাহাকে হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া তাঁহার স্বাভাবিক উচ্চগলায় বলিতে লাগিলেন, "এ কি কাঠের ঠাকুব পেয়েছ যে ন্যাস-প্রাণায়াম কবে তাকে চেতনা কববে? আক্কেল নেই? মা যে ঘেমে অস্থির হযে যাচ্ছেন।"

একবাব একটি ভক্ত মাকে প্রণাম করিতে গিযা মাযেব পায়ের বুড়ো আঙুলের উপর জোরে মাথা ঠুকিয়া দেয। মা ব্যথা পাইয়া 'উঃ' করিয়া উঠিলেন, নিকটে যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ কি করলে?' তখন ভক্তটি জবাব দিল, "মায়ের পায়ে মাথা ঠুকে ব্যথা রেখে দিলাম। যতদিন এই ব্যথা থাকবে, ততদিন মা আমাকে স্মরণ করবেন।"

পূর্বোক্ত ঘটনা দুইটি মা অনেকবার আমাদের নিকট হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন।

পূজনীয় শরৎ মহারাজ কাশী হইতে কলিকাতা আসিয়াই মাকে আনিতে জয়রামবাটীতে লোক পাঠাইয়াছেন। যথাসময়ে সকালবেলায় সকলকে লইয়া মা কলিকাতা রওয়ানা হইতেছেন। সকলের শেষে কি—মহারাজ ও হ—প্রণাম করিলেন। মা তাঁহাদিগকে তাঁহার ব্যবহৃত একখানি কাপড় ও চাদর দিয়া 'এগুলি রেখো' বলিয়া

মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং সজলনয়নে যাত্রা করিলেন। আমি পালকির সঙ্গে সাইকেলে চলিলাম. পথে শিহড়ে শান্তিনাথ মহাদেবের মন্দিরের নিকট পালকি নামাইয়া মা দুই টাকার সন্দেশ, চিনি ও নবাত (সরাগুড়) কিনিয়া শিবের পূজা দেওয়াইলেন। উপস্থিত সকলকে এবং আমাদিগকেও কিছু প্রসাদ দিয়া নিজে সামান্য গ্রহণ করিলেন ও কিছু রাধুর জন্য আঁচলে বাঁধিয়া লইলেন। যথাসময়ে সকলে কোয়ালপাড়া পৌঁছিলেন। সেইদিন সন্ধ্যায় রাধু প্রভৃতি মেয়েরা সকলে গরুর গাড়িতে বিষ্ণুপুর রওয়ানা হইলেন। পরদিন ভোর পাঁচটাব সময় আমি জগদম্বা আশ্রমে মায়ের কাছে গিয়া দেখি. তিনি ফুল মিষ্টি দিয়া ঠাকুরপূজা সারিযা ঠাকুরের ফটোখানি কাপড়ে জড়াইয়া বাক্সের মধ্যে লইতেছেন এবং ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন. "ওঠ, এবার যাত্রার সময় হলো।" আমাকে দেখিয়া বলিতেছেন, "এসেছ ? এত দেরি করলে যে ? রোদ হবে। এই যাত্রার ফুলটি নাও।" এই বলিয়া ঠাকুরের পূজার একটি ফুল নিজের মাথায় ঠেকাইয়া আমার হাতে দিলেন। পরে সকলের নিকট বিদায় লইয়া পালকিতে উঠিলেন। কিছুদূর গিয়া মা বলিতেছেন. "সর্বদা আমাদের কাছে কাছে এবং সাবধানে চল। রাধু ও মাকুর গহনাগুলি সব মাকুর পালকিতে আছে।" জয়পুরে আসিয়া মা পালকি নামাইতে বলিলেন। পালকি হইতে নামিয়া যে চটিতে মা ও আমরা সেবার জয়রামবাটী যাইবার পথে রান্না করিয়া খাইয়াছিলাম সেখানি ভগ্নপ্রায় দেখিয়া মা হাসিয়া বলিতেছেন, "আহা, আমাদের সেই চটিখানি গো।" উহাব নিকটে গিয়া কম্বল পাতিয়া বসিলেন ও বলিলেন, "বেহারাদের কিছু খাওয়াও।" দুটি টাকা দিয়া মুড়ি কিনিয়া দিতে বলিলেন। পরে মাকুর ছেলের দুধ গরম করিয়া দিয়া মা সামনের পুকুরটিতে হাত পা ধুইয়া আসিয়া বলিতেছেন, "আমার জন্যে এক পয়সাব মুড়ি এনে দাও, আমিও দুটি চিবুই। আর তোমার ও মাকুর জন্যে কিছু তেলেভাজা পাও তো নিয়ে এস।" আমি ঐসব আনিয়া দিলে মা অল্প দুটি খাইয়া আমাদের দিয়া দিলেন। বলিলেন, "আর চিবুতে পারি না।" বেহারাদের সকলের খাওয়া হইলে আবার পালকি ছাড়িয়া দিল। চাব মাইল জঙ্গল পার হইয়া তাঁতিপুকুরে আসিয়া দেখি, কতকগুলি মজুরশ্রেণীর লোক একটি ছোট দোকানের পাশে বসিযা জটলা করিতেছে। আমি ভাবিতেছি, এই জায়গাটা শীঘ্র পার হইয়া যাইতে পারিলে আর দুমাইল পরে কিছু কিছু লোকালয় পাওয়া যাইবে এবং অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। কিন্তু মা পালকি হইতে উঁকি মারিয়া দোকানটি দেখিয়াই বলিতেছেন, "একটু নামাতে বল দেখি, আমার পালকিতে বসে পা-টা ধরে গেছে। ঐ দোকান থেকে আধ পয়সার তেল একটা শালপাতায় করে এনে দাও। পা-টায় মালিশ করি।" আমি তো এই কথা শুনিয়া ভয়ে অস্থির! শেষে মাকে বলিলাম, "এইখানে কারা সব রয়েছে। আপনার আর নেমে কাজ নেই। আপনি পালকিতেই বসে থাকুন, আমি তেল এনে দিচ্ছি।" মাকু সেই সময়ে বলিতেছে, "আমার মুড়ি খেয়ে খুব তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল খাব।" মা বলিলেন, "খা

না, ঐ পুকুরটায় খেয়ে আয়।" আমি বলিলাম, "ও জল কি খাবে? খুব খারাপ।" মা বলিলেন, "রাস্তায় ওই কত লোকে খাচ্ছে। কিছু হবে না, যা। তুমি যাও ওর সঙ্গে, খাইয়ে আন।" মাকে তেল কিনিয়া দিয়া মাকুর সহিত গিয়া তাহাকে জল খাওয়াইয়া আসিয়াই রওয়ানা হইলাম। বেলা বারটা আন্দাজ বিষ্ণুপুরে সুরেশ্বরবাবুর বাড়িতে পৌঁছিলাম। সুরেশ্বরবাবু কয়েক মাস পূর্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মা তাঁহার কথা বলিতেছেন, "আহা! আমি এখানে এলে সুরেশ আমার সর্বদা জোড়হাত করে ঐখানটিতে দাঁড়িয়ে থাকত। কখনও বারান্দাটিতে পর্যন্ত উঠত না। কি ভক্তিই ছিল।"* সেইদিন বিষ্ণুপুরে থাকিয়া পরের দিন মধ্যাহ্নে আহারাদির পর মাকে লইয়া আমরা সকলে একটি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে কলিকাতা রওয়ানা হইলাম এবং রাত্রি প্রায় দশটায় 'উদ্বোধনে' পৌঁছিলাম।

যোগেন-মা ও গোলাপ-মা মায়ের শরীর দেখিয়ে আমাদিগকে বলিতেছেন, "তোমরা কি মাকেই নিয়ে এলে গো! ভূতের মতন কাল। কেবল চামড়া ও হাড় কখানি এনে হাজির করলে গা? মায়ের শরীর যে এত খারাপ তা আমরা মোটেই বুঝতে পারিনি।" পরের দিন হইতেই পূজনীয় শরৎ মহারাজ মায়ের চিকিৎসার সকল রকম ব্যবস্থা করিলেন।

মা শ্রীযুত শ্যামাদাস কবিরাজের চিকিৎসায় কয়েকদিন একটু ভাল আছেন। ঐ সময়ে একদিন বিকালে কয়েক জন স্ত্রী-ভক্ত দর্শন করিতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজনের অলঙ্কার বেশভূষার খুব পারিপাট্য। একটু চঞ্চল। মা তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "দেখ, স্ত্রীলোকের লজ্জাই হলো ভূষণ। ফুলটি দেবসেবায় লাগলেই সব চেয়ে সার্থক; না হয় গাছেই শুকিয়ে যাওয়া ভাল। কিন্তু আমাব দেখে বড় কষ্ট হয়, যখন বাবুরা ফুলটি কখনো তোড়া করে, কখনো বা এমনি হাতে নিয়ে নাকের কাছে একবার ধরে বলে, 'বাঃ, বেশ তো গন্ধটি!' ও মা, পরক্ষণেই হয়তো মেঝেয় ফেলে দিয়েছে! জুতোয় মাড়িয়েই হয়তো চলেছে। চেয়েও দেখলে না।"**

ঐ সময়ে একদিন ইটালিতে উৎসব দেখিতে যাইবার পথে রামলাল দাদা, লক্ষ্মী দিদি ও রামলাল দাদার কন্যা দক্ষিণেশ্বর হইতে মায়ের নিকট আসিয়াছেন। রামলাল দাদা মাকে প্রণাম করিয়া নিচে শরৎ মহারাজের নিকট গেলেন। মা ও অন্যান্য সকলের অনুরোধে লক্ষ্মী দিদি চাপা গলায় কীর্তন গাহিয়া ও সঙ্গে সঙ্গে মুখে খোলের বোলের অনুকরণ করিয়া শুনাইলেন। তারপর কথায় কথায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মস্থান, মন্দির ও বিষয়সম্পত্তির কথা উঠিল।

লক্ষ্মী দিদি—ও হলে সেটি আমাদের হেপাজতে থাকবে তো? এদের (রামলাল দাদা ও শিবু দাদার) ছেলেপিলেরাই সব পূজাদি করবে, থাকবে।

* মা মাঝে মাঝে বলিতেন, "সুরেশ যেন দ্বিতীয় গিরিশবাবু।"

** পরে শুনিয়াছিলাম ঐ স্ত্রীলোকটিব স্বামী নাকি বহুদিন নিরুদ্দেশ হইয়াছেন।

মা—তা কি করে হবে ? এরা সব সাধুভক্ত ; এদের জাতের বিচার আছে ? কত দেশের লোক সাহেবসুবো সব যাবে, ঐখানে থাকবে, প্রসাদ পাবে। আমাদের তো সব ভক্ত নিয়েই কারবার। তোরা হলি সংসারী। তোদের সমাজ আছে, ছেলেমেয়েদের বে থা আছে। তোদের কি ওদের সঙ্গে থাকলে চলবে ?

এইরূপ আরও কিছু কথাবার্তার পর মা আবার বলিতেছেন, "তোদের এখন যেমন ঘরগুলি আছে ঐ ধরনের, তবে করগেটের ছাউনি দিয়ে, যুগীদের খামারের কাছে, অথবা পশ্চিম দিকে যেখানে হোক একটু জায়গা নিয়ে বাড়ি আলাদা করে দেবে।"

লক্ষ্মী দিদি—তবে রঘুবীর ও শীতলা কি ঠাকুরের যে মন্দির হবে তাতেই থাকবেন ?

মা—তা কি হয় ! ও তোদের গৃহদেবতা ; পালপার্বণে তোদের বউঝিরা পূজা-অর্চনা করবে। তা হয় না। রঘুবীরের জন্য মন্দির আলাদা পাকা করে দেবে ; পাশ দিয়ে একটু রাস্তা থাকবে ; মেযেরা যাতায়াত করবে। তুই, রামলাল বা শিবু যখন যাবি, তোরা মন্দিরেই ভক্তদের সংসারে খাবি থাকবি ; তোদের আর কি ?

উপরে শরৎ মহারাজের ঘরে রামলাল দাদা প্রভৃতি আসিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের প্রস্তাব রামলাল দাদা ও লক্ষ্মী দিদি সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিলেন ও শবৎ মহারাজও সকল কথা শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ কবিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মী দিদি ও রামলাল দাদা প্রভৃতি চলিযা গেলে মা আমাকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "দেখ, তখন লক্ষ্মীর সঙ্গে কথা কইতে কইতে ওকে কাপড় ও টাকা দিতে ভুলে গেছি। তুমি কৃষ্ণলালের সঙ্গে ইটালিতে গিয়ে উৎসব দেখে এস, আর লক্ষ্মীকে টাকা ও কাপড় দিয়ে এস। ইটালিতে ওবা ঠাকুরকে বেশ সাজায়।" এই বলিয়া দুটি টাকা ও একখানি কাপড় বাহির করিয়া দিলেন। পরে বলিতেছেন, "লক্ষ্মী ঠাকুরের কাছে কীর্তনীযাদেব অনুকরণ কবে গাইতে গাইতে নেচে অঙ্গভঙ্গি করে দেখাত। ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন, 'ওর ওই ভাব। তুমি যেন ওর লয়ে লয় দিয়ে লজ্জা ভেঙো না'।"

একদিন জয়রামবাটী হইতে চিঠি আসিল যে ঐ অঞ্চলের একটি লোক ডাকাতি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে। মা শুনিয়াই বলিতেছেন, "ও বাবা, দেখলে ? আমি জানতাম তার ডাকাতি-বৃত্তিটা নষ্ট হয়নি। আমি কি সাধ করে তাকে অত আদর করতাম, অত জিনিসপত্র দিতাম ? তাই আমার বাধ্য থাকত। আমার কাছে এলে কেঁচোটির মতো থাকত। এই সব মেযের পাল নিয়ে, ওদের অত গয়নাগাঁটি নিয়ে বাস করি। তোমরা তো কে কখন আছ, কিছুই ঠিক নেই। দুর্জনকে দূরে পরিহার, তা যে ভাবেই হোক।"

মায়ের অসুখ ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে। জ্বর মাত্র দুই-আড়াই পর্যন্ত উঠে, কিন্তু হাত-পা-জ্বালার জন্য অত্যন্ত অস্থিরতা। আজকাল সর্বদা বলিতেছেন, "আমাকে গঙ্গাতীরে নিয়ে চল, গঙ্গার ধারে আমি ঠাণ্ডা হব।" পূজনীয় শরৎ মহারাজ সেজন্য চেষ্টাও করিতেছেন। কিন্তু ডাক্তাররা এই অবস্থায় নাড়াচাড়া করিতে নিষেধ করিতেছেন। একদিন

মা আমাকে বলিতেছেন, "তুমি রাধুটাধু ওদের সবাইকে জয়রামবাটী রেখে এস।" আমরা ভাবিতেছি, মা রাধুগত-প্রাণ, তাহাকে ছাড়া এক মুহূর্তও থাকিতে পারেন না, আর আজ এই অবস্থায় তাহাদিগকে জয়রামবাটী পাঠাইয়া দিতে বলিতেছেন। একি ব্যাপার! মা ক্রমশই উহাদের উপর এত বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন যে নলিনী দিদি প্রভৃতি তাঁহার কাছে যাইতে সাহস করেন না। পূজনীয় শরৎ মহারাজ মাকে বুঝাইতে লাগিলেন, "আপনার এই অসুখ দেখে ওদের যেতে কষ্ট হবে। আপনি একটু সেরে উঠলে ওরা যাবে।" মা বলিতেছেন, "পাঠিয়ে দিলেই ভাল হতো। তবে যেন আমার কাছে আর না আসে। আমার আর ওদের ছায়া দেখতেও ইচ্ছে নেই।"

একদিন দুপুরে রাধু পাশের ঘরে ঘুমাইতেছে, তাহার খোকা হামা দিতে দিতে মায়ের বিছানার নিকট আসিয়া তাঁহার বুকের উপর উঠিতেছে। মা তাহা দেখিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, "তোদের মায়া একেবারে কাটিয়েছি। যা, যা, আর পারবিনে।" আমাকে বলিলেন, "একে তুলে নিয়ে গিয়ে ওদিকে রেখে এস। এসব আর ভাল লাগে না।" আমি খোকাকে কোলে করিয়া তাহার দিদিমার নিকট দিয়া আসিলাম।*

জয়রামবাটীতে একদিন একজন ছোট মামীকে একটু রূঢ় কথা বলায় মা বলিতেছেন, "ওকি গো, মানুষের মনে আঘাত দিয়ে কি কথা বলতে আছে? কথা সত্য হলেও অপ্রিয় করে বলতে নেই। শেষে ঐরূপ স্বভাব হয়ে যায়। মানুষের চক্ষুলজ্জা ভেঙে গেলে আর মুখে কিছু আটকায় না। ঠাকুর বলতেন, 'একজন খোঁড়াকে যদি জিজ্ঞাসা করতে হয়, তুমি খোঁড়া হলে কি করে?—তাহলে বলতে হয়, তোমার পা-টি অমন মোড়া হলো কি করে'?"

শেষাশেষি মায়ের শরীর খুব দুর্বল থাকায় বেশিক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু দেখিতাম, তিনি এই শুইয়া থাকার সময়েও জপ করিতেছেন। জয়রামবাটীতে রাত্রি একটা-দুইটার সময় হঠাৎ কোন কার্য উপলক্ষে তাঁহাকে ডাকিয়া দেখিয়াছি, তিনি এক ডাকেই সাড়া দিতেন এবং "আপনি কি ঘুমান নাই?"—জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "কি করি, বাবা, ছেলেরা ব্যাকুল হয়ে এসে ধরে, দীক্ষা নিয়ে যায়। কিন্তু কই, কেউ নিয়মিত—নিয়মিত কেন, কেউ বা কিছুই করে না। তা যখন ভার নিয়েছি, তখন তাদের আমাকে দেখতে হবে তো? তাই জপ করি। আর ঠাকুরের কাছে তাদের জন্য প্রার্থনা করি, 'হে ঠাকুর, ওদের চৈতন্য দাও, মুক্তি দাও। এই সংসারে বড় দুঃখকষ্ট। আর যেন তাদের না আসতে হয়'।" বলিতে বলিতে অতি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিতেন। আবার বলিতেন, "এত আগ্রহ করে মন্ত্রটি তো নিয়ে গেল, কিন্তু কিছু করে না কেন? এমন আর কি শক্ত? একটু অভ্যাস করে করতে থাকলেই কেমন আনন্দ আসে। আহা, যোগেন ও আমরা বৃন্দাবনে কি আনন্দে কত জপ করতাম! চোখে মুখে মাছি বসে ঘা করে দিত—হুঁশ হতো না।"

* মা এইবারই স্বধামে প্রস্থান করেন।

একদিন মা বলিতেছেন, "এত জপ করলামই বল, আর এত কাজ করলামই বল, কিছুই কিছু নয়। মহামায়া পথ ছেড়ে না দিলে কার কি সাধ্য! হে জীব, শরণাগত হও, কেবল শরণাগত হও। তবেই তিনি দয়া করে পথ ছেড়ে দেবেন।" এই বলিয়া কামারপুকুরে অবস্থানকালে ঠাকুরের জীবনের একটি ঘটনা বলিলেন, "একবার কামারপুকুরে জ্যৈষ্ঠমাসের দিন বৈকালে খুব বৃষ্টি হয়ে মাঠ সব জলে উপচে গেছে। ঠাকুর ডোমপাড়ার কাছে নিচু সদর রাস্তা দিয়ে এতখানি জল ভেঙে মাঠে শৌচে যাচ্ছেন। সেখানে অনেকে মাগুর মাছ উঠেছে দেখে লাঠি দিয়ে মারছে। একটি মাগুর মাছ ঠাকুরের পায়ে পায়ে কেবল ঘুরছে। তাই দেখে তিনি বলছেন, 'এটিকে মারিসনে রে, এটি আমার পায়ে পায়ে শরণাগত হয়ে কেমন ঘুরছে। কেউ যদি পারিস তো একে পুকুরে ছেড়ে দিয়ে আয়।' তারপর নিজেই সেটিকে ছেড়ে দিয়ে এসে বাড়িতে বলছেন, 'আহা, কেউ যদি এই রকম শরণাগত হয় তবেই সে রক্ষা পায়'।"

—**স্বামী ঈশানানন্দ**

(৩)

জয়রামবাটীতে জনৈক ভক্ত জপ সম্বন্ধে মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "যখন রাস্তায় রেলে স্টীমারে থাকিতে হয়, তখন কিভাবে জপ করিব?" মা তাহাতে বলিয়াছিলেন, "তখন মনে মনে করিবে।" আরও বলিয়াছিলেন, "বাবা, ক্রমে হাত মুখ সব বন্ধ হয়ে যাবে, কেবল মনে চলবে। মনই শেষে গুরু হবে।"

একদিন কথাপ্রসঙ্গে মঠের মহারাজদের সম্বন্ধে মা বলিয়াছিলেন, "জীবের মুক্তির চাবি এদের হাতে আছে।"

কাশীতে একবার শ্রীশ্রীমায়ের জন্মদিনে স্বামী কেশবানন্দের মাতা তাঁহার কোন আত্মীয়ের বিয়োগ-কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতেছিলেন। তাহাতে মা বলিলেন, "ছি! আজ কি কাঁদতে আছে, আজ যে আনন্দের দিন।"

কোয়ালপাড়ায় রথের দিন আমাদের জনৈক গুরুভ্রাতা মাকে বলে, "মা, মন বড়ই চঞ্চল। কিছুতেই ঠিক হয় না।" তদুত্তরে মা বলিয়াছিলেন, "যেমন ঝড়ে মেঘ উড়িয়ে নেয় তেমনি তাঁর নামে বিষয়-মেঘ কেটে যাবে।"

আমি মাকে ঐদিন মনের দুর্বলতা সম্বন্ধে নিবেদন করায় মা উত্তরে বলিয়াছিলেন, "কাম কি একেবারে যায় গা, শরীর থাকলেই কিছু না কিছু থাকে। তবে কি জান, সাপের মাথায় ধুলোপড়া পড়লে যেমনটি হয়, তেমনটি হয়ে যাবে।"

মা একবার বলিয়াছিলেন, "ভয় কি? সর্বদা জানবে, তোমাদের পিছনে একজন আছেন।" আরও বলিয়াছিলেন, "যতদিন (এ) শরীব আছে, আনন্দ করে চলে যাও।"

একদিন কথাপ্রসঙ্গে মা বলেন, 'ঘাস আর বাঁশ ছাড়া সকলকেই এখানে আসতে হবে।' ইহার অর্থ আমি এই বুঝিয়াছি যে, যাহাদের কিছুমাত্র সার নাই তাহারাই কেবল এবার বাদ পড়িবে, নতুবা আর সকলেই শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাব গ্রহণ করিবে। স্বামী কেশবানন্দ ও বিদ্যানন্দের নিকটও মা এইরূপ বলিয়াছিলেন।

জনৈক স্ত্রী-ভক্ত মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মা, অনেকে তো শিবপূজা করে, আমরাও শিবপূজা করতে পারি কি-না ?" তদুত্তরে মা বলিয়াছিলেন, "আমি যে মন্ত্র দিয়েছি তাতেই সব—দুর্গাপূজা, কালীপূজা সব ঐ মন্ত্রে হয়। তবে কারও ইচ্ছা হলে শিখে নিয়ে করতে পারে। তোমাদের ওসবের দরকার নেই, ওসব করলেই হাঙ্গামা-বাড়ানো।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগ নিবেদন করা সম্বন্ধে মাকে বলা হইয়াছিল, "মা, পূজা-পদ্ধতি-মতে নিবেদন করবার মন্ত্র তো কিছুই জানি না।" তাহাতে মা বলেন, "পূজাপদ্ধতির অত দরকার নেই। ইষ্টমন্ত্রেতেই সব কাজ হয়।"

—শ্রীজিতেন্দ্রমোহন চৌধুরী, পাটনা

(৪)

ধ্যানজপের কথা উঠায় মা বলিলেন, "ধ্যানজপের একটা নিয়মিত সময় রাখা খুব দরকার। কারণ কখন যে ক্ষণ* বয়, বলা যায় না। ও হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়—টের পাওয়া যায় না। সেজন্য যতই গোলমাল হোক, নিয়ম রাখা খুব দরকার।"

আমি—কাজের ঝঞ্ঝাট বা অসুখ প্রভৃতি আছে ; সেজন্য সকল সময় নিয়ম রাখা সম্ভব হয় না।

মা—অসুখ হলে তো আর আয়ত্ত নেই। আর নেহাত যদি কাজের ঝঞ্ঝাট থাকে, তবে স্মরণ প্রণাম করলেও হয়।

আমি—কখন সময় করা কর্তব্য ?

মা—সন্ধিক্ষণেই তাঁকে ডাকা প্রশস্ত। রাত যাচ্ছে, দিন আসছে, দিন যাচ্ছে, রাত আসছে—এই হলো সন্ধি। এই সময় মন পবিত্র থাকে।

মনের দুর্বলতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় মা বলিয়াছিলেন, "বাবা, ওটা প্রকৃতির নিয়ম ; যেমন অমাবস্যা, পূর্ণিমা আছে না ? তেমনি মনও কখনো ভাল কখনো মন্দ হয়।"

মা যখন জয়রামবাটী হইতে বাগবাজার যাইতেন তখন আমাকে মাঝে মাঝে

* ক্ষণ অর্থাৎ অনুকূল সময়। কার্যের সফলতাপ্রসঙ্গে মা একদিন একটি বচন বলেন, 'যা না করে ধনে জনে, তা করে ক্ষণের গুণে।'

জয়রামবাটী যাইয়া সংবাদাদি রাখিতে বলিয়া যাইতেন। আমি তাঁহার এই আদেশ যথাসাধ্য পালন করিতে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু তিনি জয়রামবাটী না থাকায় যাইতে তেমন আনন্দ হইত না। ইহা পত্রে মাকে জানাইয়াছিলাম। তিনি জয়রামবাটী প্রত্যাবর্তন করিয়া কথাচ্ছলে আমাকে বলিলেন, "ও ন—, রান্নী (রাঁধুনী) কি বলে শোন।" মা এবাবে কলিকাতা যাইবার সময় রাঁধুনীকে বিদায় না দিয়া বড় মামীর সাহায্যার্থ রাখিয়া আসেন। গ্রীষ্মকাল; রাঁধুনী মায়ের ঘরের (পুরাতন বাটীতে) দরজার সামনে বারান্দায় মশারি খাটাইয়া শুইয়াছিল। স্বপ্নে দেখে, মা এক হাতে ফুলের সাজি ও অন্য হাতে জলের ঘটি লইয়া যেন স্নান করিয়া আসিতেছেন। আসিয়া বলিতেছেন, "ওঠ, ওঠ এখান থেকে!" এই বলিয়া দুয়ার জুড়িয়া শোওয়ার জন্য তাহাকে তিরস্কার করিতেছেন। রাঁধুনীর এই বর্ণনা শেষ হইলে মা হাসিয়া বলিলেন, "শোন, কে জানে বাবা, কি বলে!"

একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমি বলিয়াছিলাম, "মা, সংসারে থেকে কোন কাজ হয় না।" তদুত্তরে তিনি বলেন, "বাবা, সংসার মহা দঁক (পাঁক), দঁকে পডলে ওঠা মুস্কিল। ব্রহ্মা-বিষ্ণু খাবি খান, মানুষ কোন ছার! তাঁর নাম করবে। নাম করতে করতে তিনিই একদিন কাটিয়ে দিবেন। তিনি না কাটালে কি উদ্ধার হওয়া যায়, বাবা? তাঁতে খুব বিশ্বাস বাখবে। সংসারে যেমন মা-বাপ ছেলেদের আশ্রয়স্থল, তেমনি ঠাকুরকে জ্ঞান করবে।"

একদিন ভগবানে বিশ্বাস সম্বন্ধে কথা উঠিলে মা বলেন, "বাবা, শুধু পড়লে কি আর বিশ্বাস হয়? বেশি পড়লে গুলিয়ে যায়। ঠাকুর বলতেন, 'জগৎ মিথ্যা, তিনি সত্য—এইটি শাস্ত্র পড়ে জেনে নিতে হয়।' এই যেমন, তোমাকে চিঠি লিখলাম, এই এই জিনিসগুলি নিয়ে তুমি আসবে। তা চিঠির দরকার কতক্ষণ? যতক্ষণ তাতে কি আছে না জান। যাই জানা হয়ে গেল, আর চিঠির দরকার কি? সেই সব জিনিস নিয়ে তো আমার সঙ্গে দেখা করবে। না হলে, দিনরাত চিঠি পড়ে লাভ কি?"

একদিন আবেগভরে বলিলাম, "মা, এত যে আসা-যাওয়া করছি, আপনাব কৃপালাভও করলাম, তবু কেন কিছুই হচ্ছে না? আমার তো মনে হয়, আমি যেমন ছিলাম তেমনি আছি।"

তদুত্তরে মা বলিলেন, "বাবা, তুমি যদি একটা খাটে ঘুমিয়ে থাক, আর কেউ সেই খাটখানাসমেত তোমাকে অন্যত্র নিয়ে যায়, তাহলে তুমি ঘুম ভাঙতেই কি বুঝতে পারবে যে স্থানান্তর হয়েছ? না, যখন বেশ পরিষ্কারভাবে ঘুমের ঘোর কেটে যাবে, তখন দেখবে যে অন্যত্র এসেছ।"*

একবার বেলুড় মঠের উৎসবদর্শনার্থ বাড়ি হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় মেদিনীপুরে

* মা বলিতেন, "আমাব যা কবে দেবাব, আমি সেই এক সময়ে (দীক্ষাকালে) কবে দিয়েছি। তবে যদি সদ্য শান্তি চাও, সাধনভজন কব, নতুবা দেহান্তে হবে।"

একটু প্রয়োজনবশতঃ নামিয়াছিলাম। তাহাতে সেইদিন রাত্রের গাড়ি ধরিতে না পারায় পরদিন যাইতে হয়। সন্ধ্যার সময় কলিকাতা পৌছিয়া মায়ের সহিত সাক্ষাৎ করি। মা দেখিয়াই বলিলেন, "উৎসব দেখনি তো ?" "না, মা, উৎসব দেখা হয় নাই" বলিয়া রাস্তার ঘটনা বলিলাম। তাহা শুনিয়া মা বলিলেন, "যো সো করে আগে উদ্দেশ্যসাধন করে নিতে হয়। এইতো, বাবা, এত সব দেখতে পেলে না। আগের কাজ আগে করতে হয়।" পরে বলিলেন, "কালকে এখানে এসে ঠাকুরের প্রসাদ পেও।"

আহারসম্বন্ধে মা বলিতেন, "যখনই যা-কিছু আহার করবে, তা ভগবানকে নিবেদন করে প্রসাদস্বরূপ গ্রহণ করবে। তাহলে রক্ত শুদ্ধ হবে, রক্ত শুদ্ধ হলে মনও শুদ্ধ হবে।"

একদিন কোন কারণে মা তাঁহার ভাইদের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। আমি ঐ সময়ে গিয়া উপস্থিত হইলে আমাদের ঐ সম্পর্কে দু-একটি কাহিনী বলিয়া বলিলেন, "বাবা, ওরা কেবল টাকা টাকা করেই গেল। কেবল 'ধন দাও, ধন দাও'—ভুলেও কখনো জ্ঞান ভক্তি চাইলে না। যা চাচ্ছিস, তাই নে!"

জয়রামবাটীতে শেষ অসুখেব পূর্ব্ববার মা যখন কঠিন জ্বরে কষ্ট পাইতেছিলেন, তখন একদিন আমি তাঁহার পদসেবা করিতেছিলাম, এমন সময়ে বলিলেন, "দেখ, বাবা, কদিন ধরে ডাকছি কেউ শুনতে পায়নি ; কত কেঁদেছি, তবুও কেউ আসেনি। আজ অবশেষে মা এসেছিলেন—জগদ্ধাত্রী, কিন্তু মুখটি ঠিক মায়ের মুখের মতো। এবার আমার অসুখ সেরে যাবে। আর একবার ছোটবেলায় দক্ষিণেশ্বরে যেতে আমার খুব জ্বর। কোন জ্ঞান নেই। এমন অবস্থায় দেখি যে একটি কাল কুচ্‌কুচে মেয়ে এক-পা ধুলো নিয়ে আমার বিছানার পাশে বসে আমার মাথায় হাত বুলুচ্ছে। এক-পা ধুলো দেখে বললুম, 'মা, কেউ কি পা ধুতে জল দেয়নি ?' সে বললে, 'না, মা, আমি এক্ষুণি চলে যাব। তোমাকে দেখতে এসেছি। ভয় কি ? ভাল হয়ে যাবে।' তা পরদিন থেকে আমি ক্রমে সেরে উঠি। এবার বাবা, বড় কষ্ট দিয়েছে ; কত ডাকবার পর তবে আজ দেখা পেয়েছি। এবারও আমি সেরে গেলুম। ভয় কি, বাবা, তাঁকে খুব ডাকলেই সব বিষয়ে তিনি এসে রক্ষা করবেন।"

—শ্রীনলিনবিহারী সরকার, চন্দ্রকোণা

(৫)

জয়রামবাটীতে মা একদিন বলিলেন, "দেখ, বাবা, ছেলেবেলা দেখতুম, আমারই মতো একটি মেয়ে সর্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে থেকে আমার সকল কাজের সহায়তা করত, আমার সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করত। দশ-এগার বছর বয়স পর্যন্ত এ রকম হতো।"

একদিন মা বলিলেন, "ঠাকুর চলে যাবার কিছুকাল পর থেকে প্রায়ই দেখতুম দাড়িটাড়িওয়ালা এক সন্ন্যাসী আমাকে পঞ্চতপা করবার কথা বলতেন। প্রথম প্রথম আমি

তেমন খেয়াল করিনি। পঞ্চতপা কি, তাও তত জানতুম না। তিনি ক্রমেই পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। তারপর যোগেনকে (যোগেন-মা) পঞ্চতপার কথা জিজ্ঞাসা করায় যোগেন বললে, 'বেশ তো, মা, আমিও করব।' পরে পঞ্চতপার যোগাড় করা হলো। তখন বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে। চারিদিকে ঘুঁটের আগুন, উপরে সূর্যের প্রখর তেজ। প্রাতে স্নান করে কাছে গিয়ে দেখি আগুন গমগম করে জ্বলছে। প্রাণে বড়ই ভয় হলো, কি করে ওর ভিতর যাব, আর সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখানে বসে থাকব। পরে ঠাকুরের নাম করে ঢুকে দেখি, আগুনের কোন তেজ নেই। এভাবে সাতদিন কাজ করি। কিন্তু বাবা, শরীরের বর্ণ যেন কালো ছাই হয়ে গিছল! এর পর আর সে সন্ন্যাসীকে দেখি নাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মা, ঠাকুর বলেছেন, যারা তাঁর কাছে যাবে তাদের শেষ জন্ম। আপনার কাছে যারা আসবে তাদের কি হবে?"

মা—কি আর হবে, বাবা? এখানেও তাই হবে।

আমি—মা, আপনার কাছ থেকে যারা মন্ত্র নিয়েছে, তারা যদি কোনরকম জপতপ না করে, তবে তাদের পরিণাম কি হবে?

মা—কি আর হবে? তোমরা অত ভাবনা কর কেন? মনের বাসনা-কামনা যা আছে পূরণ করে নাও, পরে রামকৃষ্ণলোকে গিয়ে চির-শান্তিভোগ করবে। ঠাকুর তোমাদের জন্য নতুন রাজ্য তৈরি করেছেন।

কোন ভক্ত মন্ত্র কিভাবে অঙ্গুলিতে জপ করিতে হইবে ভুলিয়া যাওয়ায় উহা মায়ের কাছে জানিয়া লইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়া পত্র দেন। মা উহা শুনিয়া বলিলেন, "ওতে আর কি আসে যায়? এক রকমে করলেই হয়। এ সকল তো মন আনবার জন্য।"*

মুক্তি ও ভক্তি সম্বন্ধে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। মা বলিলেন,"মুক্তি তো প্রতিক্ষণে দেওয়া যায়। কিন্তু ভক্তি ভগবান সহজে দিতে চান না।" কথাগুলি এমনভাবে বলিলেন যেন মুক্তি তাঁহার হাতের মুঠোর ভিতর। কথাটা বলিয়াই চলিয়া গেলেন।

শুচি-অশুচি-বিষয়ে মা একদিন বলিলেন, "দেখ, বাবা, ঠাকুর বড়ই পেটরোগা ছিলেন। আমি নবতে থেকে ঠাকুরের ইচ্ছামত সুক্ত, ঝোল, এসব রেঁধে দিতুম। মাসের মধ্যে তিন দিন মেয়েরা ওসব করতে পারে না, সে কয়দিন মায়ের (মা কালীর) ওখান হতে প্রসাদ আসত। তা খেলেই ঠাকুরের অসুখ বাড়ত। একদিন ঠাকুর আমাকে বললেন, "দেখ, তুমি এই তিন দিন রান্না না করাতে আমার অসুখটা বেড়েছে। তুমি ও কদিন কেন রাঁধলে না?" আমি বললুম, 'মেয়েদের অশুচির তিনদিন কাউকে রেঁধে দিতে পারে না।' ঠাকুর বললেন, 'কে বললে পারে না? তুমি আমাকে দেবে, তাতে দোষ হবে না। বল তো, অশুচি তোমার

* একটি ভক্ত একদিন 'উদ্বোধনে' মাকে প্রণাম কবিবার সময় বলিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী মন্ত্র ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে পুনরায কলিকাতা আনাও তাঁহাব পক্ষে কষ্টসাধ্য। মা শুনিয়া বলিলেন, "তা ভুলে গেছে, তাতে আর কি হযেছে? ঠাকুবকে স্মবণ-মনন কবলেই হবে।"

শরীরের কোন জিনিসটা ? চামড়া না মাংস, না হাড়, না মজ্জা ? দেখ মনই শুচি-অশুচি। বাইরে অশুচি বলে কিছু নেই।' এর পর হতে আমি সর্বদা রান্না করে দিতুম।"*

কোয়ালপাড়ায় মায়ের অসুখের সময় তাঁহার জন্য শরবত প্রস্তুত করিয়া ঠিক হইয়াছে কি না দেখিবার জন্য আমি উহা চাখিয়া তাঁহাকে দিয়াছিলাম। মা কিন্তু তাহা জানিতেন না। উহার দুই-তিন দিন পরে মা নিজেই বলিলেন, "দেখ, বাবা, ভালবাসার জনকে কোন কিছু খেতে দিতে হলে আগে নিজে চেখে দেওয়া খুব ভাল।" তখন আমি বলিলাম, "মা, আমি তো আপনার শরবত চেখে দেখেছিলাম।" তিনি বলিলেন, "বেশ করেছিলে, বাবা, ভালবাসার পাত্রকে ঐ ভাবেই দিতে হয়। শোননি, রাখালরা শ্রীকৃষ্ণকে ফল খেতে দেবার আগে নিজেরা চেখে দিত ?"

একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, রাস্তাঘাটে কোন কোন লোককে দেখামাত্র মনে হয় যেন তাঁরা বিশেষ পরিচিত। পরে পরিচয়ে জানতে পারি তাঁরা ঠাকুরের বা আপনার ভক্ত। হঠাৎ দেখলে অত পরিচিত বলে বোধ হয় কেন ?" মা বলিলেন, "ঠাকুর বলতেন, 'কলমীর দল, একটি ধরে টানলেই সবগুলি নাড়াচাড়া পড়ে।' সব যে একগাছের শাখা-প্রশাখা।"

আর একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, অন্যান্য অবতাবগণ নিজ নিজ শক্তির পরে দেহরক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু এবার আপনাকে রাখিযা ঠাকুর পূর্বে চলিয়া গেলেন কেন ?" মা বলিলেন, "বাবা, জান তো ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল ? সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য আমাকে এবার রেখে গেছেন।"

—ডাঃ উমেশচন্দ্র দত্ত, ময়মনসিংহ

(৬)

উদ্বোধন, ঠাকুরঘর

সকালবেলা মা পূজার যোগাড় করিতেছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে আমি বলিলাম, "মা, আপনার কেন এত আসক্তি ? রাতদিন 'রাধী, রাধী' করছেন, ঘোর সংসারীর মতো। অথচ এত ভক্ত আসছে, তাদের দিকে একটুও মন নেই। এত আসক্তি ! এগুলো কি ভাল ?" পূর্বে কখন কখনও এরূপ বলিয়াছি। তাহাতে মা কখনও দীনতা করিযা বলিতেন, "আমরা মেয়েমানুষ, আমরা এই রকমই।" আজ কিন্তু মা বেশ একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "তুমি এরকম কোথায় পাবে ? আমার মতো একটি বের কর দেখি ? কি জান, যারা পরমার্থ

* একবাব ঐ সময়ে পূজাদি না কবায় মাযেব মন কেমন কবে। তিনি ঠাকুবকে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কবেন। ঠাকুব বলেন, "যদি পূজা না কবলে মনে কষ্ট হয় তবে করবে, নতুবা নয।"

খুব চিন্তা করে, তাদের মন খুব সূক্ষ্ম, শুদ্ধ হয়ে যায়। সেই মন যা ধরে, সেটাকে খুব আঁকড়ে ধরে। তাই আসক্তির মতো মনে হয়। বিদ্যুৎ যখন চমকায় তখন শার্সিতেই লাগে, খড়খড়িতে লাগে না।"

একদিন বলিলাম, "মা, আমার মনে খারাপ ভাব আসে না।" মা অমনি চমকিয়া উঠিয়া আমাকে বাধা দিয়া বলিতেছেন, 'বলো না, বলো না, ওকথা বলতে নেই।"

আর একদিন তাঁহাকে বলিলাম, "আপনি যে এত লোককে মন্ত্র দিচ্ছেন, তাদের তো কখনো কোন খোঁজখবর রাখেন না। এদের কি হচ্ছে না হচ্ছে, কোন খেয়াল নেই। গুরু শিষ্যের কত খোঁজ রাখেন, উন্নতি হচ্ছে কি না দেখেন। আপনার এত লোককে মন্ত্র না দিলেই হয়। যে কয়টির খবর রাখতে পারবেন, সে কয়টিকে দেওয়াই ভাল।" মা বলিতেন. "তা ঠাকুর আমাকে তো নিষেধ করেননি। তিনি আমাকে এত সব বুঝিয়েছেন, আর এটা তাহলে কি কিছু বলতেন না? আমি ঠাকুরের উপর ভার দিই। তাঁর কাছে রোজ বলি. 'যে যেখানে আছে, দেখো।' আর জান, এসব ঠাকুরের দেওয়া মন্ত্র. তিনি আমাকে দিয়েছিলেন—সিদ্ধমন্ত্র।"

একদিন বীজমন্ত্রের প্রসঙ্গে সব মন্ত্র আমাকে বলিয়া বলিলেন. "আমার সব থলে ঝেড়ে দিলুম। তুমি মন্ত্র দেবে নাকি?"

আমি—না মা, নিজেরই হলো না।

মা—তা দিলেই বা। দোষ কি? তোমরা দিতে পার।

আমি—মা, আমাকে সর্বত্যাগী করে দিন, যেন কিছুতেই টান না থাকে।

মা—সর্বত্যাগী তো আছই, আবার কি দুটো শিং বেরুবে?

আর একদিন জয়রামবাটীতে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "কি করে ভগবান লাভ হয়? পূজা, জপ, ধ্যান—এসবে হয়?"

মা—কিছুতেই না।

আমি—কিছুতেই না?

মা—কিছুতেই না।

আমি—কিছুতেই না?

মা—কিছুতেই না।

আমি—তবে কিসে হয়?

মা—শুধু তাঁর কৃপাতে হয়। তবে ধ্যানজপ করতে হয়। তাতে মনের ময়লা কাটে। পূজা জপ, ধ্যান—এসব করতে হয়। যেমন ফুল নাড়তে চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎতত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। নির্বাসনা যদি হতে পার, এক্ষুণি হয়।

একদিন জয়রামবাটীতে খাইবার পর উচ্ছিষ্ট লইতে যাইতেছি, মা আমার হাত ধরিয়া

বাধা দিয়া উচ্ছিষ্ট-থালা নিজেই লইলেন। আমি বলিলাম, "আপনি কেন ? আমিই নিচ্ছি।" মা তাহাতে বলিলেন, "আমি তোমার আর কি করেছি ? মার কোলে ছেলে বাহ্যে করে, কত কি করে ! তোমরা দেবের দুর্লভ ধন।"

—স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ

(৭)

কলকাতা

১৩১১ সালের ২ শ্রাবণ, ববিবার, সকালে ঘোড়ার গাড়ি করিয়া পূজনীয়া গৌরী-মা, তাঁহার দুর্গা ও আমি বাগবাজারে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের (ভাড়াটিয়া) বাড়িতে যাই। মায়ের শ্রীচরণ দর্শন করিবার আমার এই প্রথম সুযোগ ঘটিল। গাড়িতে আসিবার সময়, যাহাতে আমার ভাল হয় তাহা করিবার জন্য গৌরী-মার নিকট কাতরভাবে কাঁদিয়া জানাইয়াছিলাম। শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে পৌঁছিয়া সর্বপ্রথমে গৌরী-মা দোতলায় যান; আমরা তাহার পরে যাই। উপরে গিয়া দেখিলাম, গৌরী-মা আস্তে আস্তে মায়ের সহিত কি বলিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কখন কথা হইল জানি না, শ্রীশ্রীমা গৌরী-মাকে বলিলেন, "তুমি সেদিন সুরেনের বউকে নিয়ে এসেছিলে, আজ এই বৌমাকে এনেছ, তোমার এই কাজ।" এই কথা শুনিয়া গৌরী-মা জোরে বলিলেন, "দেবে না তো কি ? এসেছ কিসের জন্যে ?" তাহা শুনিয়া মা আস্তে আস্তে বলিলেন, "তবে এস, মা, এখন সময় ভাল আছে।" পরে দুর্গাকে লইয়া ঠাকুরঘরে গিয়া মা দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। গৌরী-মা ও আমি বাবান্দায় দাঁড়াইয়া রহিলাম।

দুর্গার দীক্ষা হইয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে সে বাহিরে আসিল। এইবার আমি ঠাকুরঘরের ভিতরে গেলাম। মা ভিতরেই ছিলেন। আমি ভিতরে গেলে দরজা বন্ধ করা হইল। গৌরী-মা ও দুর্গা বাহিরে বারান্দায় রহিলেন। মা আমাকে পূজার আসনে বসাইলেন এবং আমাকে দিয়া ঠাকুরের পূজা করাইলেন। দীক্ষা দিবার পূর্বে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের কুলগুরু আছে ?" আমি বলিলাম, 'আছে।' মা বলিলেন, "আবার দীক্ষা নেবে না তো ?" আমি বলিলাম, 'না।' পরে ঘরের ভিতর হইতে গৌরী-মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গৌরদাসি, কোন্ ঠাকুর দেব ?" গৌরী-মার কথামত আমার দীক্ষা হইল। আমি পূর্ব হইতেই জপ করিতাম। মা আমাকে জপ করিতে বলিলেন; কিন্তু তখন আমার শরীর ও মনের অবস্থা এমন হইল যে, আমি জপ করিতে পারিলাম না। মা নিজে আমার কর ধরিয়া জপ করাইলেন। তারপর ঠাকুরঘরের দরজা খোলা হইল। গৌরী-মা ভিতরে আসিলেন ও আমাকে মায়ের পায়ে ফুল দিতে বলিলেন। আমিও তাহাই করিলাম।

আমরা যখন মায়ের বাড়িতে পৌঁছাই, তখন মা গঙ্গাস্নানে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন।

আমরা যাওয়ায় তাঁহার আর গঙ্গাস্নানে যাওয়া হইল না। আমরা তথায় প্রসাদ পাইলাম ও সমস্ত দিন থাকিলাম।

মা ঐদিন একটি চাবি খুঁজিতেছিলেন। চৌকির নিকট একটি চাবি দেখিতে পাইয়া মাকে বলিলাম, "এখানে একটি চাবি রয়েছে।" মা যে সেই চাবিটিই খুঁজিতেছিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। চাবিটিতে হাত দিতেও আমার সাহস হইল না। মা চাবিটি হাতে করিয়া তুলিয়া লইয়া আমায় বলিলেন, "জন্মএয়োস্ত্রী হও, মা।"

মাকে ছাড়িয়া আসিতে আমার যেন ইচ্ছা হইতেছিল না। আসিবার সময় মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম। মা বলিলেন, "আবার এসো মা, চিঠি দিও।"

ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমীর দিন সেজদিদি ও আমি কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে উৎসব দেখিতে গিয়াছি। তথায় গিয়া দেখিলাম শ্রীশ্রীমা আসিবেন বলিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার বিশেষ আয়োজন হইতেছে। ঠাকুরঘরের নিকট তাঁহার বসিবার জন্য একটি স্থান ভাল করিয়া ঘেরা হইয়াছে। মা আসিবেন, তাঁহাব দর্শন পাইব, ভাবিয়া আমাব মনে খুব আনন্দ হইতেছে। মা আসিলে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। রাস্তায় নতুন কাপড় পাতা হইল, শাঁখ বাজিতে লাগিল। সেই কাপড়ের উপর দিয়া মা আসিলেন, সঙ্গে লক্ষ্মীদিদি। মাকে দেখিবার জন্য অনেকে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। আমরাও তাঁহাকে দর্শন করিতে সেইদিকে গেলাম। দেখিলাম, মা ধীরভাবে আসিতেছেন, তাঁহাব দর্শন করিতে সেইদিকে গেলাম। মধ্য হইতে আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, 'এসেছ, মা ?' অনেক লোকের ভিড় হইল ; আমি কিছু বলিতে পারিলাম না, ঘাড় নাড়িলাম মাত্র। সেজদিদি পুত্রশোকে বড় কাতব ছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, "আমি মাকে কখনো দেখিনি, তুমি মাকে বলো যেন আমায় কৃপা কবেন।" বহুলোকের ভিড়ের ভেতর আমি মাকে বলিবার সুযোগ পাইতেছিলাম না। একটু ফাঁকা হইলেই মাকে বলিলাম, "মা, এই আমার জা।" এই কথা বলিতেই মা সস্নেহে বলিলেন, "সব জানি, মা।" আমার আর কোন কথা মাকে বলা হইল না।

একদিন সেজদিদি ও আমি শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। মাকে প্রণাম করিয়া ঠাকুরঘরে ঠাকুরদর্শন করিয়া আসিলাম। মা বলিলেন, 'বস।' আমরা বসিলাম। নানা কথাবার্তার পর আমি কথায় কথায় মাকে বলিলাম, "মা মহামায়া. বাপ-মা স্বামী-পুত্র দিয়ে বেশ ভুলিয়ে রেখেছেন!" তাহা শুনিয়াই মা বলিলেন, "ও কথা বলো না। আমি ভুলিয়ে রেখেছি! সংসারীদের দুঃখ-কষ্ট দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়। কি করব, মা, তারা চায় না।"

আর একদিন সেজদিদির সহিত মাকে দর্শন করিতে গিয়াছি। নানা কথার পর সেজদিদি মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, ঠাকুর কোথায় ?" মা বলিলেন, "মা, ঠাকুর আর কোথায় ? তিনি ভক্তের নিকটে। যেখানে সাধুরা শৌচাদি করে সেখানেও যদি সংসারীরা যায়, সেই বাতাসে তাদের মনের মলিনতা কেটে যায়।"

একদিন সেজদিদি, নদিদি, মানি ও আমি শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে গিয়াছি। সেজদিদি

মায়েব নিকট মানি ও নদিদির দীক্ষার কথা বলিলেন। তাহাতে মা কোন কথা বলিলেন না। পরে সেজদিদি আবার দীক্ষার কথা তুলিলেন। মা বলিলেন, "কুলগুরু তো আছে, সেখানে নিলেই হয়।" কথাগুলি মা যেন একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন। একটু পরেই সেজদিদি সে ঘর হইতে উঠিয়া গেলেন। আমি বসিয়াছিলাম। তখন মা বলিলেন, "দীক্ষা দেওযা কি অমনি কথা, তার পাপের ভার সব নিতে হয়!"

একদিন মাকে জিজ্ঞাসা কবিলাম, "মা, ঠাকুরের জপ তো আমাকে বলে দিয়েছেন, আপনাব জপ কি করে করব ?" তাহা শুনিযা মা বলিলেন, "রাধা বলে পার, কি অন্য কিছু বলে পার, যা তোমার সুবিধা হয় তাই করবে। কিছু না পার, শুধু মা বলে করলেই হবে।"

একদিন আহারাদির পর সেজদিদি ও আমি মাকে দর্শন করিবার জন্য আসিয়া দেখিলাম সকল ঘবেব দরজা বন্ধ। শুনিলাম মা বিশ্রাম করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে ঘরের দরজা খোলা হইল। আমরা ঘরে গিয়া মাকে প্রণাম করিযা বসিলাম। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখন এলে, মা ?" আমরা বলিলাম, "এই খানিকক্ষণ হলো এসেছি। আপনি ঘুমুচ্ছেন, সেজন্য বাইরে ছিলাম।" অন্যান্য কথাবার্তার পর আমি মাকে বলিলাম, "মা, লোকে কত দর্শন পায, আমার তো কিছু হলো না!" তাহাতে মা বলিলেন, "ওসব নিচের কথা।" ইহা শুনিয়া আমার মনে খুব আশা হইল। মনে হইল, ঐ সকল দর্শন অপেক্ষা আমাব আরও ভাল হইবে। আমি মাকে বলিলাম, "মা, আমার কিছু হবে না?" মা বলিলেন, "হবে বইকি, মা, হবে।"

একদিন মাকে ঠাকুরের পূজা করিবার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহাতে মা বলিলেন, "তোমরা সংসারী, ঠাকুবের পূজা পেরে উঠবে না।"

শ্রীশ্রীমাকে কোন কথা বলিলে তিনি বলিতেন, "তোমরা ঠাকুবকে ডাক, তিনি সব কববেন। চাঁদামামা সকলের মামা।"

একদিন আমাব মা ও আমি শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে যাইতেছি। সুধীরা দিদি মাকে দর্শন করিয়া ফিরিতেছিলেন; পথে তাঁহার সহিত আমাদের দেখা হইল। মায়ের নিকট সুধীরা দিদির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে মা বলিলেন, "ঐ এক মেয়ে। বে করলে না। কেমন নিজেব জোরের উপর রয়েছে, গাড়ি চড়ে বেড়াচ্ছে।"

আর একদিন মা ও আমি শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, "মা, অনেকক্ষণ আসবার জন্য চেষ্টা করছি, কিন্তু গাড়ির জন্য আসতে দেরি হলো।" মা বলিলেন, "ঠাকুরদর্শন করবে, কেন গাড়োয়ানকে পয়সা খাওয়াবে? পায়ে হেঁটে আসবে।"

আমার মা ও আমি একদিন দুপুরবেলা শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে গিয়াছি। গোলাপ-মা আমাদিগকে অসময়ে যাইতে দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন, "মাকে দর্শন করা তো নয়, মাকে বিরক্ত করা। এখন সকলের রান্না হয়ে গেছে। যদি আসবে, সকালে খবর দিতে

হয়। এখন তোমাদের না দিয়ে ওরা খায় কি করে?" গোলাপ-মা শ্রীশ্রীমাকেও বলিলেন, "তোমার যেমন হয়েছে—যে আসবে মা বলে, অমনি পা বাড়িয়ে দেবে!" মা বলিলেন, "কি করব, গোলাপ? মা বলে এলে আমি যে থাকতে পারিনে।"

আমার মার সঙ্গে আমি যখনই শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে যাইতাম, মার ঘরকন্নার কাজ সারিয়া যাইতে রোজই বেলা হইয়া পড়িত। শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি যাইবার আগেই ভয় হইত, পাছে গোলাপ-মার সামনে পড়ি। বেলায় যাইতাম বলিয়া তিনি বকিতেন। একদিন শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে বলিলেন, "কি করবে গা? ওরা সকল দিক সেরে তো আসবে।" মাকে প্রণাম করিয়া আমরা বিদায় লইতেছি; মা বলিলেন, 'অমনি যাবে।' আমরা বলিলাম, "বাড়িতে ভাত রান্না আছে, আপনাকে দর্শন করে চলে যাব।" মায়ের ইচ্ছা আমাদেব প্রসাদ খাওয়ান। শেষে বলিলেন, "আচ্ছা, মা, এস; গোলাপ আবার রাগ করে।" নারিকেলের মালায় করিয়া আমাদের একটু অন্ন প্রসাদ দিলেন। তাহা লইয়া আমরা বাটী ফিরিলাম।

শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্মে দিবার মানসে আমার মা ও আমি একদিন ফুল বিল্বপত্র ও তুলসী লইযা মায়েব বাটীতে যাই। গোলাপ-মা তো আমাদের দেখিয়াই রাগিয়া উঠিলেন। আমরা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। পরে মাকে বলিলাম, "মা, এই ফুল এনেছি আপনার পায়ে দেব বলে।" মা বলিলেন, 'দাও।' আমি বলিলাম, "মা, জল কোথা পাব?" মা বলিলেন, "ঐ যে, নাও না।" জল লইয়া সামান্যভাবে শ্রীশ্রীমায়ের পায়ে একটু দিয়া ফুল বিল্বপত্র ইত্যাদি দিতে যাইতেছি, এমন সময় মা বলিলেন, "তুলসি-বিল্বপত্র দিও না, শুধু ফুল দাও।" শুধু ফুল মায়ের পায়ে দেওযা হইয়া গেলে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, এ ফুল কি করব?" মা বলিলেন, 'নিয়ে যাও।'

কোন ভক্তদ্বারা আমার পূর্বেকার জপকরা হরিনামের একছড়া মালা ও একছড়া নতুন রুদ্রাক্ষের মালা শ্রীশ্রীমায়ের নিকট পাঠাইয়াছিলাম। মা নতুন মালাটি নিজ হাতে জপ করিয়া দিয়াছিলেন। পুরাতন মালাটি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "ও পুরান মালা।" কিন্তু ভক্তটি বলাতে উহাও জপ করিয়া দিয়াছিলেন। তারপর যখন মায়ের নিকট যাই তখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "রুদ্রাক্ষের মালা কি বলে জপ করব?" মা বলিয়া দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হরিনামের মালাটিও কি ঐ বলে জপ করব?" মা বলিলেন, "ও তো হরিনামের মালা।" হরিনামের মালা জপ করিতে দেরি হয়। মা রুদ্রাক্ষের মালায় যে মন্ত্র জপ করিতে বলিলেন, সেই মন্ত্র জপ করিলে জপ তাড়াতাড়ি হইবে, ইহা মনে করিয়া আমি মাকে আবার হরিনামের মালাজপের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। মা তাহা অন্তরে জানিতে পারিয়া বলিলেন, "তাই করো; শিগ্‌গির হবে।"

শ্রীশ্রীমাকে লালপেড়ে শাড়িকাপড় দিবার জন্য সেজদিদি এক রাত্রে স্বপ্ন পান। সেজন্য তিনি একখানি লালপেড়ে শাড়িকাপড় কিনিয়া শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে যান। আমিও তাঁহার সহিত গিয়াছিলাম। সেজদিদি মাকে প্রণাম করিয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিলেন ও

কাপড়খানি মায়ের পদতলে রাখিলেন। মা একটু হাসিয়া কাপড়খানি হাতে করিয়া লইলেন এবং পরিলেন। অল্পক্ষণ পরে কাপড়খানি ছাড়িয়া বলিলেন, "কি করে পরব, মা ? লোকে বলবে, 'পরমহংসের স্ত্রী লালপেড়ে কাপড় পড়েছে!' থাক্, এনেছ, ঐ কাপড় পরে নাইতে যাব।" মা শীঘ্রই উড়িষ্যা যাইবেন শুনিয়া আমরা সেদিন চলিয়া আসিলাম।

তারপর তিনি যখন ফিরিয়া আসিলেন, আমি ও সেজদিদি তাঁহার শ্রীচরণদর্শন করিতে বাগবাজারে গেলাম। পুরীর কথা অনেক হইল। তারপর মা সেই কাপড় পরিয়াছিলেন কি না, সেজদিদি মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মা বলিলেন, " হাঁ মা, পরেছিলাম, দিনকতক পরার পর একজনকে দিয়ে দিয়েছি।"

আর একবার সেজদিদি ও আমি শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। মায়ের সহিত অনেক প্রকার কথা হইতেছে। আমরা মাকে বলিলাম, "মা, আমাদের কি হবে ?" মা বলিলেন, 'ঠাকুরকে ডাক '' সেজদিদি বলিলেন, "আমরা তো ঠাকুরকে দেখিনি, আমরা আপনাকে জানি।" মা বলিলেন, "তোমরা কি আমায় ডুবে মরতে বল ? যেমন, একজন 'জয় গুরু' বলে গুরুনামে বিশ্বাস করে নদী পার হয়ে গেল! গুরু তা দেখলেন। দেখে ভাবলেন, 'আমার নামের এত জোর!' তিনি 'আমি, আমি' করে জলে নামলেন, পরে ডুবে মরলেন।"

—**শ্রীমতী শৈলবালা চৌধুরী, বসিরহাট**

(৮)

একদিন আমার পুত্র হরিচরণকে লইয়া শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে যাই। তখন হরিচরণের মাথা খারাপ হইয়াছে। মায়ের কাছে গিয়া সে নানাপ্রকার এলোমেলো কথা কহিতেছে—যেমন, "ক্ষিদে পেয়েছে, খেতে দে" ইত্যাদি। মা প্রসাদ দিলেন। সে খাইতে খাইতে উচ্ছিষ্ট প্রসাদ এদিক-ওদিক ছড়াইতে লাগিল। আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "ঠাকুরবাড়ি, এঁটো ছড়াচ্ছে।" মা অমনি স্নেহভরে বলিলেন, "থাক, ওর খাওয়া হলে তুমি এঁটো পেড়ে দিও।"

আমি মাকে বলিলাম, "মা, ওর কি হয়েছে—বামুন দেখলে প্রণাম করে, গরু দেখলে প্রণাম করে!" মা বলিলেন, "জীবে দয়া হয়েছে।"

এক কোজাগরী পূর্ণিমার দিন মায়ের পাদপদ্মে ফুল দিবার মানসে উপবাস করিয়া হরিচরণ ও আমি 'উদ্বোধনের' বাটীতে যাই। মায়ের পায়ে ফুল দিয়া আমরা প্রণাম করিলাম। মা হরিচরণকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মীশ্রী হোক, দীর্ঘায়ু হও।"

শ্রীশ্রীমা আমাকে বলিলেন, "সকলকে দেখলে আমি শান্তি পাই ; তোমার মুখের গ্রাস উপযুক্ত ছেলে চলে গেছে, তোমাকে দেখলে বড় কষ্ট হয়।"

একদিন মাকে বলিলাম, "মা, ঠাকুরের পাদপদ্মে যেন ভক্তি হয়।" মা বলিলেন, "ভক্তি করতে করতে হবে।" যেদিন আমি সকালে মায়ের ওখানে যাইতাম, মা রাধুর খাওয়ার পর ঠাকুরের ভোগের আগেই আমাকে ভাত খাওয়াইতেন। বলিতেন, "পুত্রশোকে তোমার বুক শুকিয়ে গেছে, তুমি আগে খাও।" আমি বলিলাম, "একে অন্নের কষ্ট, আবার ঠাকুরের ভোগের আগেই খাব?" মা বলিলেন, "তুমি কখনো অন্নের কষ্ট পাবে না।"

একদিন মা বলিলেন, "তোমার ছেলে কি-না দেখবার জন্য আমি অনেক পাগলকে ডেকে দেখেছি। আমি বলছি, তোমার ছেলে বেঁচে আছে। শরৎও (শরৎ মহারাজ) বলেছে, বেঁচে আছে।"

আমার ছেলে ফিরিয়া আসিবে কি-না মাকে জিজ্ঞাসা করায় মা বলিলেন, 'আসবে।' তারপর মা ঠাকুরের ছবির সম্মুখে আগ তুলিলেন। কতকগুলি কাঠির উপর অনেকগুলি কাপড়ের ফালি বেশ শক্ত করিয়া জড়াইলেন। সেটি ঠাকুরের সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, "ওর ছেলে আসবে কি-না যদি সত্যি করে না বল, তোমার ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা ও গোহত্যার পাপ লাগবে।" ইতিমধ্যে কাপড়ের ফালির মধ্যস্থিত কাঠিগুলি আল্‌গা হইয়া উপরে উঠিয়াছিল এবং মা উহা ধরিতেই ঝরিয়া পড়িয়া গেল। মা বলিলেন, "এই দেখলে, মা, আগ তোলা হলো। তোমার ছেলে আসবে। তুমিও বাড়িতে নিজে করে দেখ।" আমিও মায়ের কথামত বাড়িতে আসিয়া ঐরূপ আগ তুলিলাম। তাহাতেও ঐরূপ ফল হইল।

আমার মাকে সঙ্গে লইয়া একদিন শ্রীশ্রীমায়ের জন্য একখানি কাপড় লইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে যাই। একটি লোককে ঐ কাপড় কিনিতে দিয়াছিলাম, কিন্তু সে ভাল কাপড় আনিতে পারে নাই। কাপড়খানি মাকে দিয়া আমি বলিলাম, "মা, এ কাপড়খানি ভাল নয়, আমার পছন্দ হয় নাই।" মা তৎক্ষণাৎ নিজের কাপড় ছাড়িয়া আগ্রহ করিয়া ঐ কাপড়খানি পরিলেন ও বলিলেন, "দেখ, আমি তোমার কাপড় পরলাম। দুঃখ করো না। আমি এই কাপড়খানা পরে গঙ্গাস্নান করব।"

একদিন বলরামবাবুর বাড়িতে আমি তাঁহাকে দর্শন করিতে যাই। সেই সময় একজন লোক মায়েব নিকট টাকা রাখিয়া বলিল, "মা, অমুকের অসুখ, যাতে সে ভাল হয় তাই করবেন।" মা বলিলেন, "টাকা নিয়ে যাও, জন্মালেই মৃত্যু আছে। আমি কি করব?" কিছুদিন পরে শুনা গেল ঐ লোকটি মারা গিয়াছে।

শ্রীমতী—

(৯)

আমি একদিন মাকে বলিয়াছিলাম, "মা, ঠাকুরকে আমি যেদিন প্রথম দর্শন করি, তাঁর দেহ থেকে একটা জ্যোতি বেরুচ্ছিল। কাচের উপর রোদ পড়লে যেমন আভা বেরোয়

তেমনি।" ইহা শুনিয়া মা বলিলেন, "মা, তুমি ঠিক দেখেছ। আমি যখন তাঁকে তেল মাখাতুম, মাঝে মাঝে ঐরূপ জ্যোতি দেখতে পেতুম।"

একদিন তাঁহার ভাইঝি নলিনী রাগ করিয়া সমস্ত দিন উপবাসী ছিল। মায়ের অনেক চেষ্টাতে কোন ফল হয় নাই। শেষে মা তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমাকে তোমার পিসিমা মনে করো না। আমি মনে করলে এক্ষুণি এ দেহ ছেড়ে দিতে পারি।"

ঠাকুরের কথাপ্রসঙ্গে মা একদিন নিজের বুকে হাত রাখিয়া ললিতকে (কমলেশ্বরানন্দকে) বলিয়াছিলেন, "আমি যদি ঠাকুরের কাছে যাই তোমরাও নিশ্চয় যাবে।"

শ্রীমতী—

(১০)

উদ্বোধন

আমি তখন কলিকাতার ১৭নং বোসপাড়া লেনে সিস্টার নিবেদিতার স্কুলে পড়ি। একদিন স্কুলের ছুটির পর সুধীরা দিদি আমাদের চার-পাঁচ জনকে সঙ্গে লইয়া মায়ের বাড়িতে উপস্থিত হইলেন। মা ঠাকুরঘরে আসনে বসিয়া আছেন। কুসুমদিদি একখানি বই পড়িতেছেন। আমরা প্রণাম করিলে মা বলিলেন, 'বস মা।' সুধীরা দিদিকে বলিলেন, "ভাল আছ, মা? স্কুলের এই ছুটি হলো? এই মেয়েরা তোমার কাছে পড়ে?"

সুধীরা দিদি—হাঁ মা, এরা আমাদের কাছে পড়ে।

মা—মেয়েগুলি বেশ। (আমাকে লক্ষ্য করিয়া) এটি কাদের মেয়ে? বেশ মেয়েটি।

সুধীরা—এটি বামুনের মেয়ে, কাছেই বাড়ি।

এই সব কথার পর মা বলিলেন, "কুসুম পড়, এরা শুনবে।" পড়া আরম্ভ হইল। বইখানি বোধ হয় 'কৃষ্ণচরিত' ছিল। কৃষ্ণের দই, দুধ কাড়িয়া খাওয়ার বর্ণনা শুনিয়া মা এবং অপর সকলেই খুব হাসিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন, "কি দুষ্ট ছেলে!" একটু পরেই আমাদের গাড়ি আসিল। মা বলিলেন, "তোমরা এখনই যাবে? একটু বসলে হতো না?" সুধীরা দিদির উত্তর শুনিয়া বলিলেন, "তবে সকাল করে এস মা।" প্রসাদ গ্রহণান্তে আমরা মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম। মা বলিলেন, "এস মা, আবার এস।"

আর একদিন বৈকালে সুধীরা দিদি আমাকে লইয়া মায়ের বাড়ি গেলেন। মা তক্তপোশের উপর একখানি মাদুর পাতিয়া শুইয়া আছেন। আমাদের দেখিয়া বলিলেন, 'বস, মা।' আমরা প্রণাম করিয়া বসিলাম।

মা—তোমাদের স্কুলের ছুটি হলো? কটা বেজেছে?

সুধীরা দিদি—আজ আমাদের সকাল সকাল ছুটি হয়েছে, এখন সাড়ে-তিনটে বেজেছে। তাই এদেব নিয়ে এলুম।

মা—তা বেশ করেছ।

পরে একটি মেয়ের কথা উঠিল। মা বলিলেন, "দেখ না, মা, শ্বশুরঘর করবে না, আমার কাছে এসেছে। জামাই কালো বলে মনে ধরেনি। কালো বলে কি তুই তাকে নিবি নে? সে তোর স্বামী। এ সব কি রকম মেয়ে মা, তা জানি নে। আবার শুনি তার স্বভাব খারাপ; সেইজন্যেও যেতে চায় না। তাহলেই বা, তোকে তো অযত্ন করেনি। স্বামী তো বটে। কি জানি মা, এ সব মেয়ে কি রকম! লোকে শুনলে ভাববে কি? যা মন চায় করুকগে।" ইহা বলিয়া তিনি কাপড় কাচিতে গেলেন। বিদায় লইবার সময় আমবা প্রণাম কবিয়া বলিলাম, 'যাই, মা।' মা বলিলেন, "'যাই' বলতে নেই, 'আসি' বলতে হয়। সময় পেলেই আবার এসো, মা।"

এক শনিবারে সুধীরা দিদি আমাদেব কজনকে লইযা দক্ষিণেশ্বব হইতে ফিবিবাব পথে মাযেব বাড়িতে আসিলেন। মা তক্তপোশেব উপব শুইয়া আছেন। আমাদের দেখিয়া যোগেন-মা বলিলেন, "এত রাত্রে তোমবা কোথা থেকে?" মা জিজ্ঞাসা কবিলেন, 'কে এসেছে?' যোগেন-মা বলিলেন, 'সুধীরা এসেছে।' মা শুনিযা উঠিযা বসিলেন। আমরা সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিলাম।

মা—এত রাত্রে কোথা থেকে এলে?

সুধীরা দিদি—আজ এদের নিয়ে দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিলুম, আরতি দেখে ফিরতে রাত হয়ে গেল। মনে করলুম, এত কাছে এসে চলে যাব? তাই এখানে একবার এলুম।

মা 'বেশ কবেছ' বলিয়া আবাব শুইলেন। সুধীবা দিদি তাঁহার পায়ে হাত বুলাইযা দিতে লাগিলেন। আমি কাছে দাঁড়াইয়া বাতাস কবিতে লাগিলাম। সুধীরা দিদি মায়ের কাছে দক্ষিণেশ্বরের গল্প করিতে লাগিলেন।

মা—তোমরা নবত দেখেছ তো? আমি ঐ নবতের নিচের ঘরে থাকতুম। সিঁড়ির নিচে রান্না কবতুম।

সুধীরা দিদি—হাঁ, মা, দেখে এলুম। এখনো সামনের দিকে দরমা দিয়ে ঘেরা সিঁড়ির নিচে একটা উনুন রয়েছে; আর মেছুনীদের ঝুড়িগুলি আপনার সেই বারান্দায় বসানো রয়েছে। আমি মেয়েদের আপনার কথা বলছিলুম—আপনি কি ভাবে ঐ ঘরে ছিলেন। আচ্ছা, মা, আপনি কি করে ঐ ঘরে থাকতেন? কোন কষ্ট হতো না?

মা—শৌচের আর নাওযার জন্যই যা কষ্ট হতো। বেগধারণ করে করে শেষে পেটের রোগ ধবে গিয়েছিল। আর ঐ মেছুনীরা ছিল আমাব সঙ্গী। তারা গঙ্গা নাইতে এসে ঐ বারান্দায় চুবড়ি রেখে সব নাইতে নাবত; আমার সঙ্গে কত গল্প করত। আবার যাবার সময় চুবড়িগুলি নিয়ে যেত। রাতে জেলেরা সব মাছ ধরত আর গান গাইত, শুনতুম। ঠাকুরের

কাছে কত ভক্ত আসত, গানকীর্তন হতো, তাই শুনতুম আর ভাবতুম—আমি যদি ঐ ভক্তদের মতো একজন হতুম তো বেশ ঠাকুরের কাছে থাকতে পেতুম, কত কথা শুনতুম। ঐ যোগেন, গোলাপ সব জানে। ওরা আমার কাছে যেত, আর কখন কখনও থাকত।

মা যোগেন-মার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "কি আনন্দই তখন ছিল, যোগেন!" বলিয়া যেন একটু অন্যমনস্ক হইয়া রহিলেন।

যোগেন-মা বলিলেন, "সে যে কি আনন্দ তা কি মুখে বলা যায় গো? মনে করলে আজও প্রাণ কি রকম করে ওঠে!"

এইবার মা আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "রাত হয়ে গেল, বাড়িতে বকুনি খাবে না?"

সুধীরা দিদি—তা আজ একটু বকুনি খাবে। ওদের বাড়ির লোকেরা এখানকার উপর ভারী চটা। যদি শোনে যে এখানে এসেছে, তাহলে মাথা আর রাখবে না।

মা—তাই তো, মা, বাছারা কত বকুনি খাবে! কত রকমের লোক আছে তার কি ঠিক আছে? যারা সমাজ নিয়ে চলে, তাদের কেবলই ভয়। তোমরা এস, মা। আহা, কত বকবে!

সুধীরা দিদি—এইটুকু যদি সহ্য না করতে পারে তাহলে ওরা করবে কি? আপনার আশীর্বাদে ওদের ভয় থাকবে না।

মা—ঠাকুরের কৃপায় সব সোজা হয়ে যাবে। যদি বকে, কোন কথাটি বলো না। সংসারে কতরকম লোক থাকে। সব সহ্য করে থাকতে হয়। ঠাকুর বলতেন, 'শ, ষ, স—তিনটে স। যে সয় সেই রয়।'

আমাদের জন্য ঠাকুরের কাছে হাতজোড় করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর রক্ষা কর।" আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম। ছুটির ভেতর একদিন দুপুরবেলায় সুধীরা দিদি এবং আমরা তিনজন মায়ের বাড়ি গিয়াছি। মা আমাদের দেখিয়া বলিলেন, "ঠাকুরঘরে বস। আমি ভোগ দিয়া আসি।" কিছুক্ষণ পরে মা ফিরিয়া আসিলে আমরা প্রণাম করিলাম। মা আমাদের কুশলপ্রশ্নের পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেদিন বাড়িতে বকেছিল?" আমরা বলিলাম, "বেশি খাইনি। সে আমাদের গায়েও লাগেনি!"

আহারান্তে মা সুধীরা দিদিকে হাতেমাখা প্রসাদ দিলেন। আমাদের মধ্যে দুইজন বিধবা। তাহারা সেই প্রসাদ খাইতে একটু ইতস্ততঃ করাতে মা বলিলেন, "প্রসাদে দোষ নেই, তোমরা খাও, মা।"

তারপর মা একটু শুইলেন এবং আমাদের মেজেয় মাদুর পাতিয়া শুইতে বলিলেন। বৈকালে মা ঠাকুর তুলিয়া আমাদের প্রসাদ দিলেন এবং বারান্দায় বসিয়া সুধীরা দিদির সঙ্গে কথা বলিতে লাগিলেন। একটি বউ একখানি কার্পেটের তৈয়ারি গোপালের ছবি মায়ের হাতে দিয়া প্রণাম করিয়া বসিল। সেখানি দেখিয়া মা বলিলেন, "বউমা, তুমি এখানি করেছ?"

বউ বলিল, 'হ্যাঁ, মা।' মা বলিলেন, "আহা, বেশ হয়েছে। কি সুন্দর মুখের ভাব! কেমন করেছে দেখ।" বলিয়া আমাদের সকলকে দেখাইতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "বেশ হয়েছে, না?" আমরা বলিলাম, 'হাঁ।' তিনি সেখানি আবার দেখিয়া মাথায় স্পর্শ করিয়া তুলিয়া রাখিতে বলিলেন এবং পরে বউটির বাড়ির কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে প্রসাদ দেওয়াইলেন।

গোলাপ-মা আসিতেই মা তাঁহাকে ছবিখানি দেখাইয়া বলিলেন, "কেমন সুন্দর হয়েছে দেখ!" সেই বউকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই বউমা করেছে।" গোলাপ-মা সেখানি দেখিয়া বলিলেন, "সবই বেশ ভাল হয়েছে, কেবল বাঁ হাতটা একটু মোটা হয়েছে।" আমরা হাসিতে লাগিলাম। মাও হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "গোলাপ এসে খুঁত বার করলে। ওদের পছন্দ আলাদা, মা। গোলাপ অনেক দেখেছে শুনেছে কি-না, তাই পছন্দ হয় না। গোলাপের কাজ বড় পরিষ্কার; আবার অনেক রকম কাজ জানে। ঠাকুরের যত সব জিনিস, সব গোলাপের তৈরি। আবার ভক্তদের মশারি, বালিশ, তার ওয়াড়, সব গোলাপ করে। শরীরে একটুও আলস্য নেই।"

সন্ধ্যার একটু আগে বউটি মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছে। মা বলিলেন, "আবার এস, মা।"

যোগেন-মা আসিয়া মাকে প্রণাম করিয়া বসিলেন। অন্যান্য কথার পর মা তাঁহাকেও সেই ছবিখানি দেখাইয়া বলিলেন, "কেমন করেছে দেখ! কি সুন্দর মুখের ভাব!" যোগেন-মা বলিলেন, "বেশ তো করেছে! কে করেছে? বড় চমৎকার হয়েছে তো!" মা সেই বউয়ের পরিচয় দিয়া বলিলেন, "গোলাপ বলেছে বাঁ হাতটা মোটা হয়েছে।" যোগেন-মা বলিলেন, "ওর কথা ছেড়ে দাও।"

সন্ধ্যা হইলে মা ঠাকুর প্রণাম করিয়া, "হরিবোল, হরিবোল, গুরুদেব, গুরু ভরসা" এইসব বলিয়া গঙ্গার দিকে ফিরিয়া প্রণাম করিলেন। মা ঘরে আসন পাতিয়া বসিলেন ও একটু গঙ্গাজল লইয়া জপ করিতে বসিলেন। আরতি আরম্ভ হইল। যোগেন-মা ঠাকুরের আরতির সঙ্গে মাকেও আরতি করিতে লাগিলেন। একঘর লোক বসিয়া জপ করিতেছে। কি চমৎকার দৃশ্য!

অক্ষয় তৃতীয়ার দিন আমার সঙ্গীদের মধ্যে দুইজনের দীক্ষা হইয়া গেল। আমার ভাগ্যে সেদিন আর হইল না, কারণ আমি কলিকাতায় ছিলাম না। ইহার কিছু পরে একদিন বিকালে আমি সুধীরা দিদির সহিত মায়ের বাড়ি যাইলাম। মায়ের দেশে যাইবার কথা ছিল, কিন্তু যাওয়া হয় নাই। আমরা প্রণাম করিয়া বসিতেই মা বলিলেন, 'এস মা।' সুধীরা দিদির প্রশ্নের উত্তরে মা অন্য কথার পর বলিলেন, "ছোট বউয়ের মাথাটা বড় গরম হয়েছে। ও দেশে গেলেই ভাল থাকে। আর রাধুর বিয়ে। এই সবের জন্য আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে হচ্ছে। সেই দিনই যাওয়ার সব ঠিক ছিল। কিন্তু দিনটা তত ভাল নয় বলে পেছিয়ে গেল।"

আরতির পর মা একটু শুইলেন। সুধীরা দিদি তাঁহার পা টিপিয়া দিতে লাগিলেন। মা বলিলেন, "একটু জোরে জোরে দাও, মা। কাল পূর্ণিমা কি-না, তাই পায়ের বাতটা বেড়েছে। দেখ না, এই বাতটা এমন আশ্রয় করেছে যে যাবার নাম নেই। কত দিন হয়ে গেল তার ঠিক আছে কি? যখন দক্ষিণেশ্বরে থাকি তখন থেকে হয়েছে।"

পা টিপিয়া দিতে মা একটু ঘুমাইয়া পড়িলেন। আমাদের গাড়ি আসিতেই আমরা ঠাকুর প্রণাম করিয়া বাহির হইতেছি, এমন সময় মা উঠিয়া বলিলেন, "তোমরা যাচ্ছ? আবার এস।" যোগেন-মা আমার মন্ত্র লইবার কথা মাকে বলায় তিনি বলিলেন, 'কাল সকালে এসো।'

পরদিন সকালে মায়ের বাড়ি গিয়া দেখি, মা ঠাকুরপূজা শেষ করিয়া গঙ্গাস্নানে যাইবার যোগাড় করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "এস মা, তাড়াতাড়ি, তোমাকে মন্ত্র দিয়ে আমি নাইতে যাব।" মন্ত্র দেওয়া শেষ হইলে মা বলিলেন, "ঐ ফুলগুলি আমার পায়ে দাও।" আমি ভাবিতেছি, কি বলিয়া দিব। মা তখন ফুলগুলি আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "'আমার যা কিছু সব তোমায় দিলুম' বলে ফুলগুলি আমার পায়ে দাও।" আমি ঐরূপ করিতে তিনি ঠাকুরকে দেখাইয়া বলিলেন, "ইনিই তোমার সর্বস্ব। এঁকে ডেকো, তাহলেই তোমার সব হবে।"

মায়ের আদেশে তাঁহার পায়ে আমি তেল মাখাইয়া দিলাম। স্নানাদির পর সুধীরা দিদি আমাদের যাওয়ার কথা বলিলেন। মা বলিলেন, "তোমরা এখনই যাবে কি, মা? প্রসাদ পেয়ে বিকালে যেও।" যোগেন-মা উপরে আসিতেই মা তাঁহাকে বলিলেন, "এরা বাড়ি যেতে চাচ্ছে।" যোগেন-মা বলিলেন, "এখুনি যাবে কি। মন্ত্র নিয়ে প্রসাদ পেয়ে যাবে। আমি ওদের খাবার কথা বামুনকে বলে এলুম।" মা বলিলেন, "আমিও বলেছি বিকালে যেতে।"

যোগেন-মা বাড়ি যাইবেন, মাকে প্রণাম করিলেন। মা তাঁহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "বড় বেলা হয়েছে। এখানে খেলে হতো না? আবার গিয়ে রান্না করে খেতে কষ্ট হবে।"

যোগেন-মা বলিলেন, "না, মা। মা রয়েছেন, আর তিনি সব যোগাড় করে রেখেছেন। আমি খালি একটু রাঁধব।" মা বলিলেন, "আর বেলা করো না, মা, এস গিয়ে। বড় রোদ ফুটেছে, অতটা রাস্তা যেতে হবে।"

তারপর ললিতবাবুর স্ত্রী আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন। সম্প্রতি তাঁহার মেয়েটি মারা গিয়াছে, সেজন্য বড় কাতর আছেন। মা তাঁহাকে নানাপ্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন। বলিলেন, "আহা, মা, তিনটিই গেল! একটিও কি থাকতে নেই? আবার ললিতটির কি রকম অসুখ! ঠাকুরের কৃপায় ভাল হলে হয় মা। ললিতটি বেঁচে থাকে, তবু সান্ত্বনা।" মা তাঁহাকে প্রসাদ দিয়া বলিলেন, "খাও মা, কি রোগাই হয়ে গেছ! শরীরে আর কিছু নেই।"

বিদায় লইবার সময় সুধীরা দিদি মাকে বলিলেন, "আবার কতদিনে আপনাকে দেখব?" মা বলিলেন, "আমি শীঘ্রই ফিরব। তুমি রাধুর বিয়েতে যেও না।" সুধীরা দিদি কিছু না বলিয়া বলিলেন, "আজ আসি, মা।" মা আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "আমি এলে আবার এসো।'

মা দেশ হইতে ফিরিলে আমি ও সুধীরা দিদি একদিন বিকালে মায়ের বাড়ি গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিলাম। সুধীরা দিদি বলিলেন, "মা, আপনি বড় কালো ও রোগা হয়ে গেছেন।" মা বলিলেন, "আমাদের দেশটা মেঠো দেশ কি-না, তাই রং কালো হয়ে যায়। আর খাটুনিও পড়েছিল।"

সিস্টার নিবেদিতা আসিয়া মাকে প্রণাম করিয়া বসিলেন। মা তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া একখানি ছোট পশমের তৈয়ারি পাখা তাঁহাকে দিয়া বলিলেন, "আমি এখানি তোমার জন্য করেছি।" সিস্টার উহা পাইয়া আনন্দে একবার মাথায় রাখেন, একবার বুকে ঠেকান, আর বলেন, "কি সুন্দর, কি চমৎকার।" আবার আমাদের দেখান এবং বলেন, "কি সুন্দর মা করেছেন দেখ!" মা বলিলেন, "কি একটা সামান্য জিনিস পেয়ে ওর আহ্লাদ দেখেছ! আহা, কি সরল বিশ্বাস! যেন সাক্ষাৎ দেবী। নরেনকে (স্বামীজী) কি ভক্তিই করে! সে এই দেশে জন্মেছে বলে সর্বস্ব ছেড়ে এসে প্রাণ দিয়ে তার কার্জ করছে। কি গুরুভক্তি! এদেশের উপরই বা কি ভালবাসা!"

সিস্টার দার্জিলিং যাইবেন, সে কথা মাকে বলিতেছেন। রাধু আসিলে মা তাহাকে বলিলেন, "দিদিদের প্রণাম কর, রাধু।" সুধীরা দিদি বলিলেন, "না, না , থাক। ও আবার আমাদের নমস্কার করবে কি?" মা বলিলেন, "তোমরা দিদি, তোমাদের নমস্কার করবে না?" একটি ব্রহ্মচারী আসিয়া ভক্তদের মাকে প্রণাম করিবার কথা বলিয়া গেলেন। "তাদের আসতে বল" বলিয়া মা একখানি চাদর ঢাকা দিয়া বসিলেন। যথাসময়ে আমরা মায়ের আশীর্বাদ লইয়া বাড়ি ফিরিলাম।

একদিন সিস্টার আমাদের বলিলেন, "মাতাদেবী আজ আমাদের স্কুলে আসবেন। তোমরা সকলে খুব আনন্দ কর।" সকালের পরিবর্তে চারটার সময় মায়ের গাড়ি আসিল। সঙ্গে রাধু, গোলাপ-মা প্রভৃতি। মা গাড়ি হইতে নামিতেই সিস্টার তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া ঠাকুর-দালানে বসাইলেন। মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য আমাদের হাতে ফুল দিলেন। মেয়েরা পুষ্পাঞ্জলি দিয়া উঠানে দাঁড়াইলে সিস্টার একে একে সকলের পরিচয় দিলেন। মা মেয়েদের একটু গান গাহিতে বলিলেন। মেয়েরা গান গাহিল এবং একটি কবিতা পড়িল। শুনিয়া মা বলিলেন, 'বেশ পদ্যটি।' তারপর মিষ্টি প্রসাদ করিয়া দিয়া আমাদের দিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ পরে সিস্টার মাকে লইয়া সমস্ত ঘর এবং মেয়েদের হাতের কাজ প্রভৃতি দেখাইতে লাগিলেন। মা দেখেন আর আনন্দ করেন এবং

বলেন, "বেশ তো শিখেছে মেয়েরা!" পরে সিস্টার বিশ্রামের জন্য মাকে নিজের ঘরে লইয়া গেলেন।

যেবার সিস্টার নিবেদিতার দেহত্যাগ হয়, সেবার সুধীরা দিদির খুব অসুখ হয়। তাঁহার জন্য মায়েব কি ভাবনা! বলেন, "ও ঠাকুর, সুধীরা যাবে কি? তার যে কত কাজ বাকি।" বলেন আর কাঁদেন।

শ্যামপুকুরের পিসিমাকে মা বলিলেন, "তুমি একবার সুধীরার খবরটা এনে দিতে পার, মা? আহা, তার বড় অসুখ।" তিনি স্বীকৃতা হইলে মা তাঁহার হাতে ঠাকুরের চরণামৃত, বেদানা ইত্যাদি দিয়া বলিলেন, "এগুলি তাকে দিও; আর খবরটা আমাকে এনে দেবে, কেমন আছে। আমি ঠাকুরের কাছে তার জন্য তুলসী দিচ্ছি।"

সুধীরা দিদি আরোগ্যলাভ করিলে তিনি, আমি ও সিস্টার কৃষ্টিন একদিন সন্ধ্যার সময় মায়ের বাড়ি যাইলাম। আরতির পর আমরা প্রণাম করিয়া বসিতেই মা সুধীরা দিদিকে বলিলেন, 'সেরেছ, মা?' সুধীরা দিদি বলিলেন যে অনেকটা সারিয়াছেন, তবে সাবধানে আছেন। মা বলিলেন, "তোমার জন্য বড় ভাবনা হয়েছিল। যা হোক, ঠাকুরের কৃপায় সেরেছ, মা। এই নিবেদিতাটি গেল, আবার তোমার অসুখ— শুনে ভাবি, সুধীরা গেলে স্কুল চালাবে কে? (সিস্টার কৃষ্টিনকে লক্ষ্য করিয়া) আহা দুটিতে একসঙ্গে ছিল, এখন একলা থাকতে কত কষ্ট হবে! আমাদেরই তাঁর জন্য প্রাণ কেমন করে, তোমার তো আরও বেশি হবে, মা। কি লোকই ছিল। তাব জন্য আজ কত লোক কাঁদছে।" বলিয়া মা কাঁদিতে লাগিলেন। পবে মা সিস্টার কৃষ্টিনকে স্কুল সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

সুধীবা দিদি বায়ু পরিবর্তনের জন্য আমাকে সঙ্গে লইয়া কাশী যাইবেন বলায় মা ঐসম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "শীঘ্র শীঘ্র যেও; শরীরটা সারাতে হবে তো?"

ইহার বহুদিন পর একদিন মায়ের চরণদর্শনে যাইতেছি। সঙ্গে—ডাক্তারের স্ত্রী। এবারে সুধীবা দিদি সঙ্গে না থাকায় আমার বিশেষ ভয় হইতেছিল, মা যদি আমায় চিনিতে না পারেন। আমরা ঠাকুরঘরে গিয়া দেখি, মা পূজা করিয়া উঠিয়াছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "কি মা, এসেছ? অনেকদিন আসনি যে? তোমার জন্য কত ভাবছি। কোথায় আছ?" আমি প্রণাম করিতেই মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া সুধীরা দিদির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, "তিনি কলকাতায় এসেছেন, আমি তাঁর সঙ্গে এসেছি।" মা আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া আমার প্রাণটা আনন্দে ভরিয়া গেল।

সেদিন বলরামবাবুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ ছিল, সকলেই যাইবেন। রাধুর শরীর ভাল নাই। সেজন্য মা বলিলেন, "এ তো যাবে না, রাধু আর এ থাকবে এখন।"

মাকে লইতে গাড়ি আসিয়াছে। যাইবার সময় মা আমাদের বলিয়া গেলেন, "তোমরা দুজনে খেলা কর। আমি শিগ্‌গির আসব।" আবার রাধুকে বলিলেন, "দিদির সঙ্গে খেলা কর মা, কেমন? আমি আসি।"

চারটার পর মা ফিরিয়া আসিলেন। আমাদেরও সেই গাড়িতে যাওয়া স্থির হইল। মা আমাকে তাড়াতাড়ি কতকটা প্রসাদ দিয়া বলিলেন, "আহা! মা, আমরা এলুম, আর তুমি চললে? কি করবে বল? ওদের সঙ্গে এসেছ, আবার ওদের সঙ্গে যেতে হবে তো? বউমাটি অনেকক্ষণ এসেছে।"

রাধু—কেন, দিদি থাকুক না।

মা—থাকবার কি জো আছে, মা?

রাধু—না, থাকুক। ওরা চলে যাক না।

মা—পাগল আর কি! ও থাকলে তাদের চলবে কেন? না, মা, তুমি তাড়াতাড়ি এস গিয়ে, নিচে ডাকাডাকি করছে।

আমি মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছি। মা আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "কতদিন যে তোমায় এমনি করে থাকতে হবে, মা, ঠাকুরই জানেন। আবার এসো, মা' বলিয়া সিঁড়ি পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে আসিলেন। সেদিন মায়ের কি করুণা অনুভব করিয়াছিলাম তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। "এটা কর, ওটা কর" বলিয়া কত আদেশই করিয়াছিলেন।

কাশী

পৌষমাসে বড়দিনের ছুটিতে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে থাকিবার ইচ্ছায় সুধীরা দিদি আমাদের কয়েকজনকে লইয়া কাশী গেলেন। মায়ের সহিত দেখা করিলে তিনি অন্যান্য কথার পর যোগেন-মার সংবাদ লইলেন ও বলিলেন, "আহা! মা, যোগেনটি আসতে পারলে না। যা অসুখ হয়েছিল! ঠাকুর ও মা রক্ষা করেছেন। যোগেনের জন্য বড় ভাবনা হয়েছিল।" কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর সুধীরা দিদি প্রভৃতি আমাদের থাকিবার জন্য যে বাড়ি ভাড়া হইয়াছে তাহা দেখিতে গেলেন।

মা একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। বাড়ি প্রায় নিস্তব্ধ। সকলেই বিশ্রাম করিতেছেন। এমন সময় বারান্দা হইতে একটি গান শোনা গেল—

"আমার মা কোথায় গেলে?
অনেকদিন দেখি নাই, মা, নে আমায় কোলে।
তুই গো কেমন জননী, সন্তানে হও এত পাষাণী।
দেখা দে মা, আর কাঁদাস নে তনয়া বলে।"

গানটি এত মৃদুস্বরে শোনা যাইতেছিল যে আমার মনে হইল, কে যেন খুব দূরে

কাঁদিতেছে। মা হঠাৎ উঠিয়া বলিলেন, "কে গান গাচ্ছে? চল তো মা, বারান্দায় গিয়ে দেখি।" গিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আমি অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। একটি মেয়ে এই গানটি গাহিতেছে এবং তাহার চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইতেছে। মা সেখানে বসিতেই সে মাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "মা, আমার অনেক দিনের আশা আজ পূর্ণ হলো। আজ আমার কি আনন্দ হচ্ছে বলতে পারছি না, মা।" মা তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

মেয়ে—আমি আপনার ভিখারিণী মেয়ে, মা।

মা—কোথায় থাক?

মেয়ে—অন্নপূর্ণার দরজায়, নয় দশাশ্বমেধঘাটে বেহারীবাবার মন্দিরের কাছে বসে থাকি।

মা—ভিক্ষাতে তোমার বেশ চলে তো?

মেয়ে—আপনার আশীর্বাদে বেশ চলে যায়। এ সবের জন্য কোন ভাবনা নেই। অন্নপূর্ণার দয়ায এখানে কেউ তো উপোস করে থাকে না, মা। কিসে একটু ভক্তি হয় তাই ভাবি, মা।

মা—তা হবে বইকি, মা; তুমি এমন স্থানে রয়েছ। এখানে বিশ্বনাথ, মা অন্নপূর্ণা সাক্ষাৎ বিবাজ করছেন; তাঁদের কৃপায় সব হয়ে যাবে।

মা তাহাকে আর একটি গান গাইতে বলিলেন। সে গাহিল—

"মা, আমাবে দয়া কবে
        শিশুব মতো কবে বাখ,
শৈশবেব সৌন্দর্য ছেড়ে
        বড হতে দিও নাক।
সুন্দব সবল প্রাণ,
        মান অপমান নাহি জ্ঞান,
হিংসা নিন্দা লজ্জা ঘৃণা,
        কিছুই সে জানে নাক।"

মা—আহা, কি চমৎকার গানটি।

মেয়ে—অনেকদিন ধরে আপনাকে দেখবার বড় সাধ ছিল। আপনি এখানে আছেন শুনে আসব ভাবি, কিন্তু ভয় করে পাছে কেউ কিছু বলে।

মা—কেউ কিছু বলবে না। তোমার যখন ইচ্ছা এসো।

মা তাহাকে প্রসাদ দিতে বলিলেন। সে প্রসাদ পাইয়া বিদায় লইতেছে। মা তাহাকে বলিলেন, "আবার এসো, মা।" পরে তিনি আমাদিগকে বলিলেন, "মেয়েটির বেশ ভক্তি আছে।"

কাশীতে যে কয়দিন ছিলাম, প্রত্যহ দুইবেলাই মায়ের কাছে যাইতাম। একদিন বৈকালে যাইয়া দেখি, মা অদ্বৈত আশ্রমে ভাগবত পাঠ শুনিতে যাইতেছেন। আমাদের দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আমরা মঠে ভাগবত শুনতে যাচ্ছি, কে একজন কথক পাঠ করবেন। তোমরা যাবে? চল না।" আমরা তাঁহার সঙ্গে গেলাম। দুই ঘণ্টা পর্যন্ত পাঠ হইল। পাঠ শেষ হইলে মা একটি টাকা দিয়া প্রণাম করিয়া আসিয়া কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "আহা, কি চমৎকার পাঠ। কথকটি বেশ বলেছেন।"

একদিন সন্ধ্যার পর সুধীরা দিদি ও আমি মায়ের কাছে বসিয়া আছি; মা বলিলেন, "যে একবার ঠাকুরকে ডেকেছে, তার আর ভয় নাই। ঠাকুরকে ডাকতে ডাকতে কৃপা হলে তবে প্রেমভক্তি হয়। এই প্রেমটা অতি গোপনীয় জিনিস, মা। ব্রজগোপীদের প্রেমভক্তি হয়েছিল। তারা এক কৃষ্ণকে ছাড়া আর কিছুই জানত না। নীলকণ্ঠের গানে আছে, 'ও প্রেমরত্নধন রাখতে হয় অতি যতনে'।" ইহা বলিয়া মা গানটি গাহিলেন। কি মিষ্ট গলায় মা এই গানটি গাহিয়াছিলেন তাহা আজ পর্যন্ত যেন কানে লাগিয়া আছে। গান শেষ হইলে মা বলিলেন, "আহা, নীলকণ্ঠের গান কি চমৎকার! ঠাকুর বড় ভালবাসতেন। ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন, নীলকণ্ঠ কখন কখনও তাঁর কাছে আসত ও গান গাইত। কি আনন্দেই ছিলাম! কত রকমের লোকই তাঁর কাছে আসত! দক্ষিণেশ্বরে যেন আনন্দের হাটবাজার বসে যেত!"

একদিন মায়ের বাড়ি গিয়াছি। মা বারান্দায় বসিয়া দুইজন স্ত্রীলোকের সহিত কথা কহিতেছিলেন। সেই ভিখারি মেয়েটি আসিয়া মাকে প্রণাম করিল। তাহার হাতে একটা পেয়ারা। উহা মাকে দিয়া বলিল, "মা, এটি আজ ভিক্ষায় পেয়েছি, তাই আপনার জন্য এনেছি। দিতে সাহস হচ্ছে না, মা।" মা বলিলেন, "তা বেশ করেছ; আহা! দাও, মা।" ইহা বলিয়া পেয়ারাটি লইয়া মাথায় ঠেকাইলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষার জিনিস খুব পবিত্র, ঠাকুর বড় ভালবাসতেন। বেশ পেয়ারাটি তো, আমি খাব এখন।" মেয়েটি বলিল, "আমি আপনার ভিখারিণী মেয়ে, আমার উপর এত দয়া!" ইহা বলিতে বলিতে তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। মা বলিলেন, "তোমার গান বড় মিষ্টি। তুমি একটি গান গাও।" মেয়েটি গাহিতে লাগিল—

"গোপাল, সাজিয়ে দিই বাপ তোরে।
একবার তেমনি, তেমনি, তেমনি করে
নাচবে ঘুরে ফিরে॥
চরণে নূপুর দিব বাপ আমি,
বাজবে রুনুঝুনু করে।
কটিতটে স্বর্ণপাটা দিব কোমর বেড়ে॥
গোপাল, খাইয়ে দিই বাপ তোরে।
স্বর্ণ-বলয় দিব বাপ আমি, তোমার যুগল দুটি করে॥"

গান শেষ হইলে সে বলিল, "মা, এই গানটি গাইলে দশাশ্বমেধ-ঘাটে যে বেহারীবাবা সাধু আছেন তিনি ঠিক গোপালের মতো নাচতে থাকেন। তাঁর স্বভাব ঠিক বালকের মতো।"

মা বলিলেন, "গানটি বেশ। আর একটি বল না।"

সে আবার একটি গাহিল। মা তাহাকে প্রসাদ দিতে বলিলেন। প্রসাদ লইয়া মাকে প্রণাম করিয়া সে বলিল, "আজ তবে আসি, মা।" মা বলিলেন, "আবার এসো, মা, যখন ইচ্ছে হবে এসো।"

একদিন বেলা তিনটার সময় মা বৃদ্ধাদের আশ্রম দেখিতে যাইবার পথে আমাদের তুলিয়া লইয়া গেলেন। সেখানে নামিতেই একটি বউ আসিয়া মাকে উপরে লইয়া গেলেন। বৃদ্ধারা সকলে মায়ের চরণে ফুল দিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন।

মা—একি গো? এরা সব কাশীবাসী, এরা আবার প্রণাম করে কেন?

বউ—তা করবে না, মা? আপনার অন্নে এরা প্রতিপালিত।

মা—বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণাই আছেন, মা। তুমি বুঝি এদের দেখাশুনা কর?

বউ—হ্যাঁ মা, যেমন করান।

মা—আহা, তা বেশ। এই অনাথা বুড়িদের সেবা করলে নারায়ণের সেবা করা হয়। আহা, এই সব ছেলেরা কি কাজই করেছে!

তারপর মা বৃদ্ধাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া এবং তাহাদের ঘরগুলি দেখিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

একদিন সন্ধ্যার পর আমরা সারনাথ হইতে ফিরিয়া মায়ের বাড়ি গিয়া দেখি, মা শুইয়া আছেন। রাধুও পাশে শুইয়া আছে। সারনাথের বর্ণনা শুনিয়া সে মাকে বলিল, "মা, একদিন দেখতে যাবি?"

মা বলিলেন, "কি করে যাব, মা? আমার কি পা আছে যে ঘুরে ঘুরে দেখব? এই দেখ না, মা, বিশ্বনাথদর্শনে যেতে পারি না। এরা সব যায় দেখে আমারও ইচ্ছা করে বিশ্বনাথদর্শন করে আসি; কিন্তু পা নেই তা যাব কি? কিছুই করতে পারি না। যখন পা ছিল তখন আমাদের দেশ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত হেঁটে এসেছি। তখন কত হাঁটতে পারতুম। ঠাকুরের দেহ রাখার পর বৃন্দাবন গিয়েছিলুম। তা হেঁটে হেঁটেই সব দর্শন করতুম।"

আর একদিন গিয়া দেখি একটি স্ত্রীলোক আর তাহার দশ-এগার বৎসরের একটি মেয়ে মায়ের কাছে বসিয়া আছে। স্ত্রীলোকটি বড় গরিব।

মা—তোমার স্বামী কোথায়?

স্ত্রীলোক—কোথায় বিবাগী হয়ে গেছে। এই মেয়ে যখন ছোট তখন গেছে।

মা—এতদিন কাজকর্ম নেই, কি করে চলে?

স্ত্রীলোক—কাজকর্ম করে যা ছিল তাই দিয়ে কষ্টে-সৃষ্টে চালিয়েছি। এখন আর চলে না, মা ; বড় কষ্টে পড়েছি। আপনি ওদের বলে যদি কিছু করিয়ে দেন, মা।

মা—আমি বলে দেখতে পারি। ওরা তো, মা, ভিক্ষে করে আনে। কত লোককে দিচ্ছে তার ঠিক আছে কি ? ওরা যেমন বুঝবে তেমনি দেবে তো ?

মা তাহাকে একটি টাকা ও একখানি কাপড় দিয়া বলিলেন, "আজকে এখানে দুটি খেয়ে যেও।" মা ছাদে বসিয়া আছেন। নিচে রান্না হইতেছে। স্ত্রীলোকটি বলিতেছে, "মা, খুকি বলছে, কি সুন্দর রান্নার গন্ধ !"

মা বলিলেন, "ওকি গো, ওসব কথা বলতে আছে ? ঠাকুরের ভোগ হবে।" প্রসাদ পাইবার সময় মা সেই মেয়েটিকে বেশি করিয়া মাছ তরকারি ইত্যাদি দিতে বামুন-ঠাকুরকে বলিয়া দিলেন। খাওয়া শেষ হইলে স্ত্রীলোকটি বলিল, "খুব খেয়েছি, মা, খুকি তো উঠতেই চায় না।"

মা—তা বেশ। এখন খাওয়া হয়েছে তো, নিচে গিয়ে আঁচাও।

স্ত্রীলোকটি নিচে যাইলে মা বলিলেন, "কি দারিদ্র্যের দশা ! এত লোভ—এসে পর্যন্ত মেয়েটা খাই খাই করছে ! অত বড় মেয়ের কিছু বুদ্ধি নেই। এ সব লোকের কিছু হয় না, লক্ষ্মীছাড়ার দশা।"

তাহারা উপরে আসিলে মা তাহাদের পান দিয়া বলিলেন, "এইবার এস গিয়ে।" তাহারা চলিয়া গেলে মা ঘরে তক্তপোশের উপর শুইয়া আমাদের সঙ্গে গল্প করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "কাশীতে কত রকমের লোক আছে যে তার ঠিক নেই। এই রকম কত লোক যে আসে, আর আমাকে বলে, 'আপনার ছেলেদের বলে দিন আমাকে কিছু সাহায্য করতে।' আমি আর কি বলব বল ? তারা যেমন বুঝবে তেমনি করবে তো। মাগো, যত দরিদ্রের কি এখানে বাস ? ওরাই বা কি করবে বল ? এই দেখ না, অনাথা বুড়িদের জন্য আশ্রম করেছে। তাদের কত সেবা, কত যত্ন ! রোগীদের জন্য হাসপাতাল। আবার বাইরে যে কত লোককে সাহায্য করে তার ঠিক আছে কি ? ছেলেগুলি কি খাটুনিই খাটে ! সবই তাঁর ইচ্ছা, মা। কোথা থেকে কি করাচ্ছেন তিনিই জানেন।"

একদিন বিকালে যাইয়া দেখি মা বারান্দায় বসিয়া কয়েকজন বিধবার সহিত কথা কহিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন গেরুয়াপরা। তিনি মাকে একটি গান শোনাইলেন—

"থাকরে জবা, বনের শোভা,
বনের ফুল তুই বনে ফুটি,
তোরে হেরলে শিবের বক্ষে
মনে হয় মাব চরণ দুটি।"
ইত্যাদি

গোলাপ-মা—আহা, কি চমৎকার গানটি ! আর একটি গাও।

মেয়েটি আর একটি গাহিলেন।

মা—তোমরা সেবাশ্রম দেখেছ?

সুধীরা দিদি—না, আমরা দেখিনি।

মা—তবে গোলাপের সঙ্গে গিয়ে দেখে এস।

আর একদিন বৈকালে মায়ের কাছে গিয়াছি। মা দেবব্রত মহারাজের ও শচীনের কথা বলিতে লাগিলেন। তাঁহারা হঠাৎ অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন।

মা—আহা! মা, দেবব্রতটি আজ চলে গেল। কোম্পানি সেবাশ্রমের পাশের জায়গাটার কি সাহায্য করবে বলেছে; ওরা থাকাতে আপত্তি তুলেছে, সেইজন্য রাখাল সরে যেতে বললে। জানিস তো বাপু, তার কোন দোষ নেই, তবু একটা ফেউ লেগে থাকবে। আহা, বাছারা খেয়ে গেল না।

সুধীরা দিদি—দাদা আর শচীন আমাদের কাছে খেয়ে গেছে।

মা—আহা! মা, খেয়ে গেছে তবু ভাল, আমি তাই ভাবছিলুম।

সুধীরা দিদি—দাদা যেখানেই যায়, ওরা তাদের খোঁজ নেয়। সেইজন্য দাদা বলেন, "আমার শ্বশুরবাড়ির লোক এসেছে, যাই দেখা করে আসি।"

মা—শ্বশুরবাড়ির লোকই বটে, মা। কবে স্বদেশীয় হাঙ্গামে ধরেছিল, এখনও তার খোঁজ রাখে! দেখ না, ছেলে দুটি খেয়ে যায়নি বলে সারাদিন মনটা কেমন করতে লাগল তার কি বলব, মা! যা হোক, তোমার কাছে খেয়ে গেছে শুনে প্রাণটা ঠাণ্ডা হলো।

উদ্বোধন, কলিকাতা। আজ জগদ্ধাত্রীপূজা। সকাল হইতেই ভক্ত-সমাগম। যোগেন-মার বাড়িতে পূজা; তিনি সকালে আসিয়াই চলিয়া গিয়াছেন। মাকে যাইবার জন্য বলিয়া গিয়াছেন। একটি ভক্ত আসিয়া মাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা, কৃপা করিয়া যদি এই অধম সন্তানের বাড়িতে একবার চরণধূলি দেন।" মা বলিলেন, "আচ্ছা, দেখি বিকালে যেতে পারি কি না, তুমি বিকালে একবার এস। যদি পারি তো যাব।"

দুপুরবেলা মা ও আমরা সকলে যোগেন-মার বাড়ি যাইয়া ঠাকুরদর্শন করিয়া আসিলাম। মা সারাদিন উপবাসী রহিয়াছেন, কারণ তাঁহার বাড়িতে পূজা। বেলা চারটার পর যখন সব পূজা শেষ হইল তখন মা প্রসাদ পাইয়া একটু বিশ্রাম করিলেন।

ভক্তটি মাকে লইতে আসিয়াছে। মা শুনিয়া বলিলেন, "সকালে অত করে বললে, যাই একবার ঘুরে আসি।" তাঁহার বাড়ি বেশি দূর নয়, রাজবল্লভপাড়ায়। মা গাড়ি হইতে নামিতেই তাঁহারা মায়ের পা ধোয়াইয়া সেই জল রাখিয়া দিলেন। বাড়িখানি ছোট, আবার ভাঙা। আমরা ঠাকুরপ্রণাম করিয়া ভিতরে যাইলাম। মাকে তাঁহারা ঘরে একখানি আসন পাতিয়া বসিতে দিলেন। মা ঘরের দরজার সামনে আসনখানি পাতিয়া বলিলেন, "আমি এইখানেই বসি!"

একটি বৃদ্ধা মায়ের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধা—মা, আশীর্বাদ কর আমার ছেলেকে। ওর পূজা করবার বড় সাধ, কিন্তু বাড়িঘর কিছুই নেই। যা হোক করে মায়ের পূজাটি হলো। নিজেই সব করেছে।

মা—আহা, তা বেশ করেছে। মা যখন এসেছেন তখন বাড়িঘর সব হয়ে যাবে। তোমার ছেলেটি বড় ভাল, খুব ভক্তি আছে।

একটু পরে প্রসাদ আনিয়া দিলে মা একটু মুখে ঠেকাইয়া যাইবার জন্য উঠিলেন। মা ঠাকুর দেখিয়া একটি টাকা দিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন, "প্রতিমাখানি বড় সুন্দর হয়েছে। চমৎকার মায়ের মুখের ভাব, ভক্তের পূজা কি না।" বাড়ি আসিয়া নলিনী বলিতে লাগিল, "কি বাড়ি, মা! একটু বসবার জায়গা নেই। ঐ বাড়িতে কি করে পূজো করেছে গো!" মা বলিলেন, "কি করবে বল? গরিব মানুষ, আহা, মাকে এনেছে। ব্রাহ্মণটি ভক্তলোক। মা কৃপা করে ওর বাড়িতে এসেছেন।"

জয়রামবাটী হইতে পত্র আসিয়াছে যে মায়ের পূজা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে এবং অনেক লোক প্রসাদ পাইয়াছে। মা বলিলেন, "যা হোক, মায়ের কৃপায় পূজাটি মঙ্গলমত শেষ হয়ে গেছে, মা। বড় ভাবনা হয়েছিল ওরা কি করবে। জ্ঞানটি আছে, তাই মায়ের পূজাটি ভালরকমে করেছে।"

একদিন সন্ধ্যার পর মা রাধুর কাছে বসিয়া তাহাকে সেঁক দিতেছেন। তাহার দুই পাঁজরার নিচে খুব ব্যথা হইয়াছে। একটি স্ত্রীভক্ত মাকে প্রণাম করিয়া বসিলেন।

মা—এস মা, কেমন আছ?

ভক্ত—ভাল আছি, রাধুর কি হয়েছে, মা?

মা—রাধুর সেই ব্যথা ধরেছে, মা। দেখ না, ছেলে আমার সারা হয়ে গেল। পোড়া ব্যথা কোথা থেকে এল? এত দেখানো হচ্ছে, কত ঠাকুরের মানসিক করেছি, কেউ শোনে না গা!

ভক্ত—ভাল হয়ে যাবে, মা। ভয় কি?

মা—তাই তোমরা আশীর্বাদ কর, মা।

অল্পক্ষণ কথাবার্তার পর ভক্তটি প্রসাদ লইয়া চলিয়া গেলে আমি মাকে বলিলাম, "এই কি—, মা? কি হয়ে গেছেন, চেনবার জো নেই।"

মা—চেনবার জো কি করে থাকবে, মা? পাপ ঢুকলে তার কি রক্ষা আছে? আমাদের এখানে আসা ওর বারণ, তাই রাত্রে লুকিয়ে আসে।

আমি—আগে তো আপনার কাছে থাকতে দেখেছি।

মা—হাঁ, আগে আমার কাছে দিনে থাকত, রাত্রে বাড়ি যেত। রাধুর কত সেবাই করেছে! কি একটু কর্মের ফেরে এমন হয়ে গেল, মা। আমার কাছে আসাই বন্ধ। ওর এ জন্মের কিছু নয়, সব পূর্বজন্মের।

আর একদিন বৈকালে মা ঘরে বসিয়া আছেন। ঠাকুরের ভক্ত পূর্ণবাবুর খুব অসুখ,

বাঁচিবার আশা নাই। তাঁহার মা আসিয়াছেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া মা বলিলেন, "ঐ আসছে। কি রোজ রোজ এসে আমাকে বিরক্ত করে, 'মা, আশীর্বাদ কর, পূর্ণকে ভাল করে দাও।' জানি তো পূর্ণ বাঁচবে না, তবু ওদের ভোলাবার জন্য বলতে হয়, 'ভাল হবে'।" পূর্ণবাবুর মা মাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা, তোমার ছেলেকে ভাল করে দাও" এবং কাঁদিতে লাগিলেন।

মা—আমি কি কবব, মা ? ঠাকুরকে জানাও, উনি ভাল করে দেবেন।

পূর্ণবাবুর মা—তোমরা তো ইচ্ছা করলেই পার, মা।

মা—আমি তো ঠাকুরকে জানাই।

পরে মা আমাদিগকে বলিলেন, "ঠাকুর বলেছিলেন, 'ওর বিয়ে দিলে বেশি দিন বাঁচবে না।' সে তখন শুনলে না ; তাড়াতাড়ি ছেলের বিয়ে দিলে, সন্ন্যাসী হয়ে যাবে বলে।"

কিছুদিন পরে একদিন সন্ধ্যারতির পর মা যোগেন-মা প্রভৃতি শুইয়া আছেন। মায়ের একটু তন্দ্রার মতন আসিযাছে। হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন, "পূর্ণ মারা গেল নাকি, যোগেন ?" যোগেন-মা এ প্রশ্নে আশ্চর্যান্বিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে কে বললে, মা ?" মা বলিলেন, "আমি ঘুমুচ্ছি, হঠাৎ শুনতে পেলুম, কে বললে, পূর্ণ মারা গেল।" যোগেন-মা তখন বলিলেন, "হাঁ মা, আজ বিকালে এই সর্বনাশ হয়ে গেছে। তোমাকে শোনায় নি, মা।" সেই রাত্রিতে মা কেবল পূর্ণবাবুর কথাই বলিতে লাগিলেন ও তাঁহার জন্য দুঃখ করিতে লাগিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের অসুখের সময় মা তাঁহার সেবা করিতেছিলেন। পরে ভক্তেরা চিকিৎসার জন্য ঠাকুরকে কলিকাতায় লইয়া গিয়াছেন। সে সময় গোলাপ-মা একদিন কথায় কথায় যোগেন-মাকে বলেছিলেন, "দেখ যোগেন, ঠাকুর বোধ হয় মায়ের উপর রাগ করে চলে গেছেন।" যোগেন-মার কাছে ঐ কথা শুনিয়া মা গাড়ি করিয়া কলিকাতায় গিয়া ঠাকুরের কাছে কাঁদিয়া বলেন, "তুমি নাকি আমার উপর রাগ করে চলে এসেছ ?" ঠাকুর বলিলেন, "না, কে তোমায় এ কথা বলেছে ?" মা বলিলেন, 'গোলাপ বলেছে।' তখন ঠাকুর রাগিয়া গিয়া বলিলেন, "হাঁ! সে এমন কথা বলে তোমায় কাঁদিয়েছে ? সে জানে না তুমি কে ? গোলাপ কোথায় ? আসুক না ?" মা তখন শান্ত হইয়া দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গেলেন। পরে গোলাপ-মা ঠাকুরের কাছে আসিলে ঠাকুর তাঁহাকে খুব ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "তুমি কি কথা বলে ওকে কাঁদিয়েছ ? জান না ও কে ? এক্ষুণি গিয়ে তার কাছে ক্ষমা চাওগে।" গোলাপ-মা তখনই হাঁটিয়া দক্ষিণেশ্বরে মায়ের কাছে কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া বলেন, "মা, ঠাকুর আমার উপর ভয়ানক রাগ করেছেন। আমি না বুঝতে পেরে অমন কথা বলে ফেলেছি।" মা কোন কথা না বলিয়া খালি হাসিয়া, "ও গোলাপ, ও গোলাপ" বলিয়া পিঠে তিনটি চাপড় দিতেই গোলাপ-মার সব দুঃখ যেন কোথায় চলিয়া গিয়া মন শান্ত হইয়া গেল। এই ঘটনাটি গোলাপ-মা নিজে আমার কাছে বলিয়াছিলেন।

পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ বেলুড় মঠে দুর্গাপূজা করিতেছেন। সেইজন্য তিনি মাকে লইয়া গিয়াছেন। মা মঠের উত্তরে বাগানে আছেন। জনৈক স্ত্রী-ভক্ত রাত্রিতে হঠাৎ মায়ের কাছে গিয়া উপস্থিত। মা ভক্তটির আগ্রহ দেখিয়া বলিলেন, "দেখ, এই রকম টান না হলে কি তাঁকে পাওয়া যায়?"

১৯১৮ সালে গোলাপ-মার কঠিন অসুখ হয়। সেই সময় দেখি, মা ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করিতেছেন, ঠাকুর, গোলাপকে সারিয়ে দাও। গোলাপ, যোগেন যদি না থাকে, তাহলে আমার আর এখানে থাকা চলবে না। ওরা গেলে আমি থাকব কি করে? তারপর বলিলেন, "যোগেন ও গোলাপ আমার জীবনের সব অবস্থাই জানে। আহা, গোলাপের কোন বিকার নেই, অভিমান বলে কিছু জানে না! আবার দেখ যোগেনটিও তেমনি। তখন তখন যোগেন এমন ধ্যান করত যে চোখে মাছি ঢুকে বসে থাকলেও কোন হুঁশই থাকত না। আহা,ওদের হয়ে যারা বলবে তাদের কল্যাণ হবে।"

মায়ের জনৈক ভক্তের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য একদিন যোগেন-মা মাকে বলিলেন, "মা, তুমি ওকে একটু সাবধান করে দাও, না হলে ও খারাপ হয়ে যাবে।" মা বলিলেন, "আমার বলা চলবে না, যোগেন। আমি যদি ওকে কিছু বলি, ও শুনতে পারবে না। আমি ওর গুরু; ও যদি আমার কথা না রাখতে পারে, তাহলে ওর অকল্যাণ হবে।" মা এই কথা বলাতে যোগেন-মা আর কিছুই বলিলেন না।

একদিন বৈকালে মা বসিয়া আছেন। একথা সে কথার পর বলিতেছেন, "দেখ, সব বলে কি না আমি 'রাধু রাধু' করেই অস্থির, তার উপর আমার বড় আসক্তি! এই আসক্তিটুকু যদি না থাকত তাহলে ঠাকুরের শরীর যাবার পর এই দেহটা থাকত না। তাঁর কাজের জন্যই না 'রাধু রাধু' করিয়ে এই শরীরটা রেখেছেন। যখন ওর উপর থেকে মন চলে যাবে তখন আর এ দেহ থাকবে না।"

১৯১৮ সালে কোয়ালপাড়ায় মায়ের একবার খুব অসুখ হয়। সে সময় যোগেন-মা ও পূজনীয় শরৎ মহারাজ সেখানে আছেন। রাধু মায়ের ঐরূপ অসুখ দেখিয়াও শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গেল। মায়ের ইচ্ছা ছিল না যে সে যায়। মা যোগেন-মাকে বলিতেছেন, "দেখ যোগেন, রাধু আমাকে ফেলে চলে গেল।" যোগেন-মা বলিলেন, "তা কেন যাবে না, মা? তুমি যে দক্ষিণেশ্বরে হেঁটে গিয়ে ঠাকুরের কাছে উঠেছিলে, সে কথা কি মনে নেই?" মা একটু হাসিয়া বলিলেন, 'তা ঠিক, যোগেন।' মা সারিয়া উঠিয়া কলিকাতায় আসিলেন।

'উদ্বোধনে' একদিন বলিতেছেন, "দেখ, রাধু যখন আমার মায়া কাটিয়ে চলে গেল তখন মনে করলুম এবার বোধ হয় আমার শরীর থাকবে না। কিন্তু এখনো ঠাকুরের কাজ আছে দেখছি।"

যোগেন-মার মনে একবার সংশয় আসে—'ঠাকুর অমন ত্যাগী ছিলেন, আর মাকে দেখছি ঘোর সংসারীর মতন—ভাই, ভাই-পো, ভাই-ঝিদের জন্য অস্থির। কিছুই বুঝতে

পারি না।' একদিন গঙ্গার ঘাটে ধ্যান করিতে বসিয়া তিনি দেখিলেন, ঠাকুর সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, "দেখ, গঙ্গায় কি ভাসছে।" যোগেন-মা দেখেন একটি সদ্যোজাত শিশু নাড়িভুঁড়ি-জড়ানো গঙ্গায় ভাসিয়া যাইতেছে। ঠাকুর বলিলেন, "গঙ্গা কি কখনো অপবিত্র হয়? না তাকে কিছু স্পর্শ করে? ওকে তেমনি জানবে। ওর উপর সন্দেহ এনো না, ওকে একে (নিজেকে দেখাইয়া) অভেদ জানবে।" গঙ্গা হইতে ফিরিয়া আসিয়া যোগেন-মা মাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা, আমায় ক্ষমা কর।" মা বলিলেন, "কেন যোগেন, কি হয়েছে?" তখন যোগেন-মা ঘটনাটি বলিয়া বলিলেন, "তোমার উপর অবিশ্বাস এসেছিল। তা আজ ঠাকুর আমাকে দেখিয়ে দিলেন।" মা একটু হাসিয়া বলিলেন, "তার আর কি হয়েছে? অবিশ্বাস তো আসবেই। সংশয় আসবে, আবার বিশ্বাস হবে। এই রকম করেই তো বিশ্বাস হয়। এই রকম হতে হতে পাকা বিশ্বাস হয।"

'উদ্বোধনে' মায়ের কাছে একটি স্ত্রী-ভক্ত আসিত; মা তাহাকে খুব ভালবাসিতেন। কিন্তু তাহার স্বভাব তত ভাল ছিল না। সেজন্য সাধুদের মধ্যে অনেকে চাহিতেন সে যেন কাছে না আসে। একথা মাকে বলাতে মা বলিলেন, "গঙ্গায় যে কত অপবিত্র জিনিস ভেসে যায়, তাতে গঙ্গা কি কখনো অপবিত্র হয়?"

জনৈক ভক্ত মায়ের নিকট প্রশ্নাদি করিয়া চলিয়া গেলেন। পরে মা নিজেই বলিতেছেন, "দেখ মা,শরণাগত হয়ে পড়ে থাকতে হয়, তবে তো তাঁর কৃপা হয়।"

আমি একবার মাকে জপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি, "কিভাবে জপ করব?" মা বলিলেন, "যেমন ভাবে করবে তেমনি ভাবেই হবে। ঠাকুরকে সর্বদা আপনার ভাববে!" পরে মা করে জপ করিবার নিয়ম দেখাইয়া দিলেন।

ঠাকুরের শরীরত্যাগের পর মা যখন বৃন্দাবনে ছিলেন, সেই সময়ের কথা বলিতে বলিতে তিনি একদিন 'উদ্বোধনের' বাড়িতে বলিলেন, "দেখ মা, আমি রাধারমণের কাছে প্রার্থনা করেছিলুম, "ঠাকুর, আমার দোষদৃষ্টি ঘুচিয়ে দাও। আমি যেন কখনো কারও দোষ না দেখি'।"

মা বলিতেন, "দোষ তো মানুষ করবেই। ও দেখতে নেই। ওতে নিজেরই ক্ষতি হয়। দোষ দেখতে দেখতে শেষে দোষই দেখে।" একবার যোগেন-মাকে বলিয়াছিলেন, "যোগেন, দোষ কারও দেখো না, শেষে দূষিত চোখ হয়ে যাবে।"

জয়রামবাটীতে রাত্রে মা শুইয়া আছেন। আমি প্রতিদিন যেমন তাঁহার পা টিপিয়া ও পায়ে হাত বুলাইয়া দিতাম সেইরূপ দিতেছি। মা কথাপ্রসঙ্গে কিরূপে তাঁহার প্রথম দীক্ষা দেওয়া আরম্ভ হয় সে বিষয়ে বলিতে লাগিলেন, "দেখ মা, ঠাকুরের শরীরত্যাগের পর বৃন্দাবনে আছি। সকলেই তাঁর শোকে কাতর। একদিন রাত্রে ঠাকুর বলছেন, 'তোমরা অত কাঁদছ কেন? আমি আর গেছি কোথা—এঘর আর ওঘর বইতো নয়?' একদিন ঠাকুর ছেলে যোগেনকে (স্বামী যোগানন্দকে) দীক্ষা দেবার কথা বললেন। শুনে আমার কেমন

একটু ভয় হলো, লজ্জাও করতে লাগল। প্রথম দিন দেখে ভাবলাম, 'এ আবার কি? লোকেই বা মনে করবে কি? সকলে বলবে, মা এরই মধ্যে শিষ্য করতে লাগলেন।' ওপর ওপর তিন দিন ঠাকুর ঐ একই কথা বলেন, 'আমি ওকে দীক্ষা দিইনি, তুমি দাও।' কি মন্ত্র দিতে হবে তাও বলে দিলেন। আমি তখন ছেলে যোগেনের সঙ্গে কথা কই না। ঠাকুর মেয়ে যোগেনকে (যোগেন-মাকে) দিয়ে তাকে বলতে বললেন। আমি তখন মেয়ে যোগেনকে ঐ কথা বলি। সে ছেলে যোগেনকে জিজ্ঞাসা করে জানে যে ঠাকুর তাকে মন্ত্র দেননি। ঠাকুর ছেলে যোগেনকেও দেখা দিয়ে আমার কাছে মন্ত্র নিতে বলেছেন। সে ঐ কথা আমার কাছে বলতে সাহস করেনি। যখন দেখলুম দুজনকেই বলেছে, তখন তাকে মন্ত্র দিই। এই ছেলে যোগেন হতে আমার দীক্ষা দেওয়া আরম্ভ হয়। ছেলে যোগেন আমার খুব সেবা করেছে; তেমনটি আর কেউ করতে পারবে না। পারে কেবল শরৎ। ছেলে যোগেনের পর থেকেই শরৎ করছে। আমার ঝক্কি পোয়ানো বড় শক্ত, মা। শরৎ ছাড়া আমার ভার কেউ নিতে পারবে না। গোলাপ, যোগেন, এরা না থাকলে আমার কলকাতা থাকা চলে না।"

মা জয়রামবাটী থাকিতে রাঁচি হইতে এক ভক্ত গিয়া মাকে বলেন, "আপনাকে কিছুদিনের জন্য লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি। বাড়িভাড়া ইত্যাদি সব ঠিক করিয়াছি।" মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শরৎ জানে?' ভক্তটি বলিলেন, 'না।' মা বলিলেন, "তবে আমার যাওয়া হতে পারে না। শরৎ এসে ফিরে গেছে। আগে কলকাতায় যাই। সে যদি বলে তখন দেখা যাবে।" ভক্তটি বলিলেন, "মা, আমরা যে সব যোগাড় করেছি।" মা বলিলেন, "তোমরা আগে না জানিয়ে যোগাড় করলে কেন?"

ভক্তটি চলিয়া গেলেন। মা পরে বলিতেছেন, "দেখ মা, ওরা মনে করে আমাকে নিয়ে যাওয়া খুব সোজা। ওরা কেবল হুজুগ করতেই জানে। আর একবার ঢাকাতে তারা কাগজে ছাপিয়ে দিলে আমি নাকি সেখানে যাব। অথচ আমি কিছুই জানি না! দু-চার দিন সবাই করতে পারে। আমার ভার নেওয়া কি সহজ? শরৎ ছাড়া কেউ ভার নিতে পারবে এমন তো দেখিনি। সে আমার বাসুকি, সহস্রফণা ধরে কত কাজ করছে, যেখানে জল পড়ে সেখানেই ছাতা ধরে।"

একদিন এক স্ত্রী ভক্ত মায়ের নিকট তাঁহার বন্ধুর সহিত মনোমালিন্যের কথা বলায় মা তাঁহাকে বলিতেছেন, "দেখ মা, মানুষকে ভালবাসলে দুঃখকষ্ট পেতে হয়। ভগবানকে যে ভালবাসতে পারে সেই ধন্য হয়, তার দুঃখকষ্ট থাকে না।"

আর একদিন জনৈক স্ত্রী-ভক্ত মায়ের কাছে ঠাকুরপূজা শিখিতে চাওয়ায় মা বলিলেন, "দেখ, তোমরা সংসারে থাক, অত পারবে না। তাঁর নাম যেটুকু পেয়েছ ঐটুকুই কর দেখি। ঐটুকু করতে পারলে সব হবে।"

একবার মা আমাকে একখানি গরদের কাপড় দেন। একজন তাহাতে আপত্তি করিয়া

বলেন, "কেবল ওকে কেন কাপড় দিচ্ছ, মা? আরও পাঁচজন তো আছে।" মা উত্তর দিলেন, "আমি ওকে দেব না তো দেবে কে? ওর আর আছে কে বল?"

রাধুর অসুখের জন্য মা বোসপাড়ায় নিবেদিতা স্কুলের ভাড়া বোর্ডিং বাড়িতে আছেন। আমি তাহার সেবার জন্য সেখানে আছি। একদিন মা আমাকে ঠাকুরের ভোগ দিতে বলিলেন। আমি ভোগ দিবার কোন মন্ত্রাদি জানিতাম না; তাই মাকে বলিলাম, "আমি তো মা, কি করে ঠাকুরকে ভোগ দিতে হয় জানি না।" তখন মা বলিলেন, "দেখ মা, ঠাকুরকে আপনার ভেবে বলবে, 'এস, বস, নাও, খাও।' আর ভাববে তিনি এসেছেন, বসেছেন, খাচ্ছেন। আপনার লোকের কাছে কি মন্ত্রতন্ত্র লাগে? ওসব হচ্ছে যেমন কুটুম এলে তাদের আদরযত্ন করতে হয়, সেই রকম। আপনার লোকের কাছে ওসব লাগে না। তাঁকে যেমন ভাবে দেবে, তেমনি ভাবেই নেবেন।" তারপর ভোগ দিবার একটি মন্ত্র আমাকে শিখাইয়া দিলেন।

মা একবার জনৈক ভক্তকে বলিয়াছিলেন, "দেখ বাবা, বিপদ যে তোমাদের আসবে না, তা নয়, ও তো আসবেই। তবে ও থাকবে না; দেখবে পায়ের তলা দিয়ে জলের মতন চলে যাবে।"

একটি ভক্ত মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এত তো জপতপ করলুম, কিছুই তো হলো না।" উত্তরে মা বলিলেন, "এ কি শাক মাছ যে দাম দিয়ে কিনে নিলুম?"

জয়রামবাটীতে মায়ের আত্মীয়েরা মাকে নানা বিষয়ে জ্বালাতন করিতেন। মা একদিন বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, "দেখ, তোরা আমাকে বেশি জ্বালাতন করিস নে। এর ভিতরে যিনি আছেন, যদি একবার ফোঁস করেন তো ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কারো সাধ্য নাই যে তোদের রক্ষা করে।"

১৯১৯ সালে মা তখন কোয়ালপাড়ায় ছিলেন। দশহরার দিন কয়েকজন ভক্ত মায়ের পায়ে পদ্মফুল দিযা পূজা করিয়া চলিযা গেলেন। পরে মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কি যে ছেলেরা সব পায়ে ফুল দিয়ে গেল?" আমি বলিলাম, "আজ দশহরা, তাই।" মা একটু হাসিয়া বলিলেন, "ওমা, আমি মনসা নাকি?" পরে ঠাকুরের দিকে হাতজোড় করিয়া বলিলেন, "উনিই মনসা, গঙ্গা, সব।"

রাধু বায়ুরোগে পাগলের মতো হইয়া কোয়ালপাড়ায় আছে। অনেক সময় মা তাহাকে খাওয়াইতেন। সে মুখে খাবার লইয়া প্রায়ই মায়ের গায়ে ফেলিয়া দিত। একদিন মা বিরক্ত হইয়া আমাকে বলিতেছেন, "দেখ মা, এ শরীর (নিজের শরীর দেখাইয়া) দেব-শরীর জেনো। এতে আর কত অত্যাচার সহ্য হবে? ভগবান না হলে কি মানুষে এত সহ্য করতে পারে? ঠাকুর আমাকে কখনো ফুলের ঘা-টি পর্যন্ত দেননি। কখনো 'তুমি' ছাড়া 'তুই' বলেননি। একবার আমাকে লক্ষ্মী মনে করে 'তুই' বলে কি অপ্রস্তুত! তিনি জিব কামড়ে বললেন, 'ওমা, তুমি? কিছু মনে করো না, আমি লক্ষ্মী মনে করে 'তুই' বলে ফেলেছি।'

এরা আমাকে জ্বালিয়ে খেলে, মা। এবার রাধুকে কোনরকমে ঠাকুর ভাল করে দিলে আর নয়। দেখ মা, আমি থাকতে এরা কেউ আমাকে জানতে পারবে না, পরে বুঝবে সব।"

'উদ্বোধনে' মায়ের শেষ অসুখের সময় একদিন জনৈক সাধু মাকে দেখিতে আসিয়াছেন। মা শুইয়া আছেন। সাধুটি মায়ের পায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। সে সময় মায়ের মাথায় কাপড় দেওয়া ছিল না। সাধুটি চলিয়া গেলে মা আমাকে বলিতেছেন, "আমার মাথায় কাপড় দেওয়া নেই, কাপড়টা দিয়ে দাওনি কেন? আমি কি মরে গেছি? এখনই এই করছ!"

এই সময় মায়ের খুব অরুচি, কিছুই খাইতে পারেন না। অল্প করিয়া ভাত খান। একদিন খাইবার সময় ডাক্তার কাঞ্জিলাল সেখানে আসিয়া উপস্থিত। তিনি মায়ের ভাতের পরিমাণ বেশি হইয়াছে মনে করিয়া মায়ের সামনেই আমাকে বলিলেন, "তোমার দ্বারা মায়ের সেবা হবে না। আমি কাল দুটো নার্স মায়ের সেবার জন্য আনব। তোমাকে করতে হবে না।" মা ডাক্তারবাবুর কথা শুনিয়া পরে বলিলেন, "হাঁ, আমি সেই জুতোপরা মেয়েগুলোর সেবা নেব, ও মনে করছে? তা আমি পারব না। তুমি আমার কাজকর্ম যেমন করছ করবে। কাঞ্জিলাল কেন আমার ভাতখাওয়া নিয়ে এত গোল করছে? আমি ভাত কি খেতে পারি? তা তো সে জানে না!"

ইহার কয়েকদিন পরেই মায়ের ভাত খাওয়া বন্ধ হইয়া গেল। একদিন মা বলিলেন, "দেখ, সেদিন কাঞ্জিলাল আমার ভাত খাওয়া নিয়ে চটে গিয়েছিল। সেই থেকে আমার ভাত খাওয়া একেবারে চলে গেল।"

ঐ সময়ে মায়ের স্বভাবটি একেবারে পাঁচ-বছরের বালিকার মতো হইয়া গিয়াছিল। একদিন রাত্রি বারটার সময় খাওয়াইতে গেলে বায়না ধরিলেন, "আমি খাব না। তোর একই কথা, 'মা, খাও আর বগলে কাঠি লাগাও'।" মা খাইতে চাহিতেছেন না দেখিয়া বলিলাম, "তবে কি, মা মহারাজকে ডাকব?" অনেক সময় মহারাজের নাম করিলে তিনি খাইতেন। কিন্তু এবার একেবারেই খাইতে নারাজ হইলেন। বলিলেন, "ডাক শরৎকে, আমি তোর হাতে খাব না।" মহারাজ শুনিয়াই তাড়াতাড়ি মায়ের কাছে আসিলেন। মা মহারাজকে বসাইয়া বলিলেন, "একটু হাত বুলিয়ে দাও তো, বাবা" এবং তাঁহার হাত দুখানি লইয়া বলিতেছেন, "দেখ না বাবা, এরা আমাকে কত বিরক্ত করছে। খালি 'খাও, খাও' এদের রব, আর জানে খালি বগলে কাঠি দিতে। তুমি ওকে বলে দাও যেন বিরক্ত না করে।" মহারাজ বলিলেন, "না মা, ওরা আর আপনাকে বিরক্ত করবে না।" এই রকম সান্ত্বনা দিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, এখন কি একটু খাবেন?" মা বলিলেন, 'দাও।' মহারাজ আমাকে খাবার লইয়া আসিতে বলিলেন। মা এই কথা শুনিয়াই বলিলেন, "না, তুমি আমাকে খাইয়ে দাও, আমি ওর হাতে খাব না।" ফীডিং কাপে দুধ ঢালিয়া মহারাজের হাতে দিলাম, তিনি কোন রকমে একটু খাওয়াইলেন এবং বলিলেন, "মা, একটু জিরিয়ে

খান।" শুনিয়াই মা বলিলেন, "দেখ তো, কি সুন্দর কথা—'মা একটু জিরিয়ে খান।' এ কথাটা আর ওরা বলতে জানে না? দেখ তো, বাছাকে এই রাতে কষ্ট দিলে। যাও বাবা, শোও গিয়ে" বলিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন। পরে মহারাজ মশারি ফেলাইয়া দিয়া বলিলেন, "এখন আসি, মা।" মা বলিলেন, "এস বাবা, বাছার কত কষ্ট হলো।"

শরীরত্যাগের কিছুদিন পূর্ব হইতে মা আর রাধুর কোন খোঁজখবর লইতেছেন না। একদিন মা তাহাকে বলিতেছেন, "দেখ্, তুই জয়রামবাটী চলে যা। আর এখানে থাকিস নে।" আমাকে বলিলেন, "শরৎকে বল ওদের জয়রামবাটী পাঠিয়ে দিতে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন ওদের পাঠিয়ে দিতে বলছেন? রাধুকে ছেড়ে থাকতে পারবেন কি?" মা বলিলেন, "খুব পারব, মন তুলে নিয়েছি।" মায়ের ঐ কথা যোগেন-মা ও শরৎ মহারাজকে বলিলাম। যোগেন-মা তখন মায়ের কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মা, ওদের পাঠিয়ে দিতে বলছ?" উত্তবে মা বলিলেন, "যোগেন, এর পর ওদের সেখানেই থাকতে হবে যে। হ—যাচ্ছে, ঐ সঙ্গে পাঠিয়ে দাও। মন তুলে নিয়েছি, আর চাই না।" যোগেন-মা বলিলেন, "ও কথা বলো না, মা। তুমি মন তুলে নিলে আমরা কি করে থাকব?" মা বলেছিলেন, "যোগেন, মায়া কাটিয়ে দিয়েছি, আর নয়।" যোগেন-মা কিছু না বলিয়া শরৎ মহারাজকে সমস্ত জানাইলেন। তিনি বলিলেন, "তবে আর মাকে রাখা গেল না। রাধুর উপর থেকে যখন মন তুলে নিয়েছেন তখন আর আশা নেই।" আমি সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলাম। মহারাজ আমাকে বলিলেন, "দেখ, তোমরা সব মায়ের কাছে অনেক সময় আছ, চেষ্টা করে দেখ, যদি মায়ের মন রাধুর উপর একটু ফিরে আসে।" কিন্তু আমাদের সহস্র চেষ্টাতেও কিছুই হইল না। একদিন মা বেশ জোরের সহিত বলিলেন, "যে মন তুলে নিয়েছি তা আর নামবে না জেনো।"

শরীরত্যাগের দুই-তিন দিন পূর্বে মা শরৎ মহারাজকে ডাকিয়া বলিলেন, "শরৎ, আমি চললুম। যোগেন, গোলাপ, এরা সব রইল, দেখো।"

—শ্রীমতী সরলাবালা দেবী

(১১)

জীবনে সেই আমার আনন্দের দিন গিয়াছে যখন শ্রীশ্রীমা ছিলেন। একদিন মায়ের কাছে গিয়া দেখি, তিনি একটি বাটিতে খইচুর মাখিয়া পরম আনন্দে দুইচারি বার নিজের মুখে দিলেন, তারপর ঘরে যত ভক্ত ছিলেন, তাঁহাদের হাতে হাতে দিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, "আহা! মা, আপনার খাওয়া হলো না।" মা বলিলেন, "এই সব মেয়েরা খেলেই আমার খাওয়া হলো।"

আর একদিন গিয়া দেখিলাম, মায়ের গায়ে চাকা চাকা আমবাত বাহির হইয়াছে। মা

বলিলেন, "এগুলো কি হয়েছে, মা? কিসে সারে?" আমি বলিলাম, "মা, লোকে বলে, গোয়ালে কম্বল পেতে তার উপর আড়াই বার গড়াগড়ি দিলে নাকি সারে।" মা বলিলেন, "আহা, গোয়াল ও গঙ্গা বড়ই পবিত্র; তাই বোধ হয় সারে।"

আমার একটি সাত বছরের বোনকে সঙ্গে লইয়া মাকে একদিন দর্শন করিতে যাই। কিছুদিন আগে সে নবদ্বীপে গিয়াছিল এবং তথা হইতে তুলসীর মালা পরিয়া আসিয়াছিল। মা তাহার মালা পরা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন ও তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "আহা, এর এমন বেশ কবে হলো?"

সেইদিন আমার দুই মাসের একটি কোলের মেয়ে বাড়িতে রাখিয়া গিয়াছিলাম। আমাদের বাড়ি বসিরহাট। ভোরের ট্রেনে গিয়াছি, রাত্রির ট্রেনে ফিরিব। স্তনে দুধ আসিতেছে, আর আমি জড়সড় হইতেছি। তাহা লক্ষ্য করিয়া মা বলিলেন, "তুমি অমন করছ কেন?" আমি সব বলিলাম। শুনিয়া মা বলিতে লাগিলেন, "আহা, দুমাসের মেয়ে রেখে এসেছ কেন, মা? আনলেই পারতে।" আমি বলিলাম, "মা, আপনার এস্থানে এসে অপবিত্র করে ফেলবে, তাই আনিনি।" মা বলিলেন, "তাতে কি হয়েছে? উপস্থিত সকলকে মা বারবার বলিতে লাগিলেন, "আহা! দেখ, দুমাসের মেয়ে বাড়ি রেখে কতদূর থেকে এসেছে। কত কষ্ট হচ্ছে।" আমি তাঁহাব নিকট সিংহবাহিনীর একটু মাটি চাহিলে মা তাঁহাব ভাইঝিকে উহা দিতে বলিয়া আমাকে বলিলেন, "বড জাগ্রত দেবতা।" ফিরিবার সময় প্রণাম করিলে মা বলিলেন. "এস, আবাব এসো. মা।"

শ্রীমতী--

(১২)

১৯১৬ সালের ১২ পৌষ আমি প্রথম শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্ম-দর্শন করি এবং তাঁহার কৃপালাভ করিয়া ধন্য হই। একটি গুরুভগিনীর সহিত যখন আমি কম্পিতকলেবরে মায়ের বাড়ির দোতলায় উঠি, তখন যোগেন-মা আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া মায়ের নিকট লইয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, "মা, দেখ, দেখ, তোমার আর একটি মেয়ে এসেছে—এর চোখ মুখ কেমন দেখ!" মা তখন ঠাকুরঘরে বসিয়া ফল ছাড়াইতেছিলেন। বলিলেন, "হাঁ গো, আমি একে জানি, এ রামদের মেয়ে।" আমি তো অবাক, কি করিয়া মা আমাকে জানিলেন!

মা আমাকে ডাকিয়া ঠাকুরঘরে আসনে তাঁহার পার্শ্বে বসাইলেন। আমার গুরুভগিনীটি আমাকে গঙ্গাস্নানের জন্য আহ্বান করিলে মা বলিলেন, "ওর গঙ্গাস্নান দরকার নেই" এবং আমার গায়ে গঙ্গাজল ছিটাইয়া দিলেন। তারপরই আমাকে কৃপা করিলেন। ঐ সময় আমাকে একটি কথা বলিয়া বলিলেন, "ঠাকুর আমার জন্য মন্ত্রের এই অংশটুকু রাখিয়া

দিয়াছিলেন।" মায়েব পাদপদ্মে অঞ্জলি দিবার সময় মা বলিলেন, "তুলসী ও বিল্বপত্র আমার হাতে দাও, ফুল পায়ে দাও।"

আমার সেই গুরুভগিনীটি একদিন কথাপ্রসঙ্গে মাকে বলিলেন, "একে নিবেদিতা স্কুলে পড়ালে ভাল হয়। তদুত্তরে মা বলিলেন, "না, ওখানে থাকার প্রয়োজন নেই, আমার কাছে থাকলে ভাল হতো।" কিন্তু আমাব অদৃষ্টে সে সৌভাগ্য কখনও ঘটে নাই।

একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি কি করব ? আমি তো কিছুই জানি নে।" মা বলিলেন, "কি আর করবে ? যা করছ তাই করবে। সকাল-সন্ধ্যায তাঁর নাম করবে।"

আমাদের দেশের বিধবা মেয়েরা আহারাদি সম্বন্ধে খুব কঠোরতা করে ; অন্য একটি ভক্ত মেয়ের নিকট এই কথা শুনিযা মা আমাকে বলিলেন, "তুমি রাত্রে রুটি-পরটা ইত্যাদি খেও, ঠাকুরকে নিবেদন করে খেও। দেশাচাব মানতে হয।"

—শ্রীমতী প্রিয়বালা দেবী, কাশী

(১৩)

একদিন সকালবেলা শ্রীশ্রীমা ও গোলাপ-মা গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন। গোলাপ-মা বলিলেন, "মা, তেল মাখ।" মা বলিলেন, "আমি তেল মাখব না।" গোলাপ-মা অনুরোধ করায় মা বলিলেন, "আমি মাখলে সকলেই মাখবে ; তেল মেখে গঙ্গাস্নানে যেতে নেই।"

একদিন জনৈক স্ত্রীলোক অনুতপ্ত হইয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, আমাদের উপায় কি হবে ?" মা একটু বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "তোমাদেব বছর বছব ছেলে হবে ; একটুও সংযম নেই ; আমার কাছে এসে 'আমাদের উপায় কি ?' বললে কি হবে ?"

শ্রীশ্রীমা রামেশ্বর হইতে ফিরিয়া আসিবার পর একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, কি দেখে এলেন, বলুন।" মা বলিলেন, "অনেক লোক আমাকে দেখতে এসেছিল। সেখানকার মেযেবা খুব লেখাপড়া জানে। আমাকে তারা লেকচার দিতে বললে। আমি বললাম, 'আমি লেকচার দিতে জানি না। যদি গৌরদাসী আসত তবে দিত'।'

একদিন মা বলিলেন, "যে বড় হয় সে একটিই হয়, তার সঙ্গে অন্যের তুলনা হয় না। যেমন গৌরদাসী।"

আর একদিন মা রাধুর অসুখের জন্য তাহাকে মাদুলি পরাইয়া দেবতার উদ্দেশ্যে পয়সা তুলিয়া রাখিতেছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, আপনি কেন এরূপ করছেন ? আপনার ইচ্ছাতেই তো সব হয়।" মা বলিলেন, "অসুখ হলে ঠাকুরদের মানত করলে বিপদ কেটে যায় ; আর যার যা প্রাপ্য তাকে তা দিতে হয়।"

মানিকতলায় জনৈক ভক্তের বাটীতে একবার শ্রীগৌরীমাতা কঠিন বসন্তরোগে আক্রান্ত হন। ভক্তটির মাতা ও অন্যান্য সকলে প্রাণপাত করিয়া তাঁহার সেবা

করিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, "আ—র মা এ জন্মেই মুক্ত হয়ে যাবে। গৌরদাসীর অসুখে যে সলতেটি পর্যন্ত উসকে দিয়েছে সেও মুক্ত হয়ে যাবে।"

—শ্রীমতী সরযূবালা সেন

(১৪)

মা তখন জয়রামবাটীতে। আজ মায়ের বাড়িতে ঁজগদ্ধাত্রীপূজা, তাই মা অত্যন্ত ব্যস্ত। কেবল বলিতেছেন, "কি করে মার পূজাটি হবে?" ঠাকুরের নিত্যপূজা আজ মা সকাল সকাল করিতেছেন। ঠাকুরকে ফল মিষ্টি প্রভৃতি অনেক নৈবেদ্য দেওয়া হইয়াছে। ভোগ দিবার সময় মা ঠাকুরকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, "দেখ, আজ মার পূজা, শিগ্গির করে খেয়ে নাও, আমায় সেখানে যেতে হবে।" ধীরে ধীরে আরও কি বলিলেন। মনে হইল ঠিক যেন মানুষের সহিত কথা কহিতেছেন। তারপর পূজা শেষ করিয়া ঁজগদ্ধাত্রী-মণ্ডপে গিয়া বসিলেন এবং পূজা সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত করুণভাবে একদৃষ্টে প্রতিমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কোয়ালপাড়া হইতে বাজার করিয়া ও মায়ের ঠাকুরপূজার জন্য ফুল লইয়া জয়রামবাটী গিয়াছি। আমি যাইতেই মা বলিলেন, "এই আমি ভাবছিলাম, এখনই তুমি আসবে; তারপর আমি স্নান করতে যাব।" মা জিনিসগুলি রাখিয়া আমাকে মুড়ি খাইতে দিলেন। তারপর একখানি ছোট গামছা পরিয়া তেল মাখিতে মাখিতে আমাদের সম্বন্ধে কথা কহিতে লাগিলেন। হঠাৎ বলিতেছেন, "আমি মা, লজ্জা কি?" তারপর স্নান করিয়া পূজা করিতে গেলেন।

একদিন ভাবিলাম, মাকে জিজ্ঞাসা করিব কিরূপে সাধন-ভজন করিতে হইবে। মা বিকালে বারান্দায় বসিয়া মালাজপ করিতেছিলেন। কাছে গিয়া সে-সব কথা ভুলিয়া গেলাম; প্রশ্ন করিবার ইচ্ছাই হইল না। কেবল বলিলাম, "মা, আপনি আমার ভার নিন"—বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিয়াছি। মা তখন আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "কেঁদো না, তোমার ভার তো আমি অনেকদিন নিয়েছি। ঠাকুর তোমার ভার অনেকদিন নিয়েছেন। ভাবনা কি?"

আমি একদিন স্বপ্ন দেখি যে মা আমাকে বলিতেছেন, 'ব্রহ্মচর্য লও।' পূজ্যপাদ হরি মহারাজকে উহা বলিলে তিনি বলিলেন, "এই কথা তুমি মাকে গিয়া বলিও।" কিছুদিন পরে কোয়ালপাড়ায় মাকে ঐ কথা বলিলাম। মা শুনিয়া একটু হাসিলেন এবং বলিলেন, "তবে কাল আমি যখন পূজা করব সে সময় একখানি নতুন কাপড় নিয়ে এসো। কেউ যেন না জানে।" পরদিন যখন মায়ের নিকট গেলাম তখন তিনি পূজা করিয়া জল খাবার খাইয়া বারান্দায় বসিয়া মুখে গুল দিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই জিব কাটিয়া বলিতেছেন,

"দেখ, পূজো হয়ে গেছে, আমি ভুলে গেছি। তা হোক, আমি মুখ ধুয়ে নিচ্ছি, তুমি ঠাকুরঘরে গিয়ে বস।" মা ঠাকুরঘরে আসিয়া বলিলেন, "দরজাটা ঠেসিয়া দাও, ওরা (মেয়েরা) আছে।" তারপর আমাকে বলিলেন, "গায়ের জামাটা খুলে ফেল।" কোশার জল লইয়া আমার শরীরে ছিটাইয়া দিলেন। তারপর আমার নাভিতে, বুকে ও মাথায় হাত দিয়া কি করিতে লাগিলেন। নতুন কাপড়খানি লইয়া আমাকে বলিলেন, "ঐ দেখ, ঠাকুর আছেন। বল, আজ তোমাকে আমার সব ভার দিলাম।" পরে কাপড়খানি আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "আজ তোমার প্রাণের ভিতর সন্ন্যাস দিলাম।" আমি তখন যেন দিশেহারার মতো হইয়া গিয়াছি, মাকে প্রণাম করিতে পর্যন্ত ভুলিয়া গেলাম। আমার এই ভাবটা কয়েকদিন পর্যন্ত ছিল।

মা রাধুকে লইয়া কোয়ালপাড়ায় আছেন। সেবার রাধুর সন্তান হইবে। সে তখন উন্মাদের মতো। মায়ের সর্বদাই ভাবনা, কি করিয়া রাধু নির্বিঘ্নে এ বিপদ উত্তীর্ণ হইবে। সেইজন্য কত দেবদেবীকে মানত এবং কাতরভাবে প্রার্থনা করিতেছেন।

ঐ সময় একদিন মা বলিলেন, "দেখ, 'হনুমানচরিতে' লেখা আছে নাকি, ভাল-মন্দ কি হবে বলে দিতে পারে। তা রাধুর কি হবে, বলে দিতে পারে কি-না দেখ না।" আমি বইখানি আনিয়া পড়িয়া দেখিলাম, উহাতে ছক আঁকা আছে। তাহার কোন এক স্থানে হাত দিতে হয়। মা একটি জায়গায় হাত দিলেন। ফলাফল পড়িয়া শুনাইলাম। তাহাতে লেখা আছে,ভাল হইবে। এই ভাল ফল শুনিয়া মা খুব খুশি হইলেন এবং বলিলেন, "তবে রাধু নিশ্চয় ভাল হবে। উনি (অর্থাৎ হনুমান) যখন বলিতেছেন, তখন নিশ্চয় ভাল হবে।"

এক সময় কোয়ালপাড়া মঠে কাজকর্ম লইয়া সেবকদের সহিত অধ্যক্ষের মতবিরোধ উপস্থিত হয়। মা তখন জয়রামবাটীতে আছেন। আমরা প্রায়ই কোয়ালপাড়া হইতে তাঁহার জন্য বাজার করিয়া লইয়া যাইতাম। মা কে কেমন আছে তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন। উক্ত মঠের সকল সংবাদ মা উত্তমরূপেই জানিতেন। একদিন তাঁহার ভাইঝি আমাকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেই মা তাঁহাকে বলিলেন, "তোর অত খবরে দরকার কি?" তিনি চলিয়া গেলে মা বলিলেন, "দেখ, সব বনিয়ে-বানিয়ে চলতে হয়। ঠাকুর বলতেন, 'শ, ষ, স'—সব সয়ে যাও, তিনি আছেন।" পরে মা যখন কোয়ালপাড়া আসিয়া কিছুদিন থাকেন, তখন একদিন মঠাধ্যক্ষ মাকে বলিলেন, "মা, ছেলেরা সব এখানে থাকতে চায় না। আপনি ওদের বলে দিন, যাতে ওরা কোথাও গিয়ে থাকতে না পারে এবং এখানে আপনার কাজকর্ম সব করে। ওদের ইচ্ছা অন্য জায়গায় সব চলে যায়। আপনি যদি বলে দেন তাহলে ওরা আর কোথাও যাবে না।" এই কথা শুনিবামাত্র মা ক্রুদ্ধা হইয়া বলিলেন, "তুমি আমাকে দিয়ে কি বলি'' নিতে চাও? আমি বুঝি বলে দেব যে ওরা কোথাও থাকতে পাবে না! ওরা আমার ছেলে, ঠাকুরের কাছে এসেছে; ওরা যেখানেই যাবে সেখানেই ঠাকুর ওদের দেখবেন। আর তুমি আমার মুখ দিয়ে বলিয়ে নিতে চাও, যাতে

ওবা কোথাও স্থান না পায়। একথা আমি বলতে পাবব না।" মা তখন খুব জোবে জোবে কথা বলিতেছিলেন। সকলে ভয়ে অস্থিব। মঠাধ্যক্ষ তখন মায়েব পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মা, ক্ষমা করুন, বক্ষা করুন।" মা তৎক্ষণাৎ একেবাবে শান্ত হইলেন।

একদিন জনৈক পূর্ববঙ্গীয় ভক্ত মায়েব নিকট দীক্ষা লইতে আসিয়াছেন। মা তখন কোয়ালপাড়ায়। মাকে ঐ কথা বলা হইলে তিনি বলিলেন, "না, তাব দীক্ষা হবে না।" ভক্তটি ইহা শুনিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন। পবদিন তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া মা যে বাড়িতে থাকিতেন সেই বাড়িব বাহিবে বৌদ্রে বসিয়া কাঁদিতেছিলেন। মা উহা জানিতে পাবিয়া বলিলেন, " ও কেন এ বকম কবে কাঁদছে? ওকে চলে যেতে বল।" ভক্তটিব ঐৰূপ অবস্থা দেখিয়া আমি তাহাকে ঐ কথা বলিতে গিয়াও বলিতে পাবিলাম না। ইতোমধ্যে দেখি মা নিজেই বাড়িব সদব দবজাটি অল্প খুলিয়া ভক্তটিকে দেখিতেছেন। আমি বাড়িব ভিতবে যাইতেই মা আমাকে বলিলেন, "বলে দাও, কাল ওব দীক্ষা হবে।" এই কথা শুনিয়া ভক্তটি আবও কাঁদিতে লাগিলেন। পবদিন তাঁহাব দীক্ষা হইয়া গেল।

কোয়ালপাড়া মঠে কৃষ্ণপ্রসন্ন নামক একজন শিক্ষিত ভক্ত কিছুদিন ছিল। মা একদিন আমাদেব বলিলেন, দেখ ওদেশ থেকে অনেক সাহেব-সুবো ভক্ত আসবে, তোমবা কৃষ্ণপ্রসন্নেব কাছে ইংবাজী লেখাপড়া শিখে নাও।" মায়েব কথামত আমবা পড়াশুনা আবম্ভ কবিয়াছিলাম। কিন্তু কিছুদিন পবে কৃষ্ণপ্রসন্ন চলিয়া যাওয়ায় উহা বন্ধ হইয়া যায়।

মায়েব পদচিহ্ন জনৈক স্ত্রী ভক্তেব নিকট ছিল। একদিন উহা চুবি হইয়া যায়। তাহা লইয়া মেয়েদেব মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। মা তখন কোয়ালপাড়ায়। তিনি ঐ কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন 'ঐ নিয়ে তোমাদেব এত কেন? আমি তো আছি, কত নেবে নাও। পবে কিছু কাপড় ও তবল আলতা আনিয়া অনেকগুলি পদচিহ্ন দিলেন। ঝগড়াও মিটিয়া গেল

একদিন মা প্রসন্ন মামাব বাড়িতে কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "দেখ, বাধু যখন জন্মায়নি তখন আমাব সামনে সর্বদা ছায়াব মতো ঘুবত। ঠাকুব দেখিয়ে দিয়েছিলেন, 'একে নিয়ে থাকবে'। সেই বাধুকে নিয়ে আমাব কত মায়া দেখ না। গৌবদাসী কেমন তাব মেয়েকে তৈবি কবেছে আব আমি একটা বাঁদবী তৈবি কবেছি।"

কোয়ালপাড়া মঠে তখন আতপ চাউলেব ভাত খাইতাম। অর্থাভাব হেতু তবকাবি তেমন জুটিত না। এইৰূপ খাওয়া-দাওয়াব জন্য সকলেবই শবীব খাবাপ হইয়া গেল। মা ইহা জানিয়া বলিলেন, "তোমবা মাছটাছ খাওনি কেন? না খেয়ে শবীবটি মাটি কবে কি হবে? আমি বলছি, কোন দোষ নেই, মাছটাছ খেও।" তাবপব মা জোব কবিয়া পুনঃপুনঃ মঠাধ্যক্ষকে বলিয়া আমাদেব মাছ খাইবাব ব্যবস্থা কবিয়া দিলেন।

একদিন জয়বামবাটীতে জনৈক মহাবাজ কাগজ ও দোয়াতকলম লইয়া মায়েব নিকট আসিয়া বলিলেন "মা দুধ বড় কম হচ্ছে, একটা গাইয়ে যা দুধ দেয় তাতে কুলিয়ে উঠছে

না। তাই মনে করছি আর একটা গাই কিনব। আপনি যদি অনুমতি দেন তো একজনকে টাকার জন্য লিখি।" মা বলিলেন, "লেখ, কল পেয়েছ, লিখলেই টাকা, আর কি!" তিনি চলিয়া গেলে মা হাসিয়া বলিতেছেন, "ওর কি বাসনা দেখ! আমি বাবুরামকে একসময় একটু মিছরির পানা খেতে দিয়েছিলাম। বাবুরামের তখন পেটের অসুখ। ঠাকুর তা দেখতে পেয়েছিলেন। আমাকে একদিন বললেন, 'তুমি বাবুরামকে কি খেতে দিয়েছিলে?' আমি বললুম, 'মিছরির পানা।' ঐ কথা শুনে ঠাকুর বললেন, 'ওদের যে সাধু হতে হবে। ওসব কি অভ্যাস করাচ্ছ'!"

একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ভাবে আমি সাধন-ভজন করব?" মা বলিলেন, "ঠাকুরকে ডাকলেই সব হবে। ইহা আমার মনঃপূত না হওয়ায় আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম। মা তখন বিরক্ত হইয়া জোর গলায় বলিলেন, "আমি আর কিছু জানি নে; ঠাকুরের কাছে যা চাইবে তাই পাবে।"

জনৈক ভক্ত যখন মায়ের নিকট দীক্ষা লইতে যান, মা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের বংশের কি মন্ত্র?" ভক্তটি বলিলেন, "তা আমার জানা নেই!" তখন মা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তোমাদের বংশের এই মন্ত্র" এবং ভক্তটিকে দীক্ষা দিলেন। পরে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছিল যে বাস্তবিক তাহাই।

কোয়ালপাড়ায় একদিন একটি পাগল আসিয়া বাড়ির বাহিরে পাগলামি করিতেছিল। মা উহার কাণ্ড দেখিয়া বলিলেন, "দেখ না, যত সব পাগলের মেলা। আমরা এসেছি কিনা, তাই যত সব পাগল আসছে। দেখ, রাধু পাগল, তার মা পাগল, এই সব নিয়ে আমার ঘর।" এই কথা বলিয়া একটু চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, "ঘরে আসবে চণ্ডী, শুনব কত চণ্ডী, আসবে কত দণ্ডী, যোগী, জটাধারী।"

—স্বামী ঋতানন্দ

(১৫)

জয়রামবাটী

পৌষ মাস। আজ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি। তাঁহার ঘরে তক্তপোশের উপর রাধুর ছেলেটিকে কোলে করিয়া বসিয়া আছেন। সকলেই মায়ের পাদপদ্মে পুষ্পচন্দন দিয়া পূজা করিতেছেন। আমি একটি গাঁদাফুলের গড়েমালা মাকে পরাইয়া শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলাম এবং বলিলাম, "মা, আজ আপনার জন্মদিন; অনেকের ইচ্ছা আজ আপনাকে দর্শন ও পূজাদি করেন। কিন্তু তাঁরা এই দুর্গম দেশে আসিবার সুযোগ পান না। আজ এই বিশেষ দিনে আমি সকলের আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি। সকলের যাতে মঙ্গল হয় সেই

আশীর্বাদ করুন, মা।" মা সুপ্রসন্নভাবে বলিলেন, "হ্যাঁ, বাবা, সকলের মঙ্গলের জন্য আমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি সকলের মঙ্গল করুন।"

মায়ের আদেশ অনুসারে আমি তাঁহার নিকটই থাকিতাম। ঠাকুরপূজা ও অন্যান্য কাজে খুব ব্যস্ত থাকিতে হইত। একদিন মঠের কয়েকজন সন্ন্যাসী তপস্যায় যাইবেন শুনিয়া আমি মাকে বলিলাম, "এই কর্মের মধ্যে থাকা যেন ভালবোধ হচ্ছে না। আমি তপস্যা করতে যাব, আপনি অনুমতি দিন।" মা বলিলেন, "সে কি গো, আমার কাজ করছ, ঠাকুরের কাজ করছ, একি তপস্যার চেয়ে কম হচ্ছে? হাওয়া গুণতে কোথায় যাবে? যখন খুব যাবার ইচ্ছা হবে তখন দু-এক মাস কোথাও বেড়িয়ে আসবে।"

জয়রামবাটী ম্যালেরিয়ার দেশ। মায়ের মধ্যে মধ্যে জ্বর হওয়ায় শরীর খুব খারাপ হইয়াছে। পূজনীয় শরৎ মহারাজের আদেশে কিছুদিনের জন্য দর্শনাদি বন্ধ আছে। এমন সময় বরিশাল হইতে জনৈক ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাকে দর্শনের জন্য তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ; আমিও তাঁহাকে যাইতে দিব না। সুতরাং আমাদের মধ্যে বেশ বাদানুবাদ হইতে লাগিল। গোলমাল ক্রমশঃ মায়ের কর্ণগোচর হইল। মা একেবারে আলুথালুভাবে দরজায় আসিয়া উপস্থিত। বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কেন তুমি আসা বন্ধ করছ?" আমি বলিলাম, "শরৎ মহারাজ নিষেধ করেছেন। অসুস্থ শরীরে দীক্ষা দিলে আপনার শরীর আরও খারাপ হবে।" মা বলিলেন, "শরৎ কি বলবে? আমাদের ঐ জন্যেই আসা। আমি ওকে দীক্ষা দেব।" ভক্তটিকে বলিলেন, "এস, বাবা, আজ তুমি জল খাও, কাল তোমার দীক্ষা হবে।" ভদ্রলোকটির সঙ্কল্প ছিল, দীক্ষা লইয়া তবে জল খাইবেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় মা নতুন বাটীর বারান্দায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। আমরা সেই সময় প্রণাম করিতে গেলাম। মা নিজেই বলিতে লাগিলেন, "দেখ, ক—বলে, 'ছেলেগুলো খাবার লোভে এ আশ্রম সে আশ্রম ঘুরে বেড়াচ্ছে।' কি রকম কথা দেখেছ? আমার ছেলের, ঠাকুরের ছেলের খাবার কষ্ট কেন হবে? কখনই হবে না। আমি নিজে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছি, 'হে ঠাকুর, তোমার ছেলেদের যেন খাবার কষ্ট কখনো না হয়।' বলে কিনা লোভের বশে ছুটে বেড়ায়! কেন ভাল খাবে না? যার আসক্তি আছে সেই দুঃখ-কষ্ট পাবে।"

মা পূজার ঘরে বসিয়া আছেন—পূজা শেষ হইয়াছে। একজন গুরুভ্রাতা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, আপনি ঠাকুরকে কিভাবে দেখেন?" মা কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "সন্তানের মতো দেখি।"

একদিন মা নিজে হইতেই বলিলেন, "দেখ,তোমরা 'বন্দে মাতরম্' করে হুজুগ করে বেড়িও না, তাঁত কর, কাপড় তৈরি কর। আমার ইচ্ছা হয়, আমি একটা চরকা পেলে সুতা কাটি। তোমরা কাজ কর।"

কথাপ্রসঙ্গে একদিন মাকে বলিলাম, "মা, আমাদের মনের যে অবস্থা, সময়ে সময়ে মন

যেরকম চঞ্চল হয, তাতে ভয় হয, ডুবে যাব নাকি ?" মা বলিলেন, "সে কি, বাবা, ডুববে কি ? ঠাকুবেব সন্তান তোমবা ডুববে কি ? কখনই না, ঠাকুব তোমাদেব বক্ষা কববেন।"

মা কোযালপাড়া জগদম্বা আশ্রমে আছেন। একদিন বলিতেছেন, "দেখ, অনেক দিনেব পর আজ ঠাকুরকে এখানে দেখলাম। আহারের পব বেশ বিশ্রাম কবছেন।"

একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, ব্রহ্মজ্ঞান কি কবে হয ? একি প্রত্যেক বিষযটি নিযে প্রথম প্রথম অভ্যাস কবতে হয, না আপনা আপনি হয ?" মা বলিলেন, "ঐ পথ বড কঠিন, তোমবা ঠাকুবকে ডাক, তিনি সময হলে জানিযে দেবেন।"

—স্বামী পরমেশ্বরানন্দ

(১৬)

জয়রামবাটী

একবাব শূলবেদনায বড কষ্ট পাইতেছিলাম। সেই সময একদিন তন্দ্রাবস্থায অনুভব কবি কে যেন আমাকে গুরুব পাদোদক পান কবিতে বলিতেছে। পবদিন জযবামবাটী যাইযা মাযেব পাদোদক পান কবিলাম এবং তাহাকে বলিলাম মা, আমাব ইচ্ছা ছিল আপনাব পা পূজা কবব কিন্তু জল খেযে ফেললুম।' মা বলিলেন 'তাতে কি ? চল ঐ ঘবেব মধ্যে।"

চবণপূজা হইযা গেলে আমি মাযেব পা দুখানি লইযা মস্তকে ধাবণ কবিতেই মা বলিলেন ক্ষেপা ছেলে, পা 'ক মাথায বাখতে আছে ' ওখানে ঠাকুব আছেন।"

আমি—মা, আমি তো ঠাকুবকে দেখিনি।

মা—ঠাকুব সাক্ষাৎ ভগবান।

আমি—ঠাকুব যদি ভগবান, তবে আপনি কে ?

মা—আমি আবাব কে ?

আমি—আপনি তো ইচ্ছা কবলেই ঠাকুবকে দেখিযে দিতে পাবেন।

মা—নবেনকে ঠাকুব ছুঁযেছিলেন, তাতে নবেন চেঁচিযে উঠেছিল। সাধনভজন কব, দেখতে পাবে।

আমি—মা, আপনি যাব গুরু তাব আবাব সাধনভজন কি দবকাব ?

মা—তা বটে। তবে কি জান, ঘবে বাঁধবাব সব জিনিস আছে, বান্না কবে খেতে হয। যে যত সকাল বাঁধবে, সে তত সকাল খেতে পাবে। কেউ সকালে খায, কেউ সন্ধ্যায, কেউ কুড়েমি কবে বাঁধবাব ভযে উপোস দেয।

আমি—মা, এ কথাটা বুঝতে পাবলাম না।

মা—যে যত বেশি সাধনভজন করবে, সে তত শিগ্‌গির দর্শন পাবে। না করে শেষ সময় পাবেই, নিশ্চয় পাবে। কিন্তু যে সাধনভজন না করে কেবল হইচই করে কাটাবে, তার দেরি হবে। সাধনভজন করবার জন্য সংসার ছেড়েছ। সর্বদা সাধনভজন করতে পার না বলেই ঠাকুরের কাজ ভেবে কাজ করা দরকার। তুমি বেশি কঠোরতা করো না ; তোমার শূল-বেদনা। খাওয়ার বিষয় নজর রাখবে। এ রোগ মারাত্মক নয়, কষ্টদায়ক।

যখন কোয়ালপাড়া আশ্রমে ছিলাম, তখন আমাব কাজ ছিল দুবেলা রান্নাঘর পরিষ্কার করা ও পেতলেব হাঁড়ি মাজা। তখন বর্ষাকাল। হাঁড়ি মাজিতে মাজিতে হাতে হাজা লাগিয়া কষ্ট পাইতেছি। একদিন জয়রামবাটী যাইয়া মাকে প্রণাম করিতে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো, ভাল আছ তো ?"

আমি—বড় ভাল নয়।

মা—কেন ? আবার কি পেটে বেদনা হচ্ছে নাকি ?

আমি—না, মা, বেদনা হয়না বটে, কিন্তু হাতে হাজা ধরেছে, দুবেলা হাঁড়ি মাজতে হয়।

মা—টকের জ্বালায় পালিয়ে এসে তেঁতুলতলায় বাস। কোথায় সংসার ছেড়ে এসে ভগবানের নাম করবে, না কেবল কাজ! আশ্রম হলো দ্বিতীয় সংসার। লোকে সংসার ছেড়ে আশ্রমে আসে, কিন্তু এমন মোহ ধরে যায় যে আশ্রম ছেড়ে যেতে চায় না। তোমার শরীর ভাল নয়, তুমি ডহরকুণ্ডুতে যাও ; যতটা পার ছেলে পড়াবে আর ধ্যানভজন করবে।

আমি—মা, আমার ইচ্ছা কোন জায়গায় গিয়ে সাধনভজন করি, কিন্তু শরীর ভাল নয়।

মা—এখন কিছুকাল সামান্য কাজ নিয়ে থাক ; যখন মনে প্রবল ইচ্ছা হবে তখন যেও।

আমি—জপ তো করি, কিন্তু মন বসে না।

মা—মন বসুক না বসুক, জপ করবে। রোজ যদি এত (সংখ্যা) করে জপ করতে পার তো ভাল হয়।

আমি—আপনি আশীর্বাদ করুন, যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন পাই।

মা—তুমি তো স্বপ্নে দেখেছ ; তা দর্শন পাবে।

আর একদিন জয়রামবাটী যাইতে যাইতে চিন্তা করিতেছি যে যদি মায়ের একটু সেবা করিতে পারি তো বড় আনন্দ হয়। গিয়া দেখি মা তেলের বাটিটি কাছে রাখিয়া পা দুখানি মেলিয়া বসিয়া আছেন। আমি ঐ তেল মায়ের পায়ে মাখাইতে লাগিলাম। মা বলিলেন, "দেখ, এই পা-টায় একটু জোরে মাখাও তো ; এটাতে বড় বেদনা হয়।" আমার উহা করিতে প্রায় পঁচিশ মিনিট লাগিল। মা বলিলেন, "এবার হয়েছে তো ? এখন নাইতে যাই, ঠাকুরের পূজা করতে হবে। তুমি এখানে খাওয়া-দাওয়া করে যেও।"

আমি বলিলাম, "না, মা, এখনই যেতে হবে, আর একদিন আসব।" মা বলিলেন, "না, না, আমি বলছি ; কেদার বুঝি বারণ করেছে ? আমার কথা শুনবে, না তার কথা শুনবে ? তুমি কেদারকে বলো, মা আসতে দিলেন না।"

—স্বামী তন্ময়ানন্দ

(১৭)

১৯১৪ সালের মার্চ মাসে ঠাকুরের উৎসবের দুই-তিন দিন পরে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনমানসে একদিন বৈকালে বরিশালের জনৈক ভক্তের পরিচয়-পত্র সহ 'উদ্বোধন' কার্যালয়ে উপস্থিত হইলাম। রাসবিহারী মহারাজ পত্রখানি পড়িয়া মায়ের নিকট গেলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া আমাকে মায়ের আদেশ জ্ঞাপন করিলেন, "দীক্ষা নেওয়ার উদ্দেশ্য সরলভাবে সাধনভজন করে ভগবানলাভ কবতে চেষ্টা করা, কুলগুরুর বৃত্তি নষ্ট করা নয়। আমি ঐ ছেলেকে দীক্ষা দিলে সে যেভাবে আমাকে ভক্তি করবে, ঐভাবে যদি তার কুলগুরুকেও শ্রদ্ধা করে এবং তাঁর বার্ষিক বৃত্তি যথাশক্তি বাড়িয়ে দিতে রাজি থাকে, তাহলে হতে পারে।" আমি উহাতে সম্মত হওয়ায় মহারাজ আমাকে লইয়া মায়ের নিকট গেলেন। ইহার দুই দিন পরে আমি মায়ের কৃপালাভ করিলাম। দীক্ষার পর সপ্তাহকাল পর্যন্ত একটা অনির্বচনীয় ভাবে আমার মন বিভোর হইয়াছিল।

দীক্ষার সময় মা জিজ্ঞাসা করিযাছিলেন, 'শাক্ত না বৈষ্ণব?' আমি উত্তর দিলে তিনি যে মন্ত্র আমায় দিলেন, সাত-আট বৎসর পবে আমার জননীর নিকট প্রশ্ন করিয়া জানিয়াছিলাম যে, উহাই আমাদের কৌলিক মন্ত্র--মা শুধু উহাতে বীজ সংযোগ করিয়া দিয়াছিলেন।

ইহার দুই মাস পরে আমার স্ত্রীর দীক্ষা লইবার আগ্রহ হওয়ায় তাহাকে লইয়া শ্রীশ্রীমায়ের নিকট যাই। মা তাহাকে বলিলেন, "তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার কোলে একটি ছেলে আছে। তাকে কার কাছে রেখে এসেছ?" স্ত্রী বলিল, "খোকা এসে এস্থান অপবিত্র করে ফেলবে, এই ভয়ে তাকে আনিনি।" শিশুটি মাত্র তিন মাসের, ইহা জানিযা মা আমাব স্ত্রীকে বলিলেন, "সে কি গো, এতটুকু ছেলের মলমূত্রে ঘর অপবিত্র হয়, একথা তোমাকে কে বললে? ওরা নারায়ণের মতো। ওদের ঐরকম জ্ঞানে যত্ন করবে। তুমি এখনই বাসায় যাও। নচেৎ খোকা স্তনের অভাবে গলা শুকিয়ে মারা যেতে পাবে। চারদিন পরে এসো। ঠাকুরের ইচ্ছে হলে তোমার দীক্ষা হবে। কিন্তু খোকাকে সঙ্গে আনতে ভুলো না।"

আমি নিচের তলায় বসিয়া ভাবিতেছি, মা যদি কিছু খাইতে খাইতে আমাকে প্রসাদ দেন তাহা হইলে বুঝিব তিনি আমাকে খুব ভালবাসেন। আধ ঘণ্টা পরে মাকে প্রণাম করিতে গিয়া দেখি তিনি একটি সন্দেশ খাইতেছেন। আমাকে দেখিবামাত্র বলিলেন, "বাবা, এইটুকু খেয়ে তারপর প্রণাম কর।" আমি অপ্রত্যাশিতভাবে ঐ প্রসাদ পাইয়া মাকে প্রণাম করিতেই ভুলিয়া গেলাম। কিছুক্ষণ পরে তিনিই আমাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন, "এখনি প্রণাম করে বউমাকে নিয়ে বাসায় যাও।"

মা চারদিন পরে দেখা করিতে বলায় একটু দুঃখিত ও চিন্তিত হইয়াছিলাম। কিন্তু বাসায় আসিয়া স্ত্রীর অবস্থা দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম, মা কেন অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন।

বরিশালে ফিরিবার পূর্বে মাকে প্রণাম করিতে যাই। মা বলিলেন, "সাবধানে যেও। পথে বিপদাদি থেকে ঠাকুর তোমাদের রক্ষা করবেন।" রাস্তায় ভয়ানক ঝড় উঠায় প্রাণসংশয় হইল। বাড়ি পৌঁছিয়া আমাদের সকলেরই ধারণা হইল যে মায়ের আশীর্বাদেই আমরা সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছি।

ইহার এক বৎসর পরে বৈশাখ মাসে জয়রামবাটীতে মাকে পুনরায় দর্শন করি। এইবারই তাঁহার সহিত খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। মা সামনে বসিয়া আদর করিয়া খাওয়াইতেন, আর আমি আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাইতাম।

মায়ের কাছে থাকিয়া ধ্যানজপ করিলে বেশি ফল হইবে মনে করিয়া জয়রামবাটীতে একদিন খুব ধ্যানজপ চালাইলাম। ঐদিন প্রণাম করিবার সময় মা বলিলেন, "মায়ের কাছে এসেছ, এখন এত ধ্যানজপের কি দরকার ? আমিই যে তোমাদের জন্যে সব করছি। এখন খাও দাও, নিশ্চিন্তমনে আনন্দ কর।"

পরদিন ইচ্ছা হইল মায়ের পায়ে ফুলচন্দন দিব। কিন্তু এ বিদেশে এ সব কোথায় পাইব ? এইরূপ ভবিতেছি এমন সময় মামাদের একটি ছোট মেয়েকে দিয়া মা ফুল-চন্দন পাঠাইয়া আমাকে বলিয়া পাঠাইলেন, "ছেলে যদি অঞ্জলি দিতে চায় তাহলে এখন এসে দিতে পারে।"

তৃতীয় দিবস মা পায়ের বেদনায় কষ্ট পাইতেছেন, একটু জ্বরও হইয়াছে। বেলা প্রায় দশটার সময় অপর একটি ভক্ত আসিয়া ঐ বিষয় না জানিয়া মাকে প্রণাম করিলে মা বলিলেন, "আমার পায়ে বড় ব্যথা হয়েছে। পা ছুঁয়ে প্রণাম করো না। ঠাকুর এমনি তোমার কল্যাণ করবেন।" তথায় বিলাস মহারাজ ছিলেন। তিনি মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শাস্ত্রে নাকি অসুস্থাবস্থায় অথবা শায়িতাবস্থায় প্রণাম করতে নিষেধ আছে। ও করলে কি হয় ?" অমনি মা বলিলেন, "হ্যাঁ, বাবা, ওরকম করলে ব্যাধি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কাউকে তাহার অসুস্থাবস্থায় প্রণাম করা উচিত নয়।"

প্রায় তিন বৎসর পরে বড়দিনের ছুটিতে মায়ের জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহার শেষ দর্শনলাভ করি। উৎসবের দিন সকালে মা আমাকে ও কোয়ালপাড়া মঠের জনৈক সাধুকে বলিলেন, "তোমরা কামারপুকুরে শিবুর (শিবরাম দাদার) কাছে যাও। সে তোমাদের এক কলসী দুধ কিনে দেবে এবং কিছু ফুল যোগাড় করে দেবে। তোমরা শিগ্‌গির তাই নিয়ে ফিরে এস।" বিলাস মহারাজ বলিয়া দিলেন, "দেরিতে খেলে মায়ের কষ্ট হয়। কাজেই তোমাদের নটার মধ্যে ফিরতে হবে। নইলে মাকে অঞ্জলি দিতে পাবে না।"

কিন্তু আমাদের ফিরতে সাড়ে-এগারটা বাজিয়া গেল। তখন অঞ্জলি দিতে পাইব না ভাবিয়া বড় দুঃখ হইল। বিলাস মহারাজ আমাদিগকে বিলম্বের জন্য ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "মা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।" ঠিক সেই সময়ে মা কোথা হইতে আসিয়া আমার মাথা হইতে ফুলের ডালাটি লইলেন এবং বলিলেন, "বড় সুন্দর ফুল তো !

এ দিয়ে আগে ঠাকুরপূজা করতে হয়। তোমরা শিগ্‌গির নেয়ে এস।" স্নান করিয়া আসিয়া দেখি, ঐ ফুল আমাদের অঞ্জলি দিবার জন্যই সাজান রহিয়াছে। মায়ের এই অহেতুক স্নেহদর্শনে আমরা মুগ্ধ হইয়া গেলাম।

—শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বরিশাল

(১৮)

১৯০৮ সালের নভেম্বর মাসে জগদ্ধাত্রীপূজার পূর্বদিন আমি দীক্ষাপ্রার্থী হইয়া জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি উপস্থিত হই। মায়ের নিকট সংবাদ যাইলে তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে পরদিন কৃপা করিবেন।

যথাসময়ে আমার দীক্ষা হইয়া গেল। মায়ের আদেশে আমরা কয়েকজন মিলিয়া কামারপুকুর দর্শন করিয়া আসিলাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই একজন স্বামীজীর সহিত সামান্য সামান্য ব্যাপার লইয়া আমার খুব বচসা হইল। বরদা মামা জয়রামবাটীতে ফিরিয়া মাকে সকল কথা বলিয়া দিলেন।

জগদ্ধাত্রী-প্রতিমার সম্মুখে আমি মনের উল্লাসে গান করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে মা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা, তোমার খুব আনন্দের ভাব, তুমি ঐ রকম আনন্দ করেই থাকবে। মা জগদম্বার সামনে যেমন গান গেয়ে আনন্দ করছ ঠিক তেমনি করবে। সাধুটি ঐরকম স্বভাবের—ওর কথায় দুঃখিত হবে না। তবে তোমাকে জীবনে এই কথা কটি স্মরণ রেখে চলতে হবে। ঠাকুরের খুব দয়া, তাই তোমার ছেলেবয়স থেকে তাঁর প্রতি টান আপনি এসেছে। জানবে এই তিনটির সম্বন্ধে খুব সাবধানে চলতে হয়—প্রথম নদীর তীরে বাসস্থান; কোন্ সময় নদী হুস্ করে এসে বাসস্থান ভেঙে নিয়ে চলে যাবে। দ্বিতীয়, সাপ; দেখলেই খুব সাবধানে থাকতে হয়—কখন এসে কামড়ে দেবে তার ঠিক নেই। তৃতীয়, সাধু; তাঁদের কোন্-কথায় বা মনের ভাবে গৃহস্থের অমঙ্গল হতে পারে তা তুমি জান না। তাঁদের দেখলে ভক্তি করতে হয়; কোনও জবাব করে অবজ্ঞা দেখানো উচিত নয়।" মায়ের এই অমূল্য উপদেশ চিরদিনের জন্য হৃদয়ে গ্রথিত রহিয়াছে।

শ্রী—

(১৯)

জয়রামবাটীতে একবার জন্মতিথির দিন সকাল হইতেই মা অসুস্থ বোধ করায় ভাবিয়াছিলেন যে স্নান করিবেন না। কিন্তু পাছে ছেলেরা ইহা শুনিয়া চিন্তিত হয়, এইজন্য

অবশেষে স্নান করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। সন্ধ্যার পর তাঁহার জ্বর হইল। আমি কাছে যাইতেই বলিলেন, "বাবা, প্রথমে মনের কথা শুনবে। প্রথম মনই গুরু। এই দেখ না, আজ সকালে ঘুম থেকে উঠতেই মনে হলো যে শরীরটা খারাপ, আজ আর নাইব না। আবার নানারকম ভেবে শেষে নেয়েই ফেললুম। এখন ভুগছি।"

মা বলিলেন, "ঠাকুর বলতেন, 'খাবে গরম, শোবে নরম'।"

কোয়ালপাড়া মঠে জনৈক বিশিষ্ট ভক্ত একদিন মাকে প্রণাম করিতে গিয়া কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "আমরা পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে যদি ওঁদের ঐরূপ কষ্ট পেতে হয়, তবে তা নাই করলাম।" মা ইহা শুনিয়া বলিলেন, "না বাবা, আমরা তো ঐ জন্যই এসেছি। আমরা যদি পাপতাপ না নেব, হজম না করব, তবে কে করবে? পাপীতাপীদের ভার আর কারা সহ্য করবে? তবে যারা ভাল ছেলে তারা পা ছুঁলে কিছু হয় না। এক একজন আছে, তারা ছুঁলে যেন পা একেবারে জ্বলে যায়। তোমরা পা ছুঁয়ে প্রণাম করবে বইকি, বাবা।"

জয়রামবাটীতে একদিন রাত্রে আমরা খাইতে বসিয়াছি। একটা জোনাকি পোকা প্রদীপের চারিধারে উড়িয়া বেড়াইতেছিল। জনৈক ভক্ত সেটাকে ধরিয়া বাহিরে ছাড়িয়া দিলেন। মা তাহাতে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ওতে অত দয়া করতে হয় না। ওটা মেরে ফেল। এখনি প্রদীপে পড়লে খারাপ হবে।"

—স্বামী মহেশ্বরানন্দ

(২০)

১৯১৫ সালে একদিন 'উদ্বোধনে' শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে যাই। প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে মা বলিলেন, "ঠাকুরের সত্যে কি আঁটই ছিল! আমাদের ওরকম হলো কই? ঠাকুর বলতেন, 'কলিযুগে সত্যই তপস্যা। সত্যকে ধরে থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায়'।"

পর বৎসর জয়রামবাটীতে এক সন্ন্যাসী ভক্তের নৈরাশ্যপূর্ণ পত্রের আলোচনাপ্রসঙ্গে মা হঠাৎ গম্ভীরভাবে তেজের সহিত বলিতে লাগিলেন, "সেকি গো! ঠাকুরের নাম কি চারটিখানি কথা যে অমনি যাবে? ও নাম কিছুতেই ব্যর্থ হবে না। যারা ঠাকুরকে মনে করে এখানে এসেছে তাদের ইষ্টদর্শন হতেই হবে। যদি আর কোন সময়ে না হয় তো অন্ততঃ মৃত্যুর পরক্ষণে হবেই হবে।"

১৯১৮ সালের এক রবিবারে মনের অস্থিরতার জন্য ঠাকুর ও মায়ের উপর বড়ই অভিমান হয়। স্থির করিয়াছিলাম মায়ের কাছে আর যাইব না। কিন্তু বন্ধুগণের নির্বন্ধে 'উদ্বোধনে' যাইতে হইল। গিয়া দেখি, বিস্তর ভক্ত মাকে প্রণাম করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহারা একে একে মাকে প্রণাম করিলেন, কিন্তু মা মুখ ফুটিয়া কাহারও সহিত কথা কহিলেন না। সর্বশেষে আমি প্রণাম করিতেই মা অতি স্নেহে বলিলেন, "ভাল আছ

তো— ?" আমি অভিমানভরে বলিয়া ফেলিলাম, "হ্যাঁ মা, খুব ভাল আছি।" তদুত্তরে মা সহাস্যে আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "সে কি, বাবা। মনের স্বভাবই এই। তার জন্য কি এমনটি করতে আছে।"

আর একদিন আইন পড়িবার কালে মাকে প্রণামান্তে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মা, এই তো আমার মন, তাতে আবার ওকালতি করতে চললাম। কি উপায় হবে?" মা আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "ভয় কি, বাবা? ব্যবসা বই তো নয়।"

—শ্রীললিতমোহন সাহা, ঢাকা

(১১)

উদ্বোধন

ভবানীপুর হইতে পতিপুত্রসহ শ্রীশ্রীমায়ের চরণদর্শনে যাই। দেখি, মা উপরের মাঝের ঘরে চৌকাঠের সামনে দাঁড়াইয়া কাহার সহিত কথা বলিতেছেন। প্রণাম করিতেই বলিলেন, "কোত্থেকে এলে, মা?" যেন কতদিনের পরিচিত। বলিলাম, "ঢাকায় আমাদের বাড়ি।" কথা শেষ না হইতেই গোলাপ-মা রামবাবু ও নিতাইবাবু দর্শন করিতে আসিয়াছেন বলিয়া মাকে ডাকিলেন। কপিল মহারাজ আমাকে বলিয়া গেলেন, "আপনি একটু সরে থাকুন, বলরামবাবুর ছেলে ও ভাইপো এসেছেন, তাদের সঙ্গে মায়ের কথাবার্তা হলে আপনি যা বলতে হয় বলবেন।" নিতাইবাবু মায়ের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সহিত কথা বলিয়াই মা দুটি রসগোল্লা আমার হাতে দিয়া পাশেই ঠাকুর ঘরে রামবাবুর সহিত দেখা করিতে গেলেন। আমি রসগোল্লা দুটি হাতে করিয়াই বসিয়া রহিলাম। রামবাবুর সহিত কথাবার্তা শেষ হইলে মা আমাকে ঠাকুরঘরে ডাকিলেন ও বলিলেন, "খাওনি কেন? প্রসাদ, খেয়ে ফেল।" জনৈক স্ত্রী ভক্ত আসিয়া বলিলেন, "সব মিষ্টিগুলি সকলকে খাইয়ে দিলে, মা, আমরা খাব কি?" আমি তো সঙ্কুচিত, কারণ তখনও আমার হাতে রসগোল্লা দুটি রহিয়াছে। বলিলাম, "আপনি এই দুটি খান।" তিনি বলিলেন, "না, মা, তোমাকে কিছু বলিনি, তোমারটি নেব কেন?" মা তাঁহাকে বলিলেন, "ও – এসব বলো না, ভক্তদের মনে কষ্ট হবে। বহু লোক, দুটি করেও কুলোয়নি। আহা ওরা সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে এসেছে গো।" মা আমাকে বার বার খাইতে বলায় খাইয়া ফেলিলাম। মা নিজেই জল আনিয়া দিলেন, পরে বলিলেন, "রসগোল্লার রস মেজেয় পড়েছে, ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে মুছে ফেল, হাত ধোও।" এ সকল কথা হইলে মা তক্তপোশে বসিলেন ও আমার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি যখন বলিলাম, "আমার একটি ছেলে," সেই

সময় নী—প্রণাম করিতে আসিল। বলিলাম, "মা, এই ছেলে।" নী—প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলে মা বলিলেন, "ছেলের বে দাওনি ?"

আমি—বে হয়নি।

মা—এক ছেলে, বে দাওনি ?

আমি—বে করতে চায় না।

মা—আহা, ছেলেদের আজকাল ঐ এক কথা ' কেন, বে করলে কি সৎ হতে পারে না ? মন দিয়েই সব হয়। ঠাকুর কি আমাকে বে করেননি ? ছেলে দীক্ষা নিয়েছে ?

আমি—হাঁ, আপনাবই তো ছেলে।

মা—হাঁ ! তবে বে কববে না কেন ? আচ্ছা, আমি বলে দেব। দুঃখকষ্টে যেতে চায় না। দুঃখকষ্ট পেয়েও যে ঠাকুরকে ধরে থাকবে, সে অবশ্যই ঠাকুরকে লাভ করবে। তোমাব কি ইচ্ছা তাই বল তো ?

আমি—মা, কিসে তার মঙ্গল হবে তা তো আমি বুঝতে পারি না; আপনি ওর মঙ্গলামঙ্গল জানেন, সুতবাং আপনি যা বলবেন তাই হবে ; আমার অন্য মত নেই।

মা—দেখ, যাদের খুব উঁচু ঘর তারাই সাধু হয়ে সর্ববন্ধনমুক্ত হয়ে যায়, কেউ বা সংসারের আস্বাদ ভোগবার জন্য জন্ম নেয়। আমি বলি, একেবারে ভোগ কেটে যাওয়াই ভাল। ঠাকুরের সাঙ্গোপাঙ্গদের কথা আলাদা।

আমি—মা, ও তো আপনাবই ছেলে, আপনাব হাতেই ওর মঙ্গলামঙ্গলের ভার। আপনি যা করতে হয় করবেন।

মা—আমি বলি কি, ও বে করুক ; ওর সব ভোগ একেবারে কেটে যাক। তা না হলে আবার কখন কি ভোগ এসে জোটে তা বলা যায় না। তবে জেনে রেখো, ঠাকুর যখন ধরেছেন, ওর পতন কিছুতেই হবে না। তুমি নিশ্চিন্তমনে বসে থাক। ঠাকুরের দেওয়া সিদ্ধমন্ত্র ওকে দিয়েছি, ওর কি কখনো অমঙ্গল হতে পারে ?

তারপর বলিলেন, "এখানে প্রসাদ পাবে তো ?" আমি 'হাঁ' বলায় মা ভাঁড়ারীকে বলিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

মা—কার কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছ ? ঠাকুরের নাম কার কাছে শুনেছ ?

আমি—দেওভোগে নাগ মহাশয়ের কাছে আমরা যাই এবং সেখানেই তাঁর কাছে ঠাকুরের মাহাত্ম্য শুনি। তাঁর ভাব দেখে মনে সকল সময়ই ঠাকুরকে ও আপনাকে দেখবার জন্য বড়ই আকাঙ্ক্ষা হতো। ঠাকুরের চরণদর্শনের সৌভাগ্য হয়নি; আপনার কৃপায় আপনার চরণদর্শন হলো এবং ঠাকুরকে দেখার আকাঙ্ক্ষা আমার তৃপ্ত হয়ে গেল। দীক্ষা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হয়নি।

মা—স্বপ্নে পেয়েছ তো ?

আমি—হাঁ, মা, স্বপ্নে আপনাকে দর্শন করেছি ও দীক্ষা পেয়েছি।

মা—আচ্ছা, মন্ত্র কি, মনে আছে তো ? আমাকে বলে ফেল।

আমি বীজটি বলিতেই মা বলিলেন, "হাঁ, এই তোমার ঘর ; বেশ বেশ, তুমি ভাগ্যবতী।"

আমি—মা,আর কিছু বলবেন না ?

মা—না, ঐ বীজই জপ করবে, ওতেই তোমার কল্যাণ নিশ্চয় জেনে রেখো। কার সঙ্গে এলে ?

আমি—আমার স্বামীর সঙ্গে।

মা—তিনি কোথায় থাকেন ? কি কাজ করেন ?

আমি—তিনি রা—বাবুদের এস্টেটে ম্যানেজার।

মা—ওমা, তুমি ম্যানেজার বাবুর স্ত্রী ? এতক্ষণ বলনি কেন ? ও রাধু, ও মাকু, ম্যানেজার বাবুর স্ত্রীকে এসে প্রণাম কর।

আমি মায়ের কাণ্ড দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া বলিলাম, "মা, এ বলেন কি ? আমি যে কায়স্থসন্তান, এরা ব্রাহ্মণের সন্তান হয়ে কি করে আমাকে প্রণাম করবে ?" মা বলিলেন, "ওসব বলতে নেই। তুমি ভক্ত মানুষ, ভক্তের জাত নেই ; তোমাকে প্রণাম করলে ওদের কল্যাণ হবে।" রাধু ও মাকু আসিলে আমি তাহাদের পা জড়াইয়া ধরিতেই মা বলিলেন, "থাক, থাক, দেবে না। ওরা ভক্ত কিনা, তাই সর্বভূতে ঠাকুরকে দেখছে। আচ্ছা, দেওভোগে দুর্গার কাছে কি শুনেছ ? তার কাছে তোমার যাওয়া-আসা ও পরিচয় কি করে হলো ?"

আমি—আমার স্বামী সাধুদর্শনে সেখানে একবার গিয়েছিলেন ; তাতেই নাগ মহাশয় তাঁকে আপনার করে নিয়ে ঠাকুরের কথা পুনঃপুনঃ বলেন ও আমাকে দেখতে দয়া করে আমাদের বাড়িতে যান। তাঁর ভাব ও ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে আমরা বহুদিন তাঁর কাছেই যাতায়াত করি। তিনিও দয়া করে আমাদের আপনার করে নেন এবং আপনার ও ঠাকুরের মাহাত্ম্য আমাদের কাছে বলেন। তাতেই প্রাণের ভিতর আপনাদের উপর আমরা আকর্ষণ অনুভব করি। তিনি কেবলই বলতেন, 'আমি কিছু না, ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবই আমার সব। যদি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা কর, মনে প্রাণে শরণাপন্ন হও ; এ ছাড়া অন্য গতি নেই। অদৃষ্টে ছিল, ঠাকুরের ঐ শ্রীচরণদর্শন করেছিলুম, তাই ধন্য হয়ে গেছি। শিবাবতার স্বামীজীকে সাক্ষাৎ দর্শন করেছি, সাক্ষাৎ মা ভগবতীকে দর্শন করেছি ও মায়ের কৃপা পেয়েছি। আর কি বলব, তোমরা সকলে কায়মনপ্রাণে মা ও ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে শরণ নাও, কল্যাণ হবে।'

মা—আহা, তার কথা আর কি বলব ? আমাকে সাক্ষাৎ ভগবতী ভাবে দেখত। প্রথম যে দিন আমাকে দর্শন করতে এল, আমার ছিল একাদশী। তখন কোন পুরুষ ভক্ত আমাকে সাক্ষাৎ দর্শন করতে পেত না, সিঁড়িতে মাথা ঠুকে প্রণাম করত। একজন ঝি এসে নাম বলে আমাকে বলত, 'মা, তোমাকে অমুক বাবু প্রণাম কচ্ছেন।' আমিও আশীর্বাদ

জানাতুম। সে দিন ঝি বললে, 'মা, নাগ মহাশয় কে? তিনি প্রণাম কচ্ছেন, কিন্তু মাথা এত জোরে ঠুকছেন, মনে হয় রক্ত বেরবে। মহারাজ পেছন থেকে কত বলছেন থামবার জন্য, কিন্তু কোন বাক্যই নেই, যেন হুঁশ নেই। পাগল নাকি, মা?' আমি বললুম, 'ওগো, যোগেনকে বল এখানে পাঠিয়ে দিতে।' যোগেন নিজেই ধরে নিয়ে এল। দেখি কপাল ফুলে গেছে, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, হেথায় পা ফেলতে হোথায় পড়ে, চোখের জলে আমায় দেখতে পাচ্ছে না। আমি ধরে বসালুম। কেবল 'মা, মা' শব্দ—যেন পাগল, অথচ শান্ত ধীর স্থির। চোখের জল মুছিয়ে দিলুম। আমার খাবার ছিল, লুচি, মিষ্টি, ফল। আমি খেতে বসেছিলুম, এমন সময়ে এই ঘটনা। আমি কিছু খেয়ে তাকে খাইয়ে দিতে লাগলুম। খেতে পারে না গো, খাবার জিনিস গিলতে পারলে না। বাইরের দিকে মন নেই, কেবল 'মা, মা' রব, আর আমার পায়ে হাত দিয়ে বসে রইল। আমাকে মেয়েরা বলতে লাগল, 'মা, তোমার তো খাওয়া হলো না। মহারাজকে বলি একে সরিয়ে নিতে।' আমি বললুম, 'থাক, একটু স্থির হয়ে নিক।' খানিক বাদে গায়ে মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে ও ঠাকুরের নাম করতে করতে তার হুঁশ এল। আমিও খেতে লাগলুম, ওকেও খাইয়ে দিতে লাগলুম। খাওয়া হলে তাকে নিচে নিয়ে গেল। আমাকে কেবল যাবার সময় বলে গেল, 'নাই, নাই, তুহু তুহু।' যারা কাছে ছিল তাদের আমি বললুম, 'দেখ কি বুদ্ধি! আমার জন্যে সব করতে পারত গো।'

একবার একখানা ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরে মাথায় করে বাড়ির গাছের ভাল ভাল আম এক টুকরি নিয়ে এল। মনের ভাব বসে আমাকে খাওয়াবে, কিন্তু মুখে কিছুই বলা নেই। টুকরি মাথায় নিয়ে এখানে ওখানে কাঙালের মতো ঘুরছে। যোগেন বলে পাঠালে, 'মাকে বল নাগ মহাশয় আম নিয়ে এসেছেন। কিছু বলেনও না, কারও কাছে দেনও না।' আমি বললুম, 'এখানে পাঠিয়ে দাও।' পাঠিয়ে দিলে টুকরি মাথায় করেই এল। একজন ব্রহ্মচারী মাথা থেকে টুকরি নামিয়ে নিলে। তখনও ঠাকুরপূজা হয়নি। আমাকে প্রণাম করেই পূর্ববারেরই মতো বেহুঁশ, মুখে ঠাকুরের নাম ও 'মা' 'মা' রব। দু চোখ বয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। খুব ভাল আম—কতকগুলিতে চুনের ফোঁটা দেওয়া, কেটে ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হলে মেয়ে যোগেন এসে আমাকে একখানা শালপাতায় করে প্রসাদ দিলে। আমি কিছু খেলুম ও গোলাপকে বললুম, 'আর একখানা শালপাতা দাও।' পাতা দেওয়া হলে পাত থেকে প্রসাদ উঠিয়ে দিয়ে বললুম, 'খাও।' কে খাবে, তার শরীরে হুঁশ নেই, হাত যেন অবশ। আমি ধরে অনেক বলতে বলতে খেলে তো না-ই, একখানা আম নিয়ে মাথায় ঘষতে লাগল। আমি নিচে বলে পাঠাতেই তারা লোক পাঠিয়ে নিয়ে গেল। প্রণাম করতে করতে কপাল ফুলিয়ে দিলে, অন্নপ্রসাদ আর নিলে না। কিছু বাদে হুঁশ হতেই নাকি চলে গেছে, খবর পেলুম।'

একটু পরেই পাতা হইল। মা বলিলেন, "এস, প্রসাদ পাবে।" মায়ের পিছু পিছু খাবার

ঘরে গেলে মা বলিলেন, "এস, আমার মুখো হয়ে অপর পংক্তিতে বস।" মা মাখন দিয়া ভাত মাখিয়া তিন গ্রাস মুখে দিয়াই আমাকে বলিলেন, "প্রসাদ নেবে, হাত পেতে নাও।" ডান হাত বাড়াইতেই মা বলিলেন, "ও রকম করে কি প্রসাদ নেয়? দু-হাত পেতে নাও।" আমি দুই হাত পাতিলে মা সমস্ত মাখন-মাখান ভাত আমার হাতে চাপিয়া দিয়া বলিলেন, 'মাথায় ছুঁইয়ে খেয়ে ফেল।' আমি তো অবাক। বলিলাম, "মা, আমি কায়স্থ, আমাকে তো খেতে খেতে ছুঁয়ে দিলেন। এখন আপনার কি করে খাওয়া হবে?" মা বলিলেন, 'তোমাদের সঙ্গে আবার আমার জাতের বিচার কি? তোমরা যে আমারই সন্তান। প্রসাদ খেয়ে ফেল।" তখন আমি লজ্জিতভাবে প্রসাদ খাইতে লাগিলাম। মা খুব প্রসন্নভাবে হাসিতে ও কথা বলিতে লাগিলেন এবং মাঝে মাঝে আমার কি চাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

মা—হাঁগা, তোমাদের দেশে তীর্থ নেই?

আমি—না মা, তীর্থ কই, দেখি না তো। তবে একটি স্নান আছে, তাকে ব্রহ্মপুত্র স্নান বলে।

মা—হাঁ ও কথা শুনেছি বটে। আচ্ছা, এবার আমাকে নিয়ে যেও, তোমাদের দেশও দেখে ওসব তীর্থও করা হবে।

আমি—মা পূর্ববঙ্গের কি সে সৌভাগ্য হবে?

মা—কেন হবে না? সেখানে ঠাকুরের অনেক ভক্ত আছে। নরেন গেছে, শরৎ গেছে, আরও ওরা অনেকে গেছে। যেখানে ঠাকুরকে চায়, সেখানে আমি যাব না কেন?

ছোলার ডাল, চচ্চড়ি, ডালনা ও টক—ইহাই ছিল প্রসাদ। মা বলিলেন, 'এদের মাছ এনে দাও।'

আমি—না মা, প্রসাদ খেয়েই তৃপ্ত হয়েছি, মাছ আর খাব না।

মা—সেকি গো, এয়োস্ত্রী মানুষ, মাছ খাবে না। পায়ে আলতা পরনি কেন?

আমি—আমাদের দেশে আলতা পরার চল নেই। শাঁখা, সিঁদুর পরলেই লোকে এয়োস্ত্রী বলে।

মা—তা হবে, এদেশে শাঁখা, সিঁদুর সখ করে পরে, নোয়া আর আলতাই এয়োস্ত্রীর লক্ষণ।

দুধ, একটি আম ও একটি সন্দেশ মাকে দেওয়া হইয়াছিল। মা উহা একত্র মাখিয়া একটু খাইয়া বলিলেন "ছেলের (নী—র) জন্যে রইল।" এবার আচমনের পালা। আমি পাতা তুলিতেই লক্ষ্মী দিদি তাড়াতাড়ি আমার পাতা ধরিয়া বসিলেন। আমি দিব না, তিনিও ছাড়িবেন না। মা দাঁড়াইয়া বলিলেন, "দাও, লক্ষ্মীই নিক। তুমি সকলের বড় বয়সে, ওরা থাকতে তুমি কেন নেবে?" তখন বাধ্য হইয়া ছাড়িয়া দিতে হইল। মায়ের সঙ্গে কলতলায় যাইতেই তিনি ঘটিতে করিয়া বালতি হইতে জল উঠাইয়া দিয়া বলিলেন, 'আঁচিয়ে নাও।'

আমি তো অপ্রস্তুত ! বলিলাম, "মা, আমি পারব না।" মা বলিলেন, "কেন পারবে না ?" আমার কথা মেনে চললেই তোমাদের কল্যাণ। নাও, শিগগির ক'রে আঁচিয়ে ফেল, ওরা পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। ঘটিটা মাথায় ঠেকিয়ে নাও না।" অগত্যা মায়ের আদেশই বলবৎ রহিল। আমি সরিয়া যাইতেছি দেখিয়া মা বলিলেন, "ওকি, পা ধুলে না ?" বলিলাম, 'পরে ধোব।' মা বলিলেন, "না না, এস, জল দিচ্ছি।" এবার আমি মায়ের পিছনে যাইয়া বলিলাম, "মা, আমি ওসব পারব না।" মা বলিলেন, "কেন কি হয়েছে ? খানিকটা জল মাথায় দিয়ে নাও। আমার কথা মানলে তোমাদের মঙ্গল হবে।" অগত্যা সেইরূপ করিয়া মায়ের আদেশে তাঁহার পিছনে পিছনে তাঁহার ঘরে চলিলাম।

ঘরে ঢুকিতেই মা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া একটু পরেই বলিয়া উঠিলেন, "ও—কি করলে ? ছেলে এসে কি খাবে ?" দেখি নী—র জন্য যে প্রসাদ মা রাখিয়াছিলেন, জনৈক স্ত্রীভক্ত আনন্দে তাহাই খাইতেছেন, এবং বলিতেছেন, "সবই ওঁর ছেলেরা খাবে, আর আমরা শুকিয়ে মরব !" দেখিয়া আমার যা হাসি ! শেষে লক্ষ্মীদিদি ও অন্যান্য মেয়েরাও হাসিতে লাগিলেন। আমার তো হাসি আর থামে না। মা কিন্তু বিশেষ চিন্তিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, পাচক হেঁশেল তুলিয়াছে কি-না এবং না তুলিয়া থাকিলে কি আছে। ভাত, ডাল ও চচ্চড়ি আছে শুনিয়া মা বলিলেন. "আচ্ছা, খানিকটা এখানে দিতে বল।" ব্রাহ্মণ একখানি থালায়.করিয়া উহা দিয়া গেলে মা সব একসঙ্গে মাখিয়া একটু মুখে দিয়া ঢাকিয়া রাখিলেন এবং বলিলেন, "ছেলের জন্য রইল।" আমি পিছনে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছি, তিনি দুইবার ভাত খাইলেন কিরূপে ? আরও ভাবিতেছি, কি করিয়া মায়ের একটু সেবা করিব। তাঁহার জল লইয়া আঁচান ও পা ধোযা হইল, অথচ তাঁহাব সেবা কিছুই করিতে পারিলাম না। মায়ের পিছনে চলিযাছি। মা ঠাকুরঘবে গিয়া আমাকে বলিলেন, "কপাটের উপর আমার গামছাখানা আছে, নিয়ে এস। আমার পাটা মুছে দাও।" এই কথা শুনিয়া আমি আনন্দে আত্মহারা হইলাম। আমি ঐরূপ করিতেই মা বলিলেন, "আচ্ছা, তক্তপোশে বসি, তুমি ভাল করে আমার পায়েব তলাখানা মুছে দাও।" আমি মায়ের পা দুখানি মুছিতে মুছিতে মাথায় ঠেকাইতে লাগিলাম। মা একটু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, এখন থাক।"

লক্ষ্মী দিদি পান লইয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ধন্য মেয়ে তুমি, মা যেচে কৃপা দিলেন ; ধর একটি পান খাও।" আমি চোখের জলে পান দেখিতে পাইলাম না। মা পানটি আনিয়া আমাকে দিয়া বলিলেন, "ঐ মাদুরখানা মেজেয় পাত, ঐ শতরঞ্চিখানা বিছিয়ে দাও, বালিস তিনটি দাও।" বিছানা হইলে মা শুইয়া পড়িলেন। আমি বসিয়া মায়ের পায়ে হাত বুলাইতেই মা বলিলেন, "এখন আমার পাশে শুয়ে পড়।" আমি সঙ্কুচিতা হইতেছি দেখিয়া মা বলিলেন, "আমার বালিশেই মাথা রেখে শোও।" আমি বলিলাম, "না, মা, ঘুমিয়ে পড়লে আপনার গায়ে পা লাগতে পারে, আমি শোব না।" মা বলিলেন, "সেকি

গো? আমি বলছি, তুমি শুয়ে পড়।" কি করি মায়ের আদেশই পালন করিতে হইল। মা বলিলেন, "তোমাকে দেখে বড়ই আনন্দ হলো, যেমন অনেকদিন পরে শ্বশুরঘর থেকে মেয়ে এলে মায়ের আনন্দ হয়। আচ্ছা, কবে যাবে?" আমি বলিলাম, "আজকে সন্ধ্যায়ই যাব, মা, মনে রাখবেন; জানবেন আমি আপনার ভিখারিণী মেয়ে" বলিয়াই কাঁদিতে লাগিলাম। মা বলিলেন, "ষাট, ষাট, ও কথা কেন বল, মা; তুমি আমার রাজরানী মেয়ে। তোমাকে আমি নিজে গিয়ে দীক্ষা দিয়েছি। তোমার দুঃখ করবার কিছু নেই। তোমার ভালমন্দ সবই আমি দেখব, তুমি কোন চিন্তা করো না।"

বেলা চারটার সময় রাধু স্কুল হইতে আসিল। তাহার খাওয়া-দাওয়া হইলে মা তাহাকে বলিলেন, "এস, চুল বেঁধে দিচ্ছি।" রাধু বলিল, "না, আমি নিজেই বাঁধব।" মা চিরুনি লইয়া চুলে হাত দিতেই রাধু চিরুনি দ্বারা মাকে মারিতে লাগিল। মা বলিলেন, "পাগল মেয়ে, একে কি করি বল!" যোগেন-মা আসিয়া মাকে প্রণাম করিলেন। রাধু মাকে মারিতেছে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "সেকি কথা! আমাদের মাকে রাধু কেন মারবে? আমি ওকে মেরে ফলব।" তবু রাধু ছাড়িতেছে না। তখন মা বলিলেন, "এখন শরৎকে ডাকি, আর তো ব্যথা সইতে পারি না।" যোগেন-মা ডাকিয়া বলায় পূজনীয় শবৎ মহারাজ নিচের ঘর হইতে বাহির হইযা বলিতে লাগিলেন, "এই রাধু মাকে মেরো না।" তাঁর স্বর শুনিয়াই রাধু তাড়াতাড়ি সরিয়া বসিল। কুসুম দিদি বলিলেন, "এস, আমি বেঁধে দিচ্ছি।" রাধুও শান্ত মেয়েটির মতো তাঁহার কাছে ঘেঁসিয়া বসিল। এমন সময়ে রাধুর মা আসিয়া বলিলেন, "দেখ গো, তোমার একটি ছেলে যেন কি নিয়ে এয়েছে। যদি কাপড় এনে থাকে, আমার মশারির চাঁদোয়া করব!" সত্যই নী—ফল, মিষ্টি ও কাপড় লইয়া আসিয়াছে। সে মাকে প্রণাম করিতেই মা বলিলেন, "আহা! বেশ কাপড, বেশ মিষ্টি ফল। ও গোলাপ, এসব নিয়ে তুলে রাখ। ঠাকুর উঠলে ভোগ হবে। আহা! ছেলের মুখখানা শুকিয়ে গেছে। এখন হাত-মুখ ধুয়ে প্রসাদ খেয়ে এস। বাবা, বেঁচে থাক, ভক্তি হোক। কিন্তু তোমাকে বে করতে হবে।" নী—প্রণাম করিয়া নিচে গেল। গোলাপ-মাও প্রসাদের থালা লইয়া নিচে গেলেন। রাধুর মা আসিয়া বায়না ধরিলেন, "দাও না গো কাপড় দুখানা, আমি মশারির চাঁদোয়া করব।" মা বলিলেন, "তা কি হয়? ছেলে মনে দুঃখ পাবে।" পরে কুসুম দিদিকে বলিলেন, "একখানা কাপড় দাও তো, পরব।" যোগেন-মা বলিলেন, "ভাগ্য দেখ এদের। এরা কারা গো? একদিন এসেই এত দয়া পেয়ে গেল! ধন্য মেয়ে তুমি, তোমাকে প্রণাম করতে ইচ্ছে যাচ্ছে।" আমি তো জড়সড়—ইনি আবার কি বলেন! মা বলিলেন, "এরা পূর্ব্ববঙ্গের লোক, এদের ভারি বিশ্বাস; এদের দেখলেও কল্যাণ হয়।" আমি গামছা দিয়া মায়ের পা দুখানি আবার মুছাইয়া দিলাম। মা কাপড়খানি পরিয়া আসনে বসিয়া ঠাকুরকে বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুর এদেব মঙ্গল কর। এরা তোমাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসে। এই সাত

সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে আমার কাছে এসেছে।" পরে মা আমাকে লইয়া বসিলেন এবং বলিলেন, "কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে কি?"

আমি—মা, ছোট ছোট বিধবা মেয়েরা মাছ খেলে—এ দেখে আশ্চর্য হলুম। আমাদের দেশে তো এ রকম মাছ খেতে দেয় না, সমাজে বাধে।

মা—ও সব কি জান? দেশাচার ও লোকাচার। আমাদের দেশে ছোট বিধবাদের মাছ খেতে ও গহনা, কাপড় পরতে দেয়। ওদের আকাঙ্ক্ষা থাকে কিনা। না হলে চুরি করে খাবে। যখন বুঝতে পারবে এটা সমাজবিরুদ্ধ, তখন ছেড়ে দেবে।

আমি—মা, ভোগের আকাঙ্ক্ষা কি যায়?

মা—না, মা, তা সত্য বলেছ। তবু বড় হলে দশজনকে দেখে লজ্জা হয়, ঝগড়া-বিবাদের সময়েও অপরের খোঁটা সইতে হয়, তাই আপনি সামলে চলে।

আমি—আচ্ছা, মা, আপনি বামুনের মেয়ে হয়ে দুবার ভাত খেলেন—মুখ এঁটো করলেন?

মা—সেকি গো, কখন দুবার খেলুম?

আমি—এই যে খোকাকে প্রসাদ করে দেবার সময়?

মা—ছেলেদের কল্যাণের জন্য আমি সব করতে পারি। ওতে কোন দোষ হয় না। আর প্রসাদ হলে পাঁচবারও খেতে দোষ নেই। প্রসাদ কোন বস্তুর মধ্যে নয়। ঐ সব খুটিনাটি নিয়ে মনকে বিচলিত করবে না, ওতে ঠাকুরকে ভুল হয়ে যায়। যে যা বলে বলুক, ঠাকুরকে স্মরণ করে যেটা হিতকর বুঝবে, তাই করবে। ঠাকুর বলতেন, 'লোককে দেখবে পোকের মতো।' তাই বলে সকলকে নয়, নিন্দুক লোকের ও হীন সংস্কার যাদের, তাদের কথাই বলেছেন।

আমার বাড়ি যাইবার সময় হইল। গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। মা সজলনয়নে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, 'আবার এসো।' আমার যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল না, মায়ের পা দুখানি জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। মা বলিলেন, 'কেঁদো না মা আমি তো তোমাদেরই আছি। আবার এসো।' মাকে আমার এই প্রথম ও শেষ দর্শন। মায়ের আশীর্বাদ ও স্নেহমাখা সান্ত্বনা-বাক্যই আমার জীবনের সম্বল হইয়া আছে।

—শ্রীমতী সুশীলা মজুমদার, ঢাকা

(২২)

কাশীতে 'বেণীমাধবের ধ্বজা' দেখিয়া মা বলিয়াছিলেন, "আমাকে এখন এমন অসমর্থ দেখছ, কিন্তু ঠাকুরের শরীরত্যাগের পর আমি যখন কাশী এসেছিলুম, তখন এই

বেণীমাধবের ধ্বজার উপর উঠেছিলুম। হরিদ্বারে চণ্ডীর পাহাড় আর পুষ্করে সাবিত্রী পাহাড়েও উঠেছিলুম।

জনৈক সাধু কাশীতে মণিকর্ণিকায় খুব তপস্যা করিতেছিলেন। আমি কলিকাতা আসিবার সময় তিনি আমাকে বলিলেন, "মাকে জিজ্ঞাসা করো কতদিনে ভগবানের কৃপা আমার উপর হবে।" আমি মাকে ঐ কথা বলায় মা গম্ভীর হইয়া বলিলেন, 'তাকে লিখে দাও যে, তপস্যা করছ বলেই যে ভগবানের কৃপা হবে, এমন নয়। আগে ঋষিরা ঊর্ধ্বপদে হেঁটমুণ্ড হয়ে নিচে আগুন জ্বেলে হাজার হাজার বছর কত তপস্যা করত; তাতে কখনো কারও উপর কৃপা হতো, কখনো বা হতো না। সবই তার দয়ার উপর নির্ভর করে।"

উদ্বোধনে একদিন একটি যুবক ভক্ত মাকে সাধু হইবার ইচ্ছা জানায়। মা একটু হাসিয়া নিকটস্থ একজন সাধুকে দেখাইয়া বলিলেন, "সকলেই যদি সাধু হবে তবে এদের দেখবে কে? এদের সব খাওয়া পরা কে দেবে?" ছেলেটি পরে বিবাহ করিয়াছে।

একবার ঠাকুরের সময়ে জনৈক বিশিষ্ট গৃহস্থ ভক্তের সহিত আমার কাশী যাইবার কথা উঠে। তাহাতে আমার পাথেয় খরচ তিনিই বহন করিবেন। মা শুনিয়া আমায় বলিলেন, "তুমি সাধু, তোমার কি আর যাওয়ার ভাড়া জুটবে না? ওরা গৃহস্থ, ওদের সঙ্গে কেন যাবে? এক গাড়িতে যাচ্ছ, হয়তো বললে, 'এটা কর, ওটা কর।' তুমি সন্ন্যাসী, তুমি কেন সে সব করতে যাবে?"

আর একবার মায়ের কলিকাতার বাড়ি হইতে আমার কাশী যাওয়ার কথা হয়। ঐ সম্বন্ধে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলে মা বলিয়াছিলেন, "দেখ, কলকাতায় সকাল থেকে উঠেই লোকে চাকরি-বাকরি ও ব্যবসা করতে ছুটেছে, আর কাশীতে সকাল থেকেই সকলে গঙ্গাস্নান, বিশ্বনাথদর্শন, জপধ্যান—এই সব নিয়ে আছে।" আমি বলিলাম, "এখানে আপনার সেবায় রয়েছি।" মা তাহাতে বলিলেন, "হাঁ, যে কয়দিন শরীর আছে, তাও বটে।"

একদিন প্রসঙ্গক্রমে মা বলিলেন, "ঠাকুরের চুল কি কম জিনিস! তাঁর শরীরত্যাগের পর যখন প্রয়াগ যাই,* তখন তাঁর চুল তীর্থে দেবার জন্যে সঙ্গে নিয়েছিলুম। গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে স্থির জলের কাছে ঐ চুল হাতে নিয়ে জলে দেব মনে করছি, এমন সময় হঠাৎ একটি ঢেউ উঠে ওটি আমার হাত থেকে নিয়ে আবার জলে মিলিয়ে গেল। তীর্থ পবিত্র হবার জন্যে তাঁর চুল আমার হাত থেকে নিয়ে গেল।"

একদিন আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মা, যাদের মন্ত্রদাতা গুরু ও সন্ন্যাসের গুরু পৃথক, তারা কাকে গুরুরূপে ধ্যান করবে?" মা উত্তরে বলিলেন, "মন্ত্রদাতা গুরুই গুরু, এই মন্ত্র থেকেই ক্রমে ত্যাগ, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস লাভ হয়।"

—স্বামী শান্তানন্দ

* বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পথে মা অযোধ্যা ও প্রয়াগে নামিয়াছিলেন (১৮৮৭)

(২৩)

এক রবিবার শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিবার প্রবল আগ্রহে বেলা ২।। টার সময় কলিকাতার বাসা হইতে রওনা হইয়া ঘর্মাক্তকলেবরে 'উদ্বোধন' অফিসে উপস্থিত হইলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—মা কোথাও গিয়াছিলেন, এইমাত্র ফিরিয়াছেন, একটু দেরিতে দেখা হইবে। কিন্তু আমার দেরি সহিল না। আমি দেখা করিতে যাইতেছি দেখিয়া পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ (তিনি সিঁড়ির কাছে ছিলেন) আমাকে যাইতে নিষেধ করিলেন। আমার তখন যুবা বয়স, হঠাৎ উত্তর দিলাম, "মা আপনার একার ?" মহারাজকে সরাইয়া দিয়া উপরে গেলাম। গিয়া দেখি মা পাখা করিতেছেন। আমি প্রণাম করিলে মা কুশল প্রশ্ন করিলেন এবং বলিলেন, "খুব যে ঘেমেছ।" উত্তর দিলাম, "পথে রৌদ্র ও গরম ছিল।" মায়ের নিকট হইতে পাখাখানি লইয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পর মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আজ কোথায় গিয়েছিলেন ?" মা বলিলেন, 'কালীঘাট।' তারপর বলিলেন, "কিছু প্রসাদ খাও, পরে কথা কইব।" প্রসাদ খাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, স্বরূপ-মানুষ ও দেবতার মধ্যে তফাত কি ?"

মা—মানুষই দেবতা হয়। কর্ম করলে সবই সম্ভব হয়।

আমি—কি রকম কর্ম ?

মা—ঠাকুরের বিধিনিষেধ মেনে অভীষ্টদেবতায় নিষ্ঠা রেখে ডাকলে সবই হয়ে যায়।

আজ আর কথা বলিতে পারিলাম না, কারণ দুই-এক জন স্ত্রীভক্ত আসিতেছেন। আমি প্রণাম করিয়া বিদায় লইবার সময় বলিলাম, "মা, আজ বড় অন্যায় করে এসেছি। সিঁড়ি দিয়ে আসবার সময় শরৎ মহারাজকে ধাক্কা দিয়ে এসেছি। কি করে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করব ? আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।" মা বলিলেন, "ছেলেদের আবার অপরাধ কি ? আমার ছেলেরা এমন নয় যে অপরাধ ধরবে। তুমি এজন্য ভেবো না।" নামিয়া আসিতেই মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ক্ষমা চাহিলাম। তিনি আমার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "এই রকম উৎকণ্ঠাই চাই" এবং আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। তারপর বলিলেন, "এখন থেকে তোমায় কেউ কোন বাধা দেবে না।" তাঁহার আশীর্বাদ মাথায় করিয়া লইলাম। ইহার পর হইতে তিনি আমাকে দেখিলেই খুব হাসিতেন।

আর এক রবিবার মায়ের কাছে উপস্থিত হইলাম। সেদিন ভক্তেরা কেহ আসিয়াছেন, কেহ আসিতেছেন। আমি প্রণাম করিলে মা বলিলেন, 'একটু বস।' তিনি কিছু প্রসাদ দিলেন। উহা খাইতে খাইতে তাঁহাকে বলিলাম, "মা, একটি দিন সুযোগ হয় না যে অনেকক্ষণ ধরে মনের সকল কথা জিজ্ঞাসা করি।"

মা—আমার তো সকল ছেলেরই কথা শুনতে হয় ! তবে দু-একটি জিজ্ঞাসা কর, উত্তর দিচ্ছি।

আমি—মা, যারা খুব গরিব, কাশী কি অন্য কোন ধামে যেতে পারে না, তাদের ঐ রকম ফল আর কিসে হয় ?

মা—কেন, তারা দক্ষিণেশ্বরে কিংবা বেলুড়ে গেলে সে ফল হয়, যদি সে রকম বিশ্বাস থাকে ! যাঁর জন্য কাশী যাওয়া, তিনি দক্ষিণেশ্বরে ও বেলুড়ে আছেন।

আমি—মা, আমাদের কি উপায় হবে ?

মা—তোমাদের কি ভয় ? যারা ঠাকুরের কৃপা পেয়েছে কিংবা তাঁর কোন সংস্রবে এসেছে তাদের জন্য ঠাকুরই সব করবেন।

ইহার পরই প্রণাম করিয়া বিদায় লইতে হইল। অন্য দু-একদিনের সামান্য কথাবার্তা এখানে দিতেছি।

আমি—মা, আমাদের জপধ্যান কি পদ্ধতিতে করতে হবে ?

মা—যেভাবে ও যেমন ইচ্ছা হয় ঠাকুরে একটু মন রেখে করবে। তাতেই সব মিলবে। তোমার ভাবনা কিসের ?

আমি—মা, ভাবনা নেই, তবু আপনার শ্রীমুখের আদেশ পাবার জন্য জিজ্ঞাসা করছি।

মা—তোমাদের জন্য সকলেই আছেন। ঠাকুর আছেন, আমাকে তো দেখতেই পাচ্ছ।

আমি—মা, স্বামীজীকে ও ঠাকুরকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি।

মা—ভক্তি করে ডাক, সকলকেই পাবে। আমি বলছি, তোমরা ধন্য যে এমন সময় জন্মেছ। তাঁর লীলাখেলা দেখার সময় এখন। শ্রদ্ধা ও ভক্তির চোখে দেখলে সবই সহজ।

আমি—মা, মানুষের ইচ্ছামতই কি সব কাজ হয় এবং আশা পূর্ণ হয় ?

মা—সৎ ইচ্ছাগুলিই পূর্ণ হয়।

—ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ রায়, বরিশাল

(২৪)

শ্রীশ্রীমায়ের নিকট দীক্ষা লওয়ার কিছুদিন পরে লালমোহনের (কপিলেশ্বরানন্দের) মনে সন্দেহ হয়, "এ আবার কি করিলাম ? স্ত্রীলোকের নিকট দীক্ষা লইলাম ?" ক্রমে তাহার অত্যন্ত অশান্তি আসে। পরে সে স্থির করিল যে এক দিবসের মধ্যে ঠাকুর যদি এ বিষয়ে তাহাকে বুঝাইয়া না দেন তাহা হইলে সে মন্ত্র ত্যাগ করিবে। পরদিন পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের আদেশে সে কলিকাতায় শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে দুধ লইয়া গেল। মাকে প্রণাম করিয়া উঠিলে মা তাহাকে বলিলেন, "দেখ, আমি তো তোমায় মন্ত্র দিইনি, ঠাকুর দিয়েছেন।" কিছুদিন পরে আবার তাহার সন্দেহ হয়। মনে হইল, "যদি ঠাকুরই মন্ত্র দিলেন তবে হরেনবাবু এসে যদি বলেন, 'মায়ের কাছ থেকে শক্তি পেয়েছি,' তাহলে জানব সব সত্য !" তাহার কিছুদিন পরে উৎসবের সময় হরেনবাবু মাকে প্রণাম করিয়া মঠে আসিয়া

লালমোহনকে বলিলেন, "আজ মায়ের কাছ থেকে বিশেষ শক্তি পেয়েছি।" তখন তাহার সকল সন্দেহ মিটিল।

একবার 'উদ্বোধনে' পাচক-ব্রাহ্মণকে কোন বিশেষ কারণে ছাড়াইয়া দিবার কথা হয়। কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের সেবার অসুবিধা হইবে বলিয়া তথাকার অধ্যক্ষ তাহাকে জবাব দিতে পারেন নাই। মা ইহা শুনিয়া বলিলেন, "তোমরা সন্ন্যাসী, তোমাদের ত্যাগই লক্ষ্য, একটা চাকরকে তোমরা ত্যাগ করতে পার না?"

মঠের কোন ভৃত্য কথার অবাধ্য হওয়ায় জনৈক মহারাজ তাহাকে চাপড় মারিয়াছিলেন। উহা মায়ের কানে যাইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "ওরা তো সন্ন্যাসী, গাছতলায় থাকবে। তাদের আবার মঠ, বাড়ি, চাকর – আবার সে চাকরকে মার!"

ব্রজেশ্বরানন্দ উত্তরাখণ্ডে তপস্যা করিতে যাইবার জন্য মায়ের অনুমতি চাহিতে গিয়াছিল। মা শুনিয়া বলিলেন, "এ কার্তিক মাস, যমের চার দুয়ার খোলা, আমি মা হয়ে কেমন করে তোমায় এখন যেতে বলি?"

একজন অতি গর্হিত কর্ম করিয়াছিল। তাহাকে কঠোর দণ্ড দিবার জন্য মাকে কেহ কেহ বলিয়াছিল। মা তাহাতে বলেন, "আমি মা যে গো, আমি কেমন করে অমন কথা বলব?"

এক সময়ে একটি ভক্ত মাকে বলিয়াছিল, "মা, আমি বড় গরিব। ইচ্ছা হয়, যখন তখন আপনার দর্শনে আসি। কিন্তু আপনার জন্য ইচ্ছামত কিছু আনতে পারিনে বলে সব সময় আসতে পারিনে।" শুনিয়া করুণাময়ী স্নেহবাক্যে বলিলেন, "বাবা, যখন আসবার ইচ্ছা হবে, একটা হরীতকী হাতে করে এসো।"

জনৈক ভক্ত মাকে দর্শন করিতে গিয়াছেন। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি আমার কাছে দীক্ষিত?" ভক্ত বলিলেন, "হাঁ, মা। মা, আমি বড় সংসারী। নিজে বিবাহ করিনি, কিন্তু ভাইয়ের মেয়ের দ্বিরাগমন ইত্যাদি নিয়ে আছি। আমার কি হবে, মা?"

মা বলিলেন, 'দেখি।' ইহা বলিয়া বক্ষ স্পর্শ করিবার জন্য হাত বাড়াইলেন। ভক্তটি তাড়াতাড়ি কোটের বোতাম খুলিতেছেন। কিছুদূর হাত লইয়া মা বলিলেন, "থাক, থাক, আর খোলবার দরকার নেই। তোমার তো হবে। না হলে আমার হাত ওদিকে যেত না। আমার তো নিজের কোন জিনিস দিইনি—ঠাকুরের দেওয়া জিনিস। না হলে তাঁকে আসতে হবে। আমি তো, বাবা, ব্যবসা করতে বসিনি। দেখ না, কার্তিককে (তার গুরু) ক্ষেপিয়ে দিলে। ভাল করতে পারলে না, মন্দ করলে।"

জনৈক ত্যাগী ভক্তের মাতা পুত্রের সংসারে ফিরিয়া যাইবার প্রস্তাব শ্রীশ্রীমায়ের নিকট করায় মা বলিলেন, "ত্যাগী ছেলে গর্ভে ধরা বড় সৌভাগ্যের কথা। লোকে একটা পেতলের বাটির মায়া ত্যাগ করতে পারে না, আর সংসার ত্যাগ করা কি সোজা কথা! তুমি ওর মা, তোমার ভাবনা কি? সাধু হলেই বা, সে তোমাদের সেবা করবে।"

ঠাকুরের কথাপ্রসঙ্গে মা জনৈক ভক্তকে বলিতেছেন, "বাস্তবিকই তিনি ভগবান,

জীবের দুঃখে দেহধারণ করে এসেছিলেন—রাজা যেমন ছদ্মবেশে নগরভ্রমণে যান। একটু জানাজানি হলেই সরে পড়েন।"

শেষবার জয়রামবাটীতে রাঁধুনী ব্রাহ্মণী রাত্রি নয়টার সময় আসিয়া বলিল "কুকুর ছুঁয়েছি, স্নান করে আসি।" মা বলিলেন, "এত রাত্রে স্নান করো না, হাত পা ধুয়ে এসো কাপড় ছাড়।" রাঁধুনী বলিল, 'তাতে কি হয়?' মা বলিলেন, "তবে গঙ্গাজল নাও।" তাহাতেও তাঁহার মন উঠিল না। তারপর মা বলিলেন, "তবে আমাকে স্পর্শ কর।"

নবাসন হইতে জ্ঞানানন্দ মধ্যে মধ্যে নানাপ্রকার খাবার প্রস্তুত করিয়া জয়রামবাটী লইয়া যাইত। পথে এক গ্রামের কতকগুলি লোক সর্বদা তাহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইত। একদিন তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, "আহা, কি মোহেই পড়েছে!" জ্ঞান যাইয়া মাকে এই কথা বলিলে মা উত্তেজিতা হইয়া বলিলেন, "দেখ, বাবা, এরা হচ্ছে সংসারী জীব নরকের কীট, এদের থাক আলাদা। এরা বারবার আসবে আর মরবে সংসারে পড়ে পচবে। যদি কোনকালে ভগবানের কৃপা হয় তবে মুক্ত হবে।"

জনৈক গৃহস্থ শিষ্য (রাজেন্দ্রলাল দে) মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মা, আমি কায়স্থ ঠাকুরকে অন্নভোগ দিতে পারি কিনা?" মা বলিলেন, "বাবা, তুমি তাঁর সন্তান। অন্নভোগ দেবে, তাতে দোষ কি? স্বচ্ছন্দে দিতে পার।"

ঢাকার শ্রীযুত পীতাম্বর নাথ জয়রামবাটীতে মায়ের বাড়ির বারান্দায় বসিয়া মায়ের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন। মা ঘরের ভিতরে ছিলেন, বলিলেন, "বাবা ঘরে এসে বসে বল।" ভক্তটি বলিলেন, "মা এইখানেই (বারান্দায়) বসি, আমি হীন জাত।" মা তাহাতে বলিলেন, "কে বলেছে তুমি হীন জাত? তুমি আমার ছেলে, ঘরে এসে বস।"

একদিন 'উদ্বোধনে' মায়ের অপার করুণার প্রসঙ্গ হইতেছিল। যোগেন-মা হাসিতে হাসিতে মায়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তা মা আমাদের যতই ভালবাসুন, তবু ঠাকুরের মতো নয়। ছেলেদের জন্য তাঁর কি ব্যাকুলতা, কি ভালবাসা দেখেছি, তা বলবার নয়।" মা বলিলেন, "তা হবে না? তিনি নিয়েছেন সব বাছা বাছা ছেলে কটি—তা আবার এখানে মন্ত্র টিপে, ওখানে মন্ত্র টিপে। আর আমার কাছে ঠেলে দিয়েছেন একেবারে সব পিঁপড়ের সার।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসঙ্গে মা একদিন বলিলেন, "ঠাকুর যে অমন ত্যাগী ছিলেন, তবু আমার জন্য ভাবনা ছিল। একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'তোমার ক-টাকা হলে হাতখরচ চলে?' আমি বললাম, 'এই পাঁচ-ছ টাকা হলেই চলে।' তারপর জিজ্ঞাসা করছেন, 'বিকেলে কখানা রুটি খাও?' আমি তো লজ্জায় বাঁচি না—কি করে বলি। এদিকে বারবার জিজ্ঞাসা করছেন। তাই বলতে হলো, এই পাঁচ-ছ খানা খাই'।"

রাধু একদিন ক্রুদ্ধ হইয়া মাকে বলিল, "তুই কি জানিস! স্বামীর মর্ম তুই কি বুঝিস!" মা ইহা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তাই তো গো! স্বামী তো ছিলেন ন্যাংটা সন্ন্যাসী।"

কেশবানন্দ কথাপ্রসঙ্গে মাকে একদিন বলেন, "মা, আপনাদের পরে ষষ্ঠী, শীতলা প্রভৃতি দেবতাকে আর কেউ মানবে না।" মা বলিলেন, "মানবে না কেন? তারা তো আমারই অংশ।"

কেশবানন্দ আর একদিন মাকে বলেন, "মা, হয় দেশের লোকের মতিগতি ভাল করে দিন, নয় আমার কাজের ঝোঁক কেড়ে নিন। গড়তে কেউ নেই, আরও ভাঙতে চায়।" মা তাহাতে উত্তর দেন, "বাবা, ঠাকুর বলতেন, 'মলয়ের হাওয়া লাগলে যে-সব গাছের সার আছে তারা চন্দন হয়।' মলয় বয়ে গেছে, এইবার সব চন্দন হবে। কেবল বাঁশ, কলা ছাড়া।"

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, ওঁরা (মায়েব আত্মীয়রা) এত আপনার সঙ্গ কবছেন, তবু একটুও জ্ঞান হয় না কেন?" মা বলিলেন, "সব বাঁশ, শিমূলগাছ—চন্দনের কাছে থাকলে কি হবে? সারবান বৃক্ষ হওয়া চাই।"

একটি ভক্ত মহিলা শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, আপনি যে ভগবতী তা আমরা বুঝতে পারি না কেন?" মা বলিলেন, "সকলেই কি আর চিনতে পারে, মা? ঘাটে একখানা হীরা পড়ে ছিল। সব্বাই পাথব মনে করে তাতে পা ঘষে স্নান করে উঠে যেত। একদিন এক জহুরী সেই ঘাটে এসে দেখে চিনলে যে সেখানা এক প্রকাণ্ড মহামূল্য হীরা।"

একবার মা জযরামবাটী হইতে কলিকাতা রওয়ানা হইবেন, এমন সময় সূর্য মামার মা আসিয়া বলিলেন, "মা সারদা, আমাদের ভুলো না, আবার আসবে।" মা নিজেব ঘরের ভিতরে ভূমি স্পর্শ কবিযা প্রণাম করিয়া বলিতেছেন, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গবীয়সী।"

খুব অপ্রত্যাশিতভাবে কোন এক বিশিষ্ট বড় লোকের বাড়ি হইতে এক ভক্ত যুবকের বিবাহের প্রস্তাব আসে। তাঁহারা অনেক টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন। উহাতে যুবকের প্রায় সারা জীবনের অর্থের অভাব ঘুচিয়া যাইতে পারিত। যুবক তখন এম-এ পাস করিয়া এক স্কুলের হেড-মাস্টারি করে। তাহার মন ভোগাকাঙ্ক্ষাশূন্য ছিল না। তাই শ্রীশ্রীমায়ের মত জানিবাব জন্য জয়রামবাটীতে তাহার নিকট বিবাহের কথা উত্থাপন করে (মে, ১৯১৫)। মা সব শুনিয়া বলিলেন, "বাবা, তুমি তো বেশ আছ। কেন সংসার-অনলে দগ্ধ হতে যাবে? তুমি ভাল কাজ করছ। অনেক ছেলে তোমার সাহায্যে পড়াশুনা করছে। তারা সব ভাল হবে, তোমারও কল্যাণ হবে।" যুবকটি বলিল, "মা, মন যে মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়, ভোগের দিকে যায়, তাই ভয় হয়।" মা তাহাতে বলিলেন, "তুমি কিছু ভয় করো না। আমি বলছি কলিতে মনের পাপ, পাপ নয়। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, তোমার কোন ভয় নেই।" মায়ের এই অভয়বাণী শোনা অবধি ভক্তটি আর বিবাহের কথা ভাবে নাই, বা সাময়িক মনের উদ্বেগেও বিচলিত হয় নাই।

একদিন নিবেদিতা স্কুল বোর্ডিং-এর একটি বালিকা সকালে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট যায়।

মা তখন জপ করিতেছিলেন তিনি বোর্ডিং-এর মেয়েদের কথা, কালু নামে একটি ছেলের বিষয়, এবং যে রাস্তা দিয়া মেয়েটি গিয়াছিল, তাহার আশেপাশে কি দেখিল না দেখিল ইত্যাদি নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু মেয়েটি সকল বিষয় যথাযথ উত্তর দিতে পারিল না দেখিয়া মা তাহাকে বলিলেন, "দেখ, মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে সব দেখে রাখবে ; আর যেখানে থাকবে সেখানকারও সব খবরগুলি জানা থাকা চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না।"

একদিন বিকালে উক্ত বোর্ডিং-এর মেয়েরা মায়ের কাছে যাইলে গোলাপ-মা আসিয়া বলিলেন, "মা, এদের একটু ঠাকুরের কথা বল না।" তাঁহার উত্তরে মা বলিলেন, "আমি আর ঠাকুরের কথা কি বলব ? কত কত কথা মাস্টার মশায়ের লেখা 'কথামৃতে' বেরিয়ে গেছে। আহা! মাস্টার মশায়ের দেহটি ভাল থাকলে আরও কত উপদেশ বেরুত এবং লোকের কত উপকার হতো। এখনও যা বেরিয়েছে, সব অমূল্য ধন। আমি কি ছাই অত জানতাম যে ঠাকুরের খুঁটিনাটি কথাটি পরে বেদবাক্য হয়ে দাঁড়াবে ! ঠাকুরের উপদেশের প্রণালীটি কেমন সুন্দর দেখ দেখি! হালদারপুকুর দেখে কত কি বলেছিলেন। এই রকম যেটি সামনে দেখতেন সেটিকেই লক্ষ্য করে কিছু বলা ছিল তাঁর স্বভাব।"

জনৈক ভক্ত মাকে জিজ্ঞাসা করেন, "ঠাকুর বলেছেন, 'এখানে যারা আসবে তাদের শেষ জন্ম।' আবার স্বামীজী বলেছেন, 'সন্ন্যাস না হলে কারও মুক্তি নেই।' গৃহীদের তবে উপায় ?" মা তদুত্তরে বলিলেন, "হাঁ, ঠাকুর যা বলেছেন তাও ঠিক, আবার স্বামীজী যা বলেছেন তাও ঠিক। গৃহীদের বহিঃ-সন্ন্যাসের দরকার নেই, তাদের অন্তঃ-সন্ন্যাস আপনা হতে হবে। তবে বহিঃ-সন্ন্যাস আবার কারও কারও দরকার। তোমাদের ভয় কি ? তাঁর শরণাগত হয়ে থাকবে, আর সর্বদা জানবে যে ঠাকুর তোমার পেছনে আছেন।"

১৯১০ সালে জয়রামবাটীতে সাধনভজন-প্রসঙ্গে মা জনৈক ত্যাগী ভক্তকে বলিয়াছিলেন, "সকাল-সন্ধ্যায় বসবে। আর মাথা ঠাণ্ডা রেখে জপধ্যান করবে। এর চেয়ে মাটি-কোপান সোজা কাজ।" ঠাকুরের ছবির দিকে দেখাইয়া বলিলেন, "ওঁর কৃপা না হলে কিছুই হবে না।" আশ্রমের কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য নিয়মিত জপধ্যানে বিঘ্ন ঘটিতে পারে, এই কথা বলায় মা বলিলেন, "কাজ আর কার ? কাজ তো তাঁরই।" প্রসঙ্গক্রমে আরও বলিলেন, "এর পর মনই গুরু হয়ে উপদেশ দেবে।"

মা একবার কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "আমি সতেরও মা, অসতেরও মা।" তিনি আশ্রিত সন্তানগণকে বলিতেন, "তোমাদের ভাবনা কি ?"

শ্রী—

(২৫)

আমি মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় আসিয়া যেদিন প্রথম শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে যাই সেদিন আমার শরীর ছিল খুবই অসুস্থ। গাড়ি করিয়া বাগবাজার গিয়াছিলাম। যাওয়ার পথেই আমার অত্যন্ত মাথা ঘুরিতে লাগিল ; মনে হইল যেন বমি আসিবে। কোনরূপে বাগবাজার মায়ের বাড়িতে ঢুকিয়াই সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে সিঁড়ির পাশে একটি লম্বা ঘরের দরজায় মাকে পাইলাম। স্নান কবিতে চলিয়াছেন ; যেন আমারই অপেক্ষায় দরজায় হাত দিযা দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমাকে দেখিয়াই একটু হাসিয়া বলিলেন, "কোথা থেকে এসেছ, বাছা ? কেন এসেছ ?"

বলিলাম, "মাকে দর্শন করতে এসেছি।" অমনি মা বলিলেন, "বাছা, আমিই মা। ঐদিকেব ঘবে ঠাকুর আছেন, ঠাকুরকে প্রণাম করে ঐখানে বস. আমি নেয়ে আসি।"

এই বলিয়া মা চলিয়া গেলেন। আমি ঠাকুরঘরের দরজায় গিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বসিলাম। ঠাকুরের ভোগের জন্য কিছু মিষ্টি লইয়া গিযাছিলাম, নলিনীদিদি আসিয়া একটু গঙ্গাজলের ছিটা দিযা আমার হাত হইতে উহা লইযা বাখিয়া দিলেন। ইহাবই মধ্যে মা খুব তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া চলিযা আসিলেন। দেখিলাম, আমি যাওয়াব আগেই ঠাকুরের পূজা ও ফল-মিষ্টি-ভোগ হইয়া গিযাছে। সব সাজানো বহিযাছে। আমি ভাবিলাম, আমাকে যদি মিষ্টি-প্রসাদ খাইতে দেন তাহা হইলে আমার বমি আসিযা পড়িবে, কারণ তখনও আমার মাথা ঘুরিতেছিল। মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুবের জন্য কিছু এনেছ ?" আমি আমাব আনীত মিষ্টি দেখাইয়া বলিলাম, "এনেছি, ঐখানে রেখেছেন।" মা ঠোঙাসহ ঠাকুবেব মুখেব কাছে ধরিয়া বলিলেন, 'ঠাকুব, খাও।'

ইহাব পব পিতলেব একখানা ছোট থালায় কিছু ফল এবং একটু শরবত-প্রসাদ আমাকে খাইতে দিলেন। বলিলেন, "প্রসাদ খাও, বমি হবে না।" কমণ্ডলু হইতে একটু গঙ্গাজল আমাব মাথায় দিলেন এবং কহিলেন, "আমি ঐদিকের ঘরে বসব, তুমি খেয়ে সেখানে যেও।" আশ্চর্যের বিষয. প্রসাদ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি সুস্থ বোধ করিতে লাগিলাম। তাহাব পব মা যে ঘবে বসিয়াছেন সে ঘরে গেলাম। দেখিলাম, মা আমাব বাজরানীর মতো বিশ্বজননীরূপে আসনে উপবিষ্টা . গোলাপ-মা, গৌরী-মা, যোগীন- মা তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিয়া আছেন। দেখিযা আমাব মাকে খুব আপন বলিযাই মনে হইল, কিন্তু অপর যাঁহারা বসিয়া আছেন তাঁহাদিগকে দেখিয়া কি রকম সঙ্কোচ হইতে লাগিল। আমার প্রাণের আবেদন মাকে জানাইতে পারিব কি-না ভাবিতে লাগিলাম। তাঁহাকে বলিলাম, "আট বৎসব যাবৎ প্রাণপণ চেষ্টা করেও আপনার দর্শন পাইনি, কলকাতা পর্যন্ত এসেও দর্শন না পেয়ে ঘুরে গিয়েছি।" এই বলিতেই গৌরী-মা বলিলেন, "সময় না হলে কি মায়ের দর্শন পাওয়া যায় ?" আমি বলিলাম, "এখন বোধ হয় সময় হয়েছে, মা ; এখন আপনাকে

পেয়েছি। আমাকে গ্রহণ করুন। আমি আপনার কাছে দীক্ষা নেওয়ার সঙ্কল্প করে এসেছি। শুনেছি সময় না হলে দীক্ষাও হয় না। আবার কাউকে কাউকে নাকি আপনি এখানকার লোক নয় বলে বিদায়ও দিয়ে থাকেন। কিন্তু আমার বেলায় তা হলে আমি আর বাঁচব না।"

মা আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "না, তোমার দীক্ষা হয়ে যাবে।" জিজ্ঞাসা কবিলেন, "বাছা, তুমি একাদশীতে কি খাও ?"

বলিলাম, "আগে সাগুই খেতাম, এতে নানারকম ভেজালের কথা জেনে এখন আর খাই না।"

শুনিয়াই মা বলিলেন, "না না, আমি বলছি তুমি সাগু খেও, এতে শরীর ঠাণ্ডা থাকে।" তাহার পর অতি দুঃখের সহিত বলিতে লাগিলেন, "বাছা, অনেক কঠোর করেছ। আমি বলছি, আর করো না। দেহটাকে একেবারে কাঠ করে ফেলছ। দেহ নষ্ট হলে কি নিয়ে ভজন করবে, মা ?"

তেল মাখি কি-না জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলাম, "আমি বিধবা হয়ে আর তেল মাখিনি।" শুনিয়া মা বলিলেন, "তেল মাখলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে, তেলটি মেখো।" আমি বলিলাম, "বহুদিনের অনভ্যাসে ে ল যেন ছুতেই ঘৃণাবোধ করি, তেল মাখতে পারব না মা।" গোলাপ-মা বলিলেন, "নিতান্তই ছেলেমানুষ, কঠোর করে করে না খেয়ে দেহটাকে শেষ করে ফেলেছে।" গৌরী-মা বলিলেন, "তুমি মাথার চুল কেটে ফেলে দিয়েছ কেন, বাছা ?" বলিলাম, "আমাদেব দেশের বিধবাদের চুল রাখে না।" তিনি বলিলেন, "চুল না থাকলে চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত দেহ, চুলটি বুঝি শুধু তোমার ?" তখন যোগীন-মা বলিলেন, "এই দেহটি ভগবানের মন্দির। একে সুন্দর করে রাখাই ভাল।" মা বলিলেন, "বেশ তো করেছে, চুল থাকলে একটু বিলাসিতার ভাব আসে ; চুলের যত্ন করতে হয়। যাই হোক মা, কেশের সেতু পার হয়ে তুমি এখানে এসে পৌছেছ। যাব জন্যে এত কঠোরতা, তোমার সে কাজ হয়ে গেছে। এখন আমি বলছি, আর কঠোরতা করো না। কালকে তোমার দীক্ষা হয়ে যাবে। কালকে আটটার সময় এখানে এসে পৌছুবে। দীক্ষা নেওয়ার দিন একটু গঙ্গাস্নান ও মাকালীকে দর্শন করলে ভাল হয়।"

মনে মনে ভাবিলাম, তোমাকে দর্শন করিয়াই আমার কালীদর্শন হইয়া গিয়াছে, তোমার পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া পবিত্র হইয়া গিয়াছি। তৎপর মাকে প্রণাম করিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম।

আমার দেবর ˇসতীশচন্দ্র রায় মায়ের আশ্রিত ছিল। তাহাকে লইয়াই মায়ের কাছে গিয়াছিলাম। আমার বাসস্থানে ফিরিয়া পরদিন পুনরায় আমাকে মায়ের বাড়িতে লইয়া যাইবার জন্য তাহাকে বলিয়া দিলাম। (সে অন্যস্থানে থাকিত।) বাগবাজার হইতে বাসায় আসিবার পর হইতে আবার আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। যাহা হউক, পরদিন আমি মায়ের নিকট যাইবার জন্য তৈরি হইলাম, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে সতীশ আমাকে লইতে আসিল না।

অত্যন্ত হতাশ হইয়া বসিয়া আছি, বেলা বারটায় সতীশ আসিয়া আমাকে বলিল, "কাল রাত্রিতে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী তাহাকে খবর দিয়াছেন, 'কাল বৌমার দীক্ষা হবে না, বৌমার শরীর অসুস্থ ; পরশু দিন বেলা দশটার পূর্বে বৌমাকে নিয়ে তুমি এসো।' সেইজন্যই সে দেরি করিয়া আসিয়াছে।" শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য দূরদৃষ্টির কথা ভাবিয়া বিস্মিত হইলাম। পরদিন সকালে আমিও বেশ সুস্থ আছি। সতীশ ঠিক সময়ে আমাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিল। মায়ের আদেশ অনুসারে কিছু ফল-মিষ্টি, ফুল-বেলপাতা এবং একখানা সরু লালপেড়ে কাপড় লইয়া বাগবাজারে তাঁহার বাড়িতে উপস্থিত হইলাম। মাকে এক অপূর্ব মূর্তিতে দেখিলাম। হলদে রং-এর একখানা কাপড় পরিয়া মা যেন আমার ইষ্টরূপে দরজায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "পাঁচ মিনিট দেরি হয়ে গিয়েছে, শিগ্‌গিব এস ঠাকুরঘরে।" ঠাকুরের সামনে তিনি নিজেই একখানা আসন পাতিয়া উহা হাত দিয়া ঘসিয়া মাজিয়া দিলেন। ভাবিলাম, এই আসনে কি করিয়া বসিব। সঙ্গে সঙ্গে মা তাঁহার দক্ষিণ পা দ্বারা আসনখানা ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, "হয়েছে তো ? বাবা ! মেয়েটি কম নয় !" আমি যাওযার সময় গাড়োয়ানকে দেওয়ার জন্য দুটি টাকা আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু সে সময় আমার সে টাকার কথা মনেও নাই। আমি আসনে বসিতে যাইব তখন মা বলিলেন, "বাছা, তুমি কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী ঠাকুরের আশ্রিত হতে এসেছ, তোমার আঁচলে দুটো টাকা বাঁধা রয়েছে। ওটা খুলে রেখে এস।" অমনি টাকা দুটি খুলিয়া দেয়ালের কাছে রাখিয়া দিলাম এবং আসনে বসিলাম। ...আমি সেদিন মাকে যাহা দেখিয়াছিলাম, ভাবিলাম সেই মা তো এই মা নন। ভাবিয়াই আমি সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিলাম। সঙ্গে সঙ্গেই মা আমাকে হাত ধরিয়া আসনে বসাইলেন এবং আমার মাথায় হাত দিয়া অতি মধুর কণ্ঠে 'মাভৈঃ' এই আশ্বাসবাণী তিন বার উচ্চারণ করিলেন এবং বলিলেন, "ভয় নেই, এই তোমাব জন্মান্তর হয়ে গেল। জন্মান্তরে যত কিছু করেছিলে, সব আমি নিয়ে নিলুম। এখন তুমি পবিত্র, কোন পাপ নেই।" সঙ্গে সঙ্গে আমারও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিল ; মা আমাকে দীক্ষা দান করিলেন। ...আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "জপ-বিসর্জনের কি মন্ত্র আছে ?" মা বলিলেন, "বিসর্জন বলতে নেই, সমর্পণ বলতে হয়।" একটু মিষ্টিপ্রসাদ আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "দীক্ষা নিয়ে গুরুর কাছে বেশি সময় থাকতে নেই। আজকে চলে যাও, কালকে এসে এখানে প্রসাদ পাবে।" আমি মাকে প্রণাম কবিয়া চলিয়া আসিলাম এবং পরদিন দুপুরবেলা গিয়া প্রসাদ পাইলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর তাঁহার কাছে গিয়া বসিয়াছি। মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লেখাপড়া জান তো ? সর্বদাই গীতাখানা একটু একটু পাঠ করবে, ঠাকুরের 'কথামৃত' আর 'রামকৃষ্ণপুঁথি'খানা পড়ো। আরও ঠাকুরের কত বই বের হয়েছে, ঐসব পড়বে।"

আমি বলিলাম, "মা, সংসারে আমার মন মোটেই বসে না, আমি কত কষ্টে যে সংসারের মধ্যে বাস করি তা তুমি অবশ্যই জান। আমার এই প্রার্থনা, আমাকে সংসারের

মধ্যে রেখো না।" মা বলিলেন, "তোমাদের আবার সংসার কি, মা? তোমাদের সংসারও যা, গাছতলাও তা। সংসার কি তিনি ছাড়া? তিনি সবখানেই আছেন। বিশেষ, মেয়েমানুষ কোথায় যাবে, মা? তিনি যেখানে যেভাবে রাখেন সেখানেই সন্তুষ্ট থেকো। উদ্দেশ্য তাঁকে ডাকা ও পাওয়া! তাঁকে ডাকলে তিনি তোমার হাত ধরে চালিয়ে নেবেন, তাঁতে নির্ভর করতে পারলে আর তোমার কোন ভয় নেই। আর একটি কথা—গুরু-শিষ্যে একত্রে বসবাস করা ভাল নয়; কারণ, একত্র থাকলে গুরুর কার্যকলাপ দেখে অনেক সময়ই গুরুকে মানুষ বলে মনে হয় এবং তাতে শিষ্যের ক্ষতি হয়। নিকটে অন্য কোথাও থেকে যদি রোজই কিছু সময় গুরুদর্শন, তাঁর সঙ্গ, উপদেশ পাওয়া যায় তবেই খুব ভাল; কিন্তু সর্বদাই একটু দেখা-সাক্ষাৎ না থাকলে গুরুরও শিষ্যের কথা সব সময় স্মরণে আসে না। রোজই এখানে এসো।"

আমার অবশিষ্ট জীবনের অবস্থাটি যে কি আসিবে ইহা মায়ের কথায় বেশ বুঝিলাম। আমার জন্য যে বন নয়, সংসার রহিয়াছে ইহা ভাবিয়া খুব কাঁদিলাম। আমার কান্না দেখিয়া খুব ব্যস্ত হইয়া আমাকে বুঝাইতে লাগিলেন। বলিলেন, "আমিও তো মা সংসারেই চিরদিন কাটালাম; তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ, ধর্মের জন্যে হেথা সেথা যাওয়া আরও বিপদ। আমি বলছি, যেখানে যে অবস্থায় যে ভাবে থাক, বাইরের আবিলতা তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। ঠাকুর আছেন, তোমার কোন ভয় নেই, ভাবনা নেই।"

ইহার পরেই আমি প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। সেই দিন হইতে প্রায় প্রত্যহই সাধারণতঃ বিকালের দিকে মায়ের কাছে যাইতাম এবং সন্ধ্যার পূর্বে চলিয়া আসিতাম। সাধনভজন যতটুকু দরকার বলিয়া দিয়াছিলেন এবং মনে কোন খটকা বা প্রশ্ন জাগিলে তাঁহার কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া ইহার মীমাংসা করিয়া লইতেও বলিয়াছিলেন, কিন্তু মাকে দেখিয়াই ভরপুর হইয়া যাইতাম। মনে হইত সবই হইয়াছে, সবই পাইয়াছি, আর কিছু পাওয়ার বাকি নাই। মা আমার বিশ্বজননী, রাজরাজেশ্বরী ইষ্টদেবী; গুরুরূপে আমার সামনে দণ্ডায়মানা। আমার পাইবার আর কি থাকিতে পারে? ইহা ভাবিয়া অফুরন্ত আনন্দ হইত। আমি মাকে মোটেই প্রশ্ন করিতাম না। মা নিজ হইতে যাহা বলিতেন তাহা শুনিয়াই পরিতৃপ্ত। একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "মা, তুমি অন্তর্যামিনী, তুমি সবই জান; তথাপি জোরের সহিত বলছি, আমি সংসারীর যে সংসার তা অত্যন্ত ঘৃণা করি এবং ভয় করি। আমার সংসার বাড়িঘর টাকা-পয়সা কিছুই নেই। আমি এসব জিনিস তোমার কাছে জীবনে একদিনও চাইব না। আমার প্রাণ যা চায় সেটা তুমি জান, সেটা আমাকে দিও এবং সংসারীর কাছ থেকে আমাকে দূরে রেখো।" এই বলিয়া অনেক কাঁদিলাম। এসব কথার উত্তরে খুব ছোট কথায় নিতান্ত ছেলেমানুষকে মা যেমন সান্ত্বনা দেন, মাতাঠাকুরানী আমাকে সেইভাবে প্রবোধ দিলেন। আমিও মনের ব্যথা ভুলিয়া আনন্দে ভাসিতে লাগিলাম। মা সময়ে সময়ে বলিতেন, "তোমাদের ঠাকুর বলতেন, 'মায়া-সমুদ্রে ঝাঁপ

দিয়োনি, হাঙ্গর-কুমির খেয়ে ফেলবে।' তবে তোমাদেব ভয় কি? তোমাদের ঠাকুর আছেন।"

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী অত্যন্ত পর্দানশিন ছিলেন। আমাদিগকেও তিনি সেই ভাবে রাখিয়াছিলেন। আমরা মেয়েভক্তই দেখিয়াছি, মঠের কোন সাধু-সন্ন্যাসীকে বড় বেশি দেখি নাই? আমরা শুধু মাকে দেখিয়াই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখা হইয়াছে বলিয়া ধারণা করিয়া নিয়াছি। এখন ভাবি, এই রকম মন ছিল বলিয়াই তিনি আমাদিগকে গ্রহণ করিযাছিলেন। মা শুধু বলিতেন, সকল অবস্থায় সন্তুষ্ট থেকে তাঁর নাম কর।

একদিন সুধীরা দিদি নিবেদিতা স্কুলের কয়েকটি মেয়েকে লইয়া মায়েব ওখানে আসিযাছেন। একটি মেয়ে মাকে বলিল, "মা. ক্ষীরোদ দিদিকে আমাদেব ওখানে থাকতে দেন না কেন? সে মেযেও পড়াবে, সেখানে থাকতেও পারবে।"

আমি কিন্তু ভুলিয়াও তাহাদের কাছে আমাব থাকা-খাওয়ার কথা আলোচনা করি নাই। তাই একটু অসন্তুষ্ট হইযাই ভাবিলাম, কেন এসব বলে? মা বলিলেন, "সকলেই সংসাবে এক কাজেব জন্য আসে না। তোমবা পড়বে ও মেয়েদের পডাবে, এই তোমাদের কাজ। ক্ষীবোদ এসব কবতে আসেনি। পড়াশুনা ভাল কাজ বটে, কিন্তু সকলেব জন্য নয়।" মেয়েবা চলিয়া যাইবার পব বলিলেন, "মেয়েপডানো কি কম কথা?"

আমি মাঝে একবাব দেশে আসিয়া পুনবায় কলিকাতা ফিরিবাব সময় রাধারানীব জন্য একজোডা শাঁখা লইযা গিয়াছিলাম। তাহাকে শাঁখা পরাইতে গিয়া দেখি উহা মাপে খুবই ছোট হইযা গিযাছে. তাহাব হাতে মোটেই যায না। উহাতে রাধু একেবারেই কাঁদিয়া ফেলিল। আমাবও চোখ দিযা জল পডিতে লাগিল। ভাবিলাম এত সাধ করিয়া লইযা আসিলাম. বাধু হাতে দিতে পাবিল না। নলিনীদিদি, সবলাদি, রাধু ও আমি চুপি চুপি এই কথাই আলোচনা করিতেছি. এমন সময মা ঠাকুরঘর হইতে বাধুকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা সকলে এখানে এস।" আমরা যাওযাব পর বলিলেন, 'কি হয়েছে?' রাধু তখন কাঁদিযা বলিল, "দিদিমণি আমার জন্য এমন সুন্দর শাঁখা নিয়ে এসেছেন, সেই শাঁখা আমার হাতে উঠছে না—ছোট হয়েছে।" অমনি মা বলিলেন, "তোদের যা কথা! বৌমা শাঁখা এনেছে, সে শাঁখাও লাগবে না? শাঁখা নিয়ে আমার কাছেই আগে আসতে হয়। আয় তো দেখি, কেমন শাঁখা লাগে না।" এই বলিযা পাঁচ মিনিটেই মা রাধুর হাতে ঐ শাঁখা পরাইযা দিলেন। আমরা সকলে আশ্চর্য হইয়া গেলাম; রাধু চোখে জল নিয়াই হাসিযা ফেলিল। মা বলিলেন, "সুন্দর শাঁখা পবেছ, ঠাকুরকে প্রণাম কর, আমাকে প্রণাম কব ও বৌমাকে প্রণাম কর।" তিনি ঐ কথা বলিতেই আমার বুক দুরদুর করিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলাম, আমাব বাড়িঘর কোথায়, আমি কোন জাতের মেয়ে এবং আমার কে কে আছেন সে-সব কথা মা একদিনও জিজ্ঞাসা করেন নাই। মাকে বলিলাম, "মা, আমি যে কায়েতের মেয়ে, আমাকে রাধু কেন প্রণাম করবে?" মা জিভে কামড় দিয়া বলিলেন,

"ওসব বলতে নেই, তুমি কায়েত কি ব্রাহ্মণ আমি জানি না? তুমি এতদিন ধরে এখানে আছ, এখনও তুমি কায়েতই রইলে ?" এই কথা বলিয়া রাধুকে বলিলেন, "যা, তোর দিদিমণিকে প্রণাম কর।" অমনি রাধু ঠাকুর ও মাকে প্রণাম করিয়া আমাকে প্রণাম করিল। আমিও রাধুকে প্রণাম করিলাম। মা খুব হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, "প্রণামটা ফিরিয়ে দিলে?" আমি কিন্তু ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া গেলাম।

একদিন রাধু, নলিনীদিদি প্রভৃতি সকলে আমাকে ব্যস্ত হইয়া ধরিযাছে—আমার বাড়ি কোথায়, আমি কোন জাতের মেয়ে, আমার কে কে আছে, এইসব বলিতে হইবে। কিন্তু আমি কিছুই বলিতে রাজি নহি। সেইদিনও মা ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা বৌমাকে কি নিয়ে এত জ্বালাতন করছ? আমার এখানে এস, আমি সব কথা বলে দেব।" সকলে ছুটিয়া আসিল, আমিও সঙ্গে সঙ্গে আসিলাম। ভাবিলাম মা ও সব কথা একদিনও আমাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই; আজ কি বলেন আমি শুনিব। ওরা সকলে বলিতে লাগিল, ক্ষীরোদ দিদি এতদিন এখানে আছে, কিন্তু তার বাড়ি কোথায়, সে কোন জাতের মেয়ে, তার কে কে আছে ওসব কিছুই আমাদের বলে না। আজকে আমরা এত করে বলছি, তবুও বলছে না। মা বলিলেন, "আমি সব বলে দিতে পারব, তার জন্মস্থান কমলানেবুর দেশে, শ্বশুরবাড়ি অন্য জেলায়, সে চন্দ্রকান্তের অতি নিকটের লোক; তার কেউ নেই, মাও নেই, ভাই আছে।" এই বলিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠিক হয়েছে তো, বউমা?" মায়ের কথার সঙ্গে সঙ্গেই আমার জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস আসিয়া পড়িল। অন্তর্যামিনী বুঝিলেন, আমার মায়ের কথা বলিতেই আমি দুঃখের সহিত শ্বাস ফেলিয়াছি। অমনি বলিলেন, "আহা! তোমার মায়ের কথা বলতেই তোমার দুঃখ হয়েছে, না বউমা? তোমার গর্ভধারিণী যদি বেঁচেও থাকতেন, তবু কি করতে পারতেন? শুধু চেয়ে চেয়ে তোমার দুঃখই দেখতেন। আমার মতো মা পেয়েও কি তোমার মায়ের দুঃখ রইল?..." একথা শুনিয়া আমি আনন্দে কাঁদিতে লাগিলাম। নলিনীদিদি প্রভৃতিকে বলিলেন, "আর কি জানতে চাও?" তাহারা বলিল, "ও কোন জাতের মেয়ে?" মা বলিলেন, "ওসব আমি বলব না—ওরা ভক্ত, এক জাত।" আমি মায়ের কথা শুনিয়া আনন্দে অধীর হইয়া গেলাম, মুখে কিছু বলিতে পারিলাম না।

কালীপূজার দিন সন্ধ্যাবেলায় আমি শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে গিয়াছি। সেদিন মায়ের বাড়িতে অত্যন্ত ভিড়। যাওয়ার পথে আট আনা দিয়া পাঁচটি চাঁপাফুল কিনিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। অতি কষ্টে সেই ফুল কয়টি মায়ের পাদপদ্মে দিলাম। মা বলিলেন, "আজকে বড় ভিড়। এখানে থেকে কোন কাজ নেই। তুমি সুধীরার সঙ্গে দেখা করে গৌরদাসীর ওখানে যাও, তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে বাসায় ফিরে যেয়ো।" এই কথা শুনিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেলাম। মায়ের এরূপ আদেশ তো কখনও পাই নাই। বলিলাম, "গাড়ি করে

যাব, না পায়ে হেঁটে যাব ? সঙ্গে কেউ যাবে কি, না আমি একাই যাব ?" মা বলিলেন, "পায়ে হেঁটে যাবে, একাই যাবে। চিরদিনই কি তুমি ছেলেমানুষ থাকবে ? যাও—এস গে।"

অমনি মায়ের নাম লইয়া, কোন বিষয়ের বিচার না করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। রাস্তার লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া খুব সহজেই সুধীরাদির স্কুলবাড়িতে পৌঁছিলাম। সুধীরাদি আমাকে দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত্রিবেলা তুমি কি করে এলে আবার ? কেন এসেছ ?" বলিলাম, "জানি না কেন এসেছি ; মা এখানে আসতে বললেন তাই এলাম।" ইহা শুনিয়া সুধীরাদি তাঁহার স্কুলের মেয়েদের ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা পড়াশুনা বন্ধ করে এখানে এস। ক্ষীরোদদিদি মায়ের কাছ থেকে এসেছে, তাকে এসে দেখ।"

সব মেয়েরা আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। 'মায়ের আদেশে এক্ষুণি আমাকে সারদেশ্বরী আশ্রমে যেতে হবে' বলিয়া আমি রওনা হইতে চাহিলাম। সুধীরাদি বলিলেন, 'একাই যাবে ?' আমি বলিলাম, "একা যাওয়ারই আদেশ।"

রওনা হইয়াছি। আমার সঙ্গে সঙ্গে ঐ বোর্ডিং-এর বাহিরের ঘর হইতে এক ভদ্রলোক আমার পিছনে পিছনে চলিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমার কোন পরিচয় নাই, অথচ তিনি আমার সঙ্গে চলিয়াছেন দেখিয়া আমার বুকটা দুরদুর করিতে লাগিল। গৌরী-মার যেরূপ কড়াপ্রকৃতি তাহাতে এই লোককে আমার সঙ্গে দেখিয়া হয়তো আমাকে বকুনি দিবেন। আমি ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে কোন কথাবার্তা বলি নাই। সারদেশ্বরী আশ্রমের দরজায় উপস্থিত হইয়া দরওয়ানকে বলিলাম, "মাজীকে ডাক। বল, বাগবাজার মায়ের ওখান থেকে একজন মেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

একটু পরেই গৌরী-মা একহাতে ঘৃতের প্রদীপ ও একহাতে ধুনচিতে ধূপ জ্বালাইয়া নিচে নামিলেন। আমি প্রণাম করিতে গেলে বলিলেন, "আজকে কি আমি তোর প্রণাম নিতে পারি ?" কিছুতেই প্রণাম নিলেন না। গৌরী-মা অনেকক্ষণ ধরিয়া আমার মুখের কাছে আরতির মতো করিতে লাগিলেন। আমি অবাক হইয়া গেলাম। ইহা করার পরই পূর্বোক্ত ভদ্রলোকটি তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলেন। তৎক্ষণাৎ গৌরী-মার চেহারা বদলাইয়া গেল। ঐ ভদ্রলোককে বলিলেন, "কোত্থেকে এসেছ ? তোমার বাড়ি কোথায় ? এখানে কেন এসেছ ?" তিনি বলিলেন (আমাকে দেখাইয়া), "উনি সুধীরা বসুর কাছে গিয়েছিলেন এবং তাঁর নিকট এখানে আসবেন বলে বললেন ; ভাবলাম আমি তো আপনাকে দেখি নি, ওঁর সঙ্গে এলে আপনাকে দেখতে পাব, তাই এসেছি।"

গৌরী-মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি নাম ?"

তিনি নাম বলাতে আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম। তাঁহার নাম শুনিয়াছি বটে। গৌরীমা বলিলেন, "চিনেছি ; তোমার বাড়ি সিলেটে। তা গৌরী-মা তো পর্দানশিন নন যে

তাঁকে দেখতে হলে এখানে আসতে হবে। সাধু দেখতে হলে বেলুড়ে যেয়ো ; মেয়েমানুষ সাধু কি দেখবে ?"

ঐ ভদ্রলোক বলিলেন, "রবিবারে এলে বোধ হয় আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারব ?"

গৌরী-মা বলিলেন, "না, না, এখানে আমার মেয়েরা সব রয়েছে, এখানে দেখা হবে না।"

এই বলিতেই ভদ্রলোকটি প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। তখন গৌরী-মা আমার দিকে ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন, "শ্রীশ্রীমাকে তুমি কি মনে কর ? মা কি শুধুই কৈলাসেশ্বরী। তাঁকে মানুষ ভাবা চলে না। মা জগদ্‌গুরু, বিশ্বজননী, তাঁকে গুরুত্বে বরণ করেছ। আর ভাবনা কি আছে ?" তাহার পর প্রায় দুই ঘণ্টা কাল মায়ের এবং ঠাকুরের কথা বলিতে লাগিলেন। আমি দরজায় যেভাবে দাঁড়াইয়াছিলাম, সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। গৌরী-মাও দাঁড়াইয়াই কথা কহিতে লাগিলেন। হঠাৎ গৌরী-মা আমাকে ধরিয়া বলিলেন, "চল, মাকে পূজা করতে যাব।" আমি বলিলাম, "বাগবাজারে পুনরায় যাওয়ার আদেশ আমার নেই। বিশেষ রাত হয়ে গেছে ; পরে আমি কি করে যাব ?" গৌরী-মা বলিলেন, "চল, আমি মাকে বলব।" আমি গৌরী-মার সঙ্গে চলিলাম। ছোট দুইটি মেয়েকেও তিনি সাথে লইলেন। একটির হাতে-ফুল-বেলপাতা ও অপরটির হাতে ফল-মিষ্টি। গৌরী-মার হাতে একটি কমণ্ডলু ছিল। দুই পাশের লোক অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। মায়ের বাড়ির দরজায় যাইয়াই শুনিলাম, মা বলিতেছেন, "এই গৌরদাসী এসেছে রাস্তা গুলজার করে।" সেখানে যাইয়া বুঝিলাম গৌরী-মার পূজাই আজিকার মায়ের শেষ পূজা। আর সকলেই পূজা করিয়া ফেলিয়াছেন। গৌরী-মা ঁকালীপূজার মতোই অনেক সময়ব্যাপী পূজা করিলেন। সেই পূজা দেখিবার জিনিস বটে। পরে সকলেই প্রসাদ পাইলেন। গৌরী-মা বলিলেন, "ক্ষীরোদকে আবার এখানে নিযে এলাম। সে বলেছিল, তোমার আদেশ নেই। আমি বললুম, মাকে বলব।"

মা বলিলেন, 'বেশ করেছ।'

সেদিন মায়ের বাড়িতেই থাকা গেল। সে রাত্রিটা যে কি আনন্দে কাটিয়াছিল, তাহা জীবনে ভুলিব না।

আমার বিধবা হওয়ার এক বৎসর পূর্বেই একদিন আমি অনেকগুলি পেঁপে কাটিয়া তরকারি রান্না করিয়াছিলাম। সেই পেঁপের কষ হাতে লাগিয়া হাত চুলকাইয়া ভীষণভাবে আঙুলগুলি ফুলিয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফাটিয়া গেল এবং এমন ভীষণভাবে হাতে ঘা হইল যে, বহু চিকিৎসাতেও আর ভাল হইল না। সেই ঘা ১২ বৎসর থাকে। চামচদ্বারা ভাত খাইতে হইত। সময় সময় একটু কম থাকিত। যখন বেশি হইত, তখন হাতে জল ঢালিলে মাংস পর্যন্ত পচিয়া উঠিত। শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আজ এক বৎসর যাবৎ আছি, কিন্তু একদিনও মাকে হাতখানা দেখাই নাই। আমার অনিত্য দেহের কথা মাকে বলিব না এবং

উৎকট ব্যাধি মা দেখিলে যদি তাঁহার দেহের কোন ক্ষতি হয় সেজন্য তাঁহার নিকট অতি গোপনে রাখিয়াছি। বেশি বাড়িলে মায়ের ওখানে যাইতাম না। একদিন বেশি ঘা নিয়াই চলিয়া গেলাম। সেখানে যাইয়া মাকে প্রণাম করিলাম না, পাছে প্রণাম করিলে পায়ের ধুলা লইবার সময় মা ধরিয়া ফেলেন। এই চিন্তায় একেবারে অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। এমন সময় দেখি একটি বিধবা মেয়ে মাকে প্রণাম করিয়া হাতে কাপড় জড়াইয়া পায়ের ধুলা লইলেন। ইহা দেখিয়া মনে খুব আনন্দ হইল। আমিও মাকে প্রণাম করিয়া হাতে কাপড় জড়াইয়া পায়ের ধুলা লইলাম। প্রণামের সঙ্গে সঙ্গে মা অতি আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "বৌমা, হাতে কাপড় জড়িয়ে ধুলা নিলে কেন ? তোমার হাতে কি কোন অসুখ আছে ?"

তখন মহা বিপদে পড়িলাম, বুক কাঁপিতে লাগিল। ভাবিলাম, ঐ মেয়েটিকে তো বলিতে পারিতেন। তাহাকে না বলিয়া আমাকে বলিলেন, "এইভাবে কেন ধুলা নিলে ?" বলিলাম, "হাতে অসুখ আছে।" আবার বলিলেন, 'দেখি।' হাত দেখিয়া এমনভাবেই দুঃখ করিতে লাগিলেন যে, শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম। বলিলেন, আহা ! বাছা, তুমি এতদিন এখানে আছ, আর তোমার হাতে এরূপ ব্যাধি ! আমি তোমাদেব মা, আমি জানি না। বাছা আমার এত কষ্ট হচ্ছে !" কতদিন ধরে এই রোগ হয়েছে এবং কি করে হলো, জিজ্ঞাসা করায় আমি সব কথা বলিলাম। মা বলিলেন, "বাছা, আমি এখন এমনই হয়েছি, আমাতেই ডুবে থাকি। তোমাদের দিকে বড় তাকাই না। এই হাত নিয়ে ঠাকুরপূজো কর, এতেই রোগ ধরে রয়েছে। যাক, আমার সঙ্গে এস। ঠাকুরপূজোর নির্মাল্য ও চরণামৃত গঙ্গায় ফেলবার জন্য এখনই নিয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি এস।" মায়েব সঙ্গে অন্য ঘরে গেলাম। মা বলিলেন, "ঐ দেখ কমণ্ডলুতে ঐ সব রয়েছে; সবটা হাত এতে ডুবিয়ে দাও।" তাহাই করিলাম। বলিলেন, "আর হাতে অসুখ থাকবে না। তবে মাছ-মাংস, রসুন-পেয়াজে হাত না দিয়ে যতদূব পার থেকো। ওসব একেবারে না ধরেও তো পারবে না। এসব ঘাঁটাঘাঁটি করলে একটু ফুটতে পারে। ঠাকুরপূজো তো রোজই কববে। একটু ফুটলেই ঠাকুরের চরণামৃত দিও। তবেই সেরে যাবে। যেদিন পেঁপে কেটেছিলে সেদিন কি খেউরি করেছিলে ?" বলিলাম, 'মনে নেই।' মা বলিলেন, "খেউরিও করেছিলে এবং পেঁপের কষও লেগেছে। দুটোতে মিলেই ঐ সব হয়েছে।" বিকালবেলা অন্যান্য মেয়েদের কাছে বলিলেন, "ওগো, তোমাদের সকলকেই বলছি, তোমাদের স্বামী, পুত্র এবং তোমরা নিজেরাও নাপিতের নরুন দিয়ে নখ কেটো না। এতে অনেক খারাপ বোগ হতে পারে। এইতো বৌমার হাতে এরূপ হয়েছে। অবশ্য ঠাকুরের ইচ্ছায় এ থাকবে না।"

সেদিন, একসঙ্গে বসে খাওয়া, এক বিছানায় দুজন শোয়া, একজনের কাপড়-গামছা অপরের ব্যবহার করার কত দোষ, কি ভাবে একজনের দেহের ভাল বা মন্দ অন্যের দেহে যায় এইসব বলিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, আমার জীবন-যাপন কি ভাবে হইতেছে, যেখানে থাকি সেখানে বাধ্য হইয়া আমাকে মাছমাংসও রান্না করিতে হয়—আমি এইসব মাকে

কখনও বলি নাই। কিন্তু মা বলিলেন, "ওসব না করেও পারবে না, করলেই হাতে ফুটবে, ঠাকুরের চরণামৃত দিলেই সেবে যাবে।" আশ্চর্যের বিষয়, যেদিন চরণামৃতে হাত ডুবাইলাম, তাহার পরদিন হইতে জীবনের মতো ভাল হইয়া গেলাম, কিন্তু মাছ মাংস প্রভৃতিতে হাত দিলেই হাতে গুটি গুটি বাহির হইত এবং ঠাকুরের চরণামৃত দিলেই ঘণ্টাখানেক পরেই দেখিতাম যে কিছুই নাই। আমি কিন্তু ঐ ব্যাধি সারিবার পরই মাকে বলিযাছি, "মা, দেহের ব্যাধি সারাবার জন্য তোমার কাছে আসিনি। তুমি এই পর্যন্ত দিয়েই আমাকে বিদায় করতে পারবে না।" মা হাসিয়া বলিলেন, "তোমাদের দেহ যে, মা, আমার দেহ। তোমাদের দেহ ভাল না থাকলে আমি যে, মা, কষ্ট পাই।" দৈহিক বা আর্থিক কিংবা অন্য কোন বিষয় মুখে কেন, মনে মনেও চাহিব না—ইহা আমার সঙ্কল্প। আমার ভয়, কি জানি মা ঐ সব দিযাই বিদায় দেন। ভজনে কিছু হইতেছে কি-না বুঝিতেছি না বলিলে বলিতেন, "আমি গুরু, হয় কি না হয় আমি জানি; তুমি কি করে বুঝবে? সব হবে, সব হবে—ভজনের অন্তরায় বাইরে বেশি থাকে না, ভিতরেই থাকে। ওসব ঠাকুরের নাম করতে করতে এবং ধ্যান-ধারণা করলে একটা একটা করে পড়ে যাবে। কাজ করে যাও, রইল কি গেল, সেদিকে তাকিও না।" বলিতেন, "নারকেল গাছের বালদো যেমন সময় হলে আপন হতেই পড়ে যায়, সময় না হলে সেটা ফেলতে অনেক জোর দিতে হয়, সেই রকম। সময় হলে সব যাবে।" তাঁর জপে ও ধ্যানে ডুবিয়া থাকার অবস্থা কেন আসে না জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "সবই তো করছ, সবই হচ্ছে। যে বয়সে বিধবা হয়ে যেভাবে এখানে এসে পৌঁছেছ, মা, তাই যথেষ্ট।তোমার বেশি কিছু করতে হবে না, দিনান্তে ঠাকুরকে দুটো প্রণাম দিলেই হবে। মানুষের একটি জিনিস যদি ঠিক থাকে, তবে আর কিছুই লাগে না। আপনা আপনি তোমার সব হয়ে যাবে।"

দশ বৎসরে আমার বিবাহ হয়, ১৫ বৎসরে বিধবা হইয়াছিলাম। মায়ের পাদপদ্মে আশ্রয় লইয়া তাঁহাকে বলিযাছিলাম, "মা, আমাকে তোমার পাদপদ্মে দিলাম, তুমি আমাকে রক্ষা করো।" মা বলিয়াছিলেন, "কোন ভয় নেই। ঠাকুর তোমাকে হাত ধরে নিয়ে যাবেন।" তাঁহার শ্রীমুখ দিয়া যাহা বাহির হইয়াছে তাহার একটি কথাও অযথা হয় নাই। এখন আমার বয়স ৬০-এর কাছাকাছি, মায়ের পদ্মহস্ত আমার মাথায় পড়িয়াছে, আমার হাত, মাথা মায়ের পায়ে ঠেকাইয়াছি, আমি ধন্য হইয়া গিয়াছি। মায়ের শ্রীমুখের বাক্য 'কোন ভয় নেই, ঠাকুর হাত ধরে নিয়ে যাবেন'—ইহাতেই এত দীর্ঘ জীবন যাপন করিলাম, একদিনও ভোগ-বাসনা বুঝিলাম না। শুধুই আনন্দ, শুধুই আনন্দ! দীক্ষার দিন ছাড়া আর একদিনও তিনি আমাকে বলেন নাই আমি কি করিব; বলিতেন সবই ঠাকুর করিবেন। আমাদের বুঝিতে ভুল হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার বাক্য সত্য। সব সময় তাঁহাকে না ডাকিলেও তাঁহার আশ্রিত সন্তানকে আপদে বিপদে তিনি রক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহার

কৃপা ভিন্ন কেহই বাহাদুরি করিয়া সংসার-বন্ধন জয় করিতে পারিবে না, ইহা বেশ বুঝিয়াছি।

'শুধু হাতে ঠাকুর-দেবতা দর্শন করতে নেই'—ইহা মায়েরই বাক্য ; সেইজন্য রোজই একটু কিছু লইয়া মায়ের কাছে যাইতাম। একদিন মা বলিলেন, "তোমার পয়সা-কড়ি নেই, তুমি রোজই এসব নিয়ে আস কেন, মা ? একটা হরীতকী হাতে করে নিয়ে এসো—এতেই হবে। আমি তোমাদের মুখ দিয়ে যে খাই, মা! তোমরা খেলেই আমার খাওয়া হয়। ঠাকুরের রাজ্যে এসে কতই খেয়েছি।"

আমার মেজদার গুরুতর অসুখ হইয়াছে ; চিকিৎসার জন্য তিনি কলিকাতায় গিয়াছেন। ডাক্তার সর্বাধিকারী অপারেশন করিবেন। আমাদের পরিবারের সকলেই কলিকাতা আসিয়াছেন। শুনিলাম, এই অপারেশনে রোগী বাঁচিবে কি মরিবে ডাক্তারই বলিতে পারেন না। আমি মায়ের কাছে মেজদাকে লইয়া গেলাম। সেদিন রবিবার। বিকালে ছেলেরা প্রণাম করিতে আসেন, যাওয়ার পথে মেজদা একছড়া ফুলের মালা মায়ের পায়ে দিবার জন্য লইয়া গিয়াছেন। সে মালা আমি দেখি নাই। সেখানে যাইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এত লোকের সঙ্গে মাকে প্রণাম করিবেন, আমি কাছেও থাকিতে পারিব না। মা কি তাঁহাকে লক্ষ্য করিবেন ? যাহাই হউক, যখন প্রণামের সময় হইল আমরা এক ঘরে বন্ধ হইয়া গেলাম। প্রণাম শেষ হইয়া গেলে মা রাধুকে ও আমাকে ডাকিলেন। অনেকগুলি ফুল ও মালা সরাইয়া রজনীগন্ধার একটি মালা রাধুর হাতে দিয়া বলিলেন, "ইহা বৌমার ভাই আমাকে দিয়েছে।" বলিলেন, "আমি তোমার ভাইকে দেখেছি।" আমি অবাক হইয়া গেলাম। আর কোন দিন মেজদা এখানে আসেন নাই ; ভাবিতে লাগিলাম, রজনীগন্ধার মালাই তিনি আনিয়াছিলেন কি না। অনেক মালার মধ্যে একটিমাত্র রজনীগন্ধার মালাই দেখিলাম। মাকে বলিলাম, "মা, এঁরই জন্যে সংসারে থাকতে ইচ্ছা নেই। এঁদের কাছ থেকে দূরে থাকবার জন্য তোমার কাছে এত কেঁদেছিলাম। যদি তিনি মরে যান তাহলে ওসব আমাকেই ভুগতে হবে। মা সংসারীদের মধ্যে রয়েছি বলেই তো তোমার পদতলে থেকেও আর বাঁচতে পারি না। এখন কি হবে, কি করব বল ?" মা বলিলেন, "তোমার ভাই এই অপারেশনে যদি নাও মরে, একদিন তো মরবে ?" আর বেঁচে থাকলেই বা তোমার কি উপকার হবে ? সেজন্য এত ভাববে কেন ?" ভাবিলাম, বুঝি এবার মেজদা রক্ষা পাইবেনই না। তখনই মা বলিলেন, "ভয় নেই, ঠাকুর আছেন। যে ঘরে অপারেশন হবে সে ঘরে ঠাকুরের একখানা ফটো রেখে দিও, তিনি রক্ষা করবেন।" ইহা শুনিয়াই বাসায় আসিয়া সকলের নিকট বলিলাম। সকলেই বলিতে লাগিলেন, "আর ভয় নেই, জীবন্ত কালী ছুঁয়ে এসেছে, ভয়ের কোনই কারণ নেই।" সেই অপারেশন একটা বিরাট ব্যাপার—যথাসময়ে হইয়া গেল। ঠাকুরের ফটোও রাখা হইল, মায়ের কৃপায় মেজদা সুস্থ হইয়া দেশে আসিলেন। আমার কাকা, বড়দা ইঁহারা কালীদর্শনের কথা বলায় এইরূপ মত প্রকাশ

করেন—যে কালী শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে পূজা করিয়াছিলেন, সেই কালী, তাঁর পা আমরা দর্শন করেছি, স্পর্শ করেছি; আর কোথাও যেতে হবে না। আমিই মায়ের কাছে প্রথম গিয়াছিলাম। এখন মায়ের কৃপায় এই পরিবারের প্রায় সকলেই শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে শরণ নিয়াছে।

একদিন বিকালবেলা আমি মায়ের ওখানে আছি, এমন সময় একটি বিধবা মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন—গলায় তুলসীমালা, গায়ে নামাবলী। ওঁর আসিবার পূর্বেই মাতাঠাকুরানী গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছেন। মহিলাটি আসিয়া মাকে প্রণাম করিতে গেলেন। মা বলিলেন, "পায়ে হাত দিও না, মাটিতে প্রণাম কর।" কিন্তু তিনি তাহা শুনি'লন না, পা ছুঁইয়াই প্রণাম করিলেন। ঠাকুরের ফটো প্রভৃতি দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া আমাকে বলিলেন, "দেখেছ, কেমন সুন্দর!" মা বলিলেন, "ওকে কি দেখাবে? তুমি যাকে দেখাচ্ছ, সে তাঁর পূজোই করে।" আমাকে দেখাইয়া বিধবাটি বলিলেন, "এটি কি আপনার মেয়ে?" মা উত্তর দিলেন, 'হাঁ, বাছা।' তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কয়টি ছেলেমেয়ে?" মা বলিলেন, "ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সকলেই আমার সন্তান।" মহিলাটি বলিলেন, "আপনার গর্ভজাত সন্তান কজন?" মা উত্তর দিলেন, "উনি ত্যাগী ছিলেন।" এই কথা বুঝিতে না পারিয়া মহিলাটি মাকে একেবারে অস্থির করিয়া তুলিলেন। আমি নিজেও আর ধৈর্য রাখিতে পারিলাম না। মা আমাকে বলিলেন, "তুমি ওকে বুঝাও, আমি আর পারি না।" আমি তখন তাঁহাকে বলিতে লাগিলাম, "তুমি দেখছি মায়ের সম্বন্ধে কিছুই জান না। তবে কি ভেবে মাকে দেখতে এসেছ? মাকে যারা দর্শন করতে আসে, তারা শুধু দর্শন ও প্রণাম-মাত্রই করে না। মায়ের সম্বন্ধে জানবার অনেক আছে। কত বই-এ মায়ের কথা রয়েছে; কত ভক্ত রয়েছেন, এঁদের কাছেই সব জানা যায়। মায়ের সম্বন্ধে যদি তুমি বিন্দুমাত্রও জানতে, তাহলে মাকে এত প্রশ্ন করার সাহস তোমার হতো না। যা বলতে হয় আমাকে বল, মায়ের সঙ্গে কথা বলো না।" তখন সে মহিলাটি বলিলেন, "আমার মেয়ে এখানে আসে। খুব বড়ো মুলো নিয়ে সেদিন এসেছিল।" মা উত্তর দিলেন, "কত লোক কত কিছু দেয়, সে সবের কি আমি খবর রাখি? তোমার মেয়েকে আমি জানি না।" ইহার পর বিধবাটি চলিয়া গেলেন। মা আমাকে বলিলেন, "বৌমা, একটু জল এনে আমার পা ধুইয়ে দাও এবং একটু বাতাস কর।" আমি তাহাই করিলাম।

আমার একটি খুড়তুতো ভাইয়ের নেত্রনালী হইয়াছে। ইহা অপারেশন করার জন্য আমাদের পরিবারের অনেকের সহিত তাহার মা ও বাবা তাহাকে লইয়া কলিকাতা আসিয়াছেন। অপারেশনের পূর্বে তাহাকে লইয়া মায়ের কাছে যাই। পূর্বেই এই অপারেশনের কথা মাকে বলিয়াছিলাম। মায়ের কাছে গিয়া মাকে প্রণাম করিয়াই বলিলাম, (ছেলেটিকে দেখাইয়া) "মা, এরই চোখের অপারেশন করা হবে।" মা বলিলেন, "দেখি কেমন চোখ।" দেখিয়া বলিলেন, "বাবা, এখন হরেক রকম রোগও হয়েছে যেমন, ডাক্তার

বা চিকিৎসকও হয়েছে তেমন! আগে এত রোগও হতো না, এত চিকিৎসাও লোক জানত না! এই রাধুরই কত রকম রোগ, আর কত বা চিকিৎসা! আর কত দেবতারই বা মানত করলাম, কিন্তু সে আর কিছুতেই ভাল থাকে না। ঠাকুরের যে কি ইচ্ছা তিনিই জানেন।" মায়ের কথা শুনিয়া আমি একটু হাসিলাম ; ভাবিলাম, তুমি কিছুই জান না! কথায় মনে হয় রাধুই যেন তাঁহার সর্বস্ব। মা নিজেকে অত্যন্ত চাপা রাখিতেন, তাঁহার চালচলন দেখিয়া কাহারও শক্তি নাই যে তাঁহাকে চিনিতে পারে। তিনি নিজে যাঁহাকে ধরা দিয়াছেন, একমাত্র তিনিই মাকে চিনিয়াছেন। মা ছেলেটির চোখ দেখিয়া কিন্তু ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না। প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। চোখ অপারেশন ভালভাবেই হইল। পরে দেশে ফিরিবার পূর্বে আমার খুড়িমা তাঁহার ছেলেমেয়েদের লইয়া একদিন সকালবেলা মাকে দর্শন করিতে গেলেন। তখন মা পা মেলিয়া বসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের জন্য ফল কাটিতেছেন। তাঁহারা যাইয়াই মাকে প্রণাম করিলেন। মা খুড়িমাকে বলিলেন, "এই সব ছেলেমেয়েই কি তোমার?" তিনি বলিলেন, "হাঁ, মা, আমারই সব।" মা বলিলেন, "বেশ বেশ। দেখেছ এদের ভক্তি কত! সবগুলি ছেলেমেয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেছে। বৌমা এখানকার সব জানে, তবুও সকালবেলা তোমাদের নিয়ে এসেছে; এখন ঠাকুরপূজোর সময়, তোমার সঙ্গে একটু কথাও বলতে পারব না।" খুড়িমা বলিলেন, "সে এখন আসতে বাধা দিয়েছিল। আমাদের আর সময় নেই, সেজন্যই এখন এসেছি। মা, আমরা দেশে যাওয়ার সময় ক্ষীরোদকে কিছুদিনের জন্য দেশে নিয়ে যেতে চাই। এতে আপনার কি মত জানতে ইচ্ছা।" মা বলিলেন, "দেশে নিয়ে যাবে, এত দোষ কি আছে? তবে রাস্তাখরচটি দিয়ে আবার পাঠিয়ে দিলেই হয়।" তা হবে, বলিয়া প্রণাম করিয়া তাঁহারা গাড়িতে উঠিলেন।

আমার পরিচিতা একটি মেয়ে শ্রীশ্রীমাকে কখনও দেখে নাই, তাহার স্বামী ওসব খুব পছন্দও করেন না। মেয়েটি আমাকে একদিন জোর করিয়া ধরিল, তাঁহার স্বামী অফিসে চলিয়া গিয়াছেন, বাসায় ফিরিবার পূর্বে যেন তাহাকে লইয়া মাকে দর্শন করাইয়া আসি। বলিলাম, "এ-সময় মা বিশ্রাম করেন, এখন গেলে দেখা পাবে না!" সে বলিল, "চল না, পরে যা হয় হবে।" তাহাকে লইয়া মায়ের বাড়িতে ঢুকিয়াই দেখি গোলাপ মা প্রসাদ খাইতে বসিয়াছেন। তাঁহার কাছেই গেলাম। ভাবিলাম, মা যখন জাগিবেন তখন দর্শন হইবে। গোলাপ-মা আমাকে দেখিয়া বলিতেছেন, "তোর যত সব কাণ্ড! এখন একে নিয়ে কেন এলি? জানিস না, এখন মায়ের বিশ্রামের সময়?" বলিলাম, "কেন বকছেন? মা-ঠাকরুন না জাগলে আমি তাঁর কাছে যাব, আমি কি এতই পাগল?" একটু পরেই শুনিলাম মা আমাকে ডাকিতেছেন, "বৌমা, এদিকে এস।" মায়ের কাছে গিয়া দেখি, মা তক্তপোশের কাছে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। বলিলেন, "ঐ মেয়েটি কে, মা? এখন এসেছে বলে গোলাপ বুঝি তোমাদের মন্দ বলেছে? এ যে ঠাকুরের রাজ্য। এখানে কোন আইন-কানুন নেই। এখানে সকলেরই অবারিত দ্বার। যখন যার সময় ও সুযোগ হবে,

তখনই আসবে। তুমি কিছু মনে কবো না, মা।" আমবা মাকে প্রণাম কবিযাই চলিযা আসিলাম। গোলাপ-মাকে বলিলাম, "দেখলেন? মানুষ কতখানি আর্তি নিযে মাকে দর্শন কবতে আসে! শুধু মা কেন, আপনাদেবও দর্শন কবতে চায। কিন্তু আপনাবা মাযেব দ্বাবী কিনা, মানুষকে ঠেলে বিদায কবতে চান। মা যে আমাব এক দুজনেব মা নন, তিনি সকলেব মা।" গোলাপ-মা হাসিযা বলিলেন, "যা, যা, তোবই জিত হযেছে।" গোলাপ মা, যোগীন-মা, গৌবী-মা, লক্ষ্মী দিদি প্রভৃতি আমাদেব যেরূপ স্নেহ কবিতেন তাহা অতুলনীয।

কলিকাতাব লেডি ডাক্তাব শ্রীমতী প্রমদা দত্তেব বাড়ি আমাদেব দেশে। তিনি আমাদেবই আত্মীযা। তাঁহাব স্বামীও ছিলেন ডাক্তাব। তাহাবা ব্রাহ্ম। শ্রীমতী প্রমদা দত্ত একদিন মাকে দর্শন কবিতে চাহিলেন, আমাকে লইযা যাওযাব জন্য বিশেষভাবে ধবিলেন। একদিন প্রস্তুত হইলাম। তিনি ডাক্তাবী পোশাক না পবিযা একখানা লালপেড়ে কাপড় পবিলেন। পাযে জুতাও দিলেন না। মাথায গঙ্গাজলেব ছিটা লইযা বওনা হইলেন। মাযেব বাড়িতে ঢুকিযা উপবে উঠিযা সিঁড়িব পাশেব ঘবটিতেই মাযেব ধ্যানস্থ একখানা ফটো থাকিত। ইহা দেখিযাই প্রমদা দেবী জিজ্ঞাসা কবিলেন 'এ কাব ফটো?" বলিলাম, 'মাযেবই। অনেকক্ষণ চাহিযা থাকিযা বলিলেন, "ইনিই স্বযং বাধা।' আমাব হাসি পাইল ব্রাহ্ম হইযা এসব কি বলেন! উপবে যাইযা মাকে প্রণাম কবিলেন। কতক্ষণ পবে সবলাদিকে মা বলিলেন, "ঐ খোকাকে এনে একে দেখাও তো।" খোকাটি যে কাহাব, সেকথা আমাব মনে নাই। মা এই কথা বলিতে প্রমদা দেবী আমাকে ধীবে ধীবে জিজ্ঞাসা কবিলেন, 'ইনি কি কবে জানলেন যে, আমি ডাক্তাব?" পবে ছেলেটিকে দেখানো হইল। বিকাল চাবটায ঠাকুবকে মিষ্টিভোগ দেওযা হইযাছে। মা সকলকে প্রসাদ খাইতে দিলেন, কিন্তু প্রমদা দেবীকে দিলেন না। আমাব যেন একটু লজ্জাই কবিতে লাগিল। এদিকে শ্রীমতী প্রমদা কেবলই আমাকে বলিতেছেন, "সকলকে প্রসাদ দিলেন, আমাকে কেন দিলেন না?" আমি বলিলাম, "তুমি মাকে বল না।" আমাব হাতে প্রসাদ যাহা আছে, তাহাও তাঁহাকে দিতে আমাব সাহস হয নাই। পবে প্রমদা দেবী মাকে বলিলেন, "মা, সকলকে প্রসাদ দিলেন, আমাকে দিলেন না কেন?" মা বলিলেন, "তুমি যে, বাছা, ব্রাহ্ম, তুমি ইচ্ছা কবে না নিলে কি কবে দিই?" তিনি বলিলেন, "আমাকে একটু প্রসাদ দিন।" মাও ঠিক একটি বসগোল্লা বাখিযা দিযাছিলেন উহা তাঁহাব হাতে দিলেন। প্রমদা দেবী প্রসাদ আঁচলে বাঁধিযা মাকে প্রণাম কবিযা বাসায ফিবিলেন তাঁহাব স্বামীকে বলিলেন, 'দেখ, আজ আমি যেখানে গিযাছিলাম তা স্বর্গ। যাঁকে দর্শন ও স্পর্শ কবে এসেছি তিনি স্বযং বাধা। তোমাব জন্য একটু প্রসাদ এনেছি, তুমি যদি শ্রদ্ধাব সঙ্গে নাও তবে দেব।" তিনি বলিলেন, "আমাব মতো নগণ্য একজন মাযেব প্রসাদ না খেলে বিশ্বজননীব কি এসে যায?" এই বলিযা প্রসাদ হাতে কবিযা মাথায ঠেকাইযা খাইলেন। প্রমদা দেবীও সব বর্ণনা

করিয়া কেবলই বলিতে লাগিলেন, "আজ বৃন্দাবনে গিয়ে রাধারানীর পাদপদ্ম দর্শন করে এসেছি, ধন্য হয়ে এসেছি !"

খুড়িমা প্রভৃতির দেশে আসাকালীন আমি তাঁহাদের সঙ্গে যাই নাই। দেশে আসিয়া আমার কাকা আমাকে একখানা পত্র দিলেন। লিখিলেন, "মা, তুমি আস নাই বলিয়া দুঃখ হইতেছে। তুমি জগন্মাতার পাদপদ্মে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়াছ, ইহা ভাবিলে আনন্দের অবধি থাকে না। যদি কোন দিন দেশে আস, তবে যত দোষের গোড়া মনটাকে মায়ের পায়ে বলি দিয়া আসিও। তবেই আর কোন ভাবনা থাকিবে না।" আমি মাকে সেই পত্রখানা পাঠ করিয়া শুনাইলাম। মা শুনিয়া বলিলেন, "মন কি শুধু দোষেরই গোড়া ? ব্রহ্মপদলাভ করার জন্য ছুটেছ, এখন মনকেও সঙ্গে নিতে হবে। সেখানে পৌঁছুলে তখন এরা কেউ থাকবে না। এখন মনের সহায়তারই বেশি দরকার। শুদ্ধ মনই তো মানুষকে পথ দেখিয়ে নেয়।" আমি সে কথা আমার কাকাকে লিখিলাম। শ্রীশ্রীমা আর একটি কথা বলিয়াছিলেন, "দুষ্ট মনকে যদি মোড় ফিরিয়ে দাও, তবে সে-ই ইষ্টকে ধরতে পারে। তা তোমাদের ভাবনার কোনই কারণ নেই। ঠাকুর তোমাদের হাতে ধরেই আছেন। যে-কোন অবস্থায় তিনি সব সময় তোমাদের সঙ্গে আছেন।" মায়ের ওসব কথায় কত যে শক্তি রহিয়াছে, ইহা জীবনে অনেক অনুভব করিয়াছি।

একদিন বিকালবেলায় কয়েকজন স্ত্রীলোক আসিয়াছেন। একজন মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, অনেকেই বলে, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নাকি অবতার নন। এ কি সত্য ?" মা বলিলেন, "তা তারা বলতে পারে, কারণ দেহধারী একজন মানুষকে অবতার বলে ধরে নেওয়া সহজ নহে। এক কথায়, সকলেই যদি অবতার বলে ধরে নিতে পারত তবে আর তাঁকে মার খেয়ে প্রেম বিলাতে হতো না।" বলিতে বলিতে মায়ের চোখ দিয়া শতধারে জল পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে বলিতে লাগিলেন, "অবতার-পুরুষকে সকলে কি ধরতে পারে ? দুই-একজনে চিনতে পারে মাত্র। তাঁরা জীব-উদ্ধারের জন্য কত যাতনাই না সহ্য করেন ! ঠাকুরের গলা দিয়া রক্ত বের হতো, তবুও কথার বিরাম নেই, কিসে জীবের মঙ্গল হয়।" তাহার পর মা 'মাগুরমাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল, বোল হরি বোল'—গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর এই কথাটি কি ভাবে বলা হইয়াছিল, কি ভাবে লোকে বুঝিয়াছিল, ইহার প্রকৃত অর্থ কি, সব বলিয়া সর্বশেষে বলিলেন, "অবতার দিয়ে তোমাদের কাজ কি ? যার যার গুরুই তার কাছে অবতারের চেয়ে অনেক বড় জিনিস—এই মনে করে বসে থাক।"

বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট যে মেয়েরা থাকিত তাহাদের চালচলন মা খুব লক্ষ্য করিতেন। একটি ঘটি বা বাটি জোরে ফেলিলেও মা খুবই বিরক্তি-প্রকাশ করিতেন, বিনা কারণে কাহারও সঙ্গে কথা বলিবারও আদেশ ছিল না। একদিন রাধারানী উপর হইতে খুব জোরে নামিতেছে, তাহার পায়ে মল ছিল, উহার শব্দ শুনিয়া মা এমনিভাবে উপরের দিকে চাহিয়া রহিলেন, দেখিয়া ভয় হইতে লাগিল। রাধু আসিতেই মা বলিতে লাগিলেন, "রাধি,

তোর লজ্জা নেই? নিচে সব সন্ন্যাসী ছেলেরা রয়েছে, আর তুই মল পায়ে পরে উপর থেকে দৌড়ে নাবছিস, ছেলেরা কি ভাববে বলতো? তুই পায়ের মল এখুনি খুলে ফেল। এখানে ছেলে মেয়ে যারাই আছে, তারা তামাসা করার জন্যে আসেনি, সকলেই সাধন-ভজন করছে। এদের ভজনের ব্যাঘাত ঘটলে কি হবে জানিস?" এই সব বলিতেই রাধু পায়ের মলগুলি খুলিয়া মায়ের কাছে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তাহার ভয় নাই, কিন্তু আমরা সকলে ভয়ে অস্থির হইলাম। আর একদিন রাধু স্নানের পর চিরুনি দ্বারা মাথা আঁচড়াইয়া একখানা গামছায় চাপ দিয়া চুলের পাতা নামাইতেছে। ইহা দেখিয়া মা বলিতেছেন, "ওসব কি করছিস? ওসব করলে তোরা ভাবিস খুবই সুন্দর দেখা যায়; তা নয়, আমার কাছে ও বিশ্রীই লাগে। আমি তো জীবনে চুলই বাঁধিনি। গৌরদাসী এসে আমাকে কখনো কখনো চুল বেঁধে দিত, তাও আমি বেশি সময় রাখতে পারতুম না, খুলে ফেলতুম। এখন তোদেরই দেখছি অন্য রকম।" গোলাপ-মা কাছে ছিলেন। তিনি বলিলেন, "তুমি যে মা মুক্তকেশী, তাই চুল খোলা রাখবে না তো কি করবে?"

একদিন এক মুন্‌সেফের স্ত্রী মায়ের ওখানে আছেন। তখন মহাযুদ্ধের আলোচনা হইতেছে। ঐ মেয়েটি মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, সকলেই বলে এই যুদ্ধ নাকি এখানে পর্যন্ত এসে পৌঁছুবে। তা হলে আমাদের দশা কি হবে, মা?" মা বলিলেন, "ওসব কিছু না, এখানে কি করতে আসবে? সেখানেই যেমনটি হওয়া দরকার তেমনটি হয়নি, আবার এখানে আসবে কেন?" ইহার পর অনেকেই এ বিষয়ে অনেক কথা বলিলেন। মা যেন একটু স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিলেন।

দেশে খুব দুর্ভিক্ষ লাগিয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশন হইতে দুর্ভিক্ষপীড়িত লোককে অনেক সাহায্য করা হইতেছে। একদিন মা এমনভাবে দুর্ভিক্ষের কথা বলিতে লাগিলেন—কোথায় কত দুরবস্থা, মিশন হইতে কত টাকা ঐ কার্যের জন্য দেওয়া হইতেছে, ছেলেরা কত খাটিতেছে ইত্যাদি—যেন মনে হইল, জগতের সব দুঃখ তিনি আপন প্রাণে অনুভব করিতেছেন।

আমি মাঝে মাঝে প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে লক্ষ্মীদিদির ওখানে যাইতাম। লক্ষ্মীদিদি আমাকে গোপনে প্রায়ই বলিতেন, "মাকে বলিস আমি এখানে থাকব না। এই যে আমার ভাই-এর মেয়েরা আমার সেবা-যত্নের জন্য রয়েছে, এরা কোন ভক্তের আসা পছন্দ করে না। যেখানে ভক্ত নেই সেখানে আমি থাকতে পারব না। মাকে বলিস আমি বৃন্দাবনে চলে যাব, তোকেও আমার সঙ্গে নিয়ে যাব।" আমি সব কথা মাকে বলিলাম। মা বলিলেন, "দেখ বৌমা, ভক্ত দেখলেই লক্ষ্মী একেবারে পাগল হয়ে যায়। সেইজন্যই ঐ মেয়ে দুটি ভক্ত এলে বিরক্ত হয়; তাদের দোষ নেই, বাছা। লক্ষ্মীকে বলো, আমি একদিন যাব। আর তোমাকে তার সঙ্গে কোথাও যেতে হবে না। সে রাস্তায় যদি কোন ভক্ত দেখে, তবে সেখানেই সাতদিন থেকে যাবে। তাকে রক্ষা করার জন্য সর্বদা সঙ্গে লোক থাকতে হয়।

সে বৃন্দাবনে থাকতে চায়, ওখানে যেরূপ বানরের উপদ্রব, ও কি থাকতে পারবে?" আমি সকল কথা লক্ষ্মীদিদিকে বলিলাম। আরও বলিলাম, "তোমার যা অবস্থা তাতে অন্যত্র তোমাকে পাঠাতে হলে বিশেষ বন্দোবস্ত করে পাঠাতে হবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের যা হতো তোমারও নাকি তাই হয়।" বলিতেই লক্ষ্মীদিদি আমাকে বকিতে লাগিলেন। বলিলেন, "ঠাকুরের যা হতো তা কি মানুষের হয়? আমার কি এক ব্যাধি হয়েছে, আমি তাই কোথাও যেতে পারি না।" লক্ষ্মীদিদি নিতান্ত ছেলেমানুষের মতো হইয়া গিয়াছিলেন।

একদিন কম্বল বিক্রি করিবার জন্য একজন স্ত্রীলোক আসিয়াছে। নলিনদিদি কম্বল রাখিবার জন্য দর করিতেছে। কম্বলওয়ালী দাম ১।০ আনা চাহিতেছে। নলিনদি ১ টাকা বলিতেছে। মা দূর হইতে শুনিয়া নলিনদিকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি এর সঙ্গে কি নিয়ে দামকসাকসি করছ?" সে বলিল, "আমি কম্বলের দাম এত বলি, সে এত বলে।" অমনি মা একটু অসন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, "তুমি চারআনা পয়সার জন্য তার সঙ্গে এতক্ষণ যাবৎ খ্যাচ ম্যাচ করছ? ছিঃ, সে দুপয়সা পাওয়ার জন্যই মাথায় করে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়। আর তুমি কিনা সামান্য পয়সার জন্য এতখানি সময় ওকে আটকে রেখেছ। বিশেষ, তোমার কম্বলের দরকারই বা কি? সবই তো তোমার আছে, তবু কিনতে গিয়েছ। (আমাকে দেখাইয়া) বরং বৌমাকে একখানা দিলে ভাল হতো। ও কম্বল ছাড়া অন্য জিনিস ব্যবহার করে না, তাও একখানা মাত্র কম্বল। এত শীতে সে এই নিয়ে থাকে, তবু কারুর কাছে চায় না। দুখানা কাপড়ের বেশি বোধ হয় জীবনে তিনখানা কাপড় পরেনি। তবু এতেই বেশ আনন্দে আছে। লোকের ভাল জিনিসটি তোদের চোখে পড়ে না।" আমি শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম কম্বলের কথা বা কাপড়ের কথা একদিনও তো মাকে বলি নাই, মা এতটা খবর রাখেন! আমাদের মা যে সত্যিকার মা, ইহা কতবারই না তিনি বুঝাইয়া দিয়াছেন! স্থূলদেহের অন্তরালে গিয়া মা আমার এখন আরও বেশি করুণা বিতরণ করিতেছেন। মাকে এখন যাহারা ডাকে অন্তর্যামিনী তাহাদের কাছে উপস্থিত হইয়া সকল গোল মিটাইয়া দেন। আগে মার কাছে যাইতে হইলে কত যোগাযোগের দরকার হইত—এখন মনপ্রাণ ঢালিয়া ডাকিলে এক জায়গায় বসিয়াই পাওয়া যায়। মায়ের সন্তান যাঁহারা, তাঁহারা বিপদে পড়িলে তাঁহাকে না ডাকিলেও তিনি যেন নিজের দরকারেই আসিয়া রক্ষা করিয়া থাকেন—এইরূপও কত ঘটনা শুনিতে পাইয়াছি।

একবার দেশ হইতে ঠিক সপ্তমীপূজার দিন কলিকাতায় আসিয়াছিলাম। আমার শরীর তখন নিতান্ত খারাপ, জ্বর হইতেছিল, সেই জ্বর লইয়াই মাকে পূজা করিব, সেই ভরসায় মনোমত কয়েকটি ফুলসহ মায়ের কাছে গিয়াছি। কিছুদিন আগে পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের দেহ গিয়াছে। সেবার মঠে দুর্গাপূজা হইবে না। কাশীর মঠে পূজা হইবে। আমি মায়ের কাছে যাইয়া মাকে পূজা করিলাম। মা আমাকে দেখিয়াই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আহা, বাছা আমার কেমন হয়ে গেছে!" প্রেমানন্দ মহারাজের

জন্যও দুঃখ করিলেন। বলিলেন, "আজ রাত্রেই তুমি কাশীতে রওনা হও। এখানের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী কয়েকজনও কাশী যাবে। তোমার শরীর নিতান্ত খারাপ হয়ে গেছে, কাশীতে মাসখানেক থাকিও।" বলিলাম, "সেখানে যেয়ে কি হবে। আমার এখানে থাকতে ভাল লাগে।" মা বলিলেন, "বল কি? সেটা হলো বিশ্বনাথের ধাম।" বলিলাম, "এটাও অন্নপূর্ণার ধাম।" মা হাসিয়া বলিলেন, "তা হলেও কিছুদিন সেখানে থাকলে শরীর ঠিক হয়ে যাবে।" আমি কিছু তেঁতুলের আচার দেশ হইতে নিয়া গিয়াছিলাম। অনেক লোক দেখিয়া ভাবিলাম এত ভিড়ে আচারই বা কোথায় যাইবে, মায়ের সেবায় লাগিবে কি-না অন্তর্যামিনী মা আমার গোলাপ-মাকে ডাকিয়া বলিলেন, "এই আচারটুকু যত্ন করে রাখ, পরে খাওয়া যাবে, বৌমাকে কিছু ফল রাস্তায় খাওয়ার জন্যে দিয়ে দাও।" উহা দেওয়া হইল। আমরা রওনা হইলাম। তখন কাশীতে ভীষণ ইনফ্লুয়েঞ্জা। সেখানকার মহারাজগণ আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "এখন যেরূপ ব্যাধির আক্রমণ কাশীতে দেখা দিয়েছে, এতে আপনি সুস্থ হবেন এ তো দূরের কথা, না জানি এই রোগেই আবার কাতর হয়ে পড়েন।" মায়ের আদেশে আসিয়াছি, যাহা হইবার হইবে ভাবিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। সেবার নলিনীদিদি প্রভৃতিও গিয়াছিলেন। তাঁহারা পূজার পরই অন্যত্র চলিয়া গেলেন, আমি কাশীতেই রহিলাম। আমি রাণামহলে থাকিতাম। কিছুদিন পরে আমার সেই ব্যাধি হইল। তখন মহারাজগণ ডাক্তার ও ঔষধ পাঠাইয়া আমাকে খুবই সাহায্য করিতে লাগিলেন। একদিন স্বপ্নে দেখি মা আসিয়া বলিতেছেন, "কোন ভয় নেই, আমি আছি। আমি তোর যত্ন নেব।" পরদিন হইতেই ভালর দিকে চলিলাম এবং কয়েকদিনের মধ্যে সুস্থ হইয়া উঠিলাম। একমাস পূর্ণ হইতেই পুনরায় কলিকাতা চলিয়া আসিলাম। মা আমাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন "বাঁচা গেল বাবা। যে অসুখ তোমার হয়েছিল, ভালর জন্য পাঠিয়ে মন্দ হতে চলেছিল।"

—শ্রীমতী ক্ষীরোদবালা রায়, সিলেট

নির্দেশিকা *

ঠাকুর - শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ; শ্রীমা - শ্রীসারদামণি, নরেন-নরেন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ; স্বামীজী; ব্রঃ ব্রহ্মচারী; ডাঃ - ডাক্তার; স্বাঃ-স্বামী; ম-মহারাজ, রামদত্ত-রামচন্দ্র দত্ত। 'শ্রীমা' ও 'ঠাকুর' শিরোনামায় শব্দসংখ্যা কমাইবার জন্য এঁদের সম্পর্কে কিছু কিছু শব্দ সংশ্লিষ্ট অন্য শব্দের শিরোনামায় দেওয়া হইয়াছে। যেমন 'শ্রীমা কিরণবাবুর বাড়িতে' কিংবা 'ঠাকুরের পছন্দে পাঁচফোড়ন' ঘটনাগুলি খুঁজিতে 'শ্রীমা' ও 'ঠাকুর' ছাড়া 'কিরণবাবু' এবং পাঁচফোড়ন' শিরোনামায় খুঁজিতে হইবে।

উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী

মমতাপ্রতিমা সারদা

মূল্য : ১০.০০

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিভাসিতা মা সারদা —স্বামী বুধানন্দ

মূল্য : ১৫.০০

শিশুদের মা সারদা দেবী (সচিত্র) —স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

মূল্য : ২০.০০

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা স্বামী সারদেশানন্দ

মূল্য : ২৫.০০

মাতৃসান্নিধ্যে স্বামী ঈশানানন্দ

মূল্য : ২৫.০০

জননী সারদাদেবী স্বামী অপূর্বানন্দ

মূল্য : ৫০.০০

মাতৃদর্শন

মূল্য : ৫০.০০

শ্রীমা সারদাদেবী স্বামী গম্ভীরানন্দ

মূল্য : ৮০.০০

শ্রীমা সারদাদেবী (আলোকচিত্রে জীবনকথা)

মূল্য : ১৪০.০০

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : ওয়েলনোন্ প্রিণ্টার্স, কলকাতা-৯